

বণাহুক্তিক সূচী।

(বৈশাখ—আশ্বিন)

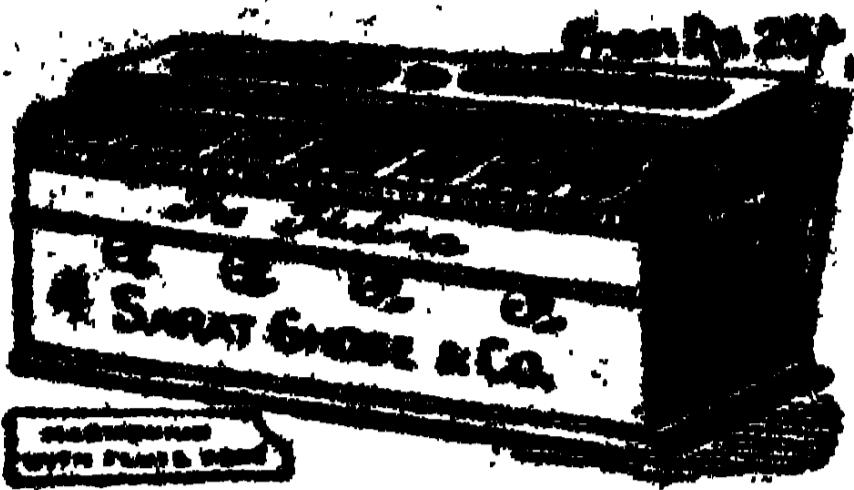
১৩২৬

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
১। অতীতের বোধা	... ওঢ়াঙ্গে আলি	... ৮১
২। আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবন সমস্যা	... শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	... ১৪২
৩। ইং-সবুজপত্র বীরবল ২১০
৪। উড়ো চিঠি মৃতুঞ্জয় ৪১
৫। উদ্বাদনকী আতঙ্ক	... শ্রীশ্রেণানন্দ ভট্টাচার্য অনুবিত্ত	২১১
৬। উপকথা (গল)	... শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৭৪
৭। একধানি পত্র	... ব্রহ্মেন্দ্রসুক্তির বিবেক	১৪২
৮। উহর পৈতৃপাতি শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৬৯
৯। কথিকা (গল)	... শ্রীবৈক্ষণেনাথ ঠাকুর ১৮০, ১৯৬, ২৫১	
১০। কবি	... শ্রীকাণ্ঠিচন্দ্র বোব	২৪৯
১১। খোলা চিঠি শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	১
১২। গান (কবিতা)	... শ্রীবৈক্ষণেনাথ ঠাকুর	১
১৩। ঝিলে ঝলে শীকার	... শ্রীযতী প্রিয়দা মেবী অনুবিত্ত	
		১৩২, ১৯৯, ৩৩৯
১৪। ঝুপ্ ঝুঁ—চুঁ! (গল)	... শ্রীশ্রেণানন্দ ভট্টাচার্য	... ২২৭
১৫। হ-ইয়ারকি শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	... ১১০
১৬। দৃষ্টি (কবিতা)	... শ্রীহেমেন্দ্রলাল রাম	... ৩৩৮
১৭। নতুন ঝুপ কথা (গল)	... শ্রীশ্রেণচন্দ্র চক্রবর্তী	... ৩০৯
১৮। নববর্ষ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	... ২২

୧୯।	ନବୀନେର ପ୍ରତି (କବିତା)	...	ଶ୍ରୀଶୁରେଶଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧୀ	...	୩୦୮
୨୦।	ଲେଖାର ଜେର (ଗଲ୍ଲ)	...	ଶ୍ରୀକାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ	...	୧୧
୨୧।	ପତ୍ର	...	ଶ୍ରୀ ଶିଶିରକୁମାର ସେନ	...	୨୦୭
୨୨।	ପ୍ରତିଧିନି (କବିତା)	...	ଶ୍ରୀଶୈଲେନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଲାହା	...	୩୮
୨୩।	ପ୍ରେସ (କବିତା)	...	ଶ୍ରୀକାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ	...	୩୯
୨୪।	ବିଜ୍ଞାପନ ବରସ୍ତ୍ତ	...	ବିରବଳ	...	୨୦୬
୨୫।	ବିରହକାଞ୍ଚା (କବିତା)	...	ଶ୍ରୀକାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ	...	୨୮୭
୨୬।	ବିସର୍ଜନ (ଗଲ୍ଲ)	...	ଶ୍ରୀବୀରେଣ୍ଟର ମଜୁମଦାର	...	୩୬୪
୨୭।	ଭାଇବୋନ (ଗଲ୍ଲ)	...	ଶ୍ରୀପ୍ରବୋଧ ଘୋଷ	...	୨୫୩
୨୮।	ଭବତୃତି (କବିତା)	...	ଶ୍ରୀଶୈଲେନ୍ଦ୍ରକୁମାର ଲାହା	...	୩୭
୨୯।	ଭାରତେର ନାରୀ	...	ଶ୍ରୀବୀରେଣ୍ଟକୁମାର ଦତ୍ତ	...	୨୭୧
୩୦।	ମହାଦେବ (କବିତା)	...	ଶ୍ରୀଶୁରେଶଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରବନ୍ଧୀ	...	୩୦୬
୩୧।	ଶାହୁମ ଓ ସମାଜ	...	" " "	...	୨୩୨
୩୨।	ମିଳନାକାଙ୍କ୍ଷା (କବିତା)	...	ଶ୍ରୀକାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ	...	୨୮୬
୩୩।	ମେଯେର ବାପ (ଗଲ୍ଲ)	...	ଶ୍ରୀପ୍ରବୋଧ ଘୋଷ	...	୨୮୦
୩୪।	ମୁକ୍ତି (ଗଲ୍ଲ)	...	ଶ୍ରୀକାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ	...	୧୮୭
୩୫।	ମୁକ୍ତିର ଇତିହାସ (ଗଲ୍ଲ)	...	ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର	...	୫୫
୩୬।	ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ପତ୍ର	...	* * *	...	୨
୩୭।	ଷ୍ଵାମେଜ୍ ହୁକ୍ରର ତ୍ରିବେଦୀ	...	ଶ୍ରୀଅତୁଳଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ	...	୬୦
୩୮।	କ୍ଲପ (କବିତା)	...	ଶ୍ରୀଶୁରେଶାନନ୍ଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ	...	୪୦
୩୯।	ସ୍ବ-ଚିମ୍-ଆନନ୍ଦ (କବିତା)	...	ଶ୍ରୀମତୀ ସରଗୀ ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ	...	୧୩୪
୪୦।	ସମ୍ପାଦକେର ନିବେଦନ	...	ଶ୍ରୀପ୍ରମଥ ଚୌଧୁରୀ	...	୧୨
୪୧।	ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚୀ	...	ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ	...	୧୦୩
୪୨।	ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ (କବିତା)	...	ଶ୍ରୀକୁମୁଦରାମନ ମଲିକ	...	୨୮୮

SONORA HARMONIUMS

INDIA'S ACKNOWLEDGED BEST



No. 5—3 Octaves, 2 sets of reeds, 5 stops,
large size, special hollow reeds.

Price Rs. 40.

RECOMMENDED TO BEGINNERS.

আমরা বেহালা, বাঁশী, হারমোনিয়ুম, পিয়ানো প্রভৃতি বিস্তৃতি যান
ও সেতার এস্রাজ প্রভৃতি দ্বাদশী ঘন্টা ও বিক্রয় করি। আমাদের
ইক ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং আমাদের জিনিয়ের
উৎকৃষ্ট সর্বজন-বিদিত।

সেতার, এস্রাজ, ক্ষয়দ, বীণা প্রভৃতি দ্বাদশী ঘন্টার উপরোক্ষ
বিস্তৃতি ইশাতের tempered music wire আমরা আমদানি করি।
একপ সন্তোষজনক তার পূর্বে কথনও আসে নাই।

সঙ্গীত বিদ্যাক যে কোন ঘন্টা সরঞ্জাম বা পুস্তক, আমাদের ও
রেকর্ড আমাদের নিকট পাইবেন।

“আলিবাবা” গানের অলিপিগ্রাম মূল্য ১১০।

SARAT GHOSE & CO.

4, DALHOUSIE SQ. CALCUTTA.

মুবাল্লি খের গান।

“কল-গন এন অপিনায়ক”, “দেশমেশ মলিত”, “অপি কল-গন”
এস্বার্থি অলিপি সহ অন্তর্ভুক্ত।



“ବେଦିନ ଫୁଟଳ କମଳ କିଛୁଇ ଆନି ନାହିଁ ଆମି ଛିଲେଷ ଅଶ୍ୟମନେ !”

—ଶ୍ରୀଜନାଥ ।

* * * ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗନ୍ଧିତେ * * *
“ପୁଣ୍ୟ” — ଅବୁତ୍ପୁଣ୍ୟୋତ୍ସ ହୀରକତ୍ରୁଷ । ୧
“ନରପୁଣ୍ୟ” — ମରକତତ୍ତ୍ଵର ପୁଣ୍ୟରେ । ୨
* * * ବେଦିନ କେବିଦ୍ୟାଳ * * *

গান।

—·:·—

আমাৰ জীৰ্ণ পাতা সাবাৰ বেলায় বাবে বাবে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতাৰ স্বাবে স্বাবে ॥
ভাই ত আমাৰ এই জীবনেৰ বনছায়ে
কাঞ্চন আসে কিৱে কিৱে দৰিন বাস্তে,
নতুন শুৱে গান উড়ে যায় আকাশ পাবে,
নতুন রঙে ফুল ফুটে ভাই ভাবে ভাবে ॥

ওগো আমাৰ নিয়মূতন, দাঢ়াও হেসে,
চল্ব তোমাৰ নিমজ্জনে নবীন বেশে ।
দিনেৱ শেষে নিব্ল ষথন পথেৱ আলো,
সাগৱতীৱে বাত্রা আমাৰ ষেই ফুৱালো,
তোমাৰ বাঁশি বাজে সাঁখেৱ অক্কারে,
শুণ্যে আমাৰ উঠল তাৱা সাবে সাবে ॥

শ্ৰীনবীজননী ঠাকুৰ ।

২৪ বৈশাখ, ১৩২৬

—

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ପତ୍ର ।

୫

ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରମଥନାଥ ଚୌଧୁରୀ

କଲ୍ୟାଣିଯେସୁ

ଆମାର ଶାରୀରିକ ଅବସାଦ - ଏତ ବେଶି ହୁଯେଚେ ମେ, ଚିଠିପତ୍ର ଲେଖାଇ ପ୍ରଭୃତି ସଂସାରେର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଣଙ୍ଗଲୋକ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଜମେ ଉଠିବେ— ପରଜମୟେ ଏହି ପାପେର ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଥାକେ ତାହଲେ ନିଶ୍ଚଯିତା ଆମି ଦୈନିକ ସଂବାଦପତ୍ରେର ଏଡ଼ିଟିର ହବ । ମେ ଆଶକ୍ତାର କଥା ମନେ ଉଦୟ ହଲେଇ ନିର୍ବାଣମୁକ୍ତିର ଜଣ୍ଟେ ଉଠିବେ ପଡ଼େ ଲାଗୁତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଯ—କିନ୍ତୁ ତାର ଚେଯେ ସହଜ ଚିଠିର ଜବାବ ଦେଓଯା । ସବୁଜପତ୍ରକେ ବାଁଚିଯେ ରାଖିବେ ହବେ ବହି କି । ଦେଶେର ତକଳିଦେର ମନେ ସବୁଜ ରଂକେ ବେଶ ପାକା କରେ ଦେବୀର ପୂର୍ବେ ତୋମାର ତ ନିନ୍ଦା ନେଇ—ପ୍ରଦୀନତାର ବର୍ଣ୍ଣିନ ବସହିନ ଚାଙ୍କଳ୍ୟାହିନ ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଭୂମିର ମାଝେ ମାଝେ ଅନ୍ତର ଏକଟା ଆଧିଟା ଏମନ ଓୟେସିମ ଥାକା ଚାଇ ଯାକେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଜ୍ୟାଠାମିର ମାରୀ ହାତ୍ୟାତେ ଓ ମେରେ ଫେଲିବେ ନା ପାରେ । ଅନ୍ତହିନ ବାଲୁକାରାଶିର ମଧ୍ୟେ ତୋମାର ନିତ୍ୟମୁଖର ସବୁଜପତ୍ରେର ଦୋହଳ୍ୟମାନ ଛାଯାଟୁକୁ ଷେବନେର ଚିର-ଉସ ଧାରାର ପାଶେ ଅକ୍ଷୟ ହୁଯେ ଥାକ । ପ୍ରାଣେର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଆପନ ବିଜ୍ଞାହେର ସବୁଜ ଅଯପତ୍ତାକାଟି ଶୁଭ୍ର ଏକାକାରହେର ବୁକେର ମଧ୍ୟେ ଗେଡ଼େ ଦିଯେ ଅମର ହୁଯେ ଦୀଡାକ । ଆମାର ଏହି ଖୋଲା ଆନାଲାଟାର କାହେ ବିଶ୍ରାମ ଶୟାଯ ଶୁଭ୍ୟେ ଆଗି ଆମାର

ঐ সামনের মাঠের দিকে অনেকটা সময় কাটাই। ওখানে দেখতে পাই মাঠের সমস্ত ঘাস শুকিয়ে পাতুল্বর্ণ হয়ে গেছে, শান্তি-উপদেশে-ভরা অতি পুরাতন পুঁথির পাতার মত। অনেক দিন বৃষ্টি নেই রৌদ্রও প্রথর—তাঁতে শুকতা প্রবল হয়ে এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যাস্ত সমস্ত ভূমিকে অধিকার করেছে। তার প্রতাপ যে কত বড় তা এই দূরবিস্তৃত শৃঙ্খলার একটানা বিস্তার দেখলেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এরই মধ্যে একটিমাত্র তালগাছ এতবড় সন্মান নিষ্ঠাবত্তাকে উপেক্ষা করে একলাই দাঁড়িয়ে আকাশের সঙ্গে আলোকের সঙ্গে নিত্যই আপনার পত্রব্যবহার চালাচ্ছে। কোথাও কিছুমাত্র বাণী নেই কিন্তু ঐ একটু খানি মাত্র জায়গায় বাণীর উৎস কিছুতেই আর বক্ষ হয় না। একটি দেবশিশু প্রকাণ্ড দৈত্যের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে যদি তুড়ি মারে তাহলে সে যেমন হয় এও তেমনি। যে অমর তার ত প্রকাণ্ড হবার দরকার করে না, মৃত্যুই আপনার আয়তনের প্রসাৱ নিয়ে বড়াই করে। আমাদের সবুজপত্র ঐ তালগাছটিরই মত দিগন্তবিস্তৃত বাঁকিক্ষেত্রে মুকুদুরবারের মাঝখানে একলা দাঁড়াক।

জ্ঞানকের দুর্গ জ্ঞানক দুর্গ—সেখানে প্রকাণ্ড কারাগার, সেখানে লোহার শিকলের মালাৰ আৰ অস্ত নেই। কিন্তু তার ভয়ঙ্কৰ কড়া পাহাড়াৰ মধ্যেও পাঁচব এসে প্রবেশ করে, তার সৈশ্য নেই সামন্ত নেই : সেই নিরন্ত তাৰণ্য কত সহজে কত অল্প সময়ে জ্ঞানকে ভূমিসাং করে দিয়ে তার কারাগারের দ্বাৰ ভেঙে দেয় ; সেখানে বন্দী ক্ষত্রিয়দেৱ মুক্তিদান করে। আমাদেৱ দেশেও জ্ঞানকের দুর্গেৱ মধ্যে দেশেৱ ক্ষত্রিয়েৱাই বন্দী রয়েছে,

যারা ক্ষতি থেকে দেশকে ত্রাণ করবে, যারা দূরে দূরাস্তরে আপন অধিকার বিস্তার করবে, যারা বিরাট প্রাণের ক্ষেত্রে দেশের অঞ্চলজা বহন করে নিয়ে যাবে, আমাদের অস্থমেধের ঘোড়ার রক্ত হবে তা'রা। সেই যুবক ক্ষত্রিয়দের হাত পা থেকে জরার লোহার বেড়ি ঘুচিয়ে দেবার ক্ষতি নিয়েচ তোমরা; তোমাদের সংখ্যা বেশি নয়, তোমাদের সমাদর কেউ করবে না, তোমাদের গাল দেবে, কিন্তু আমী হবে তোমরাই—জরার জয়, মৃত্যুর জয় কথনই হবে না।

তোমাদের সবুজপত্রের দরবারে আমাকে তোমরা আমন্ত্রণ করেচ। তোমাদের সাধনা যখন সবুজ পত্রের নাম নিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে নি তখনো এই সাধনা আমি গ্রহণ করেছি, বহন করেছি। তারণ, নৃতন নৃতন কালে, নৃতন নৃতন রূপে, নৃতন নৃতন পুস্প-পল্লবে নিজেকে বারিবার প্রকাশ করে। প্রাণের অক্ষয় বট যে অক্ষয় তার কারণ তার মজ্জার মধ্যে চিরতারণের রসধারা বইচে। তাই প্রতি বসন্তেই সে বারেবারে নৃতন বেশে নবযুবক হয়ে দেখা দেয়। আমাদের দেশেও জীর্ণ বটের মজ্জার মধ্যে যদি ঘোবনের রস একে-বারেই না থাকত তাহলে এর স্বারাই দেশের চিতাকাষ্ঠাই রচনা হত। কিন্তু এখানেও দেখি, মাঝে মাঝে ঘোবন একটা আকস্মিক বিস্রোহের মত কোথা হতে আবিভূত হয়ে কঠিন জরার প্রতি অশ্রু প্রকাশ করে। আমাদের সময়েও সে নির্ভয়ে এসেছে, নৃতন কথা বলেচ, মার খেয়েচে, পুরাতন আপন চণ্ডীমণ্ডপে বসে তাকে একঘরে করে দিয়েচে। সে দিন আমি সেই ঘোড়া মলের মধ্যেই ছিলুম। মল যে বাহিরে খুব বড় ছিল তা নয়, কিন্তু অস্তরে তার বেগ ছিল। চণ্ডীমণ্ডপ নিবাসীরা এখনো সে জন্মে আমাকে কমা করে নি। আমি

তামের ক্ষমার দাবীও করি নে, কেননা আমি জেনে শুনে ইচ্ছাপূর্বক চণ্ডীমণ্ডপের শাস্তি ভজ করেছি, সেখানকার বৈকালিক নিজাৰ ঘড়ুৱ ব্যাঘাত কৱবাৰ তা কৱতে ঢাটি করি নি। অৰ্থাৎ বিকালের নিষ্ঠক তন্ত্রালোকে সকালের চাঁকল্য সমীরিত কৱবাৰ চেষ্টা কৱেচি।

আমাদেৱ কালেৱ সেই চাঁকল্য সাধনাই তোমাদেৱ কালেৱ নৃতন পাতায় বিকশিত হয়ে নীলকাশেৱ উপুড়-পেয়ালা থেকে সূর্যালোকেৱ তেজোৱস পান কৱবাৰ চেষ্টা কৱচে। সেই তেজ তোমাদেৱ ফলে ফলে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত হয়ে দেশেৱ প্ৰাণ-ভাণ্ডারকে পুনঃ পুনঃ পূৰ্ণ কৱবে।

কিন্তু একটা কথা তোমৱা ভুলে গেছ, ইতিমধ্যে আমাৰ পদোন্নতি হয়েচে। ছিলেম যুবক মহারাজেৱ দ্বাৰেৱ প্ৰহৱী এখন শিশু-মহারাজেৱ সভায় সখাৰ পদ পেয়েচি। অৰ্থাৎ নবজন্মেৱ সীমানাৰ কাছাকাছি এসে পৌঁচেছি—মৃত্যুৰ পূৰ্বে এই চৌকাঠটি পেৱোনোই বাকি আছে। এই ষে এগোবাৰ দিকে চলেচি এখন আমাকে পিছু ডাক ডেকো না। বিধাতা আমাকে বৱ দিয়েচেন আমি বুড়ো হয়ে মৱব না। সেই অস্ত্রে ষোবন-মধ্যাহ্ন পেৱিয়ে আমাৰ আয়ু চিৱশ্যামল শিশু দিগন্তেৱ দিকে নেমেচে। আমাৰ জীবনেৱ শেষ কাজ এবং শেষ আনন্দ ক্ৰিধানেই রেখে যাবাৰ অস্ত্রে আমাৰ ডাক পড়েচে। ষোবনেৱ জয়ষাত্রায় আমাৰ জীবনেৱ অধিকাংশ কালই আমি আঘাত অপমান নিষ্ঠাৰ কাছে হার মানি নি, আমি অশাস্ত্ৰিৰ অভিষ্ঠাতৰে ভয়ে পিঠ কিৱিয়ে পালিয়ে যাই নি। কিন্তু এখন দিন শেষে আমাৰ মনিবেৱ হাত থেকে পুৱন্ধাৰ নেৰাৰ সময় হয়েচে। আমাৰ মনিব এসেচেন শিশু হয়ে, পুৱন্ধাৰও পাঞ্চি। তাঁৰ কাজে শাস্তি অল্প, শাস্তি যথেষ্ট,

কিন্তু ছুটি একটুও নেই। সেই অন্তে এখান থেকে আমি তোমাদের
জয়কামনা করি, কিন্তু তোমাদের তালে তালে পা ফেলে তোমাদের
অভিযানে চল্ব এখন আমার আর সে অবকাশ নেই। আগামী কালে
যাই যুবক হবে আমি এখন তাদের সঙ্গ নিয়েচি। তাদের সেই ভাষী
ষৌবন নির্মল হবে, নির্ভয় হবে, অড়তা, স্বার্থ বা জনাদরের প্রবলতা
বা প্রলোভনে অভিভূত না হয়ে সত্যের জন্ম আপনাকে উৎসর্গ করবে
এই যে আমি কামনা করেচি সেই কামনা যদি আমার কিছু পরিমাণেও
সিক্ষ হয় তাহলেই আমার ষৌবন চরিতার্থ হবে। ইতি ১৭ বৈশাখ
১৩২৬।

শ্রীরবীকুন্ত ঠাকুর।

খোলা চিঠি ।

—*—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীচরণেষু ।

আপনার চিঠি ঠিক সেই সময়ে আমার হাতে এসেছে, যখন
আমার অবসর মনকে চাগিয়ে তোলবার জন্ম, আপনার মুখের উৎ-
সাহের বাণী আমার মনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

আপনি সম্ভবত লক্ষ্য করেছেন যে, আমি বিছুদিন থেকে আমার
লেখার হাত ক্রমে গুটিয়ে নিছি। লেখবার প্রযুক্তি সকলের পক্ষে
অসম্ভব নয়—স্বাভাবিকও নয়। অতএব অবলীলাক্রমে লেখা সকলের
সাধ্য নয়। আমাদের মত লেখকদের পক্ষে যা স্বাভাবিক সে হচ্ছে
লেখবার অপ্রযুক্তি, এবং এই আন্তরিক অপ্রযুক্তির সঙ্গে ঘোঁঘাযুক্তি
করে' তার উপর জয়ী হওয়া যে কত কঠিন, কত আয়াসসাধ্য, তা
লেখকমাত্রেই অন্তর্ধামী জানেন। তার উপর দুঃখের বিষয় এই যে,
আর পাঁচ রকম হাতের কাজের মত, লেখার অভ্যাসটা কালক্রমে
ছিতীয় স্বত্বাব হয়ে দাঢ়ায় না। একবার হাত তৈরি হয়ে গেলে,
বাজনা লোকে অস্ত্রমনস্ক হয়েও বাজাতে পারে, কিন্তু লেখা, মন না
দিয়ে, শুধু হাত দিয়ে কেউই লিখতে পারে না, সম্ভবত এক সংবাদ
পত্রের সম্পাদক ছাড়া ।

আমি আজ পাঁচ বৎসর ধরে, আমার প্রকৃতিটির এই ধাতুগত অপ্রবৃত্তির সঙ্গে জড়াই করে আসছি, ফলে আমার অন্তর্বাচ্ছা বর্তমানে, একসঙ্গে শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও অবসর হরে” পড়েছে। আমার দেহ ও মন, তাদের বিশ্রামের হাল-বকেয়া সমস্ত পাওনা, একযোগে শুদ্ধসূক্ষ্ম আদায় করে নেবার চেষ্টায় আছে। আলস্ত যখন দেহকে এবং অবসাদ যখন মনকে একসঙ্গে পেয়ে বসে, তখন লেখক-মাত্রেরই পক্ষে, অন্তত কিছুদিনের জন্য সাহিত্যের কার্যধান থেকে ছুটি নেওয়া দরকার। তাতে শুধু লেখকের নয়, সাহিত্যের উপকার হয়। কেননা মনের এ অবস্থায় আমাদের সকল লেখাপড়া একান্ত নির্বর্থক, আঢ়োপান্ত বৃথা বলে মনে হয়।

“Of making many books there is no end and much study is a weariness to the flesh”—বাইবেলের সেই অতি পুরোণো কথা এ বিষয়ের শেষকথা বলে বিশ্বাস করতে সহজেই ইচ্ছা যায়।

আপনার চিঠি যখন আমার কাছে এসে পৌছয়, তখন আমি মনে মনে Vanity of vanities all is vanity—এই মন্ত্র জপ করছিলুম; কেননা এ মন্ত্র মনের সন্তান ঔষধ, হৃদয়ের সকল ঝটের অব্যর্থ মলম। এ সংসারে আমাদের কাছে যা সব চেয়ে প্রত্যক্ষ, সে হচ্ছে মানুষের লাঙ্গনা—একদিকে প্রকৃতির হাতে, আর একদিকে মানুষের হাতে। মানুষ যেমন অশেষ দুঃখ নিজে পায়, তেমনি অশেষ দুঃখ পরকে দেয়। মানুষের এই দুঃখ আর এই পাপকেই যদি সার সত্য বলে স্বীকার করতে হয়, তাহলে ভেবে দেখুন ত, মনের অবস্থা কটো আরামের হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় “জীবন মিথ্যা।

আর ঝুতুই সত্য”—এই বিশ্বাস মানুষের মনে অপূর্ব সাক্ষনা এনে দেয়। জীবনের বিরাট ট্রাঙ্গেডিকে farce স্বরূপে দেখতে শিখলেই, আমরা ব্যক্তির মায়ামুক্ত হই। তবে মুক্তি এই যে, এ সব কথা যত সহজে মুখে আনা যায়, তত সহজে মনে বসানো যায় না। ছনিয়াকে ফাঁকি বলে, আমরা কেউ আর নিজের দুঃখকে ফাঁকি দিতে পারি নে।

সে যাই হোক, একথা নিশ্চিত যে, এ রূকম পীড়িত মনোভাব যে-কথার পিছনে আছে, সে কথা নিষ্ক নৈরাশ্যের উক্তি হতে বাধ্য ; সুতরাং সে কথার মূল্য বিকারের প্রলাপের চাইতে বড় বেশি নয়। তা ছাড়া মনের ক্রফটপক্ষ অপরকে দেখাবার যত বস্তুও নয়। নিজের মনের মেঘের ছায়া সমাজের মনের উপর ফেলবার কোনও সার্থকতাও নেই; বিশেষত এদেশে। এমনিই আমরা কর্মসূক্ষে জ্ঞানসূক্ষে ঘৰেষ্ট নিন্দন্তম ঘৰেষ্ট নিশ্চেষ্ট। জীবনের উপর আমাদের শ্রদ্ধা নেই, শ্রদ্ধা কে দুরের কথা বিশ্বাস পর্যন্ত নেই, এবং তার কারণ আমাদের নিজের উপর নিজের ভক্তি নেই, আস্থা নেই। সুতরাং আমাদের আতীয় মনের মজজাগত অবসাদকে প্রশ্ন দেখার অধিকার আমাদের কারও নেই। “ততঃ কিয়” ভর্তৃহরির এই প্রশ্ন সেই জাতিই করতে পারে, যে জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্ৰেই নিজের কৃতিহোৱা বলে জয়মুক্ত হয়েছে। এ প্রশ্ন আজকের দিনে জিজ্ঞাসা না কৰা ইউরোপের পক্ষে যেমন ছেলেমি, জিজ্ঞাসা কৰা আমাদের পক্ষে তেমনি অ্যাঠামি। মানসিক রক্তহৌনতাকে আমি কথনই আধ্যাত্মিকতা বলে ভুল করিনি। আধ্যাত্মিকতা অর্থে আমি বুঝি আমাদের জীবাঞ্চাকে, আমাদের জীবনের বলে কর্মের বলে ভক্তির বলে শতবলে ফুটিয়ে তোলা, বুঝিয়ে দেওয়া নয় ; আমাদের প্রচল্ল আত্মশক্তিকে ব্যক্ত করে-

তোলা, চেপে দেওয়া নয়। আত্মশক্তিকে অস্বীকার করাই তা
মানুষের সকল দুর্গতির মূল। ভগবান মানুষকে একমাত্র ঐ শক্তিই
দান করেছেন, ভগবানের দানকে অগ্রাহ করে, কেউ আর মানুষ হতে
পারে না। অতএব উদাশ্রে ও নৈরাশ্রে বাণী প্রচার করতে আমি
.কথনই অতী হব না। “Vanity of vanities all is vanity”
এ কথার বিকল্পে আমাদের সকল মনপ্রাণ নিত্য প্রতিবাদ করে।

আর এক কথা। আমার বিশ্বাস দেশের লোককে আশা র কথা,
আনন্দের কথা শোনানই এ যুগের লেখকদের পক্ষে কর্তব্য, নৈরাশ্রে
কথা, উদাশ্রে কথা নয়। আনন্দই হচ্ছে একমাত্র প্রকাশ করবার,
দশদিক ছড়িয়ে দেবার, দশের মনে চারিয়ে দেবার বস্তু; অপর পক্ষে
বেদনা দশের মন থেকে ছাড়িয়ে, দশদিক থেকে কুড়িয়ে নিজের
অস্তরে সঞ্চিত ও ঘনীভৃত করাই সকলের পক্ষে না হোক, অস্তুত
লেখকদের পক্ষে কর্তব্য; কেননা যে পরের ব্যাথার বাহী নয়, সে
পরকে কখন আনন্দ দিতে পারে না। নবা-আলক্ষণিকদের আদি-
গুরু আনন্দবর্ণনাচার্য বলে গিয়েছেন যে, ক্রোক্ষমিথুন বধে বাল্মীকির
যনের শোক যদি তাঁর মুখে শোকের আকার ধারণ না করত, অর্থাৎ
তিনি ষদি নিজের অস্তরের বেদনা পরের আনন্দের সামগ্রী করে
তুলতে না পারতেন, তাহলে তিনি মানব-সমাজে শাশ্বতী সমা প্রতিষ্ঠা
লাভ করতে পারতেন না।

এর থেকে ধরে নিছি মানুষের দৃঢ় দৃ করবার শক্তি যখন
আমাদের নেই, তখন নিজের অস্তরের বেদনা, অপরের আনন্দের
সামগ্রী করে তোলাই সকলের জীবনের ত্রুটি হওয়া উচিত। কে
বলতে পারে যে, কবির স্তুতি প্রকৃতির স্তুতির চাটিতে কম সত্তা। এ

ব্রত কিন্তু এদেশে উদ্ধাপন করবার ক্ষমতা একমাত্র আপনারই
আছে। স্বতরাং আশা করি আপনার মুখ থেকে আমরা নিত্য নব
আনন্দের বাণী শুনতে পাব।

আমরা চেষ্টাচরিত্বের করে বড়জোর আশার বাণী প্রচার করতে
পারি, তাৰ বেশি কিছু করতে পারি নে, কেননা আনন্দ স্ফুট করবার
শক্তি ভগবান আমাদের দেন নি। ইতি

শ্রীপ্রথম চৌধুরী।

২০ জৈষাথ, ১৯১৬



সম্পাদকের নিবেদন।

ছেলেবেলায় গল্ল শুনেছি যে, জনৈক অতি কৌতুহলী এবং সেই
সঙ্গে অতি কৌশলী লোক কোন এক রোগের স্থযোগে মিছে করে
নিজের মৃত্যু সংবাদ রচিয়ে দেন, তাঁর মৃত্যুতে আজীব্য স্বজন বক্তু
বাঙ্কদের মধ্যে “কে কাঁদে আর কে বলে যাকগে,” বেঁচে থাকতেই
সেটা জেনে যাবার জন্য।

দেশময় যখন “সবুজ পত্রে”র মৃত্যু সংবাদ উড়িয়ে গিয়েছে তখন ও
পত্রের আবার সক্ষণ পেলে, লোকের মনে সহজেই এ সন্দেহ হতে
পারে যে আমি এইরূপ কোনও মতলবে উকুলূপ কৌশল অবলম্বন
করেছি।

“সবুজ পত্র” বক্ত করবার প্রস্তাবের ভিতর অবশ্য কোনরূপ চাপা
উদ্দেশ্য ছিল না। আমি একজন সাহিত্যিক-পলিটিসিয়ান নই; স্বতরাং
আমার কথার ভিতর কোনরূপ গৃঢ় মতলব থাকবার কথা নয়, কেন না
তা থাকলে সে কথা সাহিত্য হয় না। আর আমি পারি না পারি
সাহিত্যই রচনা করতে চেষ্টা করি। তবে সত্যের খাতিরে আমাকে
স্বীকার করতে হচ্ছে যে “সবুজ পত্রে”র মৃত্যুর জনরবের প্রসাদে ও-পত্র
সংস্কৰণে লোকমতের কিঞ্চিৎ আভাস পেয়েছি। উপরোক্ত মতলবী
ব্যক্তি তাঁর চতুরতার ফলে কি জ্ঞান লাভ করেছিলেন, সে বিষয়ে
ইতিহাস নীরব। সন্তুষ্ট সে জ্ঞান তাঁর তেমন মুখরোচক হয় নি। এ

সত্য সকলে না জানলেও সকলের জানা উচিত যে আসলে ভুল ধারণার উপরেই সকলে স্বত্ত্বে জীবন ধারণ করে। সে যাইহোক “সবুজ-পত্রে”র মৃত্যুসংবাদে বাঙ্গলার একদল লোক দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি, বিশেষত যখন “ও বালাই গেছে বাঁচা গেছে” এমন কথা কোনও দৈনিক সাপ্তাহিক, কিন্তু মাসিক পত্রে অস্তাবধি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নি। “সবুজ পত্রে”র মতামতে যাঁরা সায় দিতে পারেন না, দেখতে পাচ্ছি, তাঁরাও এ কথা স্বীকার করতে মোটেই কুণ্ঠিত নন যে, ও-পত্রের একটা নিজস্ব চেহারা আছে, এবং সেই সঙ্গে তার প্রাণও আছে। কেন না যার প্রাণ নেই অর্থাৎ যা মৃত, তার আর অকাল মৃত্যু কি করে ঘটতে পারে।

(২)

যখন দেশের অন্তত জনকতক লেখকও চান যে “সবুজপত্র” “বেঁচে থাক চিরজীবি হয়ে,” তখন যতদিন পারি ও-পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার ইচ্ছা হওয়াটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। এই প্রতিষ্ঠে অতঃপর সংকলনে পরিণত করতে বাধ্য হয়েছি, তার কারণ অনেকের মতে আপাতত ও-পত্রের প্রাণরক্ষা করা আমার পক্ষে কর্তব্যও বটে।

কেন কর্তব্য সে কথাটা একটি উদাহরণের সাহায্যে পরিষ্কার করবার চেষ্টা করা যাক। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বিজয়ী জর্মান সেনা যখন প্যারিস নগরীকে ঘিরে বসেন, তখন প্যারিসের আবালবৃক্ষ-

বনিতা সকলে একঘাকে বলে উঠেছিল, “il faut etre là”—অর্থাৎ “এখানে আমাদের থাকা চাই”। অথচ কেন যে থাকা চাই, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে শতকরা নিরনববই জন তার কোনও উত্তর দিতে পারত না। কেননা তাদের দ্বারা প্যারিস রক্ষার কোনক্ষণ সাহায্য হবার কোনই সন্তাবনা ছিল না। অথচ এক প্রাণীও প্যারিস ত্যাগ করলে না, এমন কি অতি নিরীহ স্তুলকায় মুদি-পশারীরাও নয়। কারণ এ বিষয়ে প্যারিসের কোনও নাগরিকের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না যে, “il faut etre là”—নাগরিকদের পক্ষে স্বেচ্ছায় প্যারিসে অবরুদ্ধ হয়ে থাকাটা ফলের মিক থেকে দেখলে একটা মন্ত্র অকাজ কিন্তু আত্মার দিক থেকে দেখলে যে একটা বড় কাজ, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। যখন একটা বড় গোছের দায় জাতির ঘাড়ে এসে পড়ে তখন নিজ নিজ শক্তি অনুসারে তার ভারবহন করবার অধিকার যে সকলেরই আছে, এই মহা সত্যের সঙ্গান প্যারিসিয়ান মাত্রেই নিজ অন্তরে লাভ করেছিল, এর প্রমাণের জন্য তারা কোনও যুক্তিত্বকের অপেক্ষা রাখে নি।

আজকের দিনেও আমরাও একটা যুগসন্ধির মধ্যে এসে দাঢ়িয়েছি, স্বতরাং যাদের স্বদেশের প্রতি স্বজ্ঞাতির প্রতি মমতা আছে, তাঁদের প্রতিজ্ঞের পক্ষেই যে যেখানে আছেন, তাঁর পক্ষে সেইখানেই দাঢ়িয়ে থাকা কর্তব্য, কেননা নানারকম ভৌষণ সমস্তা আমাদের চারদিক থেকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে। সংক্ষেপে “il faut etre là” যদিচ আমরা ঠিক জানিনে যে এইরূপ দাঢ়িয়ে থাকবার কোনও সার্থকতা আছে, কি নেই।

(৩)

বর্তমান ভারতে যে সমস্তাটা সব চাইতে প্রত্যক্ষ, সে হচ্ছে আমাদের পলিটিকাল সমস্তা পলিটিকাল হিসাবে আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নগণ্য জাত, এইনতা আমরা কেউ প্রসন্ন মনে গ্রাহ করে নিতে পারি নি। ফলে এই অসন্তোষ দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর শুধু বৃক্ষ ও প্রসার লাভ করে এসেছে। তার পর এই যুদ্ধের ফলে পূর্বে যা ছিল অসন্তোষ তা এখন দাঁড়িয়েছে অশাস্ত্রিতে। এ অশাস্ত্রির ভোগ পৃথিবীর সকল দেশের রাজা প্রজাকে কিছুদিন ধরে কিছু না কিছু ভুগতেই হবে, তার জন্য কোন পক্ষেরই তা হতাশ করবার প্রয়োজন নেই। এ অশাস্ত্রির মূলে আছে বিশ্বমানবের সেই মুক্তির আশা, সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, সেই মুক্তির প্রয়াস, এক কথায় মানুষের সেই আত্মজ্ঞান, যা এই যুদ্ধের ক্রোড়ে বৃক্ষিলাভ করেছে। মানুষ তার মনশ্চক্ষে আজ যে সভ্যতার সাক্ষাৎ পেয়েছে, কাল হোক পরশু হোক মানব সমাজে সে সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হবেই হবে, কেউ তা চিরদিনের জন্য ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হতে পারে যে আমার এ বিশ্বাস ভুল। তাতে কিছু আসে যায় না, কেননা ভুল ধারণার উপরেই সকলে যে জীবন ধারণ করে, আমার এ মত ত আগে থাকতেই জানিয়ে রেখেছি।

এই নব আর্ণায় আমাদের বুক বাঁধতে হবে, এবং এই নব-সভ্যতা গড়বার দায়িত্ব আর পঁচজনের মত আমাদেরও ঘাড় পেতে নিতে হবে; এই কথাটা স্মরণ রেখো যে, এই মুক্তির পথে অশেষ বাধা, অসংখ্য বিপ্লব আছে। কোন বিষয়ে বাধা পেলে হতাশ হয়ে পড়াটা

আমাদের জাতিগত স্বত্ত্বাৰ, আমৱা যদি সত্য সত্যই জীবনেৱ সকল
ক্ষেত্ৰেই নিজেৱ পায়ে ভৱ দিয়ে দাঁড়াতে চাই, তাহলে আমাদেৱ
চিৱাগত স্বত্ত্বাৰকে পদে পদে অতিক্ৰম কৱিবাৰ জন্ম প্ৰস্তুত হতে
হবে।

এ সত্য আমৱা ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষ কোনও
কাম্যবস্তু একমাত্ৰ কামনাৰ বলে লাভ কৱতে পাৱে না, যদি না তাৱ
পিছনে সাধনাৰ বল থাকে,—আৱ সাধনাৰ অৰ্থ হচ্ছে বাধা অতিক্ৰম
কৱিবাৰ ইচ্ছা ও জ্ঞান শিক্ষা ও শক্তি। সিদ্ধিলাভেৱ পক্ষে মানুষেৱ
ছিবিধ বাধা আছে, এক বাইৱেৱ আৱ ভিতৱ্বেৱ। এই বাইৱেৱ
বাধা শুলিই বেশি কৱে আমাদেৱ চোখে পড়ে, কেননা চৰ্মচক্ষুৰ
সম্পৰ্কই হচ্ছে বহিৰ্জগতেৱ সঙ্গে। অথচ এ কথা সম্পূৰ্ণ সত্য যে
নিজেৱ ভিতৱ্বকাৱ বাধাই হচ্ছে মানুষেৱ সব চাইতে বড় বাধা, এবং
এই বাধা অতিক্ৰম কৱতে না পাৱলে মুক্তিলাভ কৱতে কেউ পাৱে
না, কোন ব্যক্তিৰ নয় কোন আতিৰি নয়। আমাদেৱ নিজেৱ
প্ৰকৃতিই যে আসলে আমাদেৱ দীন কৱে রাখে, এ সত্য সকলেৱ
নিকট প্ৰত্যক্ষ নয়, তাৱপৰ ঘাঁৰ কাছে প্ৰত্যক্ষ তাঁৰ কাছেও সে সত্য
প্ৰিয় নয়। নিজেৱ প্ৰকৃতিৰ উপৰ জয়লাভ কৱা অত্যন্ত কঠিন, এ
যুক্তে হৃদয়াবেগেৱ সাহায্য পাওয়া যায় না, অপৱ পক্ষে বাহিৱেৱ
বাধা দূৰ কৱতে মৰণ আমৱা অগ্ৰসৱ হই, তখন ৰোষ ও ক্ষোভ
আবেগ ও আক্ৰোশ প্ৰভৃতি মনোবৃত্তি আমাদেৱ প্ৰবল সহায় হয়।
এদেৱ সহায়তায় অবশ্য আমৱা সব সময়ে সিদ্ধিৰ পথে অগ্ৰসৱ হতে
পাৱি নে। এ জাতীয় মনোবৃত্তি মানুষকে উত্তেজিত কৱে কিন্তু
তাৱ পথ নিৰ্দেশ কৱতে পাৱে না, এৱা যে অমুক্ত। সুতৰাং আমৱা

যদি জীবনে মুক্তপুরুষ হতে চাই তাহলে আমাদের মনকে মুক্ত
করতে হবে, জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হবে। যে জাতি-গঠনের কথায়
দেশ আজ মুখরিত, তার গোড়ার কথা এবং শেম কথাও হচ্ছে
স্বজাতীয় মন গড়ে তোলা।

(৪)

বাইরের অবস্থার যে বদল দরকার এ কথা আমি অস্বীকার করি
নে, কেননা আমি বাহ্যজ্ঞান শৃঙ্খল নই। প্রতিকূল অবস্থার ভিতর
মানুষ হয়ে উঠা যে কতদূর কঠিন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন।
ম্যালেরিয়ার ভিতর বাস করে' অনশনক্লিষ্ট লোকে কেবল মনের
জোরে যে স্থস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারে, মনের এতাদৃশ অলৌকিক
শক্তির উপর আমার কোন প্রকার ভরসা নেই। বাইরের অবস্থা
যত অনুকূল হবে, দেহ ও মনে আমরা মানুষ হয়ে উঠবার যে তত
সুযোগ পাব, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে
শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে আমাদের দুরবস্থা দূর করবার জন্য ব্রহ্মী
হয়েছেন, তাঁরা যে দেশের মহা উপকার সাধন করছেন সে বিষয়ে
সন্দেহ নেই। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, কেবল মাত্র কল
কারখানার সাহায্যে আমরা যথার্থ মুক্তি লাভ করতে পারব না ; কল
তা—সে বসনেরই হোক আর শাসনেরই হোক, মানুষ গড়তে পারে
না, কেননা ঘটনা এই যে মানুষেই কল গড়ে। বাহিরের অবস্থা যতই
অনুকূল হোক না কেন, সে অবস্থা মানুষকে তার মনুষ্যত্ব লাভের

সুযোগ দেয় মাত্র, তার বেশি কিছু করতে পারে না। সে সুযোগের সম্ভাবনা করা আর না করা, করতে পারা আর না পারা, নির্ভর করে তার মন আর চরিত্রের প্রকৃতি ও শক্তির উপর।

মানুষের মন যে তার দেহের চাইতে বড়, তার আত্মশক্তিই যে সব চাইতে বড় শক্তি, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের যথার্থ কাম্যবস্তু হচ্ছে মনের স্বরাজ্য, এবং এই স্বরাজ্য লাভের প্রধান সহায় হচ্ছে সাহিত্য। বাঙালীর মনঃবাঙলা ভাষার ভিতর দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠবে, এই বিশ্বাস এই আশাই হচ্ছে “সবুজ পত্রে”র আন্তরিক কথা। এ কথা শুনে অনেকে বলতে পারেন—“সবুজ-পত্র” ত কিছুই গড়ে না, শুধু অনেক জিনিষ ভাঙ্গে। এর উভর যে মনের দেশেও কারাগারের দেয়াল ভাঙ্গার নামই গড়া।

(৫)

পৃথিবীতে এমন লোক অনেক আছে, যারা যে কাজ করতে পারে তাকে ছোঁয় না, আর যে কাজ করতে পারে না তাতেই গিয়ে হাত লাগায়। ইইরূপ অনধিকার চর্চার ফলে মানুষের টের চেষ্টা বিফল হয়, টের কাজ বিগড়ে যায়। আশা করি এ রকম ভুল আমরা করে বসব না। ভারতবর্ষকে এ যুগে বাঙালী যা দিতে পারবে, এবং বিশেষ করে বাঙলাই তা দিতে পারবে,—সে হচ্ছে তার হাতের কাজ নয় মনের কাজ। স্বদেশকে আমাদের প্রধান দানই হবে সাহিত্যদান। এ দান ষে কি আকার ধারণ করবে তার পরিচয় নেওয়া এবং সেই

সঙ্গে তার মূল্য নির্কারণ করাটাও আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যিক, নচেৎ পরের কথায় আমরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করতে উদ্ধৃত হতে পারি, এবং তাতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতিত হবেই এবং ভারতবর্ষের কোনও লাভ হবে না। বৈমওবকুল ত্যাগ করলেই যে তাঁতিকুল লাভ করা যায় না, এ সত্য এদেশে ইতর সাধারণেও জানে। যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেন তাঁদের চিরদিনই কাজের লোকদের কাছ থেকে নানাকুপ বাজে কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। এ সব কথায় অবশ্য কর্ণপাত করতে তবে কিন্তু মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই।

(৬)

আমরা সকলেই এখন দেশের পূজায় রত হয়েছি। এ পূজায় কেউ বা দান করবেন বস্তি, কেউ বা অন্ন, কেউ বা স্বর্বর্গ কিন্তু আমরা দান করতে পারব শুধু ধূপ দীপ আর পুস্প। এই তিন দানের মূল্য যে কি সে বিষয়ে, একটি প্রাচীন ইতিহাস এখানে কীর্তন করি। পুরাকালে এই ভারতবর্ষে স্বর্বর্গ নামক জনৈক ঋষি সায়স্তুব মনুকে প্রশ্ন করেন যে ধূপ দীপ পুস্পের দ্বারা পূজা করবার সার্থকতা কি। তগবান মনু পুস্পানের এইকুপ গুণকীর্তন করেন—

* * * “দেবগণ কুমুমগন্ধ দ্বারা তৃষ্ণ হন, ধূক ও রাঙ্গমগণ কুমুম দর্শনে সন্তুষ্ট হন, নাগগণ সম্যক্রূপে পুস্প উপভোগ করিলে তৃষ্ণ লাভ করে, আর মানবগণ আঘাত দর্শন ও উপভোগ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।”

সায়স্তুব মনুর এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, রবীন্দ্রনাথ এ যুগে তা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি ভারতীর পায়ে যে

পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছেন, তার আগ্রাণে ও দর্শনে বিশ্বের লোক মোহিত হয়ে গিয়েছে এবং তা উপভোগ করবার জন্য দেব দানব যক্ষ রক্ষ সকলেই লালায়িত হয়ে উঠেছে। মনু আরও বলেন যে—

“কুমুদগণ দেবগণকে তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন করে; তাহারা সংকল্প মিল অতএব প্রীত হইয়া মানবগণের মনোরথ ইপ্সিত দ্বারা পরিবর্কিত করেন” * * *

এ অবশ্য মন্ত্র আশার কথা, তবে তা এযুগে কতদূর ফলবে, সে ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

এ দান করবার সাধ্য অবশ্য আমাদের নেই, কেন না প্রতিভাবু স্পর্শ ব্যতীত কোন ভাষাতেই কাব্যের ফুল ফুটে ওঠে না। তারপর আসে ধৃপদানের মাহাত্ম্যের কথা, এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে মনুর বচন উক্ত করা নিষ্পত্যোজন। ধৃপদান করাও আমাদের ক্ষমতার বহিভূত, আমরা বড়জোর কালেভদ্রে ধূমে দিতে পারি, কিন্তু সে শুধু মশা তাড়াবার জন্য।

এখন দৌপদানের শুফল শুনুন —

“দৌপজ্যাতি উক্তি ও অঙ্ককার বিনাশক। এই নিমিত্ত উক্তি দান করে, এ বিষয়ে এই নিশ্চয় আছে। দৌপদান হেতু দেবগণ তেজস্বী প্রভাসম্পন্ন ও শ্রেকাশমান হইয়াছেন, এবং দৌপদান না করিয়া রাক্ষসগণ তামসভাবে লাভ করিয়াছে, অতএব দৌপদান করা বিধেয় হইয়াছে। মানব আলোকদান হেতু চক্ষুস্থান ও প্রভাযুক্ত হয়, অতএব দৌপদান করিয়া হিংসা করিবে না, এবং তাহা হরণ করিবে না ও নষ্ট করিবে না” * * *

আমরা “সবুজ পত্রে”র অন্তরে মনের প্রদৌপ জালিয়ে রাখতে চেষ্টা করব এবং স্বদেশকে যদি কিঞ্চিত-মাত্র আলোকদানে সমর্থ হই, তাহলেই আমরা কৃতার্থ হব, কারণ আমরা চাই যে সকলে চক্ষুস্থান ও

প্রভাযুক্তি হন। যাঁরা আলোকে ভাল বাসেন না তাঁদের নিকট
আমাদের এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমরা মে-দীপদান করতে যত্নবান
হয়েছি সে দীপকে, “হিংসা করিবে না, তাহা হরণ করিবে না ও নষ্ট
করিবে না”। বলা বাহুল্য অঙ্ককারেই মানুষ ভয় পায়।

পূর্বেৰুক্ত ইতিহাস মহাভারতের অনুশাসন পর্বের সপ্তনবতিতম
অধ্যায় হতে অনুদিত, কিন্তু এ অনুবাদ আমাৰ কৃত নয় বৰ্জিমান
রাজবাটীতে এৱ জন্ম ; স্মৃতিৰাং এৱ ভাষাৰ জন্ম আমি কিছুমাত্
দায়ী নই। ইতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ।

ନବ-ବର୍ଷ ।

—::—

ଆମାନ ଚିରକିଶୋର
କଲ୍ୟାଣୀଯେମୁ—

ନବବର୍ଷ ଆର ନବହର୍ମ, ଏଦେଶେ ଏ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଏକ କବିତା ଛାଡ଼ା ଆର
କୋଥାଓ ମେଲେ ନା । ଆର ଆମାଦେର ଜୀବନଟା ଆର ଯାଇ ହୋକ କବିତା
ନଯ, ଯଦି କିଛୁ ହୟ ତ ସେ ଏକ ମଞ୍ଚ ହସ୍ତ ବରଳ । ତାଇ ନତୁନ ବଚ୍ଚର
ପ୍ରତି ବଂସର ଆମାଦେର ଶୁଦ୍ଧ ନତୁନ କରେ ଜାଲାତେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାତେ
ବେଶି କିଛୁ ଯାଯ ଆସେ ନା । ଅଭ୍ୟାସେର ଗୁଣେ ଓ-ଜାଲା ଆମାଦେର ଗା-
ସଓଯା ହୟେ ଗେଛେ । କିନ୍ତୁ ଏବାର ବୈଶାଖ ଏକେବାରେ ଅଗିଶମ୍ବା ହୟେ
ଦେଖା ଦିଯେଛେ । ଆକାଶ ଏକ ମଙ୍ଗେ ଏମନ ଲାଲ ଓ କରାଲ ହୟେ
ଉଠେଛେ ଆର ବାତାସ ଏତଟା ଉନ୍ଦପ୍ତ ଓ କ୍ଷିପ୍ତ ହୟେ ଛୁଟେଛେ ଯେ, ମନେ ହୟ
ଯେନ କାହେ-କୋଲେ କୋଥାଓ ଆଶ୍ରମ ଲେଗେଛେ । ସକାଳ ଥେକେ ସଙ୍କୋ
ଉପର ଥେକେ ଅବିରାମ ଅଗିରାଷ୍ଟି ହଚେଛେ, ଆର ପଶ୍ଚିମ ଥେକେ ଏକଟାନା
ଏକରୋଥା ହାତ୍ୟା ବଇଛେ, ଯାର ପ୍ରାର୍ଥେ ମୁଁ ପୁଡ଼େ ଯାଯ, ବୁକ ପୁଡ଼େ
ଯାଯ; ଆର ଦିନଭର କାନେ ଆସଛେ ତାର ହା ହା ହୋ ଶବ୍ଦ ଆର
ନାକେ ଚୁକଛେ ତାର ଚନ୍ଦନେର ନଯ, ଗଞ୍ଜକେର ଗଞ୍ଜ । ଏ ଆକାଶ ଏ ବାତାସ
ଆମାଦେର ବାଙ୍ଗଲା ଦେଶେର ନଯ, ଏମନ କୋନୋ ପୋଡ଼ା ଦେଶେର, ଯାର
ଉପର ରୁଦ୍ରେର ରୋଧ-କଷାୟିତ ନେତ୍ରେର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େଛେ ।

সিঙ্গারেশে একটি সহর আছে যার তুল্য গরম জায়গা, থারমেটেরের
মতে ভূ-ভারতে আর মেই, যতদূর মনে পড়ছে, সে সহরটির নাম হচ্ছে
শক্র। শুনতে পাই সে দেশের অধিবাসীরা বলে যে, ভগবান যখন
শক্র তৈরি করেছেন তখন নরক স্থিতি করবার আর কি প্রয়োজন
ছিল। নরকের এক প্রদেশের দাক্ষে চোখে-দেখা বর্ণনাটি নিম্নে
উক্ত করে দিচ্ছি, তার থেকে দেখতে পাবে যে, শক্র বাসীদের এ
প্রশ্ন মোটেই অসঙ্গত নয়।

“E già venia su per le torbid' onde
un fracasso d'un suon pien di spavento,
per cui tremavano ambedue le sponde.

non atrimenti fatto che d'un vento
impetuoso per li avversi ardori,
che fier la selva senza alcun rattento ;

li rami schianta, abbatte e porta fuori ;
dinanzi polveroso va-superbo,
e fa fuggir le fiere, e li pastori”

অস্যার্থ—

“নদীর অপর-পার থেকে একলক্ষে তাৰ ঘোলাজল ডিঙিয়ে এমন একটি
বিকট শব্দ আমাদের কানে এসে পৌছল, যা শুনে আমাদের মন আতঙ্কে
ভয়ে উঠল, আৱ যাৰ ধৰ্কাৰ নদীৰ উভয়কূল থৱ থৱ কৰে কাপতে লাগল।

এ শব্দ সেই বাতাসের চীৎকাৰধৰনি, যে বাতাস আগনেৱ তাড়নায় ছুটে
পালিয়ে আসছে এবং সুযুধে গাছপালা যা-পড়ে তাকেই অবিৱাম প্ৰহাৰ
কৰছে।

এই কলক-বায়ু গাছের সব ডালপালা ভেঙে মাটির উপর ছড়িয়ে দিচ্ছে, আবার সে সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ বাতাস শুমুখে ধূলোর হেষ উড়িয়ে মহাদর্পে তেড়ে আসছে, আর কি পশ্চ কি মানুষ সকলকেই মারেন চেঁটে থেদিয়ে দিচ্ছে।”

এ বৎসর বৈশাখের রোধে আমরা দাস্তের নরকের নবমচক্রে যে পড়ে গিয়েছি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জানো কি পাপে মানুষের এ নরক বাস হয়?—দাস্তে বলেন সন্তান ধর্মে বিশ্বাস না করায়। আমরা যে এ অপরাধে অপরাধী সে জ্ঞান আমার ছিল না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে নানা রকমের orthodoxy আছে, সন্তুষ্ট আমরা তার ভিতর কোন একটাৰ প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছি। সেই পাপেই আমাদের এই শাস্তি।

আসলে সত্য কথা এই যে শুধু শক্তি কেন, ভগবান যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন আর নরক তৈরি করবার কি প্রয়োজন ছিল? আগুন এদেশে চিরকালই জুলেছে—তাই না বৌদ্ধধর্মের সাধনার ধন হচ্ছে নির্বান, আর সন্তান ধর্মের কাম্য ও গম্যস্থান, স্বর্গ। আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্঵র্গে যাবার জন্য তেমনি লালায়িত হতেন, যেমন আমরা হই, সিমলে দারজিলিং যাবার জন্যে এবং দুই-ই এক কারণে অর্থাৎ হওয়া বদলাবার জন্যে। এর প্রমাণ তাঁদের সঞ্চিত পূণ্য ক্ষয় হলে তাঁরা স্বর্গ ছেড়ে আবার দেশে ফিরে আসতেন, যেমন আমাদের পুঁজি-পাটা খরচ হয়ে গেলে আমরা সিমলে দারজিলিং থেকে আবার দেশে নেমে পড়ি। আমার বিশ্বাস আমাদের কাব্যে দর্শনে পুঁথিতে পঁজিতে যে “ভবসাগর” উন্নীর্ণ হওয়া জীবনের প্রধান কর্তৃব্য বলে উল্লিখিত হয়েছে, সে ভবসাগর

হচ্ছে কালাপানী। এবার মরে আমরা কে না আবার বিলেতে
জন্মাতে চাই !

দেখতে পাচ্ছ গরমে আমার মাপা খারাপ হয়ে গিয়েছে নইলে
এত বেফোস বকি ! আসল কথা এই যে, নবনব্র আমাদের প্রাণে নব
হর্ষ না আনুক, আমাদের মনে নব-আশা এনে দেয়। বাইরে বাড়ি
বইলেও মানুষ তার অন্তরে “ন মুক্তি আশা বায়” এ হচ্ছে শাস্ত্র
বচন, তারপর ভাষাতেও বলে, “যতক্ষণ শাস ততক্ষণ আশ”।
অতএব সকলে মিলে, আশা করা যাক যে এবার বর্ষশেষে আমাদের
হর্ষের কারণ ঘটবে।

(২)

গরম দেশে বাস করার ভিত্তির সুখ না পাক স্বচ্ছ আছে। সে
দেশে মানুষ জীবনের বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে, আর বাদবাকী অংশটা
কিমিয়ে কাটাতে পারে। শৈযুক্ত বাল গঙ্গাধর বিলক প্রমাণ করতে
ব্যস্ত যে বেদ উত্তরমেরুতে রচিত হয়েছিল, এ কথা সত্তা কি মিথ্যা শুধু
তাঁরাই বলতে পারেন, যাদের প্রথমত বেদের এবং দ্বিতীয়ত উত্তর-
মেরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, আমার নেই, অতএব উক্ত মন্ত্র
প্রথমে উত্তরমেরুতে কিন্তু দক্ষিণমেরুতে উচ্চারিত হয়েছিল সে কথা
বলতে আমি অপারগ। তবে বেদ যে শৈয়া প্রধান দেশের বাণী নয়,
তার প্রমাণ “মা দিবাং সাম্পন্ন” এই বৈদিক নিষেধ বাক্য। আজও
দেখতে পাচ্ছ শীতপ্রধান দেশের সভাতার মূলকথা এই একই। ইউরো-
পের দেবতারা যে জাগ্রত এ কথা কে অস্বীকার করবে ? সে কালের
আর্দ্ধেরা এদেশে এসে আমাদের দিবানিদ্বা ভাঙ্গাতে একবার চেষ্টা

করেছিলেন, তারপর অলবায়ুর শুণে তাঁরা নিজেরাই ত্স্বাভিজ্ঞত হয়ে পড়লেন, এবং দিবানিদ্রার নাম ঘোগনিদ্রা দিয়ে বেদের অবিরোধে সেই নিদ্রাস্থ অনুভব করতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে নানারকম পার্লৌকিক সুখস্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তারপর ফাঁক পেয়ে আমরা বহুদিন ধরে দিব্য আরামে ঘুম দিচ্ছিলুম, ইতিমধ্যে ইউরোপ থেকে আর এক দল আর্য এসে আমাদের সে নিদ্রা আবার ডঙ করেছে। ইতিমধ্যে অবশ্য নানা দেশ থেকে নানা জাতি এসে আমাদের যথেষ্ট হয়রান পরিশান করেছে, কিন্তু “মা দিবাং সপ্তি”—এ তরুম আমাদের উপর তাঁরা কেউ জারি করে নি। মোগল-পাঠান আমাদের দেহ নিয়ে অনেক টানাটানি করেছে কিন্তু তাঁরা আমাদের মনের উপর ইস্তক্ষেপ করেনি, অর্থাৎ তাঁরা আমাদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়নি। বলা লাভলা ঘুমোয় আসলে শরীর, মন শুধু শুয়ে পড়ে।

এই নব ইউরোপীয় সভাতাই আমাদের মনকে এমনি জাগিয়ে তুলেছে যে, সে মনে ওঁঠবার এবং ছোটবার প্রবৃত্তি এক রকম অদম্য হয়ে উঠেছে। অথচ আমরা উঠতে গেলেই আমাদের বাসগৃহের ঢাদ আমাদের মাথায় চড় মারে আর ছুটতে গেলেই তাঁর দেয়াল আমাদের বুকে ঘুঁঁঝো মারে। আর অমনি আমরা বাঁ হাত মাথায় দিয়ে বসে পড়ে ডান হাত বুকে দিয়ে কামা জুড়ে দিই। সে কামার সুর ললিত আর তাঁর বৃংশ্লো হচ্ছে এই যে, যে মাথার মত চরম মাথা আর যে বুকের মত নরম বুক পৃথিবীতে আর কোথায়ও নেই, ছিল না, এবং থাকতে পারে না, সেই মাথা ও সেই বুকে এত চোট লাগে। এই ব্যাপারটারই নাম হচ্ছে ভারতবর্মের বর্তমান অশাস্তি। এ অশাস্তির ফল ভালই হোক আর মন্দই হোক, এর জন্য দায়ী ইউরোপের সাদা মানুষ, ভারতবর্মের

কালা আদমি নয়। “প্রথমত ইংরাজি শিক্ষা টুকর্তাক করে আমাদের শুধু জনকতকের মনের নির্দারিত করেছিল, তারপরে এই যুক্ত একঘায়ে দেশশুক্র লোকের মনের নির্দারিত করেছে। আজকের দিনে দেশের লোক কি চায় তা তারা ঠিক না জানলেও, যা আছে তাতে তারা যে সন্তুষ্ট নয় এ ত চোখে আঙুল-দেওয়া সত্য। আমাদের এ অশাস্ত্রির পরিচয় পেয়ে মাঁরা অতিমাত্রায় বিচলিত হয়েছেন, তারা বলেন, তোমরা যা চাও সে হচ্ছে আকাশের চাঁদ। তথাপ্ত। কিন্তু চাঁদ চেয়ে তার পরিবর্তে অর্দ্ধচন্দ্র পেলে মানুষের বুক ত জুড়িয়ে যায়ই না, উপরস্থ মাথা গরম হয়। দেশের কথা এইখানেই খতম করা যাক। ও-কথা বলতে গেলেই হা হতাশ করতে হয় এবং আমার বিশ্বাস আমরা সাহিত্য দৌর্য নিঃশ্বাসের যথেষ্ট অপব্যয় করেছি, এখন অস্তুত কিছু দিনের জন্য, আমাদের পক্ষে প্রাণায়াম অভ্যাস করা কর্তব্য,- মনের বলাধানের জন্য !

(৩)

দেশের অশাস্ত্রির কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বিদেশের শাস্ত্রির কথা পাড়া যাক। এ বিষয়ের বিচার আমরা খুব দূর থেকে খুব একটা উচু জায়গায় বসে করতে পারব, অতএব এ ক্ষেত্রে আমাদের রায় যথেষ্ট উদার, যথেষ্ট নিরপেক্ষ হবে; বিশেষত সে র্বায়ের যথন কোনও ফয়সালা নেই। পরের সমস্তার সহজ মীমাংসা কে না করতে পারে? তা ছাড়া এ বিষয়ে মতামত দেবারও আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মেছে। ভারতবর্ষ হচ্ছে League of Nations, একটি Original member অর্থাৎ এই যুক্তের ফলে আমাদের আর

কিছু লাভ হোক আৱ না হোক আমৱা গাছে না উঠতেই এক কাঁধি
নামাবাৰ অধিকাৰ পেয়েছি। “কিমাশ্চর্য্যামতঃপৱ্ৰম্ !”

ইংৱাজিতে একটি প্রবচন আছে যে, “মন্দেৱ ভিতৰ থেকে ভাল
বেৱয়”। এই যুদ্ধটা যতই আশুৰিক, যতই পাশবিক হোক না কেন,
এৱ তীষণ আনন্দেৱ ভিতৰ থেকে একটা আকাশ বাণী শোনা
গিয়েছে। এৱ দিগন্তব্যাপী তোপেৱ আওয়াজ ভেদ কৱে এই
কথাটা বেৱিয়ে এসেছিল যে, এ হচ্ছে প্ৰভুৰ বিৱৰণে স্বাধীনতাৰ যুদ্ধ।
এই আকাশ বাণীতে আমিও বিশ্বাস কৱেছিলুম, কেননা এ হচ্ছে
আশাৱ বাণী। জানই ত মানুষে যাকে বিশ্বাস বলে সে শুধু আশাৱই
বেনামদাৰ, স্বতৰাং ইউৱোপেৱ শান্তি-বচনে বিশ্বাস স্থাপন কৱে
আমি নিবুঁক্ষিতাৰ পৱিচয় দিই নি, পৱিচয় দিয়েছি শুধু এই সতোৱ
যে, আমিও মানুষ অৰ্থাৎ মূলত আশাজীৰ্বি।

তবে আমাৱ প্ৰকৃতি হচ্ছে এই যে, আশাই বলো আৱ বিশ্বাসই
বলো, যতক্ষণ না তা স্পষ্ট একটা আকাৰ ধাৰণ কৱে, ততক্ষণ তা
মনেৱ ভিতৰ দিয়ে শুধু আনাগোনা কৱে, সেখানে আসন পায় না।
এই সংহাৰ-নাটকেৱ যথন দম ফুৱিয়ে আসবে তথন তা যে মিলনাত্ম
হবে আমাৱ এ বিশ্বাস থাকলেও উপসংহাৰটা যে টিক কি রকম
হবে, সে সম্বন্ধে আমাৱ কোনও স্পষ্ট ধাৰণা ছিল না। অতঃপৰ
উইল্সন সাহেবেৱ কলিত সাঙ্গোপাঙ্গ শান্তিৰ প্ৰস্তাৱ যথন মুক্তিমান
হয়ে বিশ্বানন্দেৱ চোখেৱ স্মৃথি গাড়া ছল তথন মহা উৎফুল্ল হয়ে
উঠলুম, কেননা শুধু যে ধৰাছোয়াৰ মত একটা জিনিম পেলুম তাই
নয়, দেখা গেল তাৰ মনগড়া শান্তিৰ চৌদটি পদ আছে। বাঁকলাৱ
জনৈক রসিক লেখক বলে গিয়েছেন যে, “ৱচনটা গত কি পঞ্চ তা

চেনা যায় ‘শুধু চোদয়’। এই সূত্রের উপর নির্ভর করে, সহজেই বিশ্বাস করেছিলুম যে এই সংহার নটিকটি অতি বিজিগিছিল গঢ় হলেও এর উপসংহার হবে পঞ্চ, শুধু পঞ্চ নয়, একবারে চতুর্দশপদী কবিতা, ইংরাজিতে যাকে বলে ‘সনেট’। এতে মনে একটু অঙ্কারও হলো এই ভেবে যে শেষটা জয় আগাদেরই হলো কেননা উইল্সন সাহেব আগাদেরই দলের লোক অর্থাৎ তিনি একবারে অধ্যাপক ও সাহিত্যিক। ভাল কথা উইল্সন সাহেবের Essays পড়েছে ? চমৎকার মেখা। যে হাত থেকে State নামক হাজার দুয়েক শুকনো পাতার গন্ত বেরিয়েছে, সেই হাত থেকে যে অমন সব সরস প্রবন্ধ বেরতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। মধ্যে থেকে একটি অবাস্তুর কথা বলে নিলুম, এই প্রামাণ করবার জন্য যে আইনের অধ্যাপক হলেও মানুষে অবসর মত রসালাপ করতে পারে। যাক ও সব কথা, এখন আবার শান্তির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমরা ত আশা করেছিলুম কিন্তু ফলে দাঢ়াল কি ?—

দেখা যাচ্ছে যে এই কুরক্ষেত্রে জয়যুক্ত পদ্ধপাণ্ডবের হাতগড়া সঙ্কিপত্রে যা আছে, সে হচ্ছে শুধু দেনা পানোর হিসেব নিকেশ, আর পৃথিবীর জমির ভাগ নাঁটোয়ারা, এক কথায়, শুধু জ্যামিতি আর পাটিগণিত। “আশাৰ ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়”— কবিতার বদলে অঙ্গ ! আমরা চেয়েছিলুম দেখতে সভাত্বার একটা নতুন প্রাণ চির কিন্তু দেখতে পাচ্ছি শুধু পৃথিবীর একটি নতুন মারচিত্র।

আজীবন রেখা ও সংখ্যা নিয়ে কারিবার করেছেন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন লোক পাওয়া দুঃস্মৃতি যিনি একাধারে পাকা জরিপ-আমিন ও পাকা স্বৰ্গোর-নবিশ, কেননা মানব সমাজে কেউ পারে মাপতে আর কেউ পারে গুণতে। মহামান্ত কলিকাতা উচ্চ আদালতে একদল উকিল আছেন যারা নাকি মাপ বোঝেন ভাল, আর উচ্চ আদালতে একদল ব্যারিষ্টার আছেন যাঁরা নাকি হিসেব বোঝেন ভাল। এ কথা আমি বিশ্বাস করি। মোটামুটি মানুষ এই দুই ধাতেরই হয়ে থাকে। লোকে বলে আমাদের দেশে পলিটিক্সের যে দু'দল হয়েছে, তার কারণ এরা দু'দল দু'জাতের লোক, মডারেটরা বোঝে ভাল হিসেব, আর Extremists-রা নক্ষা ! আমি যে এ দু'দলের কোন দলেরই নই, তার কারণ আমার কলমের মুখ দিয়ে যা বেরয় তা রেখাও নয় সংখ্যাও নয়, ছেরেপ অঙ্কর। সীমাব জ্ঞান ও অর্থের জ্ঞান আমারও আছে, কিন্তু সে অন্ত ক্ষেত্রে। তবে পৃথিবীতে থাকতে হলে, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের সঙ্গে একটা মোটামুটি রকমের পরিচয় সকলেরই হয়, আমারও হয়েছে। সেই পরিচয়ের বলে আমি বলি, পৃথিবীর একটা নতুন নক্ষা পাঁচজনে সহজেই তৈরি করতে পারে কিন্তু বিশ্বমানবকে সেই সঙ্গে পদ্ধীকৃত করা তাদৃশ সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। মাটিকে আমরা যেমন ইচ্ছে ভাগ করতে পারি, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ-বিয়োগ করা নিয়েই ত যত মুশ্কিল। যুক্ত মাটি নিয়েই হয়, শান্তি কিন্তু মনুষ্যহের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমেই দেখনা কেন, পাঁচজনে মিলে যত সহজে পৃথিবীর কালী করেছেন তত সহজে তার নক্ষা তৈরি করতে পারছেন না। গোল

বেধেছে তাঁর রঙ দেওয়া নিয়ে। এ মানচিত্রে রেখার সঙ্গে বর্ণের মহা দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছে, বর্ণ কোথাও বা সীমারেখাকে অতিক্রম করতে চাচ্ছে কোথাও বা বিভক্ত হতে আপত্তি করছে। জর্মানী বলছে, এ সঙ্কি ত আসলে বিচ্ছেদ। অপর পক্ষে ইতালি বলছে, এ সঙ্কিতে ত সমাস হল না। এই দুই আপত্তির উভয়ে বর্ণের দিক থেকে। এ দুই আপত্তির এমন কোনও সদৃশুর নেই যা সকলে বিনা বাক্যব্যায়ে গ্রাহ করে নিতে বাধ্য, তাঁর কারণ ইউরোপের এই নৃতন ভাগ বাটোয়ারার গোড়ার একটা গলদ আছে।

এই নৃতন বন্দোবস্তের গোড়ার কথা হচ্ছে Self-determinations of Nations অথচ nation যে কাকে বলে সে বিষয়ে এই বন্দোবস্তকারীদের মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। Nation-এর মূল কোথায়, জমিতে না জাতিতে ? যাঁরা একদেশে বাস করে তাঁরা সকলে মিলে যদি একটি nation হয় তাহলে তাঁদের জমি ভাগ করে নিলে তাঁদের nationality রক্ষা হয় না। এই হচ্ছে জর্মানীর কথা। অপর পক্ষে যাঁরা এক জাতের লোক তাঁরা সকলে মিলে যদি একটি nation হয় তাহলে বিদেশকে আভ্যন্তরীণ না করলে তাঁদের nationality-ও পূর্ণাঙ্গ হয় না। এই হচ্ছে ইতালির কথা। Nation শব্দের এই দুটি বিরোধী অর্থের সমন্বয় করতে গিয়েই যত গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে। আসল কথা ও-দুয়ের কোন অর্থই পরীক্ষায় টেঁকে না, কেননা এক চৌহদির ভিতর যেমন নানা জাত বাস করে তেমনি এক জাতের লোক নানা দেশে বাস করে। তা ছাড়া ইউরোপের কোন প্রদেশই একদেশ নয় ; কেননা তাঁর প্রতি দেশের চৌহদি ক্রমান্বয়ে বদলাচ্ছে ; ইউরোপের কোন জাতিই একজাতি

নয় কেননা তার প্রতি জাতির শরীরের নানা জাতির রক্ত আছে। এক কথায় ইউরোপের সব বর্ণই সঙ্কীর্ণ বর্ণ এবং এ বর্ণের ধর্ম হচ্ছে চারিয়ে যাওয়া, কতকগুলি সরল রেখার ভিতর তাকে আটক রাখবার ঘো নেই।

কাব্য দর্শনে বিজ্ঞানে, nation শব্দের যে অর্থ ই হোক পলিটিক্সে ও-শব্দের অর্থ হচ্ছে সেই জনসমূহ যারা এক রাজাভূক্ত এবং যাদের ভিতর সর্ব প্রধান বন্ধনসূত্র হচ্ছে চিরাগত একশাসন, একপালন। প্রতি nation নিজের মনে নিজের nationality-র ভিত্তি যাই ভাবুক, প্রতি nation অপর সকল nation কে শুধু পলিটিকাল nation হিসাবেই মানে এবং তার সঙ্গে কারবার করে। রাজনীতির দৰবারে এই হিসেবটাই সব চাইতে বড় হিসেব বলেই রেখার সঙ্গে শুধু বর্ণের নয় সংখ্যারও বিবাদ ঘটে। পলিটিক্সে লোকবলও একটা কম বল নয়, স্থূতরাং ইউরোপের এই নতুন বন্দোবস্তে যে nation-এর লোক সংখ্যা বাড়ছে সেই শুসি হচ্ছে আর যে nation এর কমাচে সেই দার্জার হচ্ছে, অতএব এ কথা নিউয়ে বলা যায় যে, এ ভাগ বাটোয়ারা হচ্ছে ইউরোপের রাজশাস্ত্রের যোগ-বিয়োগ। উইলসন সাহেব আশা করেন যে এই মহাদেশের রাজশাস্ত্রের এই বিশ্বেষণ ও আশ্বেষণের ফলে পৃথিবীতে চিরশান্তি বিরাজ করবে। কিন্তু এ আশা ফলবত্তি হবে কি না, সে বিষয়ে তিনিই আমার মনে একটি খট্কা লাগিয়েছেন। মামুম যে কত নির্বোধ তার একটি উদাহরণ তাঁর New Freedom গ্রন্তেই পড়েছি। উইলসন সাহেব বলেন যে Newton যখন এই জড়-জগতের laws of motion আবিক্ষা করলেন, তখন ইউরোপ ধরে নিলে যে এই একই law রাজনীতিতে প্রযুজ্য, অমনি সে দেশের রাজমন্ত্রীরা

balance of power-এর স্থিতি করতে বসে গেলেন। এ balance টিকলে না, কেননা জড়অগং আৱ মনোজগং এক নিয়মের অধীন নয়। এখন জিজ্ঞাসা কৰি আজকের দিনে বড় বড় রাজমন্ত্ৰীৱা সেই পুরোণো balance of power ছাড়া আৱ কি রচনা করতে বসেছেন? নৃতনভৈর মধ্যে এইটুকু যে, এবাৱ নাকি এ balance তাৱ গড়নেৱ হিকমতে মানবসমাজকে stable equilibrium দান কৱবে। মানবজীবন কিন্তু ঘড়িৱ পেঞ্চলমেৱ মত। ঘড়িৱ দম বন্ধ না হলে ওৱ দোল বন্ধ হয় না। অতএব এ পৃথিবীতে মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সে কোন একটা অবস্থায় স্থিৱ থাকবে না। একমাত্ৰ মৃতুই মানুষকে চিৰশাস্তি দিতে পাৱে। মহাভাৱতে দেখতে পাই সৰ্গাবোহণ পৰ্ব ও শাস্তি পৰ্বেৱ মধ্যে আৱও অনেকগুলি পৰ্ব আছে। স্ফুতৱাং এই শাস্তি পৰ্বইয়ে ইউৱোপেৱ ইতিহাসেৱ শেষ পৰ্ব, এ কথা বিশ্বাস কৱা কঢ়িন।

(৫)

ইউৱোপ মায় আমেৱিকা সমগ্ৰ পৃথিবী নয় এবং ইউৱোপেৱ বাইৱেও মানুষ আছে স্ফুতৱাং দেখা যাক, তাৰেৱ কি ব্যবস্থা হল।

এই শাস্তিৰ দৱবাৱে স্থিৱ হয়ে গিয়েছে যে সমগ্ৰ আফ্ৰিকা এবং বেশিৱ ভাগ এসিয়াৱ সব জাতিই নাৰালক। পলিটিকাল হিসেবে তাৱা স্বৱাট নয় পূৰ্বেই বলেছি ইউৱোপেৱ কোন Nation-ই তাৰেৱ সাৰালক বলে স্বীকৰ কৱে না। তাই এই নাৰালকদেৱ জন্য সব উছি নিযুক্ত কৱা হয়েছে, এবং যতদিন তাৱা সাৰালক না হয় ততদিন এই উছিৱাই তাৰেৱ শাসন-সংৰক্ষণ কৱবে। এ অতি উত্তম ব্যবস্থা।

তবে এই প্রশ্নটা মনে সহজেই উদয় হয়, এই নাবালকেরা কবে সাবালক হবে? নাবালকের উচিৎ নিযুক্ত করা মাত্র যে তার নাবালকহের মেয়াদ বেড়ে যায় ইউরোপের সকল আইনের ত এই কানুন। তারপর শুনতে পাচ্ছি উক্ত উচিরা এই সব নাবালকদের শিক্ষার ভার হাতে নেবেন—তাদের মানুষ করে তোলবার জন্য। এ অবশ্য ভৱমার কথা, তবে ভয়ের কথা এই যে, ইউরোপীয় মতে শিক্ষাপ্রস্তরির একটা মোটা কথা এই যে, “Spare the rod and spoil the child.”

যাকগেও সব পরের কথা। আমাদের অবস্থা যে ঠিক কি দাঢ়িল সেটা এখন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। League of nations-এর হিসাবে আমরা হলুম সাবালক আর nation তিসেবে গাকলুম নাবালক। একসঙ্গে সাবালক ও নাবালক দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীতে আমরা ছাড়া কেউ হতে পারে না, আমরাই তচ্ছি মানবসমাজে একমাত্র living contradiction, এবং সন্তুষ্ট এই contradiction-টা আবহমান কাল living থাকবে।

এত লম্বা বক্তৃতা করবার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, পৃথিবীর ভাবনা ভেবে কোনও লাভ নেই। ও-বস্তু যখন গোল তখন ওকে চৌকোস করবার চেষ্টা বৃথা; বিশেষত তাদের পক্ষে যাদের হাতে হাতুড়ি নেই। তার চেয়ে Voltaire-এর উপদেশ শিরোধার্য করা চের ভাল। মানুষের কাছে তাঁর শেষ কথা এই—

“Cultivate your garden”—অতএব এসো তুমি আমি সাহিত্যের চর্চা করি, কেন না আমরা এ সাহিত্যের চাষ ছাড়া আর কিছু করতে পারব না।

(৬)

আর এক কথা, কোমর বেঁধে সাহিত্যের চাষ করাও আমাদের পক্ষে কর্তব্য। ভারতবাসীর মন গড়ে তোলবার দায় বর্তমানে বিশেষ করে বাঙালীর ঘাড়েই পড়েছে, এবং সে দায় এড়াবার আমাদের অধিকার নেই, কেননা এ দায় আর কেউ বহন করতে পারবে না।

এ যুগে সমগ্র ভারতবর্ষকে আমরা একটি বিরাট পুরুষরূপে দেখতে শিখেছি, ভারতবর্মের বিভিন্ন প্রদেশগুলি যার শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। কোন প্রদেশ তার কোন অঙ্গ তাও একরকম ঠিক হয়ে গিয়েছে। পাঞ্জাব যে এই বিরাট পুরুষের বাহু আর বোন্হাই যে তার উদর এ বিষয়ে দেশশুক্র লোক এক মত। পূর্বে আমরা দাবী করতুম যে বাঙালাই হচ্ছে বর্তমান ভারতের হৃদয়, অতএব মাস্তাজ তার পদ। মাস্তাজ অবশ্য এতে আপত্তি করত এবং সে আপত্তি হালে হোমরূপ দলে গাহ হয়েছে। এই দলের পলিটিসিয়ানদের মতে, ভারতবর্মের হৃদয় এখন তার বাঁ-দিক থেকে বদলি হয়ে ডানদিকে, এক কথায় বাঙালা থেকে সরে গিয়ে মাস্তাজে স্থিতিলাভ করেছে। এ কথার প্রতিবাদ করবার আমাদের প্রয়োজন নেই, কেননা আমাদের কাছ থেকে ভারতবর্মের হৃদয় কেড়ে নিলেও তার পা আমাদের ঘাড়ে অস্তাবধি কেউ চাপিয়ে দেয় নি। কেন দেয় নি, তার ভিতর একটু রহস্য আছে। আমাদের নব-পেট্রিয়টরা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করেছেন যে, এ বিরাট পুরুষের পা বলে কোন অঙ্গই নেই, এ যে চলে না, এই হচ্ছে এর বিশেষ ও মহাহ। এ কথা আমরা সকলেই মানতে বাধ্য, কেননা

অনৱব যে এই বব-পেট্রিয়টোই হচ্ছেন দেশের আগামী শাসনকর্তা। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে বাকী থাকল শুধু একটি অঙ্গ—মন্ত্রক। তাই আজ আমরা দাবী করতে পারি যে, বাঙ্গলাই হচ্ছে ভারতবর্ষের মন্ত্রক, আমাদের এই দাবীর বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার নেই, কেননা ও-অঙ্গের ভার নিজস্বক্ষে নিতে আমরা ছাড়া আর কেউ রাজি হবে না। ওর অন্তরে মন্ত্রিস্বরূপ নামক যে পারার মত পদার্থটি আছে তা মানুষের মনকে শেখায়-পড়ায়, তার বাহুকে শাসন করে, তার উদ্বৱকে অতি মাত্রায় স্ফীত হতে দেয় না, তার হৃদয়ের রক্তকে পরিষ্কার করে, তার পরে তা এমন সব স্থায়ের বিধান দেয় যা মেনে চলা রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। এ ছাড়া এই মন্ত্রিস্বরূপ নামক পদার্থটি “আইডিয়া” নামক এক অবস্থার সৃষ্টি করে যাকে অন্তরে স্থান দিয়ে মানুষের সোয়াস্তি থাকে না, অথচ ধার কাছ থেকে একদম পালানও মানুষের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এ অবস্থার চর্চা কাজের লোকেরা একেবারেই করতে নারাজ; অতএব এর চর্চা এ যুগে আমাদেরই করতে হবে, কেননা আমরা যে জাতকে-জাত যে unpractical, এ সত্য ত সর্বলোক-বিদিত। এই খানেই মনে করিয়ে দিই যে মানুষে যাকে সাহিত্য বলে—তার জন্মস্থান হচ্ছে এই মন্ত্রিস্বরূপ। স্বতরাং আমরা যখন প্র্যাকটিকাল নই তখন আমাদের পক্ষে একমনে সাহিত্য রচনা করাই শ্রেয়, বিশেষত যখন আমরা না করলে ও-কাজ ভারতবর্ষে আর কেউ করবে না। ভাববার চিন্তাবার আর কারও সময় নেই তারা সব বড় কাজে ব্যস্ত।

বীরবল।

তবডৃতি ।

—::—

কি মেষ গন্তীর শ্লোক উঠিলে উচ্চারি,
নির্ভয় প্রবল কঢ়ে কি মহা বক্তাৱ !
সহস্র বর্ষেৱো পৱে প্রতিখনি তাৱি,
আছে ভৱি ভাৱতেৱ প্ৰাণুৱ কান্দাৱ ।
তবু কি কৰণ গীতি, তবু কি মধুৱ !
ক্রন্দনে লুটায়ে পড় এমন কাতৱ !
বীৱেৱ বিৱহ-গাথা অপৰূপ শুৱ ;
কুসুম-কোমল তুমি হে বজ্জ-কঠোৱ !
এত প্ৰেম কে শিখালে তুলণ আকণ ?
এত গৰব ? তবু তুমি কৱ নাই ভুল ;
শোভিল তোমাৱি ভালে বিজয়-চন্দন ;
—কাল নিৱবধি আৱ পৃথিবী বিপুল ।
আজি যে সহস্র কঢ়ে উঠে তব স্তুতি
হে কঠিনে ইকুমাৱ কবি তবডৃতি !

৪ঠা মাঘ ১৩২৫ ।

শ্ৰীশৈলেন্দ্ৰকৃষ্ণ লাহা ।

প্রতিধ্বনি ।

—::—

প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনি, চারিদিকে শুধু
প্রতিধ্বনি । কে আছ নিতীক বীর হেথা ?
এই বন্ধ, অঙ্ক কারাগৃহ ভাস্তি, বঁধু,
ধ্বনিরাজ্যে নিয়ে ধাও ; দূর কর ব্যথা ।
যুগযুগান্তর পূর্বে কোন্ কথা কবে
উচ্চারিত হ'য়েছিল প্রতিশব্দ তার
প্রাচীর প্রহত হ'য়ে, বার বার, বার,
ফিরে আসে দ্বিগুণিত ত্রিগুণিত রবে ।
যদি এর আবেষ্টনী ভেঙে ফেলা যেত !
আকাশের তলে শব্দ যদি প্রাণ পেত !
কি আনন্দে মাতিয়া উঠিত দশদিক,
মানুষ কি চোখে ধরা দেখিত চাহিয়া,
জীবন কি গান জানি, উঠিত গাহিয়া !
ধ্বনিরাজ্যে নিয়ে ধাবে কে মোরে, নিতীক ?

২২শে মাঘ ১৩২৫ ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ।

প্রেম ।

— ১০৬ —

দার্শনিক-বিজ্ঞ কহে—তারে বল প্রেম ?
অবিদ্যার মোহ সেতো মানব অস্তরে ।
বিদেশী পিণ্ডল সেও স্বর্ণকূপ ধরে,
তারে বল আর কিছু—সে তো নহে হেম ।

বৈজ্ঞানিক হেসে কহে—সংজ্ঞনের ধারে
বৃক্ষি এক প'ড়ে আছে প্রকৃতিরচন,
অভাবে স্ফৰ্ভাব স্থিতি—জনমে জীবন
যৌন-নির্বাচন বৃক্ষি—প্রেম বল তারে ?

কবি কহে—পঞ্জিতের বক্ষ্যাহিয়া মাঝে
প্রেমের জনম কভু সন্তুষ্ট না সাজে !

সেতো কভু দেখে নাই রাধিকার সনে
কুঞ্জে বসি—সারা বিশ্ব শুধু শ্যামময়,
বাঁশীটি বাজেনি ঘার হৃদি-বৃন্দাবনে
সে কভু বুঝিতে পারে—প্রেম কারে কয় !

শ্রীকান্তিচন্দ্ৰ ঘোষ ।

ରୂପ ।

—*—

ନିଯେ ନିମେଷେର ପ୍ରାଣ
ହସିଯା ପଲକ,
ଫୁଲେର ଏଲାନ ବୁକେ ଉଷାର ଆମୋକେ ଖୁଲିଯା ପଲକ,
କୋଥାଯ ମିଳାଯ !

କାଟେ,—ସେ ପରଶ୍ରୁତକୁ ଭାବିଯା ଫୁଲେର, ଆକୁଳ ଦିବସ
ତାର ଅଜାନାୟ !

ମିଳାଇଯା ଗିଯାଇେ ନିମେଷେ,
ତାଇ ସେ—ଅମିଯ-ଗଲା ଶିଶିରେର କଣା ;
କୁମ୍ଭମେର ମକଳ ଜୀବନ
ସିରିଯା ଥାକିତ ସଦି ହ'ତ ସେ—ବେଦନା ।

ଏଲେ ତୁମି ଯୌବନେର
ଆବନ ଉଷାଯ,
ଢାଲିଯା ଛଦ୍ୟ ଘନେ ଅଯୁତ ସାଧନେ ଆକାଶ୍ଚ ଆଶ୍ୟ
ସେ ରୂପ-ପ୍ଲାବନ,
ପ୍ରାଣେର ଗୋପନେ ସେ ସେ ସୁମାୟେ ପଡ଼େଛେ, ତାରି ସ୍ଵପନେତେ
ଦିତୋର ଜୀବନ !

ରୂପ ସେ ସେ ବାଁଶରୀର ସ୍ତର,
କାପିଯା କାପିଯା ଦୂରେ ଉଡ଼େ ଚଲେ ଯାଯ ;
ଶୁଦ୍ଧତାର ନିବିଡ ଅନ୍ତର
ପରଶେ ଶିହରି ଦିଯା ନିଭୃତେ ସୁମାୟ ।

ଶ୍ରୀଶୁରେଶାନନ୍ଦ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ୟ ।

উড়ো-চিঠি।

—*—

এপ্রিল ২২, ১৯১৯। *

জীবনকুমার

তোমার উপরে আমি যে মনে মনে একটু বিরক্ত ছিলুম সেটা তোমার কাছে আজ আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, কেননা তোমার শেষ চিঠি 'পড়ে' একেবাবে ডবল খুসি হয়েছি। তুমি হয়ত মনে মনে ভাববে যে, সে চিঠিখানার মধ্যে এমন কি অপরকে খুসি করবার মত পরমামৃত্যু খবর ছিল! তা যে-খবর ছিল সেটা হচ্ছে এই যে, তুমি একটা কিছু করবে বলে' মনস্থ করেছ।

আমার দ্বিতীয় দফা খুসি হবার কারণ হচ্ছে এই যে, তুমি সাহিত্য-সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে মনস্থ করেছ। আমার বিশ্বাস যে, "Pen is mightier than the sword," এ-কথাটা একটুকু অতি-রঞ্জিতও নয়, অতি-মণ্ডিতও নয়। লেখনী অসির চাইতে mightier ত বটেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে তা subtler-ও। ব্রাক্ষণের স্থান যে ক্ষত্রিয়ের চাইতে উচুতে ধরা হয়েছে সেটা খামখেয়ালেও নয়, বা খোসখেয়ালীতেও নয়। অসি দান করে—মৃত্যু, আর লেখনী—অমৃত। অসি জীবন নিতেই পারে—লেখনী জীবন দিতেও পারে। তাই ত এ দেশে আজ লেখনীর এত প্রয়োজন, অবশ্য যদি সেই লেখনীর পিছনে এমন একটা মস্তিষ্ক থাকে যে-

মন্তিকের চিন্তাশীলতা অধর্ষ নয় অকর্ষণ নয়। তবে তুমি সাহিত্য-মন্দিরের পূজারি হয়ে কেবলই পুরোনো মন্ত্র আওড়াবে, না নিজে উযোগ করে' সেই সঙ্গে একটু ধ্যান ধারণাও করবে তা শুধু তোমার উপরেই নির্ভর করে। তবে তোমাকে এইখানে এই কথাটা বলে' রাখছি যে, মন্ত্রের যে শুণ তা মানুষের জিহ্বা দ্রষ্ট ওষ্ঠ কর্ণ তালু ইত্যাদি Vocal instruments-গুলোর মধ্যেই নেই, আছে তা তার অন্তরে, যেখানে মানুষ বচনশীলতায় মুখর সেখানে নেই, আছে তা যেখানে সে আত্মোপলক্ষিতে প্রথম। মন্ত্র হয়ে ওঠে কেবল বাকা, যখন সেই মন্ত্রের সঙ্গে মানুষের আত্মার কোনই সম্বন্ধ থাকে না। বাকের জোর তখনই, যখন তা হ'য়ে ওঠে মন্ত্র, মন্ত্রের শুণ তখনই যখন তা সেই মানুষের আত্মার সতো ও শক্তিতে অভিষিক্ত।

কিন্তু সাহিত্য-সেবায় তুমি জীবন উৎসর্গ করবে জ্ঞেনে স্বর্থী হলেও আমি তোমার একটা প্রশ্ন করে একটু দমে গিয়েছি—সাহিত্য-অগতে তোমার সাফল্য সম্বন্ধে। তুমি যে জিজ্ঞেস করেছ, আজ যে বাচলা দেশের সাহিত্য-সভায় ছুটো দল গড়ে' উঠল, যার এক দলকে পুরাতন ও অন্য দলকে নৃতন-পন্থী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে এই দু' পন্থীর মধ্যে কোন পন্থা পাঞ্জানের প্রেম? এ প্রশ্নে তোমার কৃতার্থতা সম্বন্ধে আমি স্বত্বাবত্তি একটু দমে' গিয়েছি এই অঙ্গে যে, ও-প্রশ্নের অর্থই হচ্ছে সন্দেহ ও সংশয়। আর সন্দেহ ও সংশয়ের মানে হচ্ছে নিজের অন্তর থেকে সেই বিষয়ে একটা কোন স্পষ্ট তাগিদ না আসা। অন্তরের এই তাগিদই হচ্ছে মানুষের সত্য; স্বতরাং সেই পন্থাই তার পন্থ। মানুষ যতক্ষণ না এই রূক্ষ তাগিদ তার অন্তর থেকে পায় ততক্ষণই তার প্রশং—এটা করিনা ওটা

ধরি ? এ রূক্ম দু' র্ণোকোর পা রাখলে আর যাই হোক, র্ণোকো চলে না। কিন্তু যা হোক এ সম্বন্ধে তোমায় আমি একটা ব্যক্তিগত মত দিতে পারি। আমার দৃঢ় বারণা যে বাঙ্গলা-সাহিত্যে আজ আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করি না কেন, আজ আমরা সেখানে র্ণোক দোহার শুরু ভাঁজতে গেলে যত্থানি ঠকব, বৈষ্ণব পদাবলীর তান সাধতে গেলেও ঠিক তত্থানিই ঠকব। কেননা আজ আমরা র্ণোকও নই বৈষ্ণবও নই—অর্থাৎ অন্তরে।

আসলে পুরাতন পন্থা ও নৃতন পন্থা করকটা সত্তি হলেও ও-সম্বন্ধে তকটাৰ অনেকথানিই বাজে। বাঙ্গলা-সাহিত্য সম্বন্ধে আসল থাঁটি কথা যেটা সেটা হচ্ছে এই যে, তা প্রথমে বাঙ্গলা হওয়া চাই, দ্বিতীয়ত তা সাহিত্য হওয়া চাই। এই হলেই আর কোন সংজ্ঞাই সেটাকে বাঙ্গলা-সাহিত্যের ফলাফলে 'আপাংক্রেয় করে' রাখতে পারবে না।

এত বড় একটা কথার মুখে তকের খাতিরে তুমি জিজ্ঞেস করতে পার যে, যদি কোন বাঙ্গালী উপন্যাসিক কামস্কাট্রিকাবাসী এক জোড়া যুবক-যুবতীর প্রণয়-কাহিনী বর্ণনা করে' একথানা উপন্যাস লেখেন তবে সে গ্রন্থকে বাঙ্গলা-সাহিত্যের জাতে তুলে নিতে হবে কি না ? তা বাঙ্গলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসন গেড়ে বসবে না কি ?—নিশ্চয় তাকে জাতে তুলে নিতে হবে। সাহিত্য-বৃক্ষের নানা শাখা যেমন কাব্য উপন্যাস ইতিহাস ইত্যাদি। এখন যদি বাঙ্গালী-ঐতিহাসিক বাঙ্গলা-ভাষায় একথানি গেঞ্জিকোর ইতিহাস লেখেন তবে তা বাঙ্গলা-সাহিত্যের সম্পদ হবে কি না ? মেঞ্জিকোর ইতিহাস যদি বাঙ্গলা-সাহিত্যের সম্পদ বৃক্ষি করে তবে কামস্কাট্রিকার প্রণয়-

কাহিনীই বা কেন করবে না ? বাঙ্গলা-সাহিত্যে স্থায়ী আসনের কথা, সেটা নির্ভর করবে তার দোষ গুণের উপরে—তা সাহিত্যের র্থাটি জিনিস, না মেকি মাল—তার উপরে ।

এই ধর না কেন, কৃতিবাস ও কাশীরামদাস যেমন রামায়ণ মহাভারতের গল্প নিয়ে বাঙ্গলা রামায়ণ মহাভারত রচনা করলেন তেমনি যদি কোন কবি ইলিয়ড ও অডেসির গল্প নিয়ে বাঙ্গলা মহাকাব্য রচনা করেন, তুমি কি মনে কর তাহলে তা বাঙ্গলা-সাহিত্যে ফেলা হ'য়ে থাকবে । বাঙালী-মনের এমন সংকীর্ণতা হবে না বলে' আমাদের সবাই প্রাণপণে আশা করা উচিত । তা যদি হয় তবে ইংরেজি-সাহিত্যে শেক্সপিয়ারের হামলেট, রোমিও-জুলিয়েত, ওথেলো ইত্যাদি নাকচ, বায়বনের ডনজুয়ান, চাইল্ড-হারল্ড ইত্যাদি কাব্যগুলো নাকচ—ফরাসী-সাহিত্যেরও ঐ রকম অবস্থা দাঢ়াবে । তোমার সূত্র অনুসারে দেখতে পাচ্ছ জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি রকম একটা হলুস্তুল বেধে যাবে । এর উভয়ে যদি বল যে, অন্য দেশের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের তুলনা ! বাঙ্গলা দেশ গড়ে' উঠেছে divine dispensation-এ । তবে অবশ্য নিরুত্তর হয়ে থাকা ছাড়া আর অন্য উপায় নেই । তবে এইখানে তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে—

“এর চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেহুইন
চৱণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলৌন !

* * * *

থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোলে আম্ববন ছায়ে”

এ মনের ভাব মানুষের একটা চিরস্তন ভাব । “আম্ববন ছায়ে”র “ক্ষুদ্র কোণ” যতই গতির কোণ হোক না কেন যতই মধুর কোণ

হোক না কেন, সেই খানেই মানুষের মন চিরকাল আঁটিবে না, আঁটিবে না। মানুষের জীবন-তারে শুণ শুণ করে একটা শুর চিরদিন, গুণ্ডিত হচ্ছে যদি কান পাততে জান তবে কান পেতে শোন, সে শুর হচ্ছে ত্রি—

“এর চেয়ে হ'তেম যদি আরব বেছাইন
চৱণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।”

এই শুর যে থামাতে চায় সে বুহৎকেই থামাতে চায়, মহৎকেই অস্বীকার করতে চায়—এ যেন সাঙ্ক্ষ-আকাশের একটা মাত্র তারার পানে চেয়ে সমস্ত আকাশটাকেই ভুলে যাওয়া—সমস্ত আকাশটাকেই অস্বীকার করা।

সে যা হোক আমাদের সাহিত্যে নৃতন ও পুরাতন এই শুক-শারীর দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে আমার যা মনে হয় তা তোমায় স্পষ্ট করে’ বলছি।

প্রথমে দু’দলের দু’জনা চৱম পঙ্কীকে নেওয়া যাক। একজন বলছেন—আমাদের অতৌতের অনুকরণ কর। আর একজন বলছেন—ইয়োরোপের অনুকরণ কর। আমার মনে হয় এ দু’জনের কেউই বর্তমানে বাঙ্লা-সাহিত্যে কোন স্থায়ী সম্পদ দিতে পারবেন না। কেননা অনুকরণ কথাটার অর্থ হচ্ছে মানুষ যা নয় তাই খেলা করা—যে ভঙ্গীটা আস্তাৱ নয় সেই ভঙ্গীটা তাৱ মনেৱ ভিতৱে কল্পনা কৰে’ তাই কালি কলমেৱ সাহায্যে কাগজেৱ উপৱে আঁকা। কিন্তু সৎ-সাহিত্য, স্থায়ী-সাহিত্য হচ্ছে তাই যাতে ফুটেছে আস্তাৱ চেহাৱা। কেননা এক আস্তাৱ হচ্ছে সৎ—আস্তাৱ হচ্ছে অজৱ অমৱ অক্ষয়, কাল তাকে ধৰংস কৱতে পাৱে না, আগুন তাকে পোড়াতে পাৱে না। এ হচ্ছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেৱ কথা—যাকে আমৱা পূৰ্ণ অবতাৱ বলে মানি।

আসলে যে অতীতের ভিতর দিয়ে আমরা চলে' এসেছি সে অতীতকে আজ আমরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারব না, আর আজ যে বর্তমানটা আমাদের সামনে এসে পড়েছে সেটাকে আমরা থুড়ি দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে পারব না। আর এতে অপমান বোধ করবারও কোন প্রয়োজন নেই বা এতে প্রাচীন স্মৃতিদের গোরব ক্ষুণ্ণ হ'ল কল্পনা করে' চোখের জল ফেলবারও কোন কারণ নেই।

আমাদের অতীতকে যে আমরা ভুলতে পারব না আর আমাদের বর্তমানকে যে আমরা ভুলতে পারব না— ইচ্ছা করলেও নয়— এটা বিশেষ করে প্রমাণিত হয়েছে আমাদেরি সাহিত্য-সাধারণ-তত্ত্বের দু'জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের জীবন দিয়ে। একজন হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর একজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তুমি মাইকেলের জীবনী জান। ইয়োরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা এবং দেশে আমদানী হবার পর বিলিতি সভ্যতার চেউয়ে মধুসূদন যেমন নাকানি-চুবোনি খেয়ে ছিলেন বাড়ী দেশের কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষের আর কেউ তেমন খান নি। তাঁর আহার বিহার পোষাক পরিচ্ছন্ন ধৰ্ম কর্ম সব ছিল বিলিতি। কিন্তু তাঁর কলম থেকে স্থায়ী যা বেরল তা হচ্ছে “মেঘনাদ-বধ”। আর এই “মেঘনাদ-বধ” কেউ ষদি ইংরাজিতে অনুবাদ করে' বিলেতে ছাপান তবে তা পড়ে' এ কথা কেউ বলবে না যে তা একজন ইংরেজ কবির রচনা। মাইকেলের সার্ট-ওয়েষ্টকোট ফুঁড়ে যে আস্তা বেরিয়েছিল তা আর যাই হোক ইংলিশ-মানের আস্তা নয়।

অশুদ্ধিকে আবার আছেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেবেলায় তাঁর ষা ইংরেজি শিক্ষা হয়েছিল সেটা চাটনি হিসেবে। এ-দেশে ত তিনি

ইংরেজি শিক্ষার “পিল” বরদান্ত করতে পারলেনই না, বিলেতে গিয়েও যে তিনি সে শিক্ষাকে মটন চপের মতো কাঁটা ঢামচের সাহায্যে নির্বিদ্বাদে উদরস্ত করতে পেরেছিলেন তা অন্তত তাঁর “জীবন স্মৃতি” পড়ে’ মনে হয় না। তবুও আজ যদি কেউ তাঁর “গীতাঞ্জলি” মৈথিলি ভাষায় রূপান্তরিত করে তবে সেটা বিশ্বাপত্তির রচনা বলে’ কেউ ভুল করতেন না নিশ্চয়।

রবীন্দ্রনাথ ষে একজন বড় কবি এ কথা তুমি মান। তাঁর প্রতিভা অমানুষী এটা ও তুমি স্বীকার কর। এই রবীন্দ্রনাথই একদিন বৈক্ষণ কবিতার রূপে শুণে মুঝ হ'য়ে সেই শুর আপনার সন্দয়-তন্ত্রীতে বাজীয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই ফল হচ্ছে “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী”। এই “ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী” সম্মক্ষে রবীন্দ্রনাথ বেশি বয়েসে যে মত প্রকাশ করেছেন তা তোমাকে এখানে শুনিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর “জীবন-স্মৃতি” তে লিখেছেন, “ভানুসিংহ যিনিই হৌন তাহার লেখা যদি বর্তমানে আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চয় ঠকিতাম না একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। * * * *। ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কসিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগন্ধমোচালা শুর নাই, তাহা আজকালকার সন্তা অর্গেনের বিলাতি টুং টাং মাত্র।” এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথ যে নিজের রচনা সম্মক্ষে কেবল বিনয়ই প্রকাশ করেছেন তা মনে করবার কোন কারণ নেই। রাধাকৃষ্ণন গানে আজ আমরা “দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা শুর” দিতে পারি নে, কারণ এ যুগের আমরা রাধাকৃষ্ণকে ঠিক তেমনি সত্য করে’

পেতে পাৰিবে, যেমন কৱে' সে যুগেৰ তাঁৰা পেতেন। এই দেখছ
না আজকাল আমৰা রাধাকৃষ্ণেৱ লম্বা-চওড়া আধ্যাত্মিক বা
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে শুল্ক কৱেছি। আৱ এইটাই প্ৰমাণ যে
আজকাৰ আমাদেৱ রাধাকৃষ্ণেৱ প্ৰতি প্ৰেম বা ভক্তিৰ জ্ঞানৰচেৱ
ফাঁজিল দাঁড়িয়েছে। আসলে ভক্তিৰ চাইতে আমাদেৱ জ্ঞানেৱ
দিকটা বেড়েই চলেছে। তাই আজ গায়েৱ যমুনাৰ কুলুকুলু রবই
আমাদেৱ দু' কান জুড়ে বসে' নেই, আজ ধৰণীৰ সপ্তসিঙ্গুৰ কলকল
ধৰনিতে আমাদেৱ চিত্ত ভৱে' উঠেছে। ভক্তিৰ দোষ সংকীৰ্ণতা—
জ্ঞানেৱ শুণ উদাহৰণ। ভক্তিৰ, সে হচ্ছে কৃপ ; জ্ঞানেৱ সে হচ্ছে
বারিধি। ভক্তিৰ কৃপ বলেই হয়ত তা শান্ত ও শীতল, কিন্তু শান্ত
ও শীতলতাকে বড় কৱে বিশালতাকে কে অস্বীকাৰ কৱবে ?

এইখানে তুমি নিশ্চয় তব তুলবে। তুমি বলবে যে রবীন্দ্ৰনাথেৱ
হেলে বঘেসেৱ কাঁচা ব্ৰচন্য পাকা রঙেৱ ও রসেৱ আশা কৱা
অস্থায়। এবং সেই আশা কৱে' এবং তাই না পেয়ে তাৱই উপৱে
সমস্ত বাঙালী কবিৱ, তথা সমস্ত বাঙালী জাতিৱ, mental Psycho-
logy-ৰ ব্যাখ্যা দাঢ়ি কৱান কেবল তকে জয়লাভ কৱিবাৰ অগোই।
তুমি হয়ত বলবে যে রবীন্দ্ৰনাথ যদি এই পথ প্ৰাপণে আৰক্ষে
থাকতেন তবে হাত পাকিবাৰ সঙ্গে সঙ্গে তাঁৰ কলমেৱ মুখ থেকে এমনি
সব পদাবলী ফুটে বেৱকুত যা “খেয়া”ৰ সুৱ বা “গীতাঞ্জলি”ৰ গানকে
চাড়িয়ে উঠত। কিন্তু রবীন্দ্ৰনাথেৱ প্ৰতিভা গোপবালাদেৱ মতো
যে যমুনা-পুলিনেৱ পথ ধৱে' চলল না এইটেই মস্ত প্ৰমাণ যে রবীন্দ্ৰ-
নাথেৱ তা সত্য নয়। কেবল রবীন্দ্ৰনাথই কেন ?—নবীনচন্দ্ৰ,
হেমচন্দ্ৰ, বিহাৰীলাল থেকে আৱস্তু কৱে' সত্যেন দণ্ড কঞ্চানিধান

পর্যন্ত কারো কবি-আজ্ঞাই যমুনা-পুলিনে কদম্ব-তরু ছায়ায় কলম
নিয়ে বসে' গেল না। বসবে কি ? যমুনা যে আজ শুকিয়ে উঠেছে—
আর কদম্বের শাখা প্রশাখা দিয়ে হয়ত মালগাড়ীর “ওয়াগন” তৈরী
হচ্ছে। তুমি কি মনে কর যে বাঙালীর কবিরা সব ঘোট বেঁধে জোর
করে' বাঙালীর শ্রেষ্ঠ ও গভৌরতৰ সত্যটাকে অস্বীকার করে'
আসছেন ! আমি কিন্তু তা মনে করি নে।

মানুষের মধ্যে এক কবির জীবনেই কবি-আজ্ঞার সঙ্গে তার বুদ্ধির
সংগ্রাম সন্তুষ্ট নয়। তা যদি সন্তুষ্ট হয় তবে কবি অ-কবিই হয়ে
উঠতে পারেন, স্ব-কবি হন না। যা হোক যধুসৃদন “অজাঞ্জনা কাব্য”
লিখেছেন। কিন্তু শোন “অজাঞ্জনা”য় তিনি লিখেছেন—

নাচিছে কদম্ব-মূলে

বাজায়ে মূরলী রে

রাধিকা-রমণ।

চল সখি ! হো করি

দেখি গে প্রাণের হরি

অজের রতন।

চাতকী আমি স্বজনি !

শুনি জলধর-ধৰনি

কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন ?

যাক মান, যাক কুল,

মন-তরী পাবে কুল,

চল, ভাসি প্রেম-নীরে ভেবে ও-চরণ !

কিন্তু—

কে তুমি, শামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে—

হাহাকার রবে ?

କେ ତୁମি, କୋନ୍ ଯୁବତୀ, ଡାକେ ଏ ବିରଳେ, ସତି !
 ଅନାଥା ରାଧିକା ସଥା ଡାକେ ଗୋ ମାଧବେ ?
 ଅଭୟ-ହନ୍ୟେ ତୁମି କହ ଆସି ମୋରେ—
 କେ ନା ଜାନେ ବଁଧା ଏ ଜଗତେ ଶ୍ୟାମ-ପ୍ରେମ-ଡୋରେ ?

କିମ୍ବା—

କୋଥା ରେ ରାଥାଳ-ଚୂଡ଼ାମଣି ?
 ଗୋକୁଳେର ଗାଭୀକୁଳ ଦେଖ, ସଥି, ଶୋକାକୁଳ,
 ନା ଶୁନେ ସେ ମୁରଲୀର ଧନି ।
 ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ମବେ ପଣିଛେ ନୀରବ,
 ଆଇଲ ଗୋ-ଧୂଲି, କୋଥାଯି ରହିଲ ମାଧବ ?

କିନ୍ତୁ ଆବାର ଏଇ ପରେଇ “ବୀରାଜନା-କାବ୍ୟ” ଥେକେ ଶୋନ—

ଏ କି କଥା ଶୁନି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରରାର ମୁଖେ
 ରହୁରାଜ ? କିନ୍ତୁ ଦାସୀ ନୀଚ-କୁଲୋଦୁଵା ;
 ସତ୍ୟ-ମିଥ୍ୟା-ଜ୍ଞାନ ତାର କତୁ ନା ସନ୍ତବେ ।

କହ ତୁମି,—କେନ ଆଜି ପୁରବାସୀ ଯତ
 ଆନନ୍ଦ-ସଲିଲେ ଯଥ ? ଛଡ଼ାଇଛେ କେହ
 ଫୁଲ-ରାଶି ରାଜପଥେ ; କେହ ବା ଗାଁଥିଛେ
 ମୁକୁଳ—କୁଶମ—ଫଳ—ପଲବେର ମାଳା
 ସାଜାଇତେ ଗୃହଦ୍ୱାରେ,—ମହୋରେ ଯେନ ?
 କେନ ବା ଉଡ଼ିଛେ ଧଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଗୃହଚାରେ ?
 କେନ ପଦାତିକ, ହୟ, ଗଜ, ରଥ, ରଧୀ
 ବାହିନୀରେ ରଣରେଶ ? କେନ ବା ବାଜିଛେ

রণবান্ত ? কেন আজি পুরনারী-অঙ্গ
মুহূর্তঃ ছলাছলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট ; গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণাধ্বনি ?

আর বেশি শোনাবার মুকার নেই। একদিকে “অঙ্গনা” আর
একদিকে “বীরাঙ্গনা”। এ দুয়ের শুরু কোন প্রভেদ অনুভব করতে
পারো ? কোন প্রভেদ দেখতে পাও ? এ দুই শুরু টিক সেই
প্রভেদ, যে প্রভেদ মিথ্যা কথায় ও সত্যের বাণীতে। আসলে মধুসূদন
যে ব্রজের গান গেয়েছেন সে গানে শুরও জমে নি আর তালও
কেটেছে। তাতে আমাদের “দিশি নহবতের প্রাণ-গলানো ঢালা শুর”
ফোটে নি। “অঙ্গনা-কাব্য” বাস্তবিক পক্ষে অঙ্গনাবধ কাব্য
হয়ে উঠেছে।

আসলে আমাদের সাহিত্য সৎ হয়ে উঠবে সেইখানে, যেখানে
আমরা সত্য। অতীতের বীজ আমাদের ধমনীতে ধমনীতে রক্তের
সঙ্গে জড়িয়ে আছেই, আর আজ আমাদের বাহিরে যে আলোক
যে বাতাস রয়েছে, সেই আলোক সেই বাতাসে সেই বীজ যে আকারে
ফুটে বেরবে সেইটৈই হবে আমাদের আসল সত্য। এই আজকার
আলোকের পাত যদি আমরা আমাদের চোখে পড়তে না দিই, আজকার
বাতাস যদি আমরা আমাদের নাসাৱক্ষে প্রবেশ কৱতে না দিই তবে
আমাদের রক্তে সেই অতীতের বীজ পচে’ উঠে আমাদের শরীর
মনকেই দূষিত কৱবে’ তাতে কৱে’ সত্যই বল আর সমাজই বল
হয়েই মৱণের পথ ফলাও হ’তে থাকবে। ফলে আমাদের
জাতীয় জীবনের সন্তানই অর্থাৎ বৃক্ষহই পাকা হয়ে উঠবে, যৌবন

তাকে কোন দিনই আক্রমণ করতে পারবে না। এটা অনেকের পক্ষে আরামের অবস্থা হলেও সকলের পক্ষে মঙ্গলের কথা নয়।

মানুষ চলতে চলতে তার আপনার পরিচয় লাভ করে। মানুষের সাহিত্য হচ্ছে তার মনের চলার নিরিখ। ওই মনের চলা বন্ধ করবার ক্ষমতা কারোই নেই, কোন শাস্ত্রের পাতেও নেই, কোন অস্ত্রের হাতেও নেই। কেননা মানুষের চলাই হচ্ছে তার প্রথম সত্য। কারণ চলারই অর্থ হচ্ছে জীবনকে পাওয়া। আর এ সত্য মানুষের নিজের গড়া নয়—এ সত্য ভগবানের। এই অন্তে হাজার শাস্ত্রও আজ আমাদের বেঁধে রাখতে পারছে না—লক্ষ্য অন্তেও পারবে না।

“অতীত” যতই উৎকৃষ্ট, যতই মহান, যতই যা-কিছু হোক না কেন তার একটা মন্ত্র অসুবিধা এই যে, তা “বর্তমান” নয়। আর “বর্তমানের” একটা মন্ত্র সুবিধা এই যে, তা “ভবিষ্যতকে” গড়ে তুলতে পারে। “বর্তমানের” এই সুবিধাকে অৰ্কড়ে ধরে’ যদি আজ আমরা কাজে না লাগাই তবে হয়ত আবার আর একদিন আসবে যখন আবার “পাত্রাধার তৈল কিঞ্চি তৈলাধার পাত্র” এ প্রশ্নের মীমাংসা করবার জন্যে আমাদের তর্ক করতে বসে’ যেতে হবে। বর্তমান যে অতীতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না, ভবিষ্যতই কে গড়ে’ তুলতে পারে এর অন্তে দোষী কাল। কাল জিনিসটার পিছনে ফেলে-আসা জিনিসের মধ্যে কিছুমাত্র মাঝা নেই, তাৰ সমস্ত অনুরাগ অনাগত যে তাৰ অন্তে। মানুষের জগতেৱ এই সব নিয়মকে ধত দিন না এক নতুন বিশ্বাসিৰ এসে উল্টে দিতে পারছেন ততদিন আমাদেৱ সাহিত্যেও এই সব নিয়মেৱ ব্যতিক্রম কেউ কৰতে পারবে না। বাষ্টিৰ জীবনে ঘাই হোক না কেন সমষ্টি জীবনেৱ দিক ধেকে

এই কালের প্রভাবকে আমরা আনি বলেই ‘কাল-মাহাত্ম্য’ ‘যুগ-ধর্ম’ ইত্যাদি কথাগুলো আমরা মানি।

তুমি হয়ত এখানে বলে’ বসবে যে কালকেই কি বড় করে তুলতে হবে? মানুষের will বলে কি কোন পদাৰ্থই নেই, পুরুষকাৰ বলে’ কি কোন বস্তুই নেই? কালকে পৱন কৱে’ দেখাও যা, দৈবকে চৱন কৱে’ আনাও তাই। আৱ খেতে শুতে উঠতে বসতে ঘেতে দৈবকে মেনে মেনেই ত এ জাতটা গেছে। জীবনকুমাৰ, তুমি ভাৱতবম্বের ইতিহাস ভুল পাঠ কৱেছ। দৈবকে মেনে মেনে এ জাতটা যায় নি, এ জাতটা গিয়েছে পুরুষকাৰকে ন। মেনে মেনে। তুমি নিশ্চয় বলবে যে আমি হৈয়ালি আওড়াচ্ছি। কিন্তু তা নয়। আৱ ও-কথাৱ তাৎপৰ্য হচ্ছে এই যে দৈবও সত্য, পুরুষকাৰও সত্য। কেন ন। ভগবানও আছেন আৱ মানুষও আছে। কেবল দৈবকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে অড়, আৱ থালি পুরুষকাৰকে মেনে মানুষ হয়ে ওঠে দানব। তাই বড় মঙ্গল সেইখানে যেখানে মানুষ ভগবানেৱ সঙ্গে মিলেছে, মঙ্গলে জয় ও জয়ে মঙ্গল সেইখানে, যেখানে মানুষেৱ পুরুষ-কাৰেৱ হাৰা দৈবই সাৰ্থক হয়ে উঠছে, যেখানে ভগবানেৱ গুণ-বাণীকে মানুষ আপনাৰ মনেৱ ইচ্ছা কৱে তুলতে পেৱেছে। ওইখানেই মানুষেৱ পৱাজ্ঞা নেই, তাৱ জয়ে অমঙ্গল নেই। তুমি অজ্ঞেস কৱতে পাৱ যে সবাৱ পক্ষে ভগবানেৱ বাণী পাওয়া কি সম্ভব? তা সম্ভব নয় বলেই আমাদেৱ সব সময় পুরুষকাৰকে জাগিয়ে রাখতে হবে, যাতে কৱে আমাদেৱ সে পুরুষকাৰ আমাদেৱ অজ্ঞাতসাৱেও ভগবানেৱ দিকে আকৃষ্ট হতে একটা স্থৈৱ পায়।

କିନ୍ତୁ କୋଥାଯି ବୈଷ୍ଣବପଦାବଲୀ ଆର କୋଥାଯି ପୁରୁଷକାର ! ହୟତ ଆର ଓ କିଛୁକଣ କଲମ ଚାଲାଲେ ତାର ମୁଖେ ଭାଷାତ୍ତ୍ଵ, ଅସତ୍ତ୍ଵ, ନେହାଂ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତ୍ୱତ୍ତ୍ଵ କି ଏହି ରକମେର ଏକଟା କିଛୁ ଏସେ ଯାବେ । କାହେଇ ଆଜ ଏହି ଥାନେଇ କେମେ ଦୀନି ଟାନଲୁମ । ଇତି

ତୋମାର ମେଳେନ୍ଦ୍ରିୟ

ମୃତ୍ୟୁଙ୍ଗସ୍ତ୍ର ।

—

ମୁଣ୍ଡିର ଇତିହାସ ।

—::—

ଶୁଣିର କାଜ ପାଇଁ ଶେଷ ହୟେ ସଥନ ଛୁଟିର ସଂଟା ବାଜେ ବଲେ, ହେନକାଳେ ବ୍ରଙ୍ଗାର ମାଧ୍ୟାଯ ଏକଟା ଭାବୋଦୟ ହଲ ।

ଭାଣ୍ଡାରୀକେ ଡେକେ ବଲ୍ଲେନ, “ଓହେ ଭାଣ୍ଡାରୀ, ଆମାର କାରଥାନା ସରେ କିଛୁ କିଛୁ ପଞ୍ଚଭୂତେର ଜୋଗାଡ଼ କରେ ଆନ, ଆର ଏକଟା ନତୁନ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରବ ।”

ଭାଣ୍ଡାରୀ ହାତ ଜୋଡ଼ କରେ ବଲ୍ଲେ, “ପିତାମହ, ଆପଣି ସଥନ ଉଂସାତ କରେ’ ହାତି ଗଡ଼ିଲେନ, ତିମି ଗଡ଼ିଲେନ, ଅଜଗର ସର୍ପ ଗଡ଼ିଲେନ, ସିଂହ ବ୍ୟାସ୍ର ଗଡ଼ିଲେନ, ତଥନ ହିସାବେର ଦିକେ ଆଦୌ ଖେଳ କରିଲେନ ନା । ସତଙ୍ଗଲୋ ଭାଣ୍ଡାରୀ ଆର କଡ଼ା ଜାତେର ଭୂତ ଛିଲ ସବ ପ୍ରାୟ ନିକାଶ ହୟେ ଏଲ । କ୍ଷିତି ଅପ୍ ତେଜ ତଳାୟ ଏସେ ଠେକେଚେ । ଥାକ୍ରବାର ମଧ୍ୟେ ଆଜେ ମର୍ଣ୍ଣ-ବ୍ୟୋମ, ତା’ ସେ ଯତ ଚାଇ ।”

ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଶ୍ଵର କିଛୁକଣ ସରେ ଚାର ଜୋଡ଼ା ଗୋଫେ ତା’ ଦିଯେ ବଲ୍ଲେନ, “ଆଜ୍ଞା ତାଳ, ଭାଣ୍ଡାରେ ଯା ଆଜେ ତାଇ ନିସ୍ତରେ ଏସ, ଦେଖା ଯାକ ।”

ଏବାରେ ପ୍ରାଣୀଟିକେ ଗଡ଼ିବାର ବେଳା ବ୍ରଙ୍ଗା କ୍ଷିତି ଅପ୍ ତେଜଟାକେ ଖୁବ ହାତେ ରେଖେ ଖରଚ କରିଲେନ । ତାକେ ନା ଦିଲେନ ଶିଂ, ନା ଦିଲେନ ନଥ, ଆର ଦୀତ ଯା ଦିଲେନ ତା’ତେ ଚିବୋନୋ ଚଲେ, କାମଡ଼ାନୋ ଚଲେ ନା । ତେବେର ଭାଣ୍ଡ ଥେକେ କିଛୁ ଖରଚ କରିଲେନ ବଟେ, ତାତେ ପ୍ରାଣୀଟା ଯୁକ୍ତକ୍ଷେତ୍ରେର କୋନୋ କୋନୋ କାଜେ ଲାଗ୍ବାର ମତ ହଲ, କିନ୍ତୁ ତାର ଲଡ଼ାଇୟେର ସଥ

রইল না। এই প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে
তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই এ'কে দ্বিজ বলা চলে।

আর যাইহোক, স্থষ্টিকর্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম
একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় ঘোলো
অনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম
আকাশকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী,
কারণ উপস্থিত হলে, দৌড়য় ; এ দৌড়য় বিনা কারণে ; যেন তার
নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত স্থ। কিছু কাড়তে
চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলি পালাতে চায়। পালাতে
পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, বিম্ব হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে,
তার পরে না হয়ে যাবে, এই তার মৎস্য। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের
মধ্যে মরুৎব্যোম যখন ক্ষিতি অপ্রত্যক্ষে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন
এটা রকমই ঘটে।

অঙ্গা বড় খুসি হলেন। বাসাৰ জন্যে তিনি অন্য জন্মৰ কাউকে
দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর দৌড় দেখতে ভাল বাসেন
বলে এ'কে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মানুষ। কাড়াকুড়ি করে সে যা-কিছু জমায়
সমস্তই মস্ত বোৰা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে
ছুটতে দেখে, মনে মনে ভাবে এটাকে কোনগতিকে বাঁধতে পারলে
আমাদের হাটকরার বড় সুবিধে !

ফাঁস লাগিয়ে ধৰলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে
জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগাম। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আৱ কাঁথে
মারে জুতোৱ শেল। তা ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেড়ে রাখ্তলে হাতছাড়া হবে তাই ঘোড়াটার চারদিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, তার গুহা কেউ কাড়ল না। কিন্তু ঘোড়ার ছিল খোলা-মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তা-বলে। প্রাণীটাকে মরুৎব্যোম মুক্তির দিকে অত্যন্ত উক্সে দিলে কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

অত্যন্ত যখন অসহ হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার পরে লাথি চালাতে লাগল। তার পা ষতটা যথম হল দেয়াল ততটা হল না তবু চুণ বালি খসে' দেয়ালের সৌন্দর্য নষ্ট হতে লাগল।

এতে মানুষের মনে বড় রাগ হল। বললে, “একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আটপ্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে !”

মন পাবার জন্যে সইসগুলো এমনি উঠেপড়ে ডাঙা চালালে বে ওর আর লাথি চল্ল না। মানুষ তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বললে, “আমার এই বাহনটির মত এমন ভক্ত বাহন আর নেই।”

তারা তারিফ করে বললে, “তাইত একেবারে জলের মত ঠাঙ্গা ! তোমারই ধর্মের মত ঠাঙ্গা !”

একে ত গোড়া থেকেই ওৱ উপযুক্ত দাঁত নেই, নখ নেই, শিং নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে শুন্যে লাথি চৌড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করবার জন্যে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল। তাতে মানুষের ঘূম ভেঙে যায় আর পাড়া-পড়শিরাও ভাবে আওয়াজটা ত ঠিক ভক্তি-গদ্গদ শোনাচ্ছে না।

মুখ বন্ধ করবার অনেক রকম যন্ত্র বেরল। কিন্তু দম বন্ধ না করলে মুখ ত একেবারে বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুমুরুর খবির মত মাঝে মাঝে বেরতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বললেন, “নিশ্চয় তোমারি কৌণ্ডি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েচ!”

যম বললেন, “স্মষ্টিকর্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ! একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখ!”

ব্রহ্মা দেখেন, অতি ছোট জায়গা, চারদিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করছে।

সন্দয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বললেন, “আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মত ওর নখ দস্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগবে না।”

মানুষ বললে, “ছিছি তাতে তিংস্তার বড় প্রশ্নয় দেওয়া হবে। কিন্তু যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগাই নয়। ওর হিতের জন্যেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েচি। খাসা আস্তাবল!”

ব্রহ্মা জেদ করে বললেন “ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।”

মানুষ বললে, আচ্ছা ছেড়ে দেব। কিন্তু সাত দিনের মেয়াদে, তার পরে যদি বল তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভাল নয় তাহলে নাকে খৎ দিতে রাজি আছি।”

মানুষ করলে কি, ঘোড়টাকে মাঠে দিলে ছেড়ে ; কিন্তু তার সামনের দুটো পায়ে কসে রসি বাঁধল । তখন ঘোড়া এমনি চলতে লাগল যে ব্যাঙের চাল তার চেয়ে স্বন্দর ।

অঙ্কা থাকেন স্বন্দুর স্বর্গে ; তিনি ঘোড়টার চাল দেখতে পান, তার হাঁটুর বাধন দেখতে পান না । তিনি নিজের কৌণ্ডির এই ভাঁড়ের মত চালচলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন । বললেন, “ভুল করেচি ত !”

মানুষ হাত জোড় করে বললে, “এখন এটাকে নিয়ে করি কি ? আপনার অঙ্কলোকে যদি মাঠ থাকে ত বরঞ্চ সেই থানে রওনা করে দিই ।”

অঙ্কা ব্যাকুল হয়ে বললেন, “যাও, যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে !”

মানুষ বললে, “আদিদেব, মানুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোৰা !”

অঙ্কা বললেন, “সেই ত মানুষের মনুষ্যত্ব !

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

— — : : — —

(১)

বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে সেনেট হলে পঠিত পাঁচটি প্রবন্ধই বোধ হয় ত্রিবেদী মহাশয়ের শেষ রচনা। এর সর্বশেষ প্রবন্ধটি আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বেদ ও যজ্ঞের জন্মদাত্রী, তাঁর জন্মভূমির একটি বন্দনা দিয়ে শেষ করেন। এবং আমরা, তাঁর স্নোতারা সমস্ত স্থানোচ্চিত গান্তৌর্য বিশ্বৃত হয়ে ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনিতে সত্তা ভঙ্গ করি। শুনেছি এই ঘটনাটি আমাদের দেশের দু’একজন যথার্থ পঞ্জিক ব্যক্তিকে কুকু করেছে। যে ভাব ও যে ভাষা সেনেট হলের ভিতরকে তাঁর বাহিরের দিঘির পার বলে’ বিভ্রম জন্মায়, তা বিশ্ব-বিদ্যার আলয়ের উপযুক্ত কি না এ বিষয়ে তাঁদের মনে সন্দেহ উঠেছে। সে সন্দেহের নিরাসন কামনায় কোনও তর্ক তুলছি নে। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ খর্ব করুক আর না-ই করুক এই বাপারটি রামেন্দ্র-সুন্দরের সাহিত্য সংগ্রহের একটি মর্ম কথার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন পঞ্জিক। সে পাঞ্জিকের ব্যাপকতা ও গভীরতা কোনও দেশেই স্ফুলত নয়। আধুনিক যুরোপের জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ভারতবর্মের বেদ ও বেদাঙ্গ—এড়’য়ের সঙ্গে কেবল তাঁর মনিষ পরিচয় নয়, মনের নাড়ীরও নিগঁা, মোগ

ছিল। কিন্তু এ পাণ্ডিত্য তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে নি। এই বিষ্ণাকে তিনি অতি সহজ লয়ভাবেই বহন করতেন। কারণ এই জ্ঞান বিজ্ঞান, বেদ বেদাঙ্গ সবই ছিল তাঁর সত্ত্বেও সবল মনের খাদ্য-পানীয়, সঞ্চিত ধনের বোৰা নয়। এই জন্ম তাঁর লেখার কোনও জায়গায় পাণ্ডিত্যের ছাপ ঠেলে ওঠে নি। তাঁর সঙ্গীব ও সরস মন পাণ্ডিত্যকে বাহন মাত্র করে' নিজেকেই প্রকাশ করেছে। তাই তাঁর সমস্ত রচনা তাঁর 'সুন্দর হাস্তে' উদ্ভাসিত, তাঁর চিরনবীন 'সুন্দর হৃদয়ের' 'মাধুর্য-ধারায় অভিষিক্ত'। তাঁর বৈজ্ঞানিক-নিবন্ধ, দার্শনিক চিন্তা, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান সমস্তই পাণ্ডিত্যকে এড়িয়ে সাহিত্য হয়ে' বিকশিত হয়ে' উঠেছে।

কলেজের পাঠ্যাবস্থায় রামেন্দ্রসুন্দরের বিশেষ পাঠ ছিল জড়-বিজ্ঞান। এবং তাঁর প্রথমকার প্রবন্ধগুলি প্রায় সবই বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ। আধুনিক বিজ্ঞানের সোনার কাঠির স্পর্শে প্রকৃতির কোন কোন মহলের দরজা খুলেছে, এবং কোন প্রাসাদে রাজ-কন্যারা জেগে উঠেছেন, কোথায় বা দৈত্য-দানবের ঘূম ভাঙছে; সেই বিচিত্র কাহিনী যুবক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। সত্য-নিষ্ঠার কঠোরতায়, বিশ্বেষণের নৈপুণ্যে, রচনার সরসতায় ও কল্পনার বৈচিত্র্যে আচার্য হাঙ্গলির বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী ছাড়ি এ গুলিকে আর কিছুর সঙ্গে তুলনা করা চলে না। আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান-কাণ্ড এবং তাঁর আচার্যেরা ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরের মনের শিঙ্কা ও প্রীতি কতটা অধিকার করেছিল হেল্মহোৎসের মৃত্যুর পর তাঁর.. জীবনী-প্রবন্ধে তিনি তাঁর পরিচয় রেখে গেছেন। এই বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান প্রীতি রামেন্দ্রসুন্দরের সমস্ত চিন্তা ও রচনাকে অনন্ত

সাধারণ যুক্তির দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা দান করেছে। মতামতের সমর্থনে ও সমালোচনায় ঠাকে সমস্ত রকম অনুদলতা ও আতিশয়ের স্পর্শ থেকে মুক্ত রেখেছে।

আধুনিক প্রাণ-বিজ্ঞান রামেন্দ্রসুন্দরের অতি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিল। ডাকুইন থেকে আরম্ভ করে' বাইস্ম্যান, ডিভিস, ও নব-মেডেলীয় পণ্ডিতেরা প্রাণের যে নিগৃঢ় তত্ত্ব প্রচার করেছেন রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবুক মন তাতে গভীরভাবে সাড়া দিয়েছে। ঠার সমাজ ও ধর্মসম্বন্ধের আলোচনা এই নবীন জীববিদ্যার প্রভাবে পরিপূর্ণ। প্রাণের বিকাশ ও বিকারের তত্ত্বের আলোতে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার উত্থান পতনের অঙ্গকার পথ কতটা আলোকিত হয় তিনি পরম কৌতুহলের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে সেটা পরীক্ষা করে' দেখেছেন। এই আলোচনাগুলি রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান ও দার্শনিক চিন্তার মধ্যে সেতুর মতন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোকেজ্জল-কৃষ্ণাশীল দ্বীপ থেকে যাত্রা আরম্ভ করে' তিনি এইখানে মানুষের অদৃষ্ট ভবিষ্যতের তমসাবৃত মহাদেশের দিকে পা বাঢ়িয়েছেন। এ আলোচনাগুলি বিজ্ঞানের মাটিতে শিকড় গেড়ে দর্শনের আকাশে পাতা মেলেছে, এবং সাহিত্যের অমৃতরস এদের অক্ষয় নবীনতা দান করেছে।

অদীর্ঘায় জীবনের শেষভাগে ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর এই বিজ্ঞানের জ্ঞান, দার্শনিক-চিন্তা ও সাহিত্যের রস প্রতিভার রসায়নে একত্র মিশিয়ে বাঙ্গলা-সাহিত্যকে এক অপূর্ব সম্পদ দান করে' গেছেন। রিপণ কলেজের অধ্যাপক সম্মিলনীতে অধ্যাক্ষ রামেন্দ্রসুন্দর ধারা-বাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এর অনেকগুলিটি 'ভারতবর্ষ'

পত্রিকায় পরে ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধগুলির বিষয় ছিল আমাদের নিত্য ঘরকল্পার ব্যবহারিক জগৎ, বিজ্ঞানের কল্পিত প্রাতিভাসিক জগৎ, এবং আধ্যাত্ম জ্ঞানের পারমার্থিক জগতের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়। সাধারণ অবৈজ্ঞানিক লোকে শরীর যাত্রা নির্বাহের জন্য জগতের যে মূর্তি কল্পনা করে বা করতে বাধ্য হয়, বৈজ্ঞানিক তাকেই একটু কেটে ছেঁটে, অল্প-বিস্তৃত মেঝে ঘসে' নিজের কাজ আরম্ভ করেন। কেননা সে কাজই হল এই ব্যবহারিক জগতের বস্তু ও ঘটনার, স্থিতি ও গতির ব্যাখ্যা দেওয়া। কিন্তু এই ব্যাখ্যার পথে চলতে চলতে আধুনিক বিজ্ঞান এমন সব তত্ত্বের পরিকল্পনা করতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে যে তাদের সমাবেশে জগতের যে মূর্তিটি গড়ে' ওঠে সেটি মোটেই আমাদের পরিচিত ব্যবহারিক জগতের মূর্তি নয়। যে মূলের টীকা আরম্ভ হল, টীকা শেষ হলে দেখা গেল সে মূলই নেই। ফলে ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক জগতের ঠিক সম্পর্কটা কি, এবং এই দুই কল্পিত জগতের কোন অংশটা কি অর্থে সত্য, এ সমস্তাটি দাঢ়িয়েছে যেমন কঠিন, তেমনি কৌতুহল-কর। ব্যবহারিক জগতের সঙ্গে পরমার্থিক সতোর সম্বন্ধ অবশ্য দর্শন-শাস্ত্রের প্রাচীন ও আদিম প্রশ্ন। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জগতটি মাঝে পড়ে' প্রশ্নটিকে আরও ঘোরাল করে' তুলেছে। অভিজ্ঞ লোকে জানেন, এই সমস্তা বর্তমান পাশ্চাত্য দর্শনের বোধ হয় সর্ব-প্রধান আলোচ্য বিষয়। এবং পশ্চিমের বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মনীষা এর আলোচনায় নিযুক্ত আছে। কিন্তু আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের এই কঠিন বাঙ্গলা প্রবন্ধের চেয়ে এ সমস্তার অধিক সুস্মরণ, অধিক গভীর ও অধিক সরস আলোচনা যুরোপেরও কোনও

দেশের ভাষা দেখাতে পারবে কিনা সন্দেহ করা চলে। কেননা অধুনিক জড় বিজ্ঞানের সঙ্গে যে নিকট পরিচয়, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের চর্চায় যে মার্জিত বুদ্ধি ও ভাবপ্রকাশে সাহিত্যিকের যে শক্তি ও রস রামেন্দ্রসুন্দরে একত্র সমবেত হয়েছে বর্তমান যুরোপের সারস্বত-সমাজেও তা স্থূলভ। আমাদের দুর্ভাগ্য রামেন্দ্রসুন্দর এই আলোচনাকে সম্পূর্ণ পরিণত গড়ন দিয়ে যেতে সময় পান নি। এবং বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বের জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে একটা দেবার মত দানের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

. (২)

৩রামেন্দ্রসুন্দরের সব স্মৃতি সভাতেই বক্তৃরা তার স্বদেশ-প্রাতির কথা তুলেছেন। আমাদের দেশের বর্তমান এখন আমাদের মনে কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে। অনুভবের শক্তি যার একেবারে লোপ হয় নি তার পক্ষেই বেশিক্ষণের জন্য দেশকে ভুলে থাকা অসম্ভব। এই বেদনার নিত্য অনুভূতি আমাদের স্বদেশ-প্রাতির প্রথম লক্ষণ। এ ব্যাথা রামেন্দ্রসুন্দরের মনে কত মর্মান্তিক ছিল, তার লেখার সঙ্গে অল্পমাত্রও যার পরিচয় আছে তিনিই তা জানেন।

দেশের ধাঁরা কষ্টী তাঁদের স্বভাবতই চেষ্টা হবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হীন বর্তমানকে মহৎ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়া। রামেন্দ্রসুন্দর লোকে যাকে কাজের লোক বলে ঠিক তা ছিলেন না। যে রঞ্জোগুণের প্রাচুর্য মানুষকে ক্ষণমাত্রও অক্ষমকৃৎ থাকতে ও কাজ ছাড়া আর কিছুতেই আনন্দ পেতে দেয় না তাঁর প্রকৃতিতে সে রঞ্জোগুণের অভাব ছিল। ভাব ও চিন্তার

জগৎ ছাড়া কাজের জগতের চলাফেরা তাঁকে বিশেষ আনন্দ দিত না। কিন্তু রামেন্দ্ৰসুন্দৱেৱ স্বদেশপ্ৰীতি এক জায়গায় তাঁৰ এই প্ৰকৃতিকে জয় কৱেছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পৱিত্ৰ-এৱ কাজে তিনি অক্ষণ্ট কৰ্ম্মা ছিলেন। তিনি এৱ জন্ম অকাতোৱে নিজেৰ সময় ও স্বাস্থ্য, দান কৱে' গেছেন। মনে হয় এ না হলে তিনি হয়ত জ্ঞান ও চিন্তাৰ রাজ্যে আমাদেৱ আৱও অনেক বেশি দিয়ে ঘেতে পাৱতেন। কিন্তু স্বদেশেৰ যে ভাষা ও সাহিত্যেৰ বিগ্ৰহকে তিনি বিশেষ ভাবে পূজা কৱতেন, তাৰ কাজেৰ আহৰণ রামেন্দ্ৰসুন্দৱ কোনও মতেই উপেক্ষা কৱতে পাৱেন নাই।

প্ৰাচীন হিন্দু সভ্যতাৰ উপৱ শ্ৰী বোধ হয় আধুনিক হিন্দুৰ স্বদেশপ্ৰীতিৰ একটা অপৱিহার্য অঙ্গ নয়। আমাদেৱ দেশে এমন সব স্বদেশহিতৈষী আছেন যাঁদেৱ অন্তৰে এই সভ্যতাৰ প্ৰতি বিন্দু-মাত্ৰও শ্ৰী ও প্ৰীতি নেই। তাঁৰা যে কথায় বা বক্তৃতাৰ এই সভ্যতাৰ গৌৱ কৱেন না এমন নয়। কিন্তু যদি কোনও আলাদীন একৱাত্ৰেৰ মধ্যে ভাৱতবৰ্ষেৰ সমস্ত অভীতটাকে মুছে কেলে ভোৱেৱ আলোৱ সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুৱোপকে (প্ৰকৃতপক্ষে আধুনিক ইংলণ্ডকে কেননা ইংলণ্ডেৰ বাইয়েৱ যুৱোপীয় সভ্যতাৰ সঙ্গে আমাদেৱ তেমন পয়িচয় নেই) একবাৱে গোটা দেশেৱ উপৱে বসিয়ে দিয়ে যায় তাতে তাঁৰা হৰ্ষোৎফুল্লই হয়ে উঠবেন। এৱ অবশ্য এক কাৰণ—কুচিব প্ৰভেদ, মানুষেৰ সকল বিষয়েই যথন কুচিৰ তক্ষণ ব্যয়েছে; তথন কেবল সভ্যতাৰ বেলাতেই দেশেৱ সকলোৱ কুচি এক হবে এমন আশা কৱা চলে না। কিন্তু এৱ নিঃসন্দেহ প্ৰধান কাৰণ আমাদেৱ দেশেৱ প্ৰাচীন সভ্যতাৰ সঙ্গে আমাদেৱ পয়িচয়েৰ একান্ত অভাৱ। বে

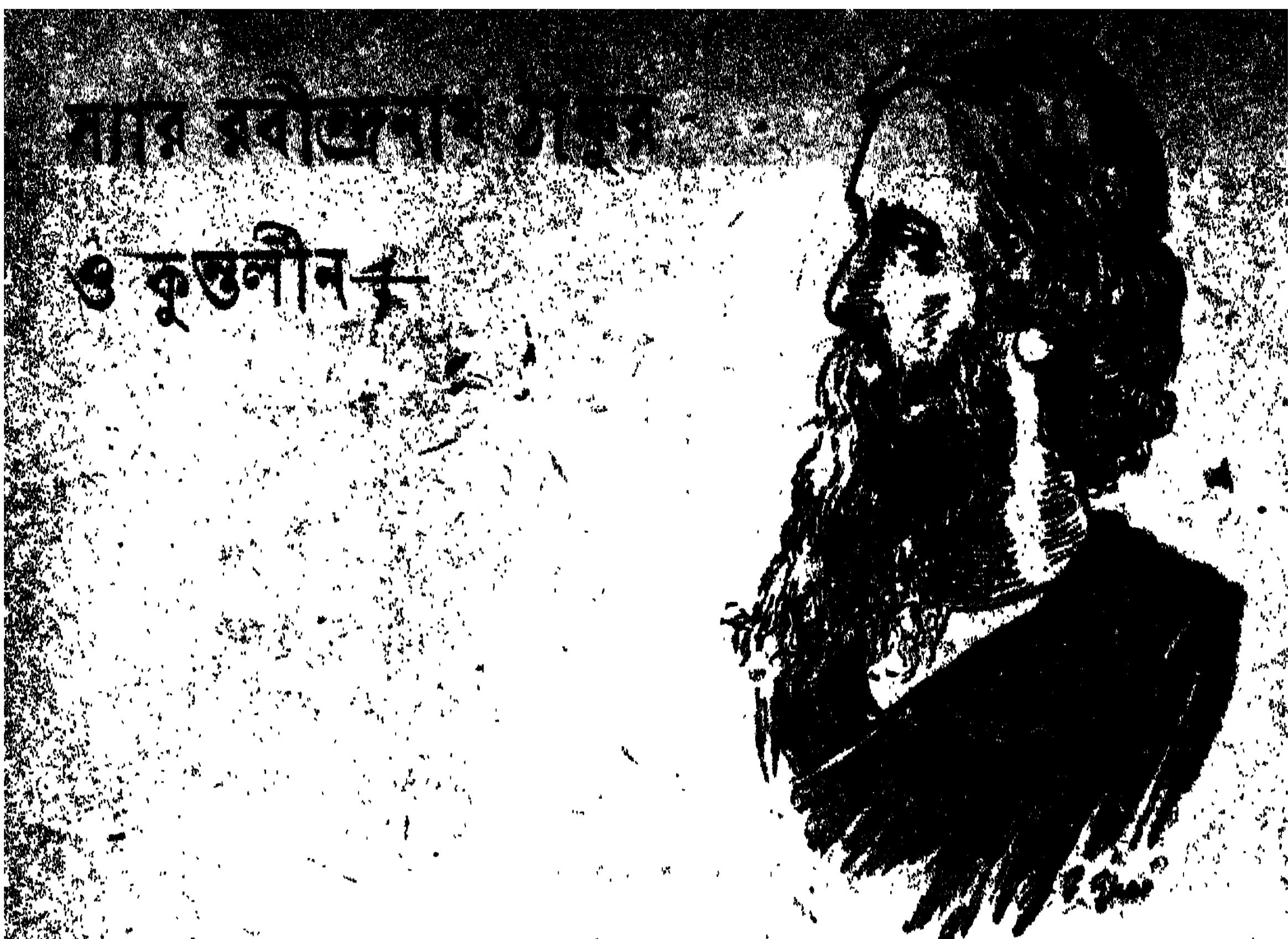
একমাত্র সঙ্গীব ও সবল সভ্যতাকে আমরা জানি সে হ'ল আধুনিক যুরোপের হালের সভ্যতা। এবং সে সভ্যতা যখন বর্তমানে সাংসারিক হিসাবে অতি প্রবল তখন তাতে যে আমাদের মনকে মুগ্ধ এবং বাসনাকে প্রলুক্ষ করবে এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

কিন্তু ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টি কেবল হালের যুরোপেই একান্ত নিবন্ধ ছিল না। এ সভ্যতার যা শ্রেষ্ঠ ফল তার আস্থাদ তিনি বিশেষ ভাবেই পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে মানবজাতির প্রাচীন সভ্যতাগুলিরও তাঁর নিকট পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে তিনি জেনেছিলেন মানুষের সভ্যতার বিশালতা ও তার ইতিহাসের বৈচিত্র্য। সেইজন্য চোখের সামনে আছে বলেই বর্তমান তাঁর কাছে অসঙ্গত রকম বড় হয়ে উঠতে পারে নি। প্রাচীন ও নবীন নানা সভ্যতার তুলনার ফলে তিনি প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার প্রতি অশেষ প্রিতিমান ও গভীর শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন। অথচ সে প্রিতিতে কোনও মোহ ছিল না, সে শ্রদ্ধায় কোনও গোড়ামি ছিল না। এ হিন্দু-সভ্যতা যে বিশাল মানব-সভ্যতার একটা অংশমাত্র সে কথা তিনি কখনও ভোলেন নি। সেইজন্য ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর নিতান্ত নিঃসঙ্কোচে বৈদিক মতের অনুষ্ঠান ও তার আদর্শের সঙ্গে স্মষ্টির ধর্মের অনুষ্ঠান ও আদর্শের তুলনা করে' এ দুয়ের মধ্যে গভীর মিল দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ বিশ্বাসও তাঁর শুব দৃঢ় ছিল যে অভিজ্ঞের বিচারে আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে কোনও সভ্যতার কাছেই মাথা হেঁটে করে' দাঢ়াতে হবে না। কেন না তিনি সেই ভারতবর্ষকে জেনেছিলেন যে ভারতবর্ষ বেদ ও উপনিষদ্ স্মষ্টি করেছে, কপিল ও শাক্যমুনিকে অস্ত দিয়েছে, যার কবি মহাভারত রচনা করেছে, যার

ঋষি ধৰ্ম অর্থ কাম মৌলও বিছাকেই উপেক্ষা করে নাই ; বে
ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় দিঘিজয়ে গৌরব খুঁজেছে, যার রাজপুত্র রাজ্য
ত্যাগ করে' প্রভৃত্যা নিয়েছে। হিন্দুর এই প্রাচীন সভ্যতা রামেন্দ্-
শুন্দরকে মুক্ত করেছিল, এবং তিনি তাঁর স্বদেশবাসিকে এর সঙ্গে
পরিচয় করিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। তার ফল তাঁর 'ঐতরেয়
আক্ষণ'-এর বাঞ্ছলা অনুবাদ, তাঁর 'বিচিত্র প্রসঙ্গ,' তাঁর বৈদিক ঘজের
বিবরণ ও ব্যাখ্যা। তিনি বেঁচে থাকলে যে এই কাজেই তাঁর শক্তিকে
বিশেষ করে' নিয়োজিত করতেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ঋত বা
নিয়মের তিনি উপাসক ছিলেন তাতে ব্যবস্থা অন্তরূপ। রামেন্দ্-শুন্দরের
অকাল মৃত্যুতে দেশের এই ক্ষতিটি বোধ হয় সব চেয়ে গুরুতর।
ভাবহীন ও অকাহীন পাণ্ডিতের হাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা
কেমন মৃত্তি ধারণ করে তা আমরা জানি ; এবং কৃষ্ণচক্র শ্রদ্ধার কাছে
তার কি লাঙ্গনা তাও আমাদের অজ্ঞাত নেই। কিন্তু ভাবুক ও
অকাশীল চক্রস্থান ও পাণ্ডিতের মনে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার কি
মৃত্তি বিরাজ করে রামেন্দ্-শুন্দর তার পরিচয় আমাদের দিতে আরম্ভ
করেছিলেন। কিন্তু প্রস্তাবনাতেই তার ব্যবনিকা পড়েছে, এবং অদূর
ভবিষ্যতে তার অপসারণেরও কোনও সন্তান দেখা যায় না।

১২ই জুলাই, ১৯১৯

শ্রীঅভুলচন্দ্র শুণ।



ও কুসুমনি—

কুসুমনি ছিল অন্ধকার দুর্মান বলে পরিচয় ছিল
পরিষেবা, অন্ধকার জীবন আবীর্বাদ এই দিন ইতোত
চল কৃত্তি হৈতেছিল। কুসুমনি প্রথমে কানুন
প্রয়োগ করে উচ্চ কানুন কর্তৃপক্ষের সুপ্রিয়া
কুসুমনি কৃষ্ণ প্রসূত প্রসূত প্রসূত প্রসূত
কুসুমনি কৃষ্ণ প্রসূত প্রসূত প্রসূত প্রসূত

শ্রীবিজয়পুরুষ

আপনাদিগকে বাজে তেল করের পূর্বে এই কথাওলি
ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

জর্বাসিট—১০০। পদ্মগুড়—২। গোলাপগুড়—২।।০। শুভ্রাশ—১।।০।

লেটিস গুড়—২।।। ভায়োসেট গুড়—৩। বোকে গুড়—

শাকস্বাদুকুচি পারলিউমার,

টেলিফোন—১০০।।।

১২০

“সবুজ পত্র” সম্পাদকের নৃতন বহি ।

- ১। নানা-কথা——ইহাতে প্রথম বাবুর ২১টি প্রবন্ধ, আকা
ডিমাই আটপেজী, ৩৬২ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট আইভরি ফিলিস
কাগজে ছাপা—মূল্য দেড়টাকা মাত্র ।
 - ২। “আহতি”——ছোট-গল্লের বহি, ইহাতে ছয়টি গল্ল, স্বদৃশ্য
বাঁধাই, প্রায় ২০০ শত পৃষ্ঠা—মূল্য পাঁচসিকা মাত্র ।
 - ৩। “পদ-চারণ”——কবিতা সমষ্টি, উৎকৃষ্ট আইভরি কাগজে
ছাপা—মূল্য বার আনা মাত্র ।
-

- ৪। বৌরবলের হালখাতা——মূল্য এক টাকা মাত্র ।
(ইহাতে বৌরবলের সমস্ত প্রবন্ধ সম্বিবেশিত হইয়াছে ।)
- ৫। চারই-ইয়ারী কথা (গল্ল)——মূল্য বার আনা মাত্র ।
- ৬। সনেট-পঞ্চাশ (কবিতা)——মূল্য আট আনা মাত্র ।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ অনুদিত, “সবুজ পত্র”-সম্পাদক প্রমঃ
বাবুর ভূমিকাসম্বলিত কবিতা-গ্রন্থ—
“কুবেইয়াও-ই-ওমর ঈয়াম”—মূল্য ১। টাকা ।

প্রাপ্তি স্থান :—ম্যানেজার, “সবুজ পত্র”, ৩ নং হেট্টিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ; রায় এম. সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ।



ଶ୍ରୀ କୃତ୍ତବ୍ୟାମିନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ପାତ୍ରମାଣି
ପାତ୍ରମାଣି, ପାତ୍ରମାଣି ଏହିଏହି ପାତ୍ର
ପାତ୍ର ପାତ୍ରମାଣି କୃତ୍ତବ୍ୟାମିନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର
ପାତ୍ରମାଣି ଏହିଏହି ପାତ୍ରମାଣି ଏହିଏହି
ଏହିଏହି ଏହିଏହି ଏହିଏହି ଏହିଏହି
ଏହିଏହି ଏହିଏହି ଏହିଏହି ଏହିଏହି

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ତବ୍ୟାମିନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର

ଆପନାଦିଗିକେ ବାଜେ ତେବେ କରେଇପୂର୍ବେ ଏହି କଥାଓଲି
ତାବିଳା ଦେଖିତେ ଅନ୍ଧରୋଧ କରି ।

ଜୀବସିଦ୍ଧି—୧୦୦

ପରମଗତ—୨

ମୋହନପାତ୍ର—୨୦

କରିବାର—୩

ଲୋକିନ ଗତ—୨

ଭାବମାନେଟ ଗତ—୨

ବୋକେ ଗତ—୨

“সবুজ পত্র” সম্পাদকের নৃতন বহি ।

- ১। নান-কথা——ইহাতে প্রথম বাবুর ২১টি প্রবন্ধ, আকাৰ
ডিমাই আটপেজী, ৩৬২ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস
কাগজে ছাপা—মূল্য দেড়টাকা মাত্র।
 - ২। “আ'হতি”——ছোট-গল্লের বহি, ইহাতে ঢয়টি গল্ল, স্বদৃশ
বাঁধাই, প্রায় ২০০ শত পৃষ্ঠা—মূল্য পাঁচসিকা মাত্র।
 - ৩। “পদ-চারণ”——কবিতা সমষ্টি, উৎকৃষ্ট আইভরি কাগজে
ছাপা—মূল্য বার আনা মাত্র।
-

৪। দীর্ঘলৈর হালখাতা——মূল্য এক টাকা মাত্র।

(ইহাতে বৌদ্ধলৈর সমস্ত প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে।)

৫। চারই-ইয়ারী কথা (গল্ল)——মূল্য বার আনা মাত্র।

৬। সনেট-পঞ্চাশ্ব (কবিতা)——মূল্য আট আনা মাত্র।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ অনুদিত, “সবুজ পত্র”-সম্পাদক প্রমঃ
বাবুর ভূমিকাসম্বলিত কবিতা-গ্রন্থ—

“কুবেইয়াও-ই-ওমর ধৈয়াম”—মূল্য ১ টাকা।

প্রাপ্তি স্থান :—ম্যানেজার, “সবুজ পত্র”, ৩ নং হেটিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ; রায় এম, সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সল্ল ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

•সোনার শাখা

উৎকৃষ্ট হস্তিদস্ত ও বিশুদ্ধ তাত্ত্বের উপর

গিনি সোনায় শাখার শাখা ।

কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনী হইতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ।

সোনা ৩০, টাকা ভরি হিসাবে শাখার মূল্য লেখা হইল ;
(সোনার বাজার অনুসারে মূল্য কমবেশী হয়) ।



হস্তিদস্তের উপর তামার উপর

চারি আনা সোনায় প্রস্তুত :— ১৪॥০ ... ১১॥০

ছয় আনা „ „ :— ১৯।০ ... ১৫৫।০

আট আনা „ „ :— ২৪। ... ২০।

তিন আনা „ „ (ছোট) ১০॥।০ ... ৯।

ভিঃ পিঃ তে মাঞ্চলাদি ১ জোড়া ॥০ আনা, ৩ জোড়া ৮০ আনা ।

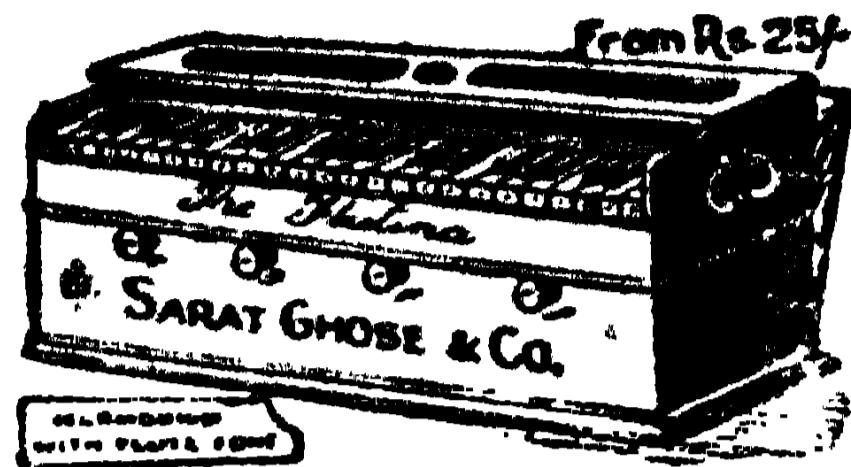
প্রত্যেক শাখার সহিত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয় । ১০ দিবস মধ্যে শাখা বদল করা বা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে, গ্যারাণ্টি পত্রে তাহা লেখা থাকে । শাখার নমুনা দেখিতে আসিলে যত্রের সহিত দেখান হয় ; মূল্য ডিপজিট রাখিয়া শাখা স্থানান্তরে দেখিবার অন্ত লইয়া যাইতে পারিবেন । শাখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া অঙ্কার দিবেন । প্রমাণ শাখার ভিতরের মাপ ২ ইঞ্চি আধ স্থূত (৮ স্থূতে ১ ইঞ্চি) । কোন বিষয় আবিবার অন্ত পত্র লিখিলে উত্তর দেওয়া হয় ।

ইকনমিক ভুয়েলারী ওয়ার্কস্ ;

৩৩ নং কর্ণফ্লামিস স্ট্রিট, কলিকাতা—এবং খুলনা ।

SARAT GHOSE'S SONORA HARMONIUMS

INDIA'S ACKNOWLEDGED BEST



No. 5—3 Octaves, 2 sets of reeds, 5 stops,
large size, special hollow reeds.

Price Rs. 40.

RECOMMENDED TO BEGINNERS.

আমরা বেহালা, বাঁশী, হারযোনিয়ম, পিয়ানো প্রভৃতি বিলাতী যন্ত্ৰ
ও সেতোৱ এস্রাজ প্রভৃতি স্বদেশী যন্ত্ৰ ও বিক্ৰয় কৰি। আমাদেৱ
ষটক ভাৱতবৰ্ষেৱ মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং আমাদেৱ জিনিষেৱ
গুৰুত্ব সৰ্বজন-বিদিত।

সেতার, এস্রাই, স্মরদ, বীণা প্রভৃতি স্বদেশী যন্ত্রের উপযোগী
বিলাতি ইঞ্জাতের tempered music wire আমরা আমদানী করি।
একপ সন্তোষজনক তার পুর্বে কথনও আসে নাই।

সঙ্গীত বিষয়ক যে কোন যন্ত্র সরঞ্জাম বা পুস্তক, আমাফোন্ ও
রেকর্ড আমাদের নিকট পাইবেন।

“ଆଲିବାବାର” ଗାନେର ଅରଲିପିର ମୂଳ୍ୟ ୧୧୦ ।

SARAT GHOSE & CO.

4, DALHOUSIE SQ. CALCUTTA.

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେର ଗାନ ।

“অন-গন ঘন অধিনায়ক”, “দেশদেশ নম্বিত”, “অয়ি ভুবন ঘন”

ଏତୁଭି ସ୍ଵରଳିପି ସହ ଏତୋବାଟି ।



“যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই আমি তা অন্মনে !”

— স্বর্ণনাথ ।

* * * অনবন্ধ গুরুত্বে * * *

“পুষ্প”—অযুতপুস্পোথ হীরকদ্রব ।

“নবপুষ্প”—মরকতঙ্গাম পুষ্পজ্ঞেহ ।

* * * বেঙ্গল কেমিকাল * * *

ওমর-ধৈয়াম । *

—*—

ফার্সি আমরা আনি নে, কিন্তু ও-ভাষার বড় বড় কবিদের নাম
আমাদের সকলেরই নিকট সুপরিচিত। হাফেজ ও সাদীর নাম
ভদ্রসমাজে কে না আনে? ওমর-ধৈয়ামের নাম কিন্তু ছ'দিন আগে
এদেশে কেউ শোনে নি, এমন কি ফার্সি-নবিশেরাও নয়। যদিচ
এযুগের সমজদারদের মতে তিনিই হচ্ছেন ইরাণদেশের সব চাইতে
বড় কবি।

আজকের দিনে ওমর যে আমাদের একজন অতিপ্রিয় কবি হয়ে
উঠেছেন, সে ইউরোপের প্রসাদে। ওমর প্রায় হাজার বছর আগে
পারস্যদেশের নৈশাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তাঁর
কবিতার খ্যাতি কালক্রমে বৃক্ষি পাওয়া দূরে থাক—সাহিত্যসমাজে
তাঁর নাম পর্যাপ্ত লুপ্ত হয়ে এসেছিল। কিছুদিন পূর্বে জনৈক ইংরাজ-
কবি ওমরকে আবিক্ষা করেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর কবিতা
ইংরাজিতে অনুবাদ করে' ইউরোপের চোখের ছবিখে ধরে দেন।

আকাশ-রাজ্যে একটি নৃতন জ্যোতিষ আবিক্ষত হলে বৈজ্ঞানিক-
সমাজ যেমন চঞ্চল ও উৎকুল হয়ে ওঠেন, মনোরাজ্য এই নব-
নক্ষত্রের আবিক্ষারে ইউরোপের কবি-সমাজ তেমনি চঞ্চল ও উৎকুল

* শৈয়ুক্ত কান্তিচন্দ্র যোধ মহাশয় কর্তৃক অনুদিত ওমর-ধৈয়ামের "রবেইরাঁ" নামক কবিতা-
গ্রন্থের ভূমিকাবরাপ লিখিত। সঃ সঃ

হয়ে উঠলেন। ফলে এযুগে ইউরোপের এমন নগর নেই যেখানে এই নব কাণ্ডালসের ঐকান্তিক চর্চার জন্ম একাধিক কাবাগোষ্ঠী গঠিত হয় নি। এই নব নক্ষত্রের একটি নব উপাসক-সম্প্রদায়ও সে দেশে গড়ে উঠেছিল, শুনতে পাই গত যুদ্ধে সে সম্প্রদায় মারা গেছে। সে যাইহোক, সেকালের এসিয়ার কবিতা একালের ইউরোপের হাতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং আমরা তার অপূর্ব রূপ দেখে চমৎকৃত ও মুক্ত হয়ে গিয়েছি।

(১)

এ কবিতার জন্ম সন্দয়ে নয়, মতিমধ্যে। ওমর-বৈয়াম ছিলেন একজন মহা পণ্ডিত। তিনি সারা জ্ঞান চর্চা করেছিলেন শুধু বিজ্ঞানের, কাব্যের নয়। অঙ্গশাস্ত্রে ও জ্যোতিষে তিনি সেকালের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন। তিনি এই জ্ঞান-চর্চার অবসরে শুটি-কয়েক চতুর্পাদী রচনা করেন। এবং সেই চতুর্পাদীক টিটি তার সমগ্র কাব্যগ্রন্থ। এত কম লিখে এত বড় কবি সন্তুষ্ট এক ভর্তুহরি ঢাড়া আর কেউ কখন হন নি। ভর্তুহরির সঙ্গে ওমরের আরও এক বিষয়ে সম্পূর্ণ মিল আছে। উভয়েই জ্ঞানমার্গের কবি, ভজনমার্গের নন।

ওমরের সকল কবিতার ভিতর দিয়ে যা ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে মানুষের মনের চিরস্তন এবং সব চাইতে বড় প্রশ্ন—

“কোথায় ছিলাম, কেনই আসা, এই কথাটা জানতে চাই

* * * *

যাত্রা পুনঃ কোন লোকেতে ?— *

এ প্রশ্নের জবাবে ওমর-বৈয়াম বলেন—

“সব ক্ষণিকের, আসল ফাঁকি, সত্যমিথ্যা কিছুই নাই”।

ওমর যে সেকালের মুসলমান সমাজে উপেক্ষিত হয়েছিলেন, এবং একালের ইউরোপীয় সমাজে আদৃত হয়েছেন, তার কারণ তাঁর এই জবাব। মাঝে মুসলমান ধর্মে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে এ মত শুধু অগ্রাহ্য নয়—একেবারে অসহ্য; কেননা এ কথা ধর্মবাদেরই মূলে কুঠারাঘাত করে। অপরপক্ষে এ বাণী মেনে নেবার জন্য এ যুগের ইউরোপের মন সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। ইউরোপের মন একান্ত বিজ্ঞান-চর্চার ফলে, গ্রাস্তধর্মের উপর তার প্রাচীন বিশ্বাস হারিয়ে বসেছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে কোনও নৃতন বিশ্বাস থুঁজে পায় নি। স্মৃতিরাঙ্ক ওমরের কবিতায় বর্ণিত ইউরোপ তার নিজের মনের ছবিই দেখতে পেয়েছিল। এই হচ্ছে প্রথম কারণ, যার দরুণ ওমরের বাণী ইউরোপের মনকে এতটা চক্ষে করে ঢুলেছিল।

(৩)

এছলে কেউ বলতে পারেন যে “Vanity of vanities—all is vanity” এসিয়ার এই প্রাচীন বাণী ত দু'হাজার বৎসর পুরুষে ইউরোপের কানে পৌঁছেছিল। বাইবেলের একটা পুরো অধ্যায়ে (Ecclesiastes) ত এই কথাটারই বিস্তার করা হয়েছে, প্রচার করা হয়েছে; অতএব ওমরের বাণীর ভিতর কি এমন নৃতনই আছে যাতে-করে সে বাণী ইউরোপের মনকে এতটা পেঁয়ে বসেছে?—

নৃতন্ত্র এই যে— ওমরের মতে, যে প্রশ্ন মানুষে চিরদিন করে' আসছে, বিশ্ব কোনদিনই তার উত্তর দেয় না, কেননা দিতে পারে না। তাঁর চোখে এই সত্য ধরা পড়েছিল যে, এ বিশ্বের অন্তরে হৃদয় নেই, মন নেই, এ জগৎ অঙ্গ নিয়তির অধীন, স্ফুতরাং তার ভিতর-বাহির দুই-ই সমান অর্থহীন, সমান মিছ। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে—

“উক্তি অধে, ভিতর বাহির, দেখছ যা সব মিথ্যা ঝাঁক,
ক্ষণিক এ সব ছায়ার বাজী, পুতুল-নাচের ব্যর্থ ঝাঁক।”

* * * *

সদ্য ফলের আশায় মোরা মরছি খেটে রাত্রিদিন
মরণ-পারের ভাবনা ভেবে আঁধির পাতা পলকহীন।

শুভ্য-আঁধার মিনার হতে মুয়েজিতনের কণ্ঠ পাই—
মুর্ধ তোরা, কাম্য তোদের হেথায় হোথায় কোথাও নাই।”

অপরপক্ষে আমাদের দেশের রাজকবি ভর্তুহরির মত জেফ-জিলামের রাজকবিরও মুখে, “Vanity of vanities—all is vanity” এ বাকেয়ের অর্থ “জগৎ মিথ্যা, অঙ্গ সত্য”। অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইহন্দী কবি দুজনেই এই বিশ্বের অন্তরে “এমন একটি সার সত্য, এমন একটি নিত্য বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন, যেখানে মানুষের মন দাঢ়াবার স্থান পায়, এবং যার সাক্ষাংকার লাভ করলে মানুষ চিরশাস্তি, চির আনন্দ লাভ করে”। ওমাৰ বৈয়ামের মতে, ও হচ্ছে শুধু মানুষের মন-ভোলানো কথা—আসল সত্য এই যে, জগৎও মিথ্যা অঙ্গও মিথ্যা। পূর্বোক্ত রাজকবিৱা মানুষের চোখের শুমুখে একটি অসীম আশাৰ মুর্দি পাড়া কৱেছিলেন, ওমৰ-বৈয়াম কৱেছেন অনন্ত

নৈরাশ্যের । ওমরের বাণী আমাদের মনকে আপিয়ে তোলে, কেবলা
এ যুগে আমরা কেউ জোর করে বলতে পারি নে যে, আমরা স্থিতি
গোড়ার কথা আর শেষ কথা জানিই জানি ।

(৪)

এতক্ষণ ধরে ওমরের দর্শনের পরিচয় দিলুম এই কারণে যে,
এই দর্শনের জমির উপরই তাঁর কবিতার ফুল ফুটে উঠেছে । যাঁদের
মতে “জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সত্য”, তাঁরা আমাদের উপদেশ দেন—

“মায়াময়মিদং অথিলং হিং
প্রবিশাশ্চ ব্রহ্মপদং বিদিশ্চ ।”

ওমরের মতে কিন্তু “মায়াময়মিদং অথিলং” হচ্ছে একমাত্র
সত্য—অবশ্য সার সত্য নয়, অসার সত্য । তিনি তাই উপদেশ
দিয়েছেন—

“এক লহমা সময় আছে সর্বনাশের মধ্যে তোর,
ভোগ-সাগরে ডুব দিয়ে কর একটা নিমেষ নেশায় তোর ।”

বলা বাহ্যিক ওমরের মুখে এ কথা হচ্ছে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিকল্পে
বিদ্রোহের বাণী । এ জীবনের যখন কোনও অর্থ নেই, তখন যা
ইঙ্গিয়গোচর আর যা অনিত্য তাকেই বুকে টেনে নিয়ে আসা যাক,
তাকেই উপভোগ করা যাক । ওমরের পূর্বেও অনেকে মানুষকে
এই উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কথার সঙ্গে ওমরের কথার
অনেকটা প্রভেদ আছে । যাঁরা বলতেন “eat, drink and be
merry, for to-morrow we die,” তাঁরা বিশ্ব-সমস্তার দিকে

একেবাবেই পিঠি ফিরিয়েছিলেন। আর প্রাচীন গ্রীসের Epicurean-রা যা-কিছু ইন্দ্রিয়-গোচর তাকেই সন্তুষ্টিতে আহ করে নিয়ে ইন্দ্রিয়-শুধের চর্চাটা একটি শুকুমার বিষ্ঠা করে' তুলেছিলেন; এছলে বলা আবশ্যিক যে, তাঁরা ইন্দ্রিয় অর্থে বহিরিন্দ্রিয় ও মানবেন্দ্রিয় দুই-ই বুঝতেন।—তাঁরা ছিলেন শান্তিতে, কিন্তু ওমরের হৃদয়মন চির অশান্ত। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যে ব্যর্থ—এ সত্য ওমর সন্তুষ্টমনে মেনে নিতে পারেন নি, এর বিকলকে তাঁর সকল মন বিস্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে বিশ্বের বিকলকে মানবাঙ্গার বিস্রোহ, উপহাস ও বিজ্ঞপের আকারে ফুটে বেরিয়েছে, কিন্তু তাঁর সকল হাসিঠাটার অন্তরে একটি প্রশংসন কাতুরতা আছে,—এইখানেই তাঁর বিশেষ। ওমর-ধৈয়ামের কবিতা যে আমাদের এতটা মুঢ় করে তাঁর প্রধান কারণ, তিনি দার্শনিক হলেও কবি, এবং চমৎকার কবি। দর্শন তাঁর হাতে জ্ঞানিতির প্রতিজ্ঞার আকার ধারণ করে নি, কুলের মত ফুটে উঠেছে। এবং সে ফুল যেমন হালুকা, যেমন ফুরফুরে, তেমনি শুন্দর, তেমনি রঙ্গীণ। এর প্রতিটি হচ্ছে ইরাণদেশের গোলাপ,—এ গোলাপের রঙের সম্মতে ওমর জ্ঞানিসা করেছেন—

“কার্দেওয়া সে লালচে আভা, হৃদয়-ছাঁচা শোণিত-ছাপ”—

এর উত্তর অবশ্য—ওমর! তোমার। অথচ এই রক্তে-নাড়োয়া গোলাপগুলির মুখে একটি সহান্ত �don't-care ভাব আছে। আর তাদের বুকে আছে একাধিরে অমৃত ও হলাহলের মিশ্রগন্ধ—এক কৃত্তায় মদিরগন্ধ। ওমরের কবিতার রম ফুলের আসন, সে রম পান করলে মানুষের মনে গোলাপী নেশা ধরে এবং সে অবস্থায় আমাদের

মন থেকে ইহলোক পরলোক সকল লোকের ভাবনাচিন্তা আপনা
হতে ধরে পড়ে ।

শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মৌস এই মন-মাতানো কাজ-ভোলানো কবিতা-
গুলি বাঞ্ছলা করে' বাঞ্ছলী পাঠক-সমাজের হাতে ধরে দিচ্ছেন ;
আশা করি সেগুলো সকলের আদরের ও আনন্দের সামগ্ৰী হবে,
কেননা এ অনুবাদের ভিতর ঘন্টা আছে, পৰিশ্ৰম আছে, নৈপুণ্য
আছে, প্ৰাণ আছে । ওমর-বৈয়ামের এত স্বচ্ছন্দ ও স-লীল অনুবাদ
আমি বাঞ্ছলা ভাষায় ইতিপূর্বে কথনো দেখি নি ।

শ্রীপ্ৰমথ চৌধুৱী ।

উপকথা ।

—*—

(ফরাসী হইতে অনুদিত)

টুমি ।

একজন মজুর ছিল, খাটতে যার জুড়ি আর কেউ ছিল না । আর তার স্ত্রী ছিল যেমন ভাল, তার ছোট মেয়েটি ছিল তেমনি শুক্ষ্মী । তারা বাস করত একটা মন্ত্র সহরের একটুখানি জায়গায় ।

একবার একটি পরবের দিনে, তারা একটি কবৃতর কিনে নিয়ে এল, তার কাবাব করবার জন্যে—এবং মেই সঙ্গে অল্পসঞ্চ ভাল ভাল শাক-সবজিও । সে রবিবারে তাদের ক'জনের আনন্দের আর সৌম্য ছিল না, এমন কি বাড়ীর বিড়ালটি পর্যাপ্ত আড়চোখে মেই কবৃতরের দিকে চেয়ে মনে মনে হেসে বললে যে, “আজ এমন হাড় চুমতে পাব, যার ভিতর রস আছে” !

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর বাপ বললে—

—“আজ যা’হোক কিছু পয়সা খরচ করে একটিনার আমরা টুমে চড়বই—এবং সহরের শেষ পর্যাপ্ত যাব ।”

তারপর তারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল ।

তারা চিরদিনই দেখে আসছে যে, ভাল ভাল পোষাক-পরা সাহেব মেমরা আঙুল তুলে ইসারা করবামাত্র কণ্ঠাক্তির অমনি ঘোড়া রুখে টুম ধামায়—তাদের তুলে নেবাৰ জন্ম ।

সেই বারোমাস খেটে-খাওয়া মজুরটি তার মেঘের হাত ধরে আর তার স্তোকে পাশে নিয়ে, একটি বড় রাস্তার একধারে গিয়ে দাঁড়ালে।

একটু পরেই তারা দেখতে পেলে যে একটি বানিসকরা চক্ককে টুমগাড়ি তাদের দিকে আসছে, তার ভিতর লোক প্রায় ছিল না বল্লেই হয়। তাই দেখে তাদের মহা আঙ্গুদ হল—এই ভেবে যে, প্রতিজ্ঞনে চার চার পয়সা খরচ করে' তারা আজ টুমে চড়ে সহর যুরে আসবে। অমনি তারা আঙুল তুলে ইসারা করলে—টুম থামাবার জগ্তে। কঙ্কালের কিন্তু তাদের কাপড় চোপড় দেখে বুঝতে পারল যে তারা নেহোৎ গরীব, তাই সে অবজ্ঞাভরে তাদের দিকে চেয়ে টুম আর বাঁধলে না, সটান চলে গেল।

মৰ্মামা

মানুষের মনের ঈশ্বর্য যে সব বইয়ে সন্ধিত ছিল, সে-সব বই একদিন এক যাদুমন্ত্রে পৃথিবী থেকে উড়ে গেল।

তখন বিদ্যুনের এক মহা সম্মিলনী হল। যারা গণিত, পদাৰ্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্য ইতাদি শাস্ত্রের পাইদশী, তারা সকলে পরামর্শ করে একমত হয়ে বল্লেন—

মানব-প্রতিভার যা-কিছু শ্রেষ্ঠকৌতু, সে-সকল আমাদের কাছে গচ্ছিত রয়েছে, আমরাই সে-সবের রক্ষক; অতএব আমাদের স্মৃতিৱ ভাণ্ডার থেকে সে-গুলো উদ্ধাৰ কৰে, মাৰ্বেল পাথৰে খুদে রাখবো, যাতে কৰে সেগুলো আৱ লোপ না পায়:—অবশ্য মানব-প্রতিভার সেই সেই কীৰ্তি, যাৱ প্রতিটি হচ্ছে গগন-স্পণ্ডী। এ প্ৰস্তুৱ-ফলকে জায়গা

হবে শুধু Pascal-এর একটি চিন্তার, Newton-এর একটি তারার, Darwin-এর একটি পতঙ্গের, Galileo-র একটি ধূলিকণার, Tolstoy-এর একটু করুণার, Henri Heine-র একটি শ্লোকের, Shakespeare-এর একটি মর্মেচ্ছাসের, Wagner-এর একটি শুরের।

অতঃপর তারা যখন একাগ্রমনে তাদের স্মরণপথে আনবার চেষ্টা করলেন মানুষের মনের কেবল কোন্ কোন্ স্থিতি মানবজাতির মাহাত্ম্য-রক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তখন তারা সভয়ে আবিক্ষার করলেন যে, তাদের মাথার ভিতর কিছুই নেই,—সব খালি।

পশ্চর দ্বর্গালোক।

একটা বন্ধ-গাড়ীতে যোগী বুড়ো হানড়া দোড়া, বাত্তপুরে একটি আমোদের আড়তার দরস্তার সামনে ইষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজ্ছিল আর বিমচ্ছিল। ভিতরে মেঘেপুরুষের হাসিতামাসা চল্ছিল।

সেই মড়া-খেকো হাড়-বের-করা কুম্ভের জৌবচি, কতক্ষণে এদের আমোদ শেষ হবে, এবং সে আবার তার ভাঙ্গাচোরা অতি নোংরা আস্তাবলে ঢুকতে পাবে, সেই অপেক্ষায় অতি গ্রিঘন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল,—কেননা তার পা আর তার শরীরের ভার বইতে পারছিল না।

আজ তার মনে তার ছোটবেলার পুতি সব অস্পষ্ট স্মরণের মত স্তোষে বেড়াচ্ছিল। তার মনে পড়ে গেল যে এক সময় সে ছিল লাল ঝড়ের একটি বাচ্চা, আর তখন সে সবুজ মাঠের উপর ছুটোছুটি

লাফালাফি করে বেড়াত, আর তার মা তার গাঁথালি ময়লা করে দিত, নিজের গায়ের ঘেঁস দিয়ে।

হঠাৎ সে সেই কাদায়-প্যাচ্পেচে রাস্তার উপর সটান শুয়ে পড়ে মরে গেল।

তারপর সে স্বর্গের ছুয়োরে গিয়ে হাজির হল। একজন মন্ত্র পণ্ডিত, কতক্ষণে Saint Peter তাঁর জন্য ছুয়োর খুলে দেন, তারি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি সেই ঘোড়া বেচারাকে বললেন—

“তুই বেটা এখানে কি করতে এসেছিস?—স্বর্গে প্রবেশ করবার অধিকার তোর নেই—আছে আমার, কেননা আমি মানবীর গভে জন্মেছি।

উত্তরে সেই হাড়-বের-করা ঘোড়া বেচারা বল্লে—

“আমার মা’র মন বড় নরম ছিল। সে পৃথিবীতে বুড়ী হয়ে যখন মারা গেল, তখন যত জোকে মিলে তার রক্ত শুয়ে থেলে। আমি ভগবানের কাছে শুধু জানতে এসেছি, সে এখানে আছে কি না”

তখন স্বর্গের দরজার দুই-পাল্লা একসঙ্গে খুলে গেল, এবং শুমুখে দেখা গেল গ্রয়েছে পশুর সর্গলোক। ঘোড়াটি দেখলে যে তার মা সেখানে আছে। দেখবামাত্র তার মা ও তাকে চিনতে পারলে, অমনি চিঁহি ববে দু’জনে দু’জনকে সাদর সন্তান করলে। তারপর তারা স্বর্গের প্রকাণ্ড মহদানে বেড়াতে গেল। সেখানে গিয়ে এই দেখে তার মহা আহ্লাদ হ’ল যে, তার মট্টোর কফ্ট-জীবনের পুরোনো সঙ্গীরা সবাই সেখানে মহাশুখে বাস করছে। পৃথিবীতে যারা সহরের সান-বাঁধানো রাস্তায় পাথর-বোঝাই গাড়ী টেনে বেড়াত, আর পা পিছলে ক্রমান্বয় ইঁটুর উপর বসে পড়ত, তাঁরপর মারের চোটে আধমরা হয়ে গাড়ী ঘাড়ে

করে রাস্তার উপর শুয়ে পড়ত ; আর যারা চোখে ঠুলি পরে' দিন দশঘণ্টা করে ঘানি ঘোরাত ; আর যে ঘোড়িগুলোর পিঠে চড়ে মানুষে ঝাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করতে যেত, আর ঝাঁড়ের শিংয়ের ঘায়ে যাদের চেরাপেট থেকে নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে আখ্ডার তপ্পবালি ঝেঁটিয়ে যেত, আর তাই দেখে ভদ্র-মহিলাদের মুখ আনন্দে রাঙ্গা হয়ে উঠত,—সেই সব ঘোড়া সেখানে ছিল। স্বর্গের সেই প্রকাণ্ড ময়দানে তারা চির শান্তির মধ্যে মনের স্বৃথে চরে' বেড়াচ্ছিল।

তা ছাড়া সেখানে অপর সকল জন্মাও মহা শৃঙ্খিতে ছিল। দিব্য চিকন বেড়ালগুলো আপনভাবে বিভোর হয়ে খোসমেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তারা ভগবানের কথাও মানছিল না, আর তিনি তাদের এই অবাধাতা দেখে শুধু হাসছিলেন। তারা কটায় মিলে এক টুকরো দড়ি নিয়ে এমন ধৌরভাবে লম্বু পদাবাতে সেটিকে ঢেলছিল, যেন সে কাজের ভিতর এমন একটা মহা শর্থ আছে, যা তারা খুলে বলতে চায় না।

আর কুকুরগুলো সব বড় ভাল মা। তাদের সময় ত বাছাগুলোকে দুধ দিতে দিতেই কেটে যাচ্ছিল। মাছগুলো সব সাঁতরে বেড়াচ্ছিল—ছিপের ভয় ত আর তাদের নেই। পাঁচীরা যার যেদিকে মন চায় সে সেদিকে উড়ে যাচ্ছিল,—বাধের ভাবনা ত আর তাদের ভাবতে হয় না।

এই স্বর্গগুলোকে কোন মানুষ ছিল না।

জীবনের পথ।

একজন কবি একদিন কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে বসলেন একটি গম্বুজ লেখবার জন্য। তাঁর মাথায় সেদিন কোন আইডিয়াই এল না।

সেদিন কিন্তু তাঁর মন খুব প্রফুল্ল ছিল, কেননা জানিলার ধারে একরাশ লাল ফুলের উপর সূর্যের আলো পড়েছিল, আর সেই খোলা জ্বানিলার নীল ফাঁকের ভিতর একটি সোনালি মাছি উড়ে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ তাঁর সমগ্র জীবনের ছবিটে তাঁর চোখের ডুমুখে এসে দাঢ়াল। তিনি দেখলেন যে, সে একটি লম্বা সাদা পথ। সে পথ সুরু হয়েছে একটি অঙ্ককার বনের গা থেকে, ঘার পায়ের কাছে জল খলুখল করে হাসছে; আর শেষ হয়েছে, শাস্তিতে ঘেরা একটি ছোট্ট কবরে, যে কবরকে কঁটাগাছ আর গাছের শিকড়ে চারধার থেকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে, জড়িয়ে ধরেছে।—

এইখানে তিনি সেই দেবতার সাক্ষাৎ পেলেন, জগ্নি থেকে তাঁর জীবনের ভার যে দেবতার হাতে ছিল। সে দেবতার কাঁধে বোল্তার পাথার মত সোণালি ঝড়ের একজোড়া পাথা ছিল। তাঁর মাথার চুল একেবারে সাদা, আর তাঁর মুখটি প্রীতিকালের চৌবাচ্চার জলের মত স্বচ্ছ ও প্রশংসন্ত।

দেবতা কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—

“তুমি যখন ছোট ছিলে, তখনকার কথা কি তোমার মনে পড়ে?— তোমার বাবা নদীতে ছিপে মাছ ধরতে যেতেন, আর তোমার মা ও তুমি তাঁর সঙ্গে যেতে। আর এই জলের ধারে মাঠের উপর কত চমৎকার ফুল ফুটে থাকৃত, আর ফড়িঙ্গরা সব লাফিয়ে বেড়াত, দেখে মনে হত যেন এখানে ওখানে ঘাসের ঢেঁড়া পাতা সব চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।”

কবি উত্তর করলেন—“হাঁ, পড়ে”।

তারপর দুজনে একসঙ্গে গিয়ে সেই নীল নদীর ধারে দাঢ়ালেন। তার উপরে ছিল নীল আকাশ আর পাড়ে ঘোরনীল বাদামের পাছ।

—“তাকিয়ে দেখো, এই হচ্ছে তোমার শৈশব”।

কবি জলের দিকে চাইলেন আর অমনি তাঁর চেখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

—“কৈ, আমি ত এ জলের ভিত্তির আমার বাপ-মার সঙ্গে মুখচ্ছবি দেখতে পাচ্ছি নে ? তাঁরা দুজনে এইখানে বসে থাকলেন। তাঁদের মনে কোনও পাপ ছিল না, ছিল শুধু শান্তি আর শুধু। আমার পরনের ধোপ কাপড় আমি কেবলি ময়লা করতুম, আর আমার মা বারবার তাঁর কুমাল দিয়ে তা' পরিষ্কার করে দিতেন।

“হে দেব আমাকে বলো, এই জলের উপর আমার বাপ-মাৰ মুখের যে সুন্দর প্রতিবিম্ব পড়ত, সে প্রতিবিম্ব কোথায় গেল ? আমি তা দেখতে পাচ্ছি নে, মোটেই দেখতে পাচ্ছি নে।”

এই সময় খাসা এক খোকা বাদাম পাড়ের একটা গাছ গেকে থমে ‘জলের উপরে পড়ে’ স্বোতের মুখে ভেসে যেতে লাগল।

দেবতা তখন বললেন—

—“এই জলের উপরে-পড়া তোমার বাপ-মার মুখের ছবি, এ সুন্দর ফলগুলোর মতই স্বোতের মুখে ভেসে চলে গিয়েছে। কেননা সবই স্বোতে ভেসে চলে যায়, যার কায়া আছে তাও, আর যা ছায়ামাত্র তাও। তোমার বাপ-মার ছবি জলে মিশেছে, যা অবশিষ্ট আছে তা'র নাম স্মৃতি। তুমি ততটা অধীর হয়ো না, যাদের হয়ি এত ভালবাসতে তাদের শুরণ চিহ্ন সব আমাৰ দেখতে পাবো।”

একটা নীলকণ্ঠ পাখী উড়ে এসে শরবনের উপর পসূল। অমনি
কবি বলে উঠলেন, “আমি দেখতে পাইছি এই পাখা দুটির উপরে
আমার মায়ের চোখের রঙ চারিয়ে গিয়েছে”।

দেবতা বললেন—“ঠিক কথা, আর একটু ভাল করে চেয়ে
দেখো।”

একটি গাছের আগুড়ালে একটি সাদা দুব তার বাসা বেঁধেছিল,
সেখান থেকে সাদা রঙের একটি হালকা পালক উড়ে এসে জলের
উপর পড়ে’ পাক থেতে লাগল।

কবি অমনি বলে উঠলেন—

—“এই পালকটির গায়ের এই শুভ্রতা, একি আমার মার অনুঃ-
করণের নির্মলতা নয় ?”

দেবতা বললেন—“ঠিক বলেছি।”

তারপর একটু হাওয়া উঠল, তার পাশে জলের গায়ে কাটা
দিলে, পাতার মুখে মর্মুর-ব্লনি ফুটল।

কবি অমনি জিজ্ঞাসা করলেন—

—“এই যে মধুর ও গন্তার শব্দ আমার কানে আসছে, একি
আমার বাবার কণ্ঠস্বর নয় ?”

দেবতা উন্নত করলেন—“ঠিক বলেছি।”

* * * *

বেলা দুপুর হলো। নদীর একধারে কতকগুলো সরল গাছ ধীরে
ধীরে হেলচিল আর দুলচিল। তাদের মধ্যে যেটি মাঠের একটেরে
একা দাঙিয়েছিল, সেটিকে দুর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে যুবতীর
মত দেখাচ্ছিল। তখন আকাশের আলো এমন শুন্দর হয়ে উঠেছিল

যে, মনে হচ্ছিল সে আকাশ যেন যুবতীর গঙ্গাশলের রঙে রাঙানো হোৱেছে।

তখন জীবনে সবপ্রথম যে তরুণীকে তিনি ভালবাসেন তাৰ কথা কবিৱ মনে পড়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে তাঁৰ বুকটি ব্যথায় ভৱে' উঠল।

দেবতা বললেন—

—“তোমাৰ ঐ ভালবাসা ছিল এত নিৱাবিল এবং এতে তুমি এত দুঃখ পেয়েছ যে, এৱ জন্ম আমি তোমাৰ উপৰ রাগ কৰি নি।”—

তাঁৰা দু'জনে ধীৱে ধীৱে আবাৰ অগ্ৰসৱ হতে লাগলোন, ক্ৰমে বেলা পড়ে এল; আকাশেৰ আলো এত নৱম, এত কোমল হয়ে এল যে, মনে হল সে আলো যেন ছায়া হয়ে উঠেছে। কবিৱ কাতৰতা দেখে দেবতা স্টৰ্ষ হাস্ত কৱলেন, রঞ্জ মাতাৰ মুখেৰ হাসিৰ মতই তা সকাতৰ ও কৰণ।

একটু পৰে চারিদিকেৱ নিষ্ঠুকঢাৰ ভিতৰ তাৰাশুলো সব ফুটে উঠল। আকাশ তখন সেই বৃত্তাশয়াৰ মত দেখাতে লাগল, যাৱ চাৱদিকে বড় বড় মোমবাতি হলেছে, আৱ যাকে ঘিৱে রয়েছে শুধু শব্দহীন বুক-ভাঙা শোক। আৱ রাত্ৰি যেন শোকাভিভূতা বিধবাৰ মত মাটিতে ঝাটুপেতে নতমুখে অবস্থিতি কৰচে।

দেবতা জিজ্ঞাসা কৱলেন—

—“এ দৃশ্য চিনতে পাৰছ ?”

কবি এ কথাৰ কোন উত্তৰ না দিয়ে মাটিতে ঝাটুপেতে নতমুখ হয়ে বইলেন।

অবশেষে তাঁরা যেখানে রাস্তার শেষ, সেই কবর্টির কাছে গিয়ে পৌছলেন, যে কবর্টিকে কাটা গাছ চারধার থেকে ধিরে ফেলেছে আর গাছের শিকড় চারধার থেকে জড়িয়ে ধরেছে।

দেবতা তখন বললেন—

“আমি এসেছিলুম তোমাকে জীবনের পথ দেখিয়ে দিতে। এই থানে এই জলের ধারে তুমি চিরদিন দুমবে। আর এই জল প্রতিদিন তোমার কাছে বয়ে নিয়ে আসবে তোমার সব শুভ্র ছবি—নীলকণ্ঠ-পাখীর সেই পাথা, যার রঙ তোমার মা’র চোখের মত ; বুদ্ধুর সেই সাদা পালক, যা তোমার মা’র অন্তঃকরণের মত নির্মল ; পাতার সেই মর্মরপুনি, যা তোমার বাদার কণ্ঠস্বরের মত মধুর ও গন্তীর ; আর সেই সরল গাছ, যা তোমার প্রিয়ার মত লম্বা ও ছিপ্পিদে।”

সর্বশেষে আসবে তারায় আলো-করা চিররাত্রি।

*

*

*

*

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ।

অতীতের বোৰা ।

— :: —

পুরাতন-বিদ্দের মুখে শুনতে পাওয়া যায় যে, ভারতের সভ্যতা অতি প্রাচীন । ইংরাজদের পূর্ব পুরুষেরা যখন নানা রকম রং মেখে সংসেজে উলঙ্গ শরীরে বন্ধ পশ্চর শ্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন তখন নাকি এদেশে শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতি শাস্ত্রের আলোচনা হত । এই প্রাচীন সভ্যতার গৌরব নিয়ে আমরা এখন বুক ফুলিয়ে বেড়াই । কেউ কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পাড়লে তখনই কোন না কোন বিষ্টা-দিগ্গংজ চোখ রাখিয়ে উত্তর দেন, “ও-সব আর বিলেত থেকে আমদানী করতে হবে না । ও-সব এবং আরও অনেক রকম জিনিস এ দেশে ছিল । পরের কাছে শোন্বার আর আমাদের কিছুই নেই । যা-কিছু থাকা উচিত বৈদিক-যুগে সবই ছিল । গোলযোগ ঘটেচে কেবল পৌরাণিক যুগে আর মুসলমান যুগে । তাই বলি আমাদের নৃতন কিছু করতে হবে না, পুরোণে জিনিসগুলোর পুনরুদ্ধার করলেই সব চুকে যাবে ।” বক্তৃতার সাথে কতকগুলো সংস্কৃত শ্লোকের বাদাম-কিসমিস মিশিয়ে পশ্চিত ম'শ্যায় নিরীহ শ্রোতার মানসিক ভোজনের মুখরোচক ব্যবস্থা করেন । শ্রোতা সাদা-সিধা লোক, এত বক্তৃতা, এত শ্লোক আওড়ান, হাত পা নাড়া এবং মুখ ভেঢ়ানো দেখে স্তুতি হয়ে যায়, তাবে এর ভিত্তি কিছু সার না থাকলে পশ্চিতপ্রবর এতটা বাচালতা আর এতটা আজ্ঞা-ত্বষ্টু

কখনই দেখাতে পারতেন না। শ্রোতাৱ অভ-শত ভাৰ্বাৱ সময় নেই, পড়াৰও সময় নেই, আৱ আলোচনা কৱাৰ সময় তো নেই-ই। তা ছাড়া বেচাৱা সংসারি লোক, কৃটিনেৱ বাইৱে যাবাৰ ইচ্ছা ও কম, আৱ সাহসও অল্প। পশ্চিমেৱ কথা তাৱ মানসিক, নৈতিক এবং সামাজিক অলসতাৱ অনুকূল হওয়ায় সে মাছেৱ টোপ গেলাৱ মত টপ কৱে সেটাকে গিলে ফেললৈ। ফলে পশ্চিমেৱ মৰ্যাদা বাড়ল, নব্য-তাঙ্গিকদেৱ যথেষ্ট নিৰ্যাতন হল, এবং জন-সাধাৱণেৱ পক্ষে নিৰুৎসুগে নিম্ন। দেৰৌৱ স্বৈৰাগ্য ঘটল।

(২)

ক্ষতি হল কিন্তু দেশেৱ। প্ৰকৃতিৱ একটা এই মহা দোষ যে, সে বকৃতা শোনে না। প্ৰকৃতি কোন দয়াময় সৰ্ববজ্ঞ সুখৰ কৰ্তৃক রচিত হয়েচে কি অণু-প্ৰমাণুগুলোৱ উদ্দেশ্য বিহীন আকস্মিক সংযোগে ঘটিচে, সে বিষয় দার্শনিকদেৱ মধ্যে মন্ত মতভেদ আছে। আমাৱ কিন্তু ধাৰণা যে বঙ্গদেশীয়দেৱ মতে প্ৰকৃতিৱ এই বকৃতাৰ প্ৰতি বিৱাগই তাৱ অনৈশ্বৰিক উদ্দেশ্তহীনতাৱ যথেষ্ট প্ৰমাণ। প্ৰকৃতিৱ যদি মাথামুড় থাকত তাহলে আমাৰে এত বড় বড় বকৃতা সত্ত্বেও আমাৰে দেশেৱ এত দূৰবস্থা হবে কেন?

সত্য কথা এই যে, আমাৰে এত জ্ঞান গৱিমা সত্ত্বেও, সত্যেৱ সঙ্গে আমাৰে জাতীয় জীবনেৱ সম্বন্ধ অতি অল্প। এই সত্যেৱ প্ৰতি অশৰ্কাই আমাৰে দুৱবস্থাৰ প্ৰধান কাৰণ। আমাৰা বকৃতা কৱতে শিখেচি, বিকট মুগ্ধভঙ্গি কৱে ইংৰাজি শব্দৱাজিৱ অপূৰ্ব সমাবেশ

কর্তৃতে শিখেচি, কিন্তু সত্যের অনুসরণ কর্তৃতে, তাকে নতশিরে মেনে নিতে এবং তার প্রচারের অন্য দৃঢ়সংকল্প হতে শিখি নি। সে শিক্ষা যদি আমাদের থাক্ত তাহলে ঐতিহাসিক বুহেলিকা-সমাজের প্রাচীন-কাল হতে আমরা খুঁজে খুঁজে কতকগুলো অসম্ভব উপ্য আমাদের আজ্ঞানাঘা চরিতার্থ কর্বাৰ জন্মে বাৱ কর্বাৰ ভাগ কৱতাম না এবং সেই-গুলো নিয়েই অহঙ্কারে ফৌত হয়ে আধুনিক সমস্তা সকলকে উপেক্ষা কৱে “তাইৱে-নাৱে-না” গেয়ে ঘুৰে বেড়াতুম না। একপ ব্যবহাৰ বাক্তি-গত কিন্তু জাতীয় স্বাস্থ্যৰ পরিচায়ক নয়। যদি কিছুৱ পরিচায়ক হয় ত’ সে জাতীয় দুর্বিলতাৰ ও নিষ্ঠেজতাৰ।

(৩)

শুন্তে পাই, উঠ পাখি বিপদ দেখলে বালিতে মুখ লুকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। মনে কৱে তোখে দেখ্তে না পেলেই, আপদ দূৰ হল। আমৰা ও মনে কৱি চোখ বুজে থাকলেই আমৰা প্ৰকৃতিৰ নিয়ম লজ্জান কৱে বেঁচে যাব। প্ৰকৃতিকে কিন্তু অত সহজে বোকা বানান যায় না। ভগবানেৱ যাঁতা আস্তে আস্তে ঘোৱে বটে কিন্তু শেষে গুঁড়ো কৱেই ছাড়ে।

পাঠক জিজ্ঞাসা কৱবেন যে, প্রাচীনদেৱ অবলম্বিত পথেৱ অনুসৰণ কৱলেই কি স্বভাবেৱ নিয়ম ভাঙা হল? আমাৰ উন্নৰ এই যে, প্রাচীন কালেৱ নজীবকে উপরোক্ত কূপ ভয় ভক্তি নিষ্ঠলনেত্ৰে দেখা এবং তাৰ বিধানেৱ পায়ে সমস্তমে আজ্ঞা-সমৰ্পণ কৱা উন্নতিৰ স্বাভাৱিক নিয়মেৱ লজ্জন কৱা ছাড়া আৱ কিছুই নহু। পৃথিবী পৱিত্ৰণশীল, দুই মুহূৰ্তেৱ

অবস্থা কখনো এক হয় না। আজিকার দিন কালিকার দিনের অবিকল
নকল হতে পারে না, কারণ, আজ এবং কালের মধ্যে যে সব ঘটনা
ঘটচে তাৰ সমষ্টি আজকে কাল হতে বিচ্ছিন্ন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন
কৱে' ফেলেচে; তাৰ দৰণই আজ হচ্ছে আজ, আৱ কাল হচ্ছে কাল।
কোন পার্থক্য না থাকলে আমৱা আজ আৱ কালের মধ্যে কোন মতেই
প্ৰভেদ কৱতে পাৱতাম না। বৈজ্ঞানিকের নজৰে পৃথিবীৰ এক পলেৱ
অবস্থা আৱ এক পলেৱ অবস্থা হতে বিভিন্ন। এ কথা যদি সত্য হয়
তাহলে মহাভাৰতেৰ কিম্বা বৈদিক যুগেৰ অবস্থাৰ সঙ্গে আজিকার
অবস্থাৰ যে প্ৰভেদ আছে তাতে তো কোন সন্দেহই হতে পারে না।
এ সব সূক্ষ্ম তক ছেড়ে যদি ঐতিহাসিক সত্ত্বেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৱে'
বিচাৰ কৱা যায়, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ভাৱতেৰ দুই
যুগেৰ অবস্থাতে প্ৰভেদ বিস্তুৱ ও বিৱাট। প্ৰাচান কালে (যথা—মনুৰ
যুগ) ভাৱতে এক হিন্দুজাতিৰ বাস ছিল। মুসলমান, খ্রিস্টান
প্ৰভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকেৱা এখনে ছিল না। তথনকাৰ নীতি-
প্ৰবৰ্তকদেৱ কেবল এক হিন্দু-সমাজেৰ কথা ভাৱতে হয়েচে। এখন
কিন্তু দেশেৰ অবস্থা একেবাৰে বদলে গেচে। এখন এদেশে হিন্দু
ছাড়া মুসলমান পাশ্চাৎ প্ৰভৃতি অন্যান্য জাতিৱা বাস কৱচে।
বিদেশীৱা এখন এদেশেৰ রাজা হয়েচেন। বিদেশেৰ সঙ্গে সম্পৰ্ক
এখন এদেশেৰ লোকেৱ পূৰ্ববাপেক্ষা অনেক বেড়ে গেচে। এই সব
নৃত্য ঘটনা ঘটাতে দেশে নৃত্য নৃত্য জীবন সমষ্টা এসে জুটোচে।
এ সব সমষ্টাৰ ক্ৰিয়া মৌমাংসা হওয়া উচিত সে বিষয় মনু এবং তাহাৰ
সমসাময়িক লোকদেৱ ভাৱৰাৰ সহযোগ হয় নি; স্বতন্ত্ৰাং এ সব বিষয়
তাঁৰা কিছুই লিখে যান নি। এখন হিন্দুদেৱ নিজেৰ বুদ্ধিৱ

সাহায্যেই এ সব সমস্তার মৌমাংসা করতে হবে। মনু যখন হিন্দুর
সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের প্রবর্তন করেন, তখন ইয়োরোপের
democratic হাওয়া এদেশেও আসে নি, এখন কিন্তু এসেচে এবং
তেড়েই এসেচে। এখন হিন্দু যদি জাতিভেদের বাসি মড়া নিয়ে বসে
থাকে তাহলে তার ভারতবর্ষ থেকে লোপ পাবারই সন্তানী বেড়ে
যাবে। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। এ
সকল সত্য হতে কেবল একটি মাত্র সিদ্ধান্তে আসা যায়
এবং সেটা এই যে, নৃতন যুগের নৃতন সমস্তার নৃতন মৌমাংসা'র
দরকার।

(৬)

Experience একটি অমূল্য জিনিস। আমরা শিশু হতে
বালককে, বালক হতে যুবককে এবং যুবক হতে বৃক্ষকে অধিক জ্ঞানী
এবং অধিক বিজ্ঞ বলে' মনে করি। এক্ষেপ বিশ্বাসের কারণ এই যে,
বালক অনেক জিনিস দেখেচে যা শিশু দেখে নি, যুবক অনেক জিনিস
দেখেচে যা বালক দেখে নি এবং বৃক্ষ অনেক জিনিস দেখেচে যা
যুবক দেখে নি। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানও বেড়ে যায়।
এ হিসাবে প্রাচীনদের অপেক্ষা আমাদের জ্ঞান বেশি, অস্তুত হওয়া
উচিত। মেকন বলেচেন যাদের আমরা প্রাচীন বলি তাঁরা প্রকৃত
পক্ষে শিশু ছিলেন। যেটাকে আমরা প্রাচীনকাল বলি সেটাকে
পৃথিবীর বালাকাল বলা উচিত এবং সেই হিসাবে যাদের আমরা নবীন
বলি তাদের প্রবীন বলা উচিত এবং যে মুগকে আমরা নব্য-মুগ বলি
সেটাকে প্রাচীন মুগ বলা উচিত। প্রাচীনদের অপেক্ষা আমাদের

অনুজ্ঞা তিনি হাজার বৎসরের বেশি অভিজ্ঞতা আছে ; সুতরাং আমাদের জ্ঞানও তাঁদের অপেক্ষা সেই হিসাবে বেশি হওয়া উচিত। অতীত হচ্ছে মানব সত্যতার শৈশব। শিশু স্নেহের পাত্র, ভক্তির পাত্র নয়। অতীতকে অবশ্য ভালবাসা উচিত, কিন্তু তাই বলে তার কাছে পদানত হওয়া বৃক্ষিমানের কাজ নয়।

(৪)

শক্তির চর্চার ফলেই শক্তি বাড়ে। প্রাণী-জগতে দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রাণী যখন কোন বিশেষ শক্তি বাড়াবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করতে থাকে, তখন সেই শক্তি ও তার আশ্চর্য রকমেই বেড়ে যায়। এই স্বাভাবিক নিয়মের বলেই হরিণ দৌড়তে শিখেছে, পাথী উড়তে শিখেছে, আর মানুষ কথা কইতে শিখেছে। পক্ষান্তরে চর্চা চলে' গেলে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ়ুটিত শক্তি ও ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে যায়, এমন কি শেষে সম্পূর্ণরূপে মোপ পেয়েও যায়। এই সত্ত্বের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাণী-জগতে দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রে অনেক প্রকার জন্ম বাস করে, যাদের চোখ আছে অথচ তারা দেখতে পায় না। এক সময় তারা স্তলচর জন্ম ছিল এবং স্তলচরের জীবনে-পয়েগী ইন্দ্রিয় সকল তাদের মধ্যে শক্তিশালী অবস্থায় বর্তমান ছিল। তাদের বর্তমান environment-য়ে ঐ সব পূর্বার্জিত শক্তি সমূহের ব্যবহার তাদের জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যিক হয় না, এর ফল এই হয়েছে যে, তাদের ঐ সকল অনাবশ্যকীয় ইন্দ্রিয় দুর্বল হয়ে হয়ে শেষে একেবারে বিকল হয়ে গেচে। এখন এ সবের দ্বারা কোন কাজ হয়

না, ও-গুলো যেন প্রাণীর পূর্ব-জীবনের ইতিহাস, আমাদের জ্ঞানাবার
জন্ম এখনও বর্তমান রয়েছে।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে যা বলা গেল তা মানসিক ক্ষমতা সম্বন্ধেও সমান
থাটে। মানুষের এই আত্ম-শক্তির চর্চার পক্ষে তার অতীত হচ্ছে
একটা মন্ত্র বাধা। অতীতের প্রতি অতিভক্তি আর বর্তমানের প্রতি অতি
অভক্তি এছই-ই হচ্ছে একই মনোভাবের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। যে-জাতির
বর্তমানের উপর কোন বিশ্বাস নেই তার ভবিষ্যতেরও কোনো আশা
নেই। আর বলা বাহ্যিক যে, বর্তমানের উপর বিশ্বাস আর নিজের উপর
বিশ্বাস একই বস্তু। আমরাই ত বর্তমান। যে জাতি আমাদের মত
অতীতকে আঁকড়ে 'ধরে' পড়ে' থাকে এবং পৈতৃক প্রথা নামক ঠাকুরের
মন্দিরে সকাল সঙ্কো পূজা দেয়, তাদের মধ্যে মনুষ্যহ সম্যক চর্চার
অভাবে নিষ্ঠেজ হয়ে যায় এবং তারা অবনতির নিম্ন হতে নিম্নতর শ্রেণী
স্বাভাবিক নিয়মে নাম্নতে থাকে। এই জন্ম দেখা যায় উন্নতিশীল
জাতিরা প্রাচীন প্রথার কিন্তু প্রাচীন authority-র বিশেষ সম্মান
করে না, করলে তাদের উন্নতিশীলতাই চলে যেত। তারা নিত্য নতুন
জিবিস আবিষ্কার করে', নিত্য নতুন নৌত্রির প্রবন্ধন করে', নিত্য নতুন
তথ্য সংগ্রহ করে', আর নিত্য নতুন experiment নিয়ে বাস্তু থাকে।
যে দিন তারা এ সব ছেড়ে পুরাণ প্রধার অনুধাবনে প্রবৃত্ত হয় সেই
সেই দিন থেকেই তাদের উন্নতিশীল জীবনের সমাপ্তি হয়।

(৯)

প্রাচীন গ্রৌসের কথা একবার মনে করুন। প্রাচীন মিশরীয়
পুরোহিত সোলোণকে (Solon) বলেন “তোমাদের গ্রীকদের চরিত্র

বালকের মত'। তোমাদের মধ্যে না-প্রাচীনকাল-বিষয়ক জ্ঞান আছে, না-জ্ঞানের প্রাচীনতা আছে।” মিশনী যাকে নিম্ননীয় বলে’ দ্রুপ করেন সেই গুণেরই বলে গ্রীস উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। তাদের বাল-স্কুলত চক্ষলতা ও অসচ্ছেদ্যতা তাদের সভ্যতাকে উচ্চ হতে উচ্চতর সোপানে তুলেছিল। যেদিন তাদের এই বালস্মভাব তাদের পরিত্যাগ করলে, যে দিন তারা জাতীয় কৃতকার্যতায় সমৃষ্ট হয়ে পূর্ব-কীর্তির চর্বিত চর্বনে প্রবৃত্ত হল সেই দিন থেকেই গ্রীসের অধঃপাতের শুরু হল।

যা গ্রীসে ঘটেছিল আরবেও তাই ঘটেছে। একটি মেষ-পালক বর্বর জাতি এক মহাপুরুষের অপূর্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে “আল্লাহো আকবর” রবে সভ্যতার রঞ্জনকে প্রবেশ করলে। মহাপুরুষের দ্রু মন্ত্রের ভৌমনাদে সেকালের রাজ্য সাম্রাজ্যগুলো বাস্প-নির্মিত সৌধসম আকাশে বিলীন হয়ে গেল। আরব সভ্য-জগতে প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন হয়ে মৃত প্রায় সভ্যতাকে নব-জীবন দান করলে। দেশ বিদেশ দমন করে’, পাহাড় পর্বত লজ্জন করে’, সমুদ্র মহাসমুদ্র মন্তন করে’, আরব যে সভ্যতা গড়েছিল, তা অপূর্ব। আরবের এই উন্নতি পৈত্রিক প্রথার অনুসরণে হয় নি। হজরৎ মোহাম্মদের পুরুকালিন অবস্থাকে তারা “আইয়ামে জাহেলিয়াঃ” (অঙ্ককাৰ যুগ) বলুন। হজরতের সময় থেকে আরম্ভ কৱে প্রায় চারশত বৎসর পর্যন্ত আরবেৱা ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসৱ হয়েছিল। এই উন্নতির যুগে তারা নিষ্য-নতুন তথ্য আবিষ্কাৰ কৱেছিল এবং নানা দিকে নৃতন নৃতন Experiment কৱেছিল। তাৰপৰ প্রাচীনতাৱ বাঁধ তাদেৱ সামনে এসে দাঁড়াল। উন্নতিৰ প্ৰবাহ বক্ষ হল। দৰ্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ব্যবহাৰ

জীবী (ককিহ) এবং পুরাতনবিদ্মের (মোহাদ্দেস প্রভৃতি) ইঙ্গিত বেশি হল। এই খানথেকেই আবিবের প্রাণহীন জীবন আরম্ভ হল।

(৬)

সত্যতা দেখতে পাই কালক্রমে এক জাতির হাত থেকে আর এক জাতির হাতে যায়, এবং তা হয়, যার হাতে যায় তার গুণে, আর যার হাত থেকে যায় তার দোষে। আবিবের জরা-শিথিল হাত থেকে ইউরোপীয়রা সত্যতার পতাকা কেড়ে নিয়ে দিঘিঅঘয়ে অগ্রসর হল। ইউরোপের তামসিক যুগের অবসান হল। শ্রাবণের ধারায় স্ফীত শ্রোতস্বত্তীর শ্রায় তাদের জীবন-শ্রোত প্রবাহিত হতে লাগ্ল। সে শ্রোত এখনো ধামে নি। তামসিক যুগে ইউরোপও আমাদের মত authority-র উপাসক ছিল। প্রাচীনকালের উপর সেখানেও তাদের আমাদেরই মত অটল ভক্তি ছিল। Aristotle-এর উপর কথা বলবার ক্ষমতা কোনো বৈজ্ঞানিকেরই ছিল না। বিজ্ঞানের সত্যতা পুরোহিতদের ধারণায়ে পালিয়ালির উপর নির্ভর করত। ইউরোপের সৌভাগ্য যে, তাদের সে মনোভাব চলে গেচে। এখন জীবনের সঙ্গে অতীতের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইউরোপীয়রা স্বীকার করেন না; তারা এখন নিত্য নতুন সত্য আবিষ্কার করছেন, নিত্য নতুন জিনিসের নিত্য নতুন জিনিস নিয়ে experiment করছেন, এক নীতি ছেড়ে অন্য নীতি ধরছেন, এইরূপে তাদের আশা ও উচ্চমপূর্ণ জীবন কেটে যাচ্ছে। রোজই তাদের আজ্ঞাশক্তি বাড়চে বই কমচে না।

(৭)

ভাৱতবৰ্ষ যে এই প্ৰাকৃতিক নিয়মেৱ বহিভূত, তা নয়। ভাৱতেৱ হিন্দুজ্ঞাতিৱ মধ্যেও একসময় সত্যতাৰ কৰ্মবিকাশ হয়েছিল। তখনও তাৰেৱ মধ্যে বাৰ্কক্যোৱ দুৰ্বলতা আসে নি। ষোবন-স্থলভ চক্ষলতাৱ প্ৰসাদে তাৰা নানা নৌতিৱ অনুসৰণ কৱেছিল, নানা মতেৱ প্ৰবৰ্তন কৱেছিল, নানাৰ্বিধ সামাজিক বিধানেৱ সৃষ্টি কৱেছিল এবং নৈতিক বৈজ্ঞানিক, কাৰ্ব্ব ও কলাৰ্বিষয়ক, সামাজিক, এবং রাষ্ট্ৰনৌতি সম্বন্ধীয় experiment কৱেছিল। কৰ্মে তাৰেৱ বাৰ্কক্য উপস্থিত হল। জীবনে অড়তা এসে পড়ল। ষোড়শোপচাৰে প্ৰাচীনতাৱ পুঁজো আৱস্থ হল। ফলে এই হল যে, হিন্দুজ্ঞাতি নিজীবতাৱ একটা মন্ত্র উদাহৰণ স্বৰূপ হয়ে দাঢ়াল।

আমাদেৱ Nation—হিন্দু এবং মুসলমান, এই দুয়ে মিলে গঠিত। এই দুই সমাজই নিজেদেৱ জীবনেৱ মূল্য ভুলে গিয়ে প্ৰাচীন প্ৰথাৱ অনুকৰণেৱ বৃথা চেষ্টায় জীবন অতিবাহিত কৱচে। এৱ ফল যে বিষয় হচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কৱাৰ কোনো কাৰণ নেই। চোখ খুলে চাৰিদিকে চেয়ে দেখলেই দেখ্তে পাৰেন যে, এ পৃথিবী এক অনন্ত সংগ্ৰামেৱ ক্ষেত্ৰ। এখানে মানুষে মানুষে, মানুষে পশুতে এবং পশুতে পশুতে জীবন-সংগ্ৰাম চলেচে। এই জীবন-সংগ্ৰামে যে জাতি নিয় কালোপযোগী প্ৰথাৱ উন্নাবন কৱতে পাৱে সে জাতিই টিকে যায়, অশ্বেৱা লোপ পেয়ে যায়। অতীতেৱ গুৰুতাৱ ঘাড়ে কৱে যাৱ পক্ষে চলাই কঠিন, তাৱ পক্ষে এই জীবন-সংগ্ৰামে জয়ী হৰাৱ আশা কোথায়? আমাৱা যে ভাৱে চলচি সে ভাৱে আৱ ক'

ଦିନ ଚଲିବେ ? ଅତୀତେର ବୋକା, ମାଥା ଥିକେ ଝୋଡ଼େ ଫେଲିବାର ଶକ୍ତି କି
ଆମାଦେର ଶରୀରେ କଥନିଇ ଜୟାବେ ନା ? କେଉଁ ଯେନ ମନେ ନା କରେନ ଯେ,
ଆମି ବିଶେଷ କରେ' ହିନ୍ଦୁ-ମମାଜେର ଉପର ଆକ୍ରମଣ କରଛି । ଏଦେଶେ
ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଦୁଃଖନେହି ନିଜ ନିଜ ଅତୀତେର ଚାପେ ବସେ ପଡ଼େଚେ, ଦୁଃଖନେର
ଦଶାଇ ସମାନ, ଏବଂ ମେ ଦଶାର ନାମ ହଚ୍ଛେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ।

ଓୟାଙ୍ଗେଦ ଆଲି

ନେଶାର ଜେର

— ୧୫୦ —

ତାର ନାମ ଛିଲ ମିନା ।

ମେ ଛିଲ ବିଧିବା ; ମେ ଛିଲ ଯୁବତୀ ; ଏବଂ ମେ ଛିଲ ସ୍ଵନ୍ଦରୀ । ତାର ଗାୟେ ଥାକତ ଲୋମ ବିରହିତ ସାଦା ବ୍ଲାଉଜ ଓ ପରଣେ ଥାକତ ପାଡ଼-ବିହିନ ସାଦା ରେଶମେର ଶାଡ଼ୀ । ବାହିକ ଆଚାର ବାଦହାରେ ତାର ଅଞ୍ଚଳର୍ମେର ଲେଶମାତ୍ର ଛିଲ ନା—ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାବାନ ମାଧ୍ୟତ, ପାନ ଥେତ ଏବଂ ବେଶ ପ୍ରସମ ମନେଇ ବିକାଳେ ଛାଦେ ବେଡ଼ାଇ ।

ତାର ଉପର ମେ ଛିଲ ବଡ଼ଲୋକେର ମେୟେ ।

ଅତ୍ରବେ ପାଶେର ବାଡ଼ୀର ମେସେର ଛେଲେରା ଯେ ତାର ବିଷୟେ ପାଞ୍ଚରକମ ଭାବତ, ତାତେ ଆଶର୍ଯ୍ୟ ହବାର କିଛୁଇ ନେଇ ।

କିନ୍ତୁ ତାଦେର, ଅନ୍ତର ତାଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକଜନେର ଭାବନାଟା ଯଦି ଭାବନାତେଇ ଥେକେ ଯେତ ଏବଂ ଲୋଭଟା ଯଦି ତାଦେର ଉପରେ ମିନାକେ ଦେଖେଇ ଚରିତାର୍ଥ ହତ, ତାହଲେ ଆର କିଛୁ ହୋକ ଆର ନା ହୋକ, ଆମାର ଏ ଗନ୍ଧଟାର ସୃଷ୍ଟି ହତ ନା ।

ଚିନ୍ତା ଏବଂ କାଜ, ଏ ଦୁଟୀର ମଧ୍ୟେ ଯେ ବେଡ଼ାଟା ଆଛେ, ମେଟା ମେସେର ଏକ ଯୁବକ ହଠାତ୍ ଏକଦିନ ଭେଙେ ଦିଲେ ଏବଂ ତାର ଫଳ ମିନାର ହାତେ ଏକଥାନା ଚିଠି ଏସେ ପୌଛିଲ । ଚିଠିଟା ପଡ଼େ ତାର ମୁଖେ ଯେ ଏକଟା ଲାଲିମାର ଆତା ଦେଖା ଗିଛିଲ, ମେଟା ରାଗେ କି ଅନୁରାଗେ—ତା' ବଲା

বড় কঠিন ; কেননা নারীর মনের খবর তাঁরা নিজেরা না দিলে স্বর্গের রিপোর্টারদেরও তা আনবার সম্ভাবনা নেই । এটা শাস্ত্রের বচন, অতএব সত্য ।

কিন্তু যখন রোজ একথানা করে চিঠি আসতে লাগল তখন মিনার গণে লালিমার সঙ্গে ক্রযুগলেও কুঁফিত-রেখা ফুটে উঠতে লাগল । এর থেকে খরে নেওয়া যেতে পারে যে, তার মনে বিরক্তির ভাবটা ঘনীভূত হয়ে আসছিল, কেননা ক্রকুটি বিরক্তির লক্ষণ । এটা ও অলঙ্কার শাস্ত্রের ন অতএব গ্রাহ ।

স্ত্রীলোকের সংসার-জ্ঞান, বয়সের অনুপাতে পূর্ণসের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে থাকে । তার উপর মিনা আজম কলিকাতার বিশিষ্ট সমাজেই বন্ধিত । অতএব তার বাইশ বছরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা যে মেসে-পালিত পঁচিশ বছরের পাড়াগেঁয়ে যুবকের চেয়ে বেশি হবে, তার আর আশ্চর্য কি । কল্পনা দেবীর অনুগ্রহটা ও ও-পক্ষের চেয়ে এ-পক্ষে একটু বেশি পরিমাণে পড়েছিল । সেইজন্মই মিনার মনে বিরক্তির সঙ্গে ভয়ের মিশ্রন একটুও ছিল না এবং ঠিক সেই কারণেই মেসের যুবকটির অন্তরে ভয়ের ভাব যথেষ্ট থাকলেও মিনার নীরব প্রত্যাখ্যানে বিরক্তির কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি ।

এমন সময়ে এলাহাবাদ থেকে বৌদ্ধিদি চিঠি লিখলেন, “ঠাকুরবৰ্ধি, তুমি যে হোকুটার কথা লিখেছ, তাকে আর প্রশংসন দিওনা । তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার হবে পড়েছে । ‘বড় ঠাকুরকে রলে’ তার একদিন চাবুকের ব্যবস্থা কোরো ।” চিঠিটা পড়ে মিনার মুখে একটুও চাকলোর লক্ষণ দেখা গেল না । সেউত্তরে লিখলে, “তার দরকার হবে না, বৌদ্ধি । আমিই তাকে শিক্ষা দেবো ।”

(২)

দু'দিন পরে মিনা বৌদিকে পুনরায় চিঠি লিখলে—

—“তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। কাল বিকালে সে এসেছিল। দক্ষিণের পড়বার ঘরটাতে তার জন্যে সত্যিকারের জলখাবার সাথিয়ে রেখেছিলুম। সে তো ঘরে ঢুকে প্রথমটা হতঙ্গ হয়ে গেছে—বসবে কি দাঢ়াবে, নমস্কার করবে কি, না করবে—কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিল না। আমি খাবারের দিকে দেখিয়ে দিতেই সে একখানা চেয়ারে বসে পড়ে ভোজন শুরু করে দিলে। খাবার সময়ে তার হাতটা মুখে তোলবার ভঙ্গী এবং খাওয়ার ফাঁকে আমার দিকে মাঝে মাঝে মুখ তুলে চাইবার ধরণ—এর মধ্যে কোনটা যে বেশি বিশ্রী ঠেকছিল, তা’ বলা বড় শক্ত। আমি তাকে একেবারেই “তুমি” বলে সম্মোধন করে বসলুম। এতে চমকে যেওনা। ও-সম্মোধনটা প্রেমাস্পদেরই একচেটে নয়—বাড়ীর সরকার, লোকজন এবং তাদেরই সম্পদসহ বাইরের লোকেরও ও-সম্মোধনটাতে একটা দাবী আছে। সে আমাকে কিন্তু “তুমি” বলতে সাহস করে নি এবং প্রতি কথার গোড়ায় “আজ্ঞে” বলে ভণিতা করেছিল। হ’রে চাকরের চেয়ে সত্য বটে—যে “এজ্ঞে” বলে কথা আরম্ভ করে। যাই হোক, তার কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নিলুম এবং তাকেও অনেক কথা জানিয়ে দিলুম। তার নাম গোবর্ধন কি জনাদিন, কি ওই রকম একটা কিছু। তবে ষে চিঠিতে “দিব্যেন্দুশুন্দর” বলে’ সই করা ছিল—তার কারণ আর কিছুই নয়—ক’লকাতার মেয়েরা সে-কেলে নামগুলো পছন্দ করে না বলে’।

আমাৰ সন্দক্ষে তাৰ ইচ্ছাটা ছিল শুভ ;—অৰ্থাৎ ডাক্তানি কলেজেৱ
ছেলে হলেও আমাৰ উপৱ অস্ত্ৰ-প্ৰয়োগ কৱাৰ ইচ্ছা তাৰ কোন
কালেই ছিল না অথবা আমাৰ গয়নাগুলো বিক্ৰি ক'ৰে ডাক্তানিথানা
খোলবাৰ মৎলবও তাৰ মনে কথনো ঘৰ্টে নি। আমাকে তাৰ বিয়ে
কৱাৰই অভিপ্ৰায় ছিল। বাপারটা একবাৰ কল্পনা কৰ দিকিন্ত।
একটা এঁদো গলিৰ ভিতৱ একখানা ভাঙা বাড়ী—তাৰ মধ্যে এই
গোৰ্কন বা জনাদ্দিন-নামা স্বামী-দেবতাৰ সঙ্গে আজীবন বাস। ঠাঁটুৱ
উপৱ-ওঠা কাপড় পৱে' প্ৰত্যহ তাঁৰ বাজাৰে গমন এবং বাজাৰ থেকে
ফিৱে এসে মুটেৱ সঙ্গে এক পয়সাৰ হিসেব নিয়ে বাকযুক্ত!.....
তাকে তাৰ সদতিপ্ৰায়েৱ জন্ম ধন্তবাদ দিলুম। তাকে বললুম বিয়ে
হয় কি ক'ৰে ?—বিধবাৰ বিয়ে হতে গেলেও জাতো তো ভিন্ন হলে'
চলবে না। সে বললে—কেন, আপনাৱা তো আমাদেৱ পাল্টি ঘৱ।
বললুম—তা' হ'তে পাৱে ; কিন্তু তবুও তো একজাত নয়। কেন যে
নয়, সেটা তাকে বোৰাতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল।
অবস্থাৰ তফাওটাই যে আদল জাতেৱ তফাও—অস্তত আমাৰ যে
তাই ধাৰণা—তা' এই বিশ্ববিদ্যালয়েৱ শিক্ষিত যুবকটিৰ মন্ত্ৰকে শেম
পৰ্যন্ত ঢোকাতে পেৱেছিলুম কি না সে বিয়ে আমাৰ এখনও সন্দেহ
আছে। সে তো এক মহা বক্তৃতা জুড়ে দিলে— খুব উচ্ছ্বাসময় এবং
খুব সন্তুব আগে থাকতে মুখস্থ কৱা। তাৰ মোদ্দাথানা এই যে,
প্ৰেমেতে ও-সমস্ত বৈষম্য ঢাকা পড়ে' যায়। এ হচ্ছে আসলে যেটা
প্ৰশংসন, সেটাকে উত্তৱ বলে মেনে নেওয়া। তবে এ-ফেজে ওটা জ্ঞানেৱ
অভাৱ কি প্ৰেমেৱ স্বত্বাৰ—সেটা বুৰাতে পাৱলুম না। বললুম—কালু-
চাৱেৱ বৈষম্যে প্ৰেম তো জন্মাতেই পাৱে না—অস্তত জন্মান উচিত

নয়। সে তখন একটু গরম হয়ে' বললে—“আপনারা আমাদের নিতান্তই অসত্তা বাড়াল, নয় তো পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে’ মনে করেন—না? আমি বললুম—শুধু যে মনে করি তা’ নয়, মুখেও বলি। তবে জ্যান্ত মানুষকে “ভূত” না ব’লে “অস্তুত” বলি।” সে তখন মহা রেগে উঠেছে। বললে—“আমায় এ-রকম অপমান করবার মানে কি? আমিও ষদি জানিয়ে দি যে আপনি আজ আমার সঙে লুকিয়ে দেখা করেছেন, তাহলে আপনার মুখ থাকে কোথায়?” এ-ধরণের লোকদের ভদ্রতার মুখোস্টা কত সহজে খসে’ পড়ে দেখছ! তার যা’ প্রতীকার আমার হাতে ছিল—সেইটে তাকে জানিয়ে দিয়ে বেশ শাস্তিভাবেই বললুম—“প্রাণী বিশেষকে মারা বড় শক্ত নয় তবে নিজের হাতে গক্টা থেকে যায় এবং ও-জাতের গক্টের উপর আমার একটা চিরকেলে বিত্তৃষ্ণা আছে। অতএব—।” আর কিছু শোনবার অপেক্ষা না রেখেই সে পলামুন দিলে। ভাগিম জলখাবারটা খেয়ে গিছ্ল—তা’ নইলে বেচারার কি কষ্টই হত!

(৩)

সেই দিনেই মেসে ফিরে এসে দিব্যেন্দুস্মর ওরফে গোবর্ধন বা জনার্দন সকলকে জানিয়ে দিলে যে, সে তার পরদিনই দেশে কিরে যাবে কারণ এখানে তার “নোনা” লেগেছে। কলকাতার জল আরাপ, হাওয়া খারাপ, ক'লকাতাটা নরকেরই প্রতিরূপ—ইত্যাদি।

পরদিনেই দেশে ফিরে গিয়ে সকলকে জানালে যে, সে ক'লকাতা একেবারেই ত্যাগ করে এসেছে। এখানে মাইনর ইস্কুলের একটা মাষ্টারি করে থাবে তবু আর ক'লকাতায় ফিরবে না। সেখানে তার

একটা বেঙ্গাতের মেঘের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল আর কি? সে একরূপ ঝোর করেই পালিয়ে এসেছে। ক'লকাতার লোকেরা সব করতে পারে। আর তাদের মেঘেদের তো জান না। তারা সকলেই—ইত্যাদি।”

তার কিছুদিন পরেই ভাজ এসে ননদকে জড়িয়ে ধরে বললে, “আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছিস ভাই। লোকটার কি আস্পদ্ধা!” ননদ আন্তে আন্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু হাসলে, আর সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও পড়ল বোধ হয়।

শ্রীকান্তিচন্দ্ৰ ঘোষ।

সাহিত্য-চর্চা । *

—::—

(G. Lanson-র ফরাসী হইতে) ।

সেকেলে ভূগিকার সরল পন্থানুসরণ করে' আমি এই বই* “বাবা
পড়ে”—অর্থাৎ যারা আমাদের ফরাসী লেখকদের লেখা পড়ে, তাদের
হাতে দিলুম। অন্নবয়সে বিদ্যাভাসের জন্য যারা সাহিত্য-চর্চার
মনোনিবেশ করে, আমাদের ইঙ্গুলকলেজের সেই ছাত্রছাত্রীদের,
আশা করি, এই বইখানি কাজে লাগবে; বিশেষ করে' এই জন্যই
আরও কাজে লাগবে যে, কেবলমাত্র তাদের কাজে লাগবার জন্য,
তাদের পরীক্ষার নির্দিষ্ট পরিমাণে মুখ্য করবার জন্য, বা তাদের
আমোদ দেবার জন্য এ বই লেখা হয় নি। যে ফরাসী সাহিত্যের
ইতিহাস সকল শিক্ষিত বা শিক্ষাভিলাষী ব্যক্তির উদ্দেশে রচিত, ষাবর
পাঠে তাদের বিদ্যানুশীলনকে নিঃস্বার্থতর উদারতর করে' তুলবে, এমন
একটি বই আমাদের ছাত্রদের হাতে দেওয়ার চেয়ে কি বেশি মহৎ
উপকার আমি তাদের করতে পারি তা' ত জানি নে। পরীক্ষার পড়া
তৈরি করবার সময় তারা যদি তুলতে পারে যে তারা পরীক্ষার্থী, যদি
কেবল সাহিত্য-চর্চার উদ্দেশ্যেই সাহিত্য-চর্চা করতে পারে, তাহলে
তারা পরীক্ষার অতিরিক্ত সাফল্য লাভ করবে।

* ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস।

আমি কি করতে সক্ষম হয়েছি তার বিচারের ভার অঙ্গের হাতে,
আমি শুধু কি করতে চেয়েছি, কোন্ ভাবের বশবর্তী হয়ে' এই কার্যে
অতী হয়েছি, তাই হিসাব দিতে পারি।

একালে সাহিত্যের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা একটা মন্ত ভুল
ধারণা অনুসারে করা হয়। ও-বস্তুর যেন একটা বাঁধা তালিকা
আছে, যেটা যেন-তেন-প্রকারেণ যত শীত্র সন্তু আঢ়োপাস্ত চোখ
বুলিয়ে সাঙ্গ করে' গলাখংকরণ করা চাই, যাতে “ফেল মার্তে” না
হয় ; তারপরে জমের মত তার সঙ্গে এবং আর আর পড়াশুনার সঙ্গে
দেনা-পাওনা চুকিয়ে শোধবোধ হয়ে' যায়, চিরজীবন আর ভুলেও
সেদিকে মন যায় না। এই রকম করে' সব শিখতে এবং সব শেখাতে
গিয়ে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অজ্ঞতার ফাঁক না দিলে, ফলে আনুষ্ঠা-
নিক জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু ছাত্রের মনে সাহিত্যের রসবোধ
কিছুমাত্র জমায় না ; সাহিত্য কতকগুলি শুক তথা ও সুত্রের সমষ্টিতে
পর্যবসিত হয়, এবং যে সকল রচনার বাধা তাঁতে করা হয়,
সেগুলির প্রতি শিক্ষিতদের চিত্রে স্বভাবতই বিত্তফোঁ অন্মাবার কথা।

এই গুরুম'শায়ী ভাস্তুটি আর একটি গভীরতর, ব্যাপকতর ভাস্তুর
উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি অতীব সাংঘাতিক কুসংস্কারবশত সাহিত্যকে
বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা হয়েছে ; সাহিত্যের বিশেষ
জ্ঞানেরই একটা বিশেষ মধ্যাদা দাঢ়িয়ে গেছে ; এবং এজন্তু স্ময়ং
বিজ্ঞান কিংবা বৈজ্ঞানিকরণ দায়ী নন। দুঃখের সহিত স্বীকার
করতে বাধা হচ্ছি যে, Reuau উক্ত ভুল ধারণার একজন প্রধান
পৃষ্ঠপোষক। তাঁর “বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ” নামক গ্রন্থে তিনি যে
কথাটি লিখেছেন, সেটি তাঁর অল্লবস্তুসের উৎসাহের নির্দর্শন বলে',

বিজ্ঞান-চৰ্চায় মূলন ক্ষেত্ৰীৰ অতিশয়োক্তি বলে' মেনে নেওয়াই ভাল। কথাটি এই,—“মাৰবেৱ সাঙ্গাংসম্বন্ধে সাহিত্য-চৰ্চার স্থান ভবিষ্যতে অনেকপৰিমাণে সাহিত্যেৰ ইতিহাস-পাঠেৰ দ্বাৰা অধিকৃত হবে।” এই কথাটি একেবাৱে সাহিত্য-চৰ্চার মূলে কৃষ্ণাঘাত কৰে। এতে কেবলমাত্ৰ ইতিহাসেৰ একটি শাখাকুপে সাহিত্যেৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰা হয়,—তা নৌতিৰ ইতিহাসই হোক, আৱ তাৰে ইতিহাসই হোক।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, সাহিত্যেৰ সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতানো ঘটটা আবশ্যিক, তাৰ ইতিহাস এবং সারমৰ্ম্মেৰ সঙ্গে তাৰ সিকিৰ সিকি ও নয়। চাকুশিল্পেৰ ইতিহাস পাঠ কৱলেই যে ছবি এবং মূল্তি চোখ চেয়ে দেখাৰ কাজ হয়ে যায়, এ কথা বোধ হয় কেউ মানবে না। শিল্পেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, ব্রচনা-বিশেষকে বাদ দিলে চলে না ; কাৰণ প্রতি ব্রচনিতাৰ বিশেষহ সেই ব্রচনাৰ মধ্যে নিহিত থাকে, এবং তাৰই দ্বাৰা প্ৰকাশিত হয়। মূল বাক্যাবলীৰ পাঠে মানুষেৰ মনে উৎসুক্য জন্মানো যদি সাহিত্যেৰ ইতিহাসেৰ চৱম লক্ষ্য না হয়, তাহলে সে ইতিহাস পাঠে যে জ্ঞানলাভ হয়, সে জ্ঞান যেমন নৌৱস তেমনি অসাৱ। উন্নতিৰ নাম কৱে' আমাদেৱ ভোগা দিয়ে মধ্যযুগেৰ সেই জ্ঞানেৰ কাৰ্পণ্যেৰ দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যে-সময় এক অঙ্ক এবং সব বিষয়েৰ সাৱত্ব বই লোকে আৱ কিছু জ্ঞানত না। আমাদেৱ মনে রাখা উচিত যে, মূল গ্ৰন্থেৰ অনুশীলন এবং টীকা-ভাষ্যেৰ বজ্জন দ্বাৰাই ইতালীয় নবযুগ শ্ৰেষ্ঠত্ব ও কৃতীত লাভ কৱেছিল।

অবশ্য আজকালকাৱ দিনে সাহিত্য-চৰ্চা কৱতে গেলে পাণ্ডিতোৱ

সহায়তা চাই ; আমাদের বিচারবুদ্ধির স্থাপনা ও চালনা করবার
জন্ম কতকপরিমাণ নির্দিষ্ট এবং নিশ্চিত জ্ঞান থাকা আবশ্যিক ।
আর সে-সকল প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়, যার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক
প্রণালী প্রয়োগপূর্বক আমাদের বাক্তিগত মনোভাবগুলিকে স্বসম্ভব
করা, এবং সাহিত্যের গতি, বুদ্ধি ও পরিবর্তন সমগ্রভাবে ফুটিয়ে
তোলা । কিন্তু দুটি জিনিস যেন আমরা সর্বদা মনে রাখি—
সাহিত্যের ইতিহাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাক্তি-বিশেষহের বর্ণনা, এবং তার
ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত অনুভূতি । জীবজগতের কোন-একটি বিশেষ
শ্রেণীর জ্ঞানলাভ করা তার লক্ষ্য নয়,—তার লক্ষ্য Corneille,
তার লক্ষ্য Hugo এবং যে-সব অভিজ্ঞতা ও প্রণালী সকলেরই
আয়ত্তাধীন, যার দ্বারা সকলেই সমান ফল পায়, তার দ্বারা সে উদ্দেশ্য
সিদ্ধ হয় না ; সিদ্ধ হয় সেই সকল অনুভূতির দ্বারা, যা' মানুষে মানুষে
বিভিন্ন, এবং যা'র ফল আপেক্ষিক ও অনিশ্চিত হওয়া অনিবার্য ।
হিসাবমত ধরতে গেলে, সাহিত্য-জ্ঞানের উদ্দেশ্যাত্মক বল, উপায়টি বল,
কোনটিই পুরোদস্ত্র বৈজ্ঞানিক নয় ।

শিল্পে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি, রচনা-বিশেষকে অগ্রাহ করলে
চলে না ; কারণ তার শক্তি ও সৌন্দর্য অসৌম ও অনিদিষ্ট, এবং
কেউ বলতে পারবেন না যে তিনি নিঃশেষে তার সারসংক্ষেপে করেছেন,
কিংবা তাকে পরবার সূত্র বানিয়েছেন ।—অর্থাৎ সাহিত্য একমাত্র
জ্ঞানের অধিগম্য নয় ; সাহিত্য হচ্ছে চর্চা করবার, উপভোগ করবার
জিনিস । ও-বস্তু জানতে হয় না, শিখতে হয় না ; তা' সাধনা
করতে হয়, অনুশীলন করতে হয়, ভালবাসতে হয় । Descartes
সাহিত্য সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেইটিই সব চেয়ে সত্য কথা ;— তাল

বই পড়া মানে হচ্ছে সেকালের শ্রেষ্ঠ বাকিদের সঙ্গে কথা বলা,
এবং সে কথোপকথনে তাঁরা কেবলমাত্র তাঁদের শ্রেষ্ঠ মনোভাব
ব্যক্ত করেন।

আমি কোন কোন অঙ্ক-শাস্ত্রিকে জানি, যাঁরা সাহিত্য-চর্চায়
আমোদ পান, যাঁরা চিন্তিবিনোদনের জন্য নাট্যাভিনয় দেখতে যান,
বা একটু ফাঁক পেলেই একখানি বই নিয়ে পড়তে বসেন; আবার
এমন সাহিত্যিকও জানি, যাঁরা পড়েন না, কিন্তু সাহিত্যের খোসা
ছাড়িয়ে নেন, এবং যা-কিছু ছাপানো জিনিস তাঁদের হস্তগত হয়, তাঁকে
খেলার কড়িতে পরিণত করাই কর্তব্য মনে করেন। এ দুই
দলের মধ্যে প্রথমোক্ত দলই সত্ত্বের পথে অধিক অগ্রসর হয়েছেন
বলে ত আমার বিশ্বাস। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আমাদের আমোদ
দেওয়া; কিন্তু সে আমোদ মানসিক, সে আমোদ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির
খেলা হতে উৎপন্ন। এবং তাঁর ফলে সে বৃত্তিশূলি অধিকতর সবল
সচল ও গ্রন্থব্যাখ্যালী হয়। অর্থাৎ সাহিত্য অন্তরের উৎকর্মসাধনের
একটি উপায়,—এই হচ্ছে তাঁর আসল কাজ।

সাহিত্যের একটি মহৎ শুণ এই যে, তাঁর চর্চায় মানুষ ভাব-
রাজ্যের স্থুরাস্ত্রদনে অভাস্ত হয়। তাঁর ফলে মানুষ নিজের বুদ্ধির
চালনায় একাধাৰে স্থুথ, শাস্তি ও সংজ্ঞীবনী-শক্তি লাভ করে। সাহিত্য
সাংসারিক কাজকর্ণের অবকাশে মানুষের মনোরঞ্জন করে, এবং
জ্ঞান বিজ্ঞান, স্বার্থসিদ্ধি ও বৈষম্যিক পক্ষপাতিতার উর্দ্ধে মানুষের
চিন্তকে উত্তোলন করে;—বিশেষজ্ঞের মনের সংক্ষীর্ণতা দূর করে।
একালে উন্মাদ সত্ত্বের আলোক বিশেষকৃত্বে আমাদের মনের পক্ষে
আবশ্যিক; কিন্তু দর্শনের মূল গ্রন্থের আলোচনা সকলের আয়ত্তাধীন

নয়। সাহিত্য প্রকল্পকে দর্শনকে ইতর না করে'ও লোকায়ত করে; তাকে মধ্যস্থ করেই আমাদের লোক-সমাজের ভিতর দিয়ে সেই সকল বড় বড় দার্শনিক শ্রেত বইতে থাকে, যার স্বার্থ সামাজের উন্নতি, অস্তত পরিবর্তন নির্ধারিত হয়। যে-সকল মানবাঙ্গা জীবনসংগ্রামে থিল্ল এবং বিষয়ব্যাপারে মগ, সাহিত্যই তাদের অস্তরে সেই সকল উচ্চ সমস্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আগরুক রাখে, যেগুলি মনুষ্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, এবং তার অর্থ ও লক্ষ্য নিরূপিত করে। আধুনিক কালে অনেকের মনেই ধর্মভাব বিলুপ্তপ্রায় এবং বিজ্ঞান স্বদুরবর্তী; একমাত্র সাহিত্যই তাদের কাছে সেই সকল আবেদননিবেদন পেঁচে দেয়, যার নির্বাক্তাতিশয়ে তারা সকৌণ অহমিকা এবং পাশব পেশাদারীর হাত হতে মুক্তিলাভ করে।

অতএব আমি যতদূর বুঝি, সাহিত্য-চর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের উৎকর্ষসাধন ও চিন্তবিনোদন। অবশ্য শুধু সৌধীন ও সহজভাবে সাহিত্য পাঠ না করে' যারা শিক্ষা দেবার জন্ম পাঠ করতে চান, তাদের নিজের জ্ঞানকে বিধিবন্ধ করতে হবে, ব্যবস্থাপূর্বক বিদ্যাবুলীলন করতে হবে, অপেক্ষাকৃত নির্দিষ্ট, নিভুল, এমন কি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই অধ্যয়ন করতে হবে, তা' স্বীকার করি। কিন্তু দুটি জিনিসের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা চাই;—একটি হচ্ছে এই যে, তিনিই সাহিত্যের সদ্গুরু, যিনি শিশ্যের মনে প্রধানত সাহিত্যরস উপভোগ করবার ক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে উঠেগী হবেন, ও তাদের মনের গতি এমন দিকে ফেরাতে পারবেন যাতে চিরজীবন তারা সাহিত্যকে একদিকে বুক্সিবন্ডির সঞ্চীবনী রসায়ন, অপরদিকে কর্ম-জীবনের অবকাশের নর্ম-সচিবশৰূপ মনে করবে। এই

গন্তব্যস্থানে পৌছনোই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত,— কেবল তাদের পরীক্ষার দিনের উপযোগী কাটাছাটা উক্তর যোগানো নয়। আর একটি স্মর্তব্য কথা হচ্ছে এই যে, কেউ তাঁর শিক্ষাকে এইপ্রকারে সফল করে' তুলতে সম্ভব হবেন না, যদি তিনি পশ্চিত হবার আগে নিজেই সখের সাহিত্যিক না হ'য়ে থাকেন; আজ যে সাহিত্যকে অপরের উন্নতিসাধনের উপায়স্বরূপ ব্যবহার করছেন, এক সময়ে সেটিকে যদি তিনি নিজের উৎকর্মসাধনের কাজে না লাগিয়ে থাকেন; সাহিত্য-রচনা সম্বন্ধে যা-কিছু অমুসন্ধান, যা-কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করেছেন, সে সব যদি তিনি নিজেই আরও ভাল করে' মোবার উদ্দেশ্যে, বুঝে আরো বেশি উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে না করে' থাকেন। স্বতরাং আমার এই গ্রন্থপাঠ সাহিত্যের মূল রচনাবলী পাঠকে অনাবশ্যক করে তুলবে না, বরঞ্চ সাহিত্যপাঠের নিমিত্তকালীন হবে; কৌতুহল নিরুত্ত করবে না, বরঞ্চ উদ্দেশ্যে করবে,— এই আমার অভিপ্রায়; এবং এই উদ্দেশ্য অঙ্গীকার করেই আমি ফরাসী-সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

* * * * *

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমি নতুন কথা বলবার জন্ম বা নতুন কিছু আবিক্ষার করবার জন্ম ব্যাস্ত হই নি; এবং আমার সমসাময়িক অধিকাংশ পাঠকের মনে যে লেখা পড়ে' যে ভাব উদয় হয়ে থাকে, মোটামুটি সেই সকল ধারণাই আমারও মনে জমেছে,— এই কথা আনতে পারলে আমি যেমন কৃতার্থ হব, এমন আর কিছুতে নয়।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

ডু-ইয়ারকি

— -ঃ০ঃ —

শ্রীমতী.....দেবী

করকমলেষু—

আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে' আসছি যে খবরের কাগজ তুমি
বিত্য পড় আর সেই সঙ্গে নিতা ভ-কুঞ্চিত কর। তোমার এহেন
অপ্রসন্ন হবার কারণ আমি তোমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করি নি, কারণ
আমি যে কাগজ পড়াটা তুমি একটা দৈনিক কর্তব্যের হিসেবে দেখো।
আর দৈনিক কর্তব্য মাত্রেই বিরক্তিকর, যথা—আমাদের আপিসে
বাঁওয়া।

কিন্তু কাল তোমার মুখে শুনলুম যে, তোমার ব্যাজার হবার
এদানিক একটু বিশেষ কারণ ঘটেছে। তুমি সম্প্রতি আবিষ্কার
করেছ যে খবরের কাগজ নিত্য এক কথা লেখে, তাও আবার
প্রয় একই ভাষায়; শুধু তাই নয়, কাগজওয়ালাদের যত বকাবকি
যত রোখাকুখি কিছুদিন ধরে সব নাকি হচ্ছে একটা কথা নিয়ে এবং
সে কথাটা হচ্ছে *diarchy*; অথচ ও-কথার মানে জানা দূরে থাক
নামিও তুমি ইতিপূর্বে শোন নি, যদিচ ইংরেজি ভাষার সঙ্গে
তোমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ও-কথার অর্থ যে জাননা
তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। দুদিন আগে আমরাও কেউ জানতুম
না। কথাটা গ্রীক কিন্তু জন্মেছে ভারতবর্ষে। *Monologue*-এর

সঙ্গে dialogue-এর যা প্রভেদ, মূলত monarchy-র সঙ্গে diarchy-রও সেই প্রভেদ—অর্থাৎ একের সঙ্গে দুয়ের যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ। এখন বুঝলে ত ?

তুমি যদি মনে ভাব বুঝেছ, ত ঠিকেছ। এই diarchy-র মূল অর্থ ভুল অর্থ। সে অর্পের সঙ্গে তার হাল অর্থের সম্পর্ক এক রকম নেই বললেই হয়। অভিধানের ভিত্তির থেকে ওর মৰ্ম্ম উক্তির করতে পারবে না। ওর অর্থের গোজ নিতে হবে এক সঙ্গে হিস্টরি এবং জিওগ্রাফির কাছে। ইউরোপের হিস্টরি আর ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি এই দুয়ের মিলনের ফলে এই diarchy জন্মলাভ করেছে। এই কথাটার অসমৃত্তান্ত তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি, তাহলে তুমি ওর ক্রপণ্ণণের পরিচয় পাবে।

(২)

এদেশে কিছুকাল থেকে একটা পলিটিক্যাল-মামলা উঠেছে—বাবু নাম হচ্ছে Democracy vs. Bureaucracy, এ ক্ষেত্রে বাদী হচ্ছে স্বদেশী শিক্ষিত সম্প্রদায় আর প্রতিবাদী হচ্ছেন বিদেশী শাসক সম্প্রদায়। উভয় পক্ষের ভিত্তির অনেক তর্কাতকি চটাচটি এখন কি সময়ে সময়ে গুতোগুতি পর্যাপ্ত হয়ে গেছে, শেষটা এ মামলার বর্তমানে যেটা সর্ব-প্রধান ইন্দ্র হয়ে দাঢ়িয়েছে তারি নাম হচ্ছে diarchy. বিলাতের পার্লিমেন্ট মহাসভায় এখন এই মামলার শুনোনি হচ্ছে, তাতে দু-পক্ষই কসে' সওয়াল-জবাব করছেন। উভয় পক্ষই যে এক কথা একশ-বাব বলছেন, তার কারণ আমরা ধাকে ওকালতি বলি—সে হচ্ছে এক কথা একশ' রকমে বলবাব বিষ্টে।

এই মামলাটির আসল হাল বুঝতে হলে' ইউরোপের ইতিহাসের অন্তত মোটামুটি জ্ঞান থাকাটা আবশ্যক। তাই আমি সে ইতিহাসের সারমৰ্ম্ম যতদূর সন্তুষ্ট সংক্ষেপে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা কৰো। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি যে দু'কথায় তা হবে না।

ইউরোপীয়দের মতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম কথাও যা আৱত্তাৰ শেষ কথাও তাই, সে কথা হচ্ছে *democracy*,—ও শব্দটো গ্ৰীক তাৱে থেকেই অনুমান কৰা যায় যে, এই হচ্ছে ইউরোপের সভ্যতাৰ গোড়াৰ কথা। কিন্তু এক্ষেত্ৰে অনুমানেৰ কোনও প্ৰয়োজন নেই, কেননা এৱং পাই যে গ্ৰীসেৰ শাসনতন্ত্ৰ সাধাৱণত লোকমতেৰ উপৰে প্ৰতিষ্ঠিত ছিল এবং সে শাসনতন্ত্ৰেৰ নাম হচ্ছে *democracy*. *Demos* শব্দেৰ মানে তুমি অবশ্য জানো, কেননা এদেশে *democracy*-ৰ সঙ্গে আমাৰদেৱ সাঙ্গাং পৰিচয় না পাকলো—তু'চাৰজন *demagogue*-এৰ সঙ্গে তা আছেই। তাৱপৰ রোমক সভ্যতাৰ ঈ *democracy*-ৰ উপৰেই দাঢ়িয়েছিল। রোম যে দিন পেকে তাৱ Republic খুইয়ে সংঘাটেৱ ভাবীন হন সেইদিন থেকেই তাৱ অধঃ-পতনেৰ সূত্ৰপাত হয়। রোমক-সাগৰজোৰ ইতিহাস যে, তাৱ Decline এবং fall-এৰ ইতিহাস—এ সতোৱ সাঙ্গাং ত আমৰা Gibbon-এৰ বইয়েৰ মলাটেই পাই।

(৩)

“ডিমোক্ৰাসি” ইউরোপেৰ ইতিহাসেৰ প্ৰথম কথা আৱ শেষ কথা হলো এৱং এৰ মধ্যেৰ কথা কিন্তু স্বতন্ত্ৰ। ইউরোপেৰ মহাযুগ একালেৱ

ইউরোপীয়দের মতে উক্ত মহাদেশের সভ্যতার নয়—অসভ্যতার যুগ। রোমক-সাম্রাজ্য যতই জরাজীর্ণ হোক না কেন,—আরও বল্কাল টিঁকে থাকত, বাইরে থেকে বর্বররা এসে যদি না তা সম্মুলে ধ্বংস করত। গ্রীকো-রোমান সভ্যতা ত বড় জিনিস, এই বর্বররেরা কোনরকম সভ্যতারই ধার ধারত না, স্বতরাং তারা ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতা একঘায়ে ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে এবং রোম সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে নিয়ে নিজেরা তোগ দখল করতে লাগল। ফলে বেশ নৃতন তন্ত্র সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করে বসলে, তার নাম হচ্ছে Feudalism। এই Feudalism ব্যাপারটা যে কি তা একটা ঘরাও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। একথা নিশ্চয়ই শুনেছে যে, এক সময়ে বাঙ্গলা দেশে বারোজন ভুইঞ্জি ছিলেন। এই দ্বাদশ ভূম্যধিকারী যে এ-দেশের শুধু জমিদার ছিলেন তাই নয়—তাঁরা এক একজন ছিলেন এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। আমরা জমিদারদের চিঠি লিখতে হলে আজও শিরোনামায় লিখি “প্রবল প্রতাপেষু”। মধ্যযুগে ইউরোপ ঐ শ্রেণীর এক ডজন নয়, শতশত ভূম্যধিকারীর অধীন হয়ে পড়েছিল। ইউরোপের এ যুগের ইতিহাস হচ্ছে এদেরই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের জমি নিয়ে কাঢ়াকাঢ়ি ও লড়ালড়ির ইতিহাস। এই কাঢ়াকাঢ়ি ও লড়ালড়ির ফলে, ইউরোপে শেষটা কতগুলি বড়বড় রাজ্য দাঢ়িয়ে গেল। সে রাজ্যগুলি আজ প্রায় সবই বজায় আছে।

ইংলণ্ডের জিওগ্রাফিও যেমন ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন, ইংলণ্ডের হিস্টরিও তেমনি বিভিন্ন। প্রথমত হিপা হবার দরুণ ইউরোপের কোন দেশের সঙ্গে তার কশ্মিনকালেও সীমানাঘটিত বিবাদ ঘটে নি। আর মধ্যযুগের যত ভূম্যধিকারী-রাজাদের পরস্পরের যত মারামারি

হত তা এ চৌহদি নিয়ে। প্রকৃতি যেমন ইংলণ্ডকে একদেশ করে গড়ে দিলেন, William the Conqueror-ও তেমনি একদিনে এ দেশকে এক রাজ্য করে তুল্লেন। সামন্ত রাজাদের সঙ্গে বুগযুগ ধরে কাটাকাটি করে' ইংলণ্ডের রাজাকে একরাট হতে হয় নি। এই কারণে ইংলণ্ডের ইতিহাসের ধারাও একটু স্বতন্ত্র। রাজায় সামন্তে জমি নিয়ে লড়ালড়ি লয়, রাজাধ প্রজায় রাজশক্তি নিয়ে কাঢ়াকাঢ়ির ইতিহাসই হচ্ছে ইংলণ্ডের আসল ইতিহাস।

মধ্যযুগের অবসানে যখন আমরা বর্তমান যুগের মুখে এসে পৌঁছাই তখন দেখতে পাই যে ইউরোপ কতগুলি ছোট বড় রাজ্য বিভক্ত, এবং প্রতিদেশের মাথার উপর বসে আছেন এক এক জন সর্বেসর্ববা রাজা,—যিনি হচ্ছেন সর্বলোকের অধিত্তীয় অধীশ্বর, সর্বস রাজশক্তির একমাত্র আধার। এ রাজশক্তি সংযত করবার ক্ষমতাও কানো ছিল না, কেননা এ শক্তি সেকালের মতে ছিল—ভগবদ্বত্ত, সুতরাং তার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার মানুষের ছিল না। ইতিমধ্যে ইউরোপের সকল জাতিই খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিল, এবং সেই ধর্মের প্রসাদে তারা বিশ্বরাজ্য যে একেশ্বরের সন্ধান পেয়েছিল, প্রতি রাজা নিজ নিজ রাজ্য তদনুরূপ একেশ্বরের পদ লাভ করেছিলেন অর্থাৎ তারা প্রতিজন হয়ে উঠলেন, স্বরাজ্যের অধিত্তীয় হর্ণা কর্তা বিধাতা। Monarchy, অবশ্য প্রাচীন গ্রীসেও ছিল, কিন্তু ইউরোপের এই নব Monarchy-র তুলনায় সে হচ্ছে নিতান্ত অকিঞ্চিতকর বস্তু। তার পিছনে না ছিল এতাদৃশ ধর্মবল, না ছিল এতাদৃশ বাহুবল।

(৪)

যে ডিমোক্রাসি মধ্যযুগে একদম ছাইচাপা পড়ে গিয়েছিল, বর্তমানে তা আবার ইউরোপে সদর্পে জলে উঠেছে। এ যুগের ইউরোপীয়রা এ ছাড়া যে অপর কোনও শাসনতন্ত্র সভ্যজগতে গ্রহণ হতে পারে এ কথা মুখে আনলেও কানে তোলে না। এ বিষয়ে পরস্পরে যে মতভেদ আছে সে শুধু তার বাহ্য আকার নিয়ে। শাসন ষষ্ঠটা কি তাবে গড়লে ডিমোক্রাসি স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়, এই নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে, এমন কি জাতিতে জাতিতে মতান্তর হয়। এক কথায় ডিমোক্রাসির ধর্ম্ম সবাই মানেন, যা কিছু সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে সে শুধু তার Church নিয়ে, সে Church-এর মাথায় জনৈক ধর্ম্মরাজ, কিংবা পঞ্চায়েৎ থাকা শ্রেয় ; এ নিয়ে তর্কের আর শেষ নেই। এ তর্কের শেষ ক্ষিনকালে যে হবে তারও আশা করা যায় না, কেননা মানুষের কৃচি ভিন্ন আর তর্ক করবার প্রয়োজন অদম্য।

সে যাই হোক ইউরোপের এই নব-ডিমোক্রাসি ও তার প্রাচীন ডিমোক্রাসি এক বস্তু নয়, এদের পরস্পরের আজ্ঞাও বিভিন্ন ;—এ দুয়ের ভিতর যে আশমান জমিন ফারাক এমন কথা বললেত অত্যাক্ত হয় না।

ইউরোপের পণ্ডিতদের মতে সে দেশের সভ্যতা হচ্ছে Antico-modern, অর্থাৎ—ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের পাতা ক'টা প্রক্ষিপ্ত, আর সেই প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু ছেঁটে ফেললেই তার অতীত তার বর্তমানের সঙ্গে জুড়ে যায়, আর তখন দেখা যায় যে ইউরোপ আসলে গ্রীকো-রোমান সভ্যতারই জের টেনে আসছে।

এ মতটা অবশ্য সত্য নয়। দু'হাজার পাতার ইতিহাসের মধ্যে থেকে ষদি হাজার পাতা ছিঁড়ে ফেলা যায়, তাহলে তার যে অঙ্গহাননী হয় “এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। বর্তমান ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের যোগ আছে শুধু বইয়ের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ সে যোগ হচ্ছে বিদ্যাবৃক্ষের যোগ; কিন্তু তার নাড়ীর যোগ আছে শুধু মধ্যযুগের সঙ্গে।

জের, ইউরোপ আজও মধ্যযুগেরই টানছে। বকেয়ার মায়া কেউ বা বেশি কাটিয়েছে কেউ বা কম, সে দেশে এ যুগে জাতিতে জাতিতে মনের তফাং এই মাত্র। ইউরোপে মধ্যযুগে মানুষের যে আত্মা গড়ে উঠেছে, সেই আত্মা হচ্ছে এই নব-ডিমোক্রাসির আত্মা। আর ঐ মধ্যযুগে ও-দেশে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে সেই রাষ্ট্রই এই নব ডিমোক্রাসির দেহ।

এই নব-মানবধর্মের বীজ-মন্ত্র যে liberty, equality এবং fraternity—এ কথাত এ দেশের স্বীকৃত জানে। Liberty শব্দ যে-অর্থে আমরা বুঝি সে-অর্থে প্রাচীন ইউরোপ বুঝত না, liberty শব্দের এ-কেলে অর্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সে-কালে State-এর বহিভূত ব্যক্তিহের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তারপর দাস প্রথাৱ উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন সভ্যতার ধর্মই ছিল অধিকারী ভেদ আৱ এ অধিকারী ভেদ ছিল জাতিভেদেৱই একটি অঙ্গ। যারা জাতিতে গ্রীক কিম্বা রোমান নয় তাৱা সকল রাজনৈতিক অধিকারে সমান বৃক্ষিত ছিল। রোম শেষটা অবশ্য—রোমক-সাম্রাজ্যেৱ অধিবাসী মাত্রকেই রোমেৱ নাগৰিক হিসেবেই গণ্য কৱতে স্বীকৃত কৱেছিল, কিন্তু সে হয়েছিল তখন যখন সে সাম্রাজ্যেৱ ভগদশা

উপস্থিত। এবং তার কারণ সে অবস্থায় রোমান নামক একটা বিশেষ জাতির কোন অস্তিত্বই ছিল না। রোম সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করেছিল, তার ফলে সমগ্র ইউরোপের অধিবাসীরাও রোমানদের গ্রাস করে ফেলে। স্বতরাং equality বলতে এ-কালের লোক যা বোকে সে-কালের লোক তা বুঝত না। এসিয়ার ধর্ম যদি ইউরোপের মনে বসে না যেত তাহলে liberty, equality প্রভৃতি শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থের সঙ্গান ইউরোপ পেত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে হচ্ছে এই যে, ইউরোপ যুগ যুগ ধরে পৃষ্ঠাধর্শের বশীভৃত না হলে তার মুখ দিয়ে Fraternity শব্দ কথমই বার হত না। নব-ডিমোক্রাসির মুখে এ কথাটুলি শুধু শাসন-তন্ত্রের মূল সূত্র নয়, পূর্ণ মনুষ্য ই লাভের সাধন-মন্ত্র। গ্রীকো-রোমান সাহিত্যের প্রভাবে, ইউরোপের এই উদ্বৃক্ত আত্মজ্ঞান, আত্মশক্তি-জ্ঞানে রূপান্তরিত হল। ইউরোপ আত্মবলে স্বর্গরাজ্য জয় করবার দুরাশা ত্যাগ করে, পৃথিবী জয় করতে উদ্ধৃত হল। মধ্যযুগের অক্ষবিদ্যার আসন নবযুগের বিজ্ঞান অধিকার করে বসলে।

(৯)

ডিমোক্রাসির আত্মাকে অব্যাহতি দিয়ে এখন তার দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

প্রাচীন ইউরোপের ডিমোক্রাসি সব এক একটি ছোট সহরকে অবলম্বন করে' তার গভীর মধ্যেই কায়েম ছিল। এবং সে সকল সহরের, আদ-বাসিন্দারা নিজেদের সব এক বংশের লোক মনে করত।

তারা সকলে পরম্পরার যে পরম্পরারের, জাতি না হোক অন্তত যে স্বগোত্র মে বিষয়ে তাদের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। স্বতরাং সে কালের ডিমোক্রাসি ছিল এক রকম কুলাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বতরাং সহরের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে সকল নাগরিকদের মতই নেওয়া হত। নাগরিক মাত্রেরই ভোট ছিল, কিন্তু অ নাগরিকের এ-বিষয়ে কথা কইবার কোন অধিকারই ছিল না। নাগরিকরা মাথা-গুণতিতে অতি স্বল্পসংখ্যক ছিল বলে' সকলে একত্র হয়ে তাদের পুরী-রাজ্যের ছোট বড় রাজকার্য সব চালাতে পারত। অর্থাৎ সে-কালের ডিমোক্রাসি ছিল এক রকম পারিবারিক-পঞ্চায়েৎ।

এ-কালের রাজ্য কিন্তু একটা সহরের চতুঃসীমার মধ্যে আবস্থ নয়, এক একটা প্রকাণ্ড দেশ জুড়ে' তা বসে আছে। আর এই সব দেশে এক কুলের ত দূরে থাক, একজাতির লোকও বাস করে না। স্বতরাং বর্তমান যুগে এক-দেশীমাত্রেই পলিটিক্যাল হিসাবে একজাতি। এক কথায় এ যুগে স্বদেশীতে আর স্বজাতিতে কোনই তফাং নেই। সে-কালের রাজারা ছিলেন নৃপতি আর এ-কালের রাজারা হচ্ছেন ভূপতি। এ পরিবর্তন ঘটেছে মধ্যযুগে। মনে রেখো, মধ্যযুগের সামন্তরাজারা ছিলেন সব ভূম্যধিকারী। সাদা কথায় জমিদার। স্বতরাং বর্তমান যুগের প্রারম্ভে দেখতে পাই ইউরোপের প্রতি রাজা তার রাজ্যের অন্তর্ভূত সমগ্র দেশটাকে নিজের জমিদারী মনে করতেন। এই ইংরাজি নাম হচ্ছে territorial sovereignty, আর রাজহের এই নৃতন আইডিয়া থেকে একালের ডিমোক্রাসিতে আতিথৰ্ম নির্বিচারে প্রজামাত্রকেই ভোট দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অধিকারভেদ একালে কে কত খাজনা দেয় তার উপর নির্ভর করে, কে

কোন্ দেবতা মানে তার উপর করে না। এ কালের রাজশাস্ত্র আকাশ থেকে নেমে মাটির উপর দাঢ়িয়েছে। ফলে একালে এত অসংখ্য লোকের ভোট আছে যে, সকলে একত্র হয়ে, দেশের রাজ-কার্য চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। স্তুতরাঃ একালে দেশের লোক তাদের শুধু জনকতক প্রতিনিধি নির্বাচন করে। সেই প্রতিনিধি-সভাই রাজকার্য চালায়। এরি নাম representative গভর্নমেন্ট। ইউরোপের সেকেলে আর একেলে ডিমোক্রাসির প্রভেদটা এত লম্বা করে বর্ণনা করবার উদ্দেশ্য, এই কথাটা পরিকার করা যে নব ডিমোক্রাসির গোড়া-পতন যেমন এদেশের অভীতেও হয় নি তেমনি সে দেশের অভীতেও হয় নি। এ-বস্তু আমাদেরও অস্বাভাবিক নয়, তাদেরও নয়। প্রাচীন আথেন্স রোমের মত স্বরাট সহর প্রাচীন ভারতবর্ষেও একটি আধিটি নয়, একশ' দুশ' ছিল। নব ডিমোক্রাসির সূত্রপাত সব প্রথম ইংলণ্ডেই হয়, একমাত্র ইংরাজ জাতিরই এ বিষয়ে একটা পাঁচ ছশ' বছরের tradition। আছে, কিন্তু সে tradition আজ 'দেড়শ' বছর আগে ইউরোপ মহাদেশের কোন জাতেরই ছিল না। এই কারণে ফরাসী-বিপ্লবের নেতৃত্বা যখন Constitution গড়তে বসেন তখন Arthur Young নামক জনৈক ইংরেজ বলেন এ হচ্ছে পাগলামি, কেন না ফরাসী জাতের ভিতর এ বিষয়ে পাঁচশ' বছরের পুরোনো কোনো tradition ছিল না। এর উত্তরে ফরাসীরা যে বলেন তবে কি আমাদের আর পাঁচশ' বছর হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে? Arthur Young-এর সেই পুরোনো কথা আজ সহস্র ইংরাজ-কণ্ঠে উচ্ছারিত হচ্ছে। আমাদের জবাবও ফরাসীদের সেই পুরোনো জবাব। গাটি ইংরাজের মনোভাব এই

যে পৃথিবীর অপর সকল জাতি যদি তাদের মঙ্গল চায় তাহলে তাদের পক্ষে ইংরাজ জাতির হিস্টরির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এ কথা বলাও ষা আর এ কথা বলাও তাই যে, পৃথিবীর অপর সকল দেশ যদি তাদের মঙ্গল চায় তাহলে তাদের দেশের জিওগ্রাফিকেও ইংলণ্ডের জিওগ্রাফির অনুরূপ করতে হবে। ইংলণ্ডের জিওগ্রাফিট যে ইংলণ্ডের হিস্টরি গড়েছে এ ত ইংলণ্ডের পশ্চিতদের মত।

(৮)

এই নব-ডিমোক্রাসির জন্মাতা যে ফরাসী বিপ্লব, এ কথা সর্ববাদী সম্মত।

এছলে তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার যে ইংলণ্ডের ইতিহাস এর স্বর্ণ নয় কেন? যে পালিয়ামেণ্টের গভর্ণমেন্ট ডিমোক্রাসির দেহ তা ত ফরাসী-বিপ্লবের বক্তৃতার্থে গড়ে উঠেছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ডিমোক্রাসির দেহ ইংলণ্ডে গড়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সে দেশের লোক তার আত্মার সর্তিক সন্দৰ্ভ পায় নি। ফলে ইংলণ্ডবাসীরা এ দিময়ে সব দেহাত্মবাদী হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে উক্ত দেহের অতিরিক্ত কোনও আত্মা নেই। গভর্ণমেন্ট ভাবের জিনিস নয় কাজের জিনিস। আর যে রাধায় ব্যবস্থা তারা গড়ে তুলেছে সে ব্যবস্থার সার্থকতা শুধু ইংলণ্ডই আছে অপর কোথায়ও নেই। এক কথায় লোকায়ত শাসন-প্রণালী ইংরাজ জাতির একায়ত।

অপর পক্ষে ফ্রান্স স্বদেশে ডিমোক্রাসির যন্ত্র গড়বার পূর্বেই তার মন্ত্রের দলি করলে, যে যন্ত্র আজ পুণিদী শুল্ক লোক আওড়াচ্ছে।

ফ্ৰান্সেৱ কথা এই যে, মানুষ মাত্ৰেৱই কলকণ্ঠলো জনাপ্লতি অধিকাৰ আছে এবং সেই সব অধিকাৰ বজায় ৱাখাই হচ্ছে গভৰ্ণমেণ্টেৱ উদ্দেশ্য। নৰ-ডিমোক্রাসিৱ মূল সূত্ৰগুলি এই —

1. Men are born and remain free and equal in their rights.

2. The rights are liberty, ownership of property, security, and resistance to oppression. Liberty consists in being able to do anything which is not injurious to others.

3. The principle of all sovereignty rests in the nation.

4. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to co-operate personally or through their representatives in its formation. The law should be the same for all."

এই কথাগুলি পৃথিবী শুল্ক লোকেৱ মনে বসে গেল, বিশেষত তাৰেৱ মনে, যাৱা উল্ল সকল অধিকাৰে বঞ্চিত। এ সব কথায় বিশ্বানবেৱ মন যে, 'এক সঙ্গে সাড়া দিলে ও সায় দিলে, তাৱ কাৰণ, ফৱাসি জাতি এ সব অধিকাৰ শুধু নিজেদেৱ জন্য নয়, জাতি দেশ বৰ্ণ ও ধৰ্ম নিৰ্বিচাৰে মানুষ মাত্ৰেৱই জন্য দাবী কৱেছিল। এক কথায় ফ্ৰান্স পৃথিবীতে এক নতুন ধৰ্ম মত প্ৰচাৰ কৱলে। এ ধৰ্মৰ মুক্তি পারত্ৰিক নয়, এহিক সমগ্ৰ ইউৱোপেৱ জনগণ এই মুক্তিলাভেৱ জন্য লালায়িত এবং সেই সঙ্গে চক্ৰল হয়ে উঠল। অপৰ

সকল ধর্মের মত এই ধর্মের dogma-গুলির উপরে লজিকের ছুরি অবশ্য চালানো যায়, এবং সে ছুরি চালাতে ইউরোপের পণ্ডিত-মণ্ডলী, বিশেষত জর্জীনরা মোটেই কস্তুর করেন নি। এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত বই লেখা হয়েছে, তা একটা করলে বোধ হয় একটা নতুন আলেকজাণ্ট্রিয়ার লাইব্রেরি তৈরি করা যায়—যা ভস্মসাং করলে মানুষের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। পণ্ডিতের তর্ক পণ্ডিতে করে চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষে এই ধর্মমত অনুসরণ করে এক নব-সভ্যতা গড়ে চলেছে—যার নাম হচ্ছে ডিমোক্রাসি। লজিকের ছুরি এ dogma-গুলোকে যথম করলেও তার প্রাণবন্ধ করতে পারে নি, তার কারণ এর একটিও axiom নয় ; সব postulate. এ যুগের ফ্রান্সের একটি বড় দার্শনিক, কিছুদিন হল আবিস্কার করেছেন যে, মানুষের অন্তরে একরকম অশরীরি শক্তি আছে, যার নাম idea-force, যার বলে, মানুষে তার সমাজ গড়ে, সভ্যতা গড়ে। Liberty, equality ও fraternity-র তুল্য প্রবল idea-force যে এ যুগে আর কিছু নেই, তার প্রমাণ গত দেড়শ' বৎসরের ইউরোপের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। এই সব আইডিয়া যখন মানুষের স্বার্থের সঙ্গে একজোট হয় তখন তার শক্তি যে কি রকম অদম্য হয়ে ওঠে, তার পরিচয় ত গত যুক্তেই পাওয়া গেছে।

(৭)

অশরীরি আত্মা যতক্ষণ না একটা দেহের ভিত্তি প্রবেশ করতে পারে ততক্ষণ তার একটা স্থিতিভিত্তি হয় না, আর তা পৃথিবীর কোন কাজেও লাগে না। স্বতরাং নব-ডিমোক্রাসির আত্মা ফ্রান্সে

জন্মগ্রহণ করে' ইংলণ্ডের তৈরি দেহকে আশ্রয় করলে। এক কথায় ইংলণ্ডের শাসন-ব্যক্তির অনুকরণে তারা তাদের দেশের শাসনব্যন্তি গড়লে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে, রাজ-বিস্তোহী ফ্রান্স যে, Constitution তৈরি করলে তার আদর্শ হল ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্টারি গভর্নেন্ট। এ নকল করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। প্রগতি সে সময় লোকায়ন শাসনতন্ত্র এক ইংলণ্ড ব্যৱীত আর কোথায়ও ছিল না। প্রতীয়ত—যে সব আইডিয়ার উপর ফ্রান্সে তার নবমানবধর্মের প্রতিষ্ঠা করলে সে সব আইডিয়ারও সূত্রপাত হয়েছিল এ ইংলণ্ডেই। ইংলণ্ড আগে আইডিয়া গড়ে' তারপর সেই আইডিয়া অনুসারে তার গভর্নেন্ট গড়ে নি। কিন্তু সেই গভর্নেন্টের অন্তরে যে সব আইডিয়া প্রচলনভাবে অবস্থিতি করছিল, যে সব পলিটিক্যাল-আইডিয়া ইংলণ্ডের মগ্নাচেটগ্রের ভিতর লুকিয়ে ছিল, ফ্রান্সের দার্শনিকরা সেইগুলি টেনে বার করে, জাগ্রতচেতন্যের দেশে তাদের খাড়া করলেন। সত্য কথা বলতে গেলে Hobbes, Leek প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিকরাই এ সব আইডিয়া প্রথমে আবিষ্কার করেন, Montesquie, Rousseau—প্রভৃতি সেইগুলিকে শুধু ফুটিয়ে তোলেন এবং তাদের একটা নতুন দিক্ আর নতুন গতি দেন। ইংলণ্ড যা তার থানদানি জিনিস মনে করত, ফ্রান্স তা বিশ্বানবের সম্পত্তি বলে প্রচার করলে। এই যা তফাও, কিন্তু এ তফাও মস্ত তফাও। ইংলণ্ডের হাতে যা কর্মমাত্র ছিল, ফ্রান্সের হাতে পড়ে' তা ধর্ম হয়ে উঠল।

(৮)

তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ যে, Rights of Man-এর যে চারটি

মূলসূত্রের পরিচয় দিয়েছি, তার প্রথম দুটির বিষয়ের সঙ্গে শেষ দুটির বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম দুটির সার কথা হচ্ছে, গভর্ণমেণ্ট মাত্রেরই পক্ষে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা কর্তব্য আর শেষ দুটির সার কথা হচ্ছে, সর্বলোকের সমবেত ইচ্ছার উপরই প্রতি দেশের গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। একটি হচ্ছে গভর্নমেণ্টের গড়নের কথা, আর একটি হচ্ছে গভর্নমেণ্টের সার্থকতার কথা। যে diarchy-র নাম শুনে শুনে তোমার কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছে তার মানে বুঝতে হলে, গভর্নমেণ্টের গড়নের কথাটাই মোটামুটি বুঝতে হবে, কেননা মণ্টেগু-চেম্সফোর্ড-কল্পিত Reform Bill-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ দেশের শাসন-যন্ত্রটা নতুন করে গড়া। গভর্নমেণ্টের কর্তব্যের কথাটা এখন মুলতুবি রাখা যাক, কেননা তা হলে Reform Bill-এর নয় Rowlat Act-এর আলোচনা করতে হয়, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র বিষয়। নব ডিমোক্রাসির উক্ত সূত্রগুলির একটির সঙ্গে আর একটির যে যোগ নেই, তা নয়। তবে ইউরোপের লোকের বিশ্বাস যে শাসনযন্ত্রটা লোকায়ত না হলে লোক সমূহের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব, স্বতরাং ডিমোক্রাসির প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ডিমোক্রাটিক গভর্নমেণ্টের স্থাপনা করা। এ মতে Reform Bill পাশ হলে আর Rowlat Bill পাস হতে পারে না। সর্বলোকের সম্মতিক্রমে যদি আইন গড়তে হয়, তাহলে সর্বলোকের অসম্মতিক্রমে কোনও আইন তৈরি হতে পারে না। আর সামাজিক জীব যাকে স্বাধীনতা বলে, তা একমাত্র আইনের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের দ্বারাই রক্ষিত, অতএব স্বেচ্ছায় আইন গড়বার অধিকার হচ্ছে সমাজের সব অধিকারের মূল।

(৯)

এই থানে বলে' রাখি যে Representative Government হচ্ছে ডিমোক্রাসির প্রথম কথা, আর responsible Government তার শেষ কথা। এই কথা দু'টোর মোটামুটি অর্থ এখন তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব। ব্যাপারটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়, বিশেষত তোমাদের পক্ষে, কারণ আসলে ও হচ্ছে সামাজিক ঘরকন্নার কথা। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সের উদাহরণ নেওয়াই সঙ্গত, কেননা ফ্রান্স তার নব-শাসনতন্ত্র কর্তৃক গুলো স্পষ্ট Principle-এর উপরে একদিনে ঢাঢ়া করেছে; স্বতরাং সে শাসনতন্ত্রের মূল উপাদানগুলি ধরা সহজ। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বর্তকাল ধরে ধীরে-সুস্থে হাত-আন্দাজে গড়ে তোলা হয়েছে। ফ্রান্স তার প্রজাতন্ত্র একদম নতুন করে গড়েছে, ইংলণ্ড তার সেকেলে রাজতন্ত্র ক্রমান্বয় এখানে ওখানে মেরামত করে' করে' তার হাল শাসনযন্ত্র লাভ করেছে। অবশ্য এই মেরামতের প্রসাদে তার সেকেলে গভর্ণমেন্টের খোল এবং নইচে দুই-ই বদল হয়ে গেছে।

তা ছাড়া ফ্রান্সের গভর্নমেন্টের লিখিত আইন আছে, ইংলণ্ডের নেই। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের মূল, আইন নয়—আচার; স্বতরাং তার ভিতর আগাগোড়া মিল পাবে না। ইংলণ্ডের পলিটিক্যাল ধর্মও হচ্ছে একরকম protestantism—অর্থাৎ মধ্যযুগের রাজ-শক্তির বিরক্তে যুগে যুগে প্রতিবাদ করে' সে শক্তিকে ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ করে' হরণ করে' অহরণ করে' ইংরাজেরা তাদের Constitutional monarchy ঢাঢ়ু করিয়েছে। রাজা কি কি করতে পারবেন না,

সেই বিষয়েই তারা রাজার কাছে সব লেখা পড়া করে নিয়েছে। কিন্তু গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য এবং মানুষের সহজ অধিকার সম্বন্ধে তাদের Constitution নীরব। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নব-ডিমোক্রাসির ভিত্তি, ইংলণ্ডের আইন-কানুনে তার নাম পর্যন্ত নেই। অথচ ও-স্বাধীনতা ইংরাজের মত আর কোনও আতের নেই। রাজশক্তিকে আইনে বেঁধে এ স্বাধীনতা তারা পরোক্ষ ভাবে লাভ করবে।

“No man can be accused, arrested or detained in prison except in cases determined by law, and according to the forms prescribed by law”—

Declaration of Rights of Man-এর এই সূত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি অতি প্রাচীন কথা, এর সাক্ষাৎ Magna charta-তেই পাবে। ইংলণ্ড তার সকল মন ব্যক্তিগত স্বত্সামিন রক্ষার উপরেই নিয়োগ করাতে, সে দেশের Constitution ইংরাজের। অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবে গড়ে তুলেছিল। ফলে ইংলণ্ডের গভর্নমেন্ট, গড়নে কতকটা English Church-এর অনুকূপ—অর্থাৎ নৃতনে পূর্বাতনে যোড়া-তাড়া দিয়ে তা খাড়া করা হয়েছে। এক কথায় Reason এবং authority,—এই দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী বস্তুর এক রকম কাজ চালানো-গোচ সমন্বয়ের উপর ইংলণ্ডের মন ও জীবন দৃঢ়-ই সমান প্রতিষ্ঠিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রান্ত যথন তার নব Constitution গড়তে বসল, তখন তার চোখের ঠমুখে এই ইংলণ্ডের Constitution ছাড়া ডিমোক্রাসির আর কোনও জ্যান্ত নমুনা ছিল

না। ফ্রান্স অবশ্য তার নৃতন গভর্নেমেণ্ট, একমাত্র Reason-এর উপরেই খাড়া করতে চেয়েছিল, তা সদেও যে ইংলণ্ডের মডেল গ্রহ করতে তার আপত্তি হল না, তার কারণ ইতিপূর্বে জৈবেক ফরাসি দার্শনিক, ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের অনুর্ণবিত reason আবিষ্কার করেছিলেন। Montesquieu-র মতে রাজশাস্ত্র সর্বত্র ত্রিমূর্তি ধারণ করেই আবিভূত হয়। এর একটির কাজ হচ্ছে—বিচার (Judicial), আর দ্বিতীয়টির আইন গড়া (Legislative), আর তৃতীয়টির শাসন সংরক্ষণ (Executive).

Montesquieu-এই মত প্রচার করেন যে, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে বিচারের ক্ষমতা রাজা'র নিয়োজিত জজের হস্তে অস্ত, আইন গড়া'র ক্ষমতা সে দেশে আছে শুধু পালিয়ামেণ্ট অর্থাৎ প্রজাবর্গের প্রতিনিধির হাতে, আর শাসন-সংরক্ষণের ক্ষমতা চিরদিনই রাজা'র হাতে রয়ে গিয়েছে। Montesquieu-র এ মত অবশ্য সম্পূর্ণ সত্ত্ব নয়। অস্ট্রিয়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের রাজশাস্ত্রের কোন অংশ যে কার হাতে ছিল তা বলা অসম্ভব, কেননা এ বিষয়ে তখন কোন একটা লিখিত-পত্রিত ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় নি। আসল কথা এই যে রাজা ও প্রজা'র অধিকারের পাকা-পোকা সীমানা তখনও ঠিক হয়ে যায় নি, এমন কি আজও হয় নি। এর ভিতর যে-শক্তি যখন প্রবল হ'ত তখনই সে শক্তি তার অধিকারের মীমাংসা বাঢ়িয়ে নিত। সে যাই হোক, বিদ্রোহী ফ্রান্স Montesquieu-র মত গ্রহ করে' নিয়েই ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে তাহার আদ্ব. Constitution গড়ে। এ তন্ত্রে শাসন-সংরক্ষণের ক্ষমতা রাজা'র হাতেই রয়ে গেল, প্রজা'র হাতে পড়ল শুধু—আইন তৈরি করবার ক্ষমতা। এই প্রতিনিধি সত্ত্ব

আসলে ব্যবস্থাপক সভা হলেও, ইংলণ্ডের নজির দৃষ্টে প্রজার উপর টেক্স ধার্য করবার এবং বাংসরিক বজেট পাশ করবার ক্ষমতাও এই সভা আন্তর্ভুক্ত করে নিলে। ইংলণ্ডের মতে এ ক্ষমতার অভাবে প্রজার কোন ক্ষমতাই থাকে না। আমরা যজা করে' টাকাকে রুধির বলি, কিন্তু উপমাটা নেহাঁ বাজে নয়। প্রজার হাতে টাকার থলি এসে পড়ায় রাজস্বের রক্ত-চলাচল বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা তাদের হস্তগত হয়। এই নমুনার গভর্ণমেন্টের নামই হচ্ছে representative Government সে দিন পর্যন্তও জার্মানীতে এই ধরণের গভর্ণমেন্টই ছিল।

(১০)

যে-দেশে representative Government আছে, এখন দেখা ষাক্ষ সে-দেশে রাজার হাতে কি ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে। শাসন-সংরক্ষণের একাধিক বিভাগ আছে, যথা,-administration, justice, finances, foreign affairs, army, navy, commerce, agriculture, education and public works ইত্যাদি ইত্যাদি। এর প্রতি বিভাগটি এক একটি রাজমন্ত্রীর হাতে সঁপে দেওয়া হয়, এবং সেই রাজমন্ত্রীক'টিকে নিয়ে যে মন্ত্রী-সমিতি গঠিত হয়, তা'রই নাম হচ্ছে—Executive Council. বলা বাহুল্য যে, সমগ্র দেশের শাসনভাব এই মন্ত্রী-সমিতির হাতেই পুরোপুরি থাকে। ফলে মে দেশে Legislative-শক্তি থাকে প্রজার প্রতিনিধির হাতে আর Executive ক্ষমতা রাজমন্ত্রীর হাতে, সে দেশে এ দুয়ের ভিতর বিরোধ অবিনাশ। প্রতিনিধি সভা ক্রমান্বয়ে রাজমন্ত্রীদের সকল কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে, আর

রাজমন্ত্রীরা নিত্য প্রতিনিধি সভার দল ভাড়িয়ে সে সভাকে কাহিল করে ফেলবার চেষ্টা করে।

ফ্রান্সের উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস হচ্ছে এই বিরোধের ইতিহাস। সে দেশে যে আশি বৎসরের মধ্যে তিনবার রাষ্ট্র-বিপ্লব হয়েছে এবং চ'বার গভর্ণমেণ্টের বদল হয়েছে, তার একমাত্র কারণ—Legislative Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর এই চিরন্বস্তু। এ বিরোধ দূর তল তথনই, যখন Executive রাজাৰ অধীন না হয়ে Legislative Council-এর অধীন হল। এর চলতি উপায় হচ্ছে প্রতিনিধি সভার সভ্যদের মধ্যে থেকে জনকতককে মন্ত্রী নিযুক্ত কৰা, যাদের উক্ত সভার কাছে জবাবদিহি করতে হবে, এবং যাদের বরখাস্ত কৰবার ক্ষমতা উক্ত সভারে হাতেই থাকবে। Absolute monarchy-র দিনে—যেমন legislative এবং executive, উভয় ক্ষমতাই একমাত্র রাজাৰ হাতে ছিল, পূর্ণাঙ্গ ডিমোক্রাসিৰ দিনে, তেমনি এই দুই ক্ষমতাই একমাত্র প্রজাৰ হাতে আসে। এই তন্ত্রের নামই হচ্ছে responsible Government, আৱ এই হচ্ছে ডিমোক্রাসিৰ শেষ কথা।

(১১)

এতক্ষণ যদি পেরে থাকো ত আৱ একটু ধৈর্য ধৰে আমাৱ ব্যাখ্যান শুনলে, আমাদেৱ পলিটিক্যাল মামলাৰ মোদা কথাটা জলেৱ মত বুঝে যাবে। কাৰণ এ পত্ৰে আমি ইউৱোপেৱ পলিটিক্সেৰ শুধু ক থ-ৱ পৱিচয় দিচ্ছি। প্ৰস্তাৱনাটি যত লম্বা হয়েছে, উপসংহাৰ তাৰ সিকিও হবে না।

আমাদের গভর্ণমেন্টের বর্তমান অবস্থা এই। বিচার করবার আইন-তৈরি করবার ও শাসন সংরক্ষণ করবার ক্ষমতা সবই আজ Bureaucracy-র হাতে। এদেশে অবশ্য Legislative Council আছে, এবং তাতে জনকতক প্রজার প্রতিনিধিত্ব আছেন, কিন্তু আসলে এ Legislative Council, গভর্নমেন্টের Executive Council-এর সদর মহল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বাবস্থাপক সভায় প্রজার মুখ্যপাত্রেরা তর্ক করতে পারে, বক্তৃতা করতে পারে, কিন্তু কোন আইনের জন্মও দিতে পারে না, কোন আইনের ভূমিষ্ঠ হওয়াও বন্ধ করতে পারে না, এক কথায় আমাদের প্রতিনিধিদের মুখ আছে কিন্তু হাত নেই। প্রমাণ—দেশী সভাদের সে ক্ষমতা থাকলে Rowlat Bill আর Rowlat Act হত না।

এই যুদ্ধের তাড়নায় ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রতি দেশগুলি, ডিমোক্রাসির মূলসূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে।

এই স্থিয়েগে Congress এবং Moslem League, দু-জনে ছ-হাত মিলিয়ে জোড়করে বিলেতের কাছে Representative Government ভিক্ষা করে। আর প্রায় টিক সেই সময়ে ইংরাজিবাজ ভারতবর্ষকে চোখের এক নতুন কোণ দিয়ে দেখতে পেলেন, যে-কোণকে দক্ষিণ কোণ আর ইংরাজিতে right angle বলা যেতে পারে, এবং সেই কারণে বিলাতের মন্ত্রীসভা এর উভয়ের বলেন যে—

The policy of His Majesty's Government is. ...
the gradual development of self-governing institutions
with a view to the progressive realisation of
responsible government in India as an integral part of

the British Empire. They have decided that substantial steps in this direction should be taken as soon as possible."

আমরা ভিক্ষে চেয়েছিলুম representative Government বিলেত দিতে চাইলেন, তার উপরে ফাউ হিসেবে কিঞ্চিৎ responsible Government। যত গোল বেধেছে এ একটা নিয়ে।

ফলে দাঙ্ডিচে এই যে, মন্টেগু এবং চেম্সফোর্ড সাহেব উভয়ে মিলে reform bill-এর একটি খসড়া তৈরি করেছেন। যে শাসনযন্ত্র এঁরা গড়তে চাচ্ছেন সে এত জটিল যে, তার কলকাতা সব তোমাকে চিনিয়ে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। এ যন্ত্রের গড়নটা এত জটিল হবার কারণ, তার break-এর আধিক্য। মোটার গাড়ীতে সবে ঢুটি ব্রেক আছে, এক হাত-ব্রেক আর এক পা-ব্রেক। কিন্তু এ যন্ত্রের সর্ববাঞ্জে ব্রেক আছে। মনে রেখো পার্লিমেন্টের অভিপ্রায় হচ্ছে gradual development, স্থুতরাঃ ডিমোক্রাসির গতি এমন্থে যাতে অতি ধীর-লিপিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এ যন্ত্র গড়া হয়েছে। অনেকের মতে, এ যন্ত্রের গতিরোধ করবার যত রকম কায়দা-কানুন বানানো হয়েছে তাতে ওটা চলবেই না। সে যাই হোক এই বিলের সর্টি অনুসারে আমরা যে পুরো Representative Government পাব না, সে বিষয়ে আর অনুমতি সন্দেহ নেই।

গভর্নমেন্ট যখানে পুরোপুরি representative নয়, সেখানে তা যে কি করে' responsible হতে পারে তা বোঝাই কঠিন। অথচ এ মীমাংসা করাই চাই, নচেৎ পার্লিমেন্টের কথার খেলাপ হয়। এ মীমাংসা অন্য কোনও জাত করতে পারত কি না সন্দেহ, ইংরাজ-

রাজমন্ত্রীরা যে পারছেন, তার কারণ ইংরাজের রাজনীতি লঙ্ঘিকের তোয়াকা রাখে না।

অতঃপর মীমাংসাটা দাঢ়িয়েছে এই যে, আধা representative Government-এর সঙ্গে আধা responsible Government জুড়ে দেও—এ দুটি যমজ ভাতার মত এক সঙ্গে বাড়বে এবং কালক্রমে হই যখন সাবালক হবে তখন ভারতবর্ষ Canada প্রভৃতির মত “an integral part of the British Empire” হয়ে উঠবে।

আপাতত কোথায় এবং কতটুকু responsible Government দেবার প্রস্তাৱ হচ্ছে জানো?—বড়লাটের বড় খাসদৰবারে নয়—প্রাদেশিক ছোটলাটদের যত ছোট ছোট খাসদৰবারে। এই ছোটলাট-দের দৰবারে নানাকুপ শাসন-বিভাগ আছে, তাৰই দুটো একটা নিরীহ-বিভাগ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভাৰ দুটি একটি সরকারেৱ মনোনীত সভ্যকে দেওয়া হবে। যে-সব বিভাগেৱ কাজ হচ্ছে রাজ্য-শাসন ও সংরক্ষণ কৱা সে সব বিভাগ নয় কিন্তু যে সব বিভাগেৱ কাজ হচ্ছে দেশেৱ উন্নতি সাধন কৱা সেই সব বিভাগ, যথা—শিক্ষা-বিভাগ, স্বাস্থ্য-বিভাগ ইত্যাদি, অর্থাৎ রাজ্য-চালনাৰ ভাৱে থাকল রাজপুরুষদেৱ হাতে আৱ প্ৰজাৰ উন্নতি কৱিবাৰ ভাৱে পড়ল পড়ল তাদেৱ হাতে। ভাষাস্তুৱে প্ৰজাকে শাসন কৱিবাৰ ক্ষমতা ময়ে গেল তাদেৱই হাতে, এখন তা আছে যাদেৱ হাতে। এবং প্ৰজাকে লালন কৱিবাৰ দায় পড়ল তাদেৱ ঘাড়ে ঘাঁৰা কশ্মিনকালেও কোন রাজকাৰ্য চালান নি। এৱই নাম diarchy.

অতএব দাঢ়াল এই যে, দেশেৱ ঘৰকল্পা চালাবাৰ সেই বন্দোবস্ত কৱা হল যে-বন্দোবস্তে আমাদেৱ পারিবাৰিক ঘৰকল্পা চালান হয়। পারিবাৰিক-গভৰ্ণমেণ্টেৱ যেমন কতক বিভাগ থাকে

আমাদের হাতে আর কতক বিভাগ তোমাদের হাতে, এই নব-শাসন-তন্ত্রেরও তেমনি বড় বিভাগগুলো থাকবে ও নাদের হাতে আর ছোটগুলো আমাদের হাতে।

পৃথিবীতে আর কোথাও যে এ বন্দোবস্ত নেই তার কারণ পৃথিবীর আর কোনও জাতের অবস্থাও আমাদের মত নয়। ভারত-বাসীরা আবহমান কাল দোটানার মধ্যেই পড়ে আছে। এ দেশের যে-যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করো দেখতে পাবে একদিকে রয়েছে রাজভাষা আর একদিকে রয়েছে লোকভাষা, একদিকে রয়েছে পৌরাণ অর্থাৎ রাজবেশ আর একদিকে রয়েছে আটপৌরে কাপড় অর্থাৎ লোকবেশ। আর আমরা ভদ্রলোকেরা—এক সঙ্গে এ দুই-ই অঙ্গীকার করে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করে আসছি; স্বতরাং রাষ্ট্রতন্ত্রে এই diarchy আমাদের দেশেরই উপযুক্ত হয়েছে।

যদি বলো এ ঘরকম্বা চলবে কি রকম? তার উত্তর, সে নির্ভর করবে কাকে রাজন্তু আর কাকে লোকমন্তু করা হয় তার উপর। যদি স্ত্রী পুরুষে মনের মিল থাকে তাহলে চলবে নিখিরখিচে আর তা যদি না থাকে ত দিনরাত খিটিমিটি হবে। এই দু-ইয়ারকি duet ও হতে পারে dud ও হতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে যে, এ বন্দোবস্তে Bureaucracy-র তরফ থেকে এত আপত্তি উঠছে কেন? আপত্তি উঠছে এই ভয়ে যে, প্রজার প্রতিনিধিরা মন্ত্রী-সভায় ছুঁচ হয়ে ঢুকবে আর ফাল হয়ে বেরবে। আর এ পক্ষ যে এই বন্দোবস্ত বজায় রাখবার জন্য এতটা জেদ করছেন, তার কারণ অপর পক্ষের যেটা আশকা এ পক্ষের সেইটেই আশা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সৎ - চিদ---আনন্দ ।

—::—

“আমি আছি !”

—কে শুনাল হেন অধিয় কথা !

আছ তুমি রোমে রোমে,
আছ তুমি ব্যোমে ব্যোমে,
অভয় প্রতিষ্ঠা তব
সর্বকালে সর্বগতা ।

তুমি সৎ—মধুময় এ বারতা ।

“আমি জ্ঞান !”

—কি সুধা সম্বাদ হল রাটনা !

জ্ঞানে কর সুখ স্থষ্টি,
দুঃখে রাখ জ্ঞান দৃষ্টি,
জ্ঞানমনস্তং জ্ঞান
পূর্ব জগত-ঘটনা ।

তুমি চিদ—ধন্য হল এ চেতনা ।

“আমি রস !”

—কি অমৃত-ভাবে ভরিল এ কান !

ওহে প্রেম, হে আনন্দ !
যুচিল সকল দ্বন্দ্ব ।

সর্বং খলু অঙ্গ,
অপ্রিয় প্রিয় সমান ।

তুমি আনন্দ,—নন্দিত এ-পরাণ !

শ্রীমতী সন্মা দেবী চৌধুরাণী ।

ଶାରୀରିକ ପାଦାନ୍ତର

କୁତୁଳୀମ



श्रीकृष्णराम

ଆପନାଦିଗତେ ବାଜେ କରିଲେ କର୍ମର ପୁରୀ ଏହି କଥାତିଲି
ଭାବିରା କେବିତେ ଅଧିକାର କରି ।

মুক্তি—৫% পর্যন্ত—
গোপনীয়—৫% কার্য

লেটাস গু—২৫
ভার্জিনিয়া গু—১০
বোকে গু—৮

ବୋଲକ ଗୀତ

শ্বানুক টেক্টাৰিং পারকিউমাৰ,

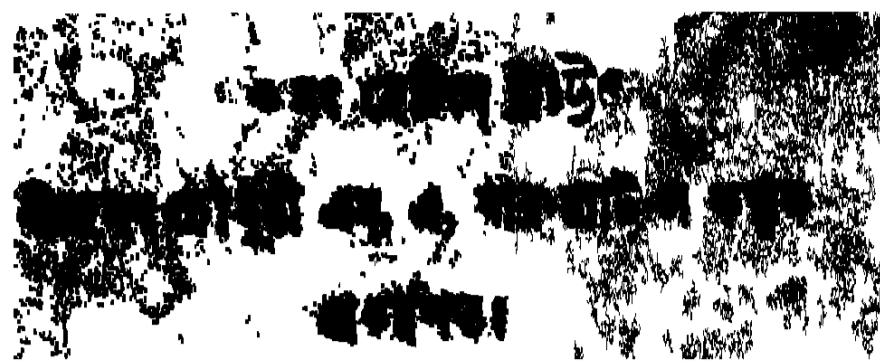
क्रेटिकान—१०८६।

29527

১৯৭৮ শতাব্দীর প্রতিক্রিয়া।

SCOTT & WEAVER B. B.





कलिकाठ।

द्वैरस्त्रो वेचिन विष्टि वार्कन्,

• वृ द्वैरस्त्रो लिटे।

प्रातःस्त्राप्तमाम नाम शार्दा शुक्ल

वर्षित दूष्य तिष्ण वार्कन् वार्कन्।

विष्टि वार्कन् दूष्य वार्कन् वार्कन्।



“সবুজ পত্র” সম্পাদকের নৃত্ব বহি ।



- ১। মান-কথা——ইহাতে প্রথম বাবুর ২১টি প্রবন্ধ, আকা. ডিমাই আটপেজী, ৩৬২ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট আইভরি ফিলিস কাগজে ছাপা—মূল্য দেড়টাকা মাত্র ।
 - ২। “আহতি”——চোট-গল্লের বহি, ইহাতে ছয়টি গল্ল, শুদ্ধশ্ব বাঁধাই, প্রায় ২০০ শত পৃষ্ঠা—মূল্য পাঁচসিকা মাত্র ।
 - ৩। “পদ চারণ”——কবিতা সমষ্টি, উৎকৃষ্ট আইভরি কাগজে ছাপা—মূল্য বার আনা মাত্র ।
-

৪। বারবলের হালখাতা——মূল্য এক টাকা মাত্র ।

(ইহাতে বৌরবলের সমস্ত প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে ।)

৫। চার-ইয়ারী কথা (গল্ল)——মূল্য বার আনা মাত্র ।

৬। সনেট-পঞ্জাশৎ (কবিতা)——মূল্য আট আনা মাত্র ।

প্রাপ্তি স্থান :—ম্যানেজার, “সবুজ পত্র”, ৩ নং হেটিংস্ল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ; রায় এম্. সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স ৩
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ।

সোনার শাখা

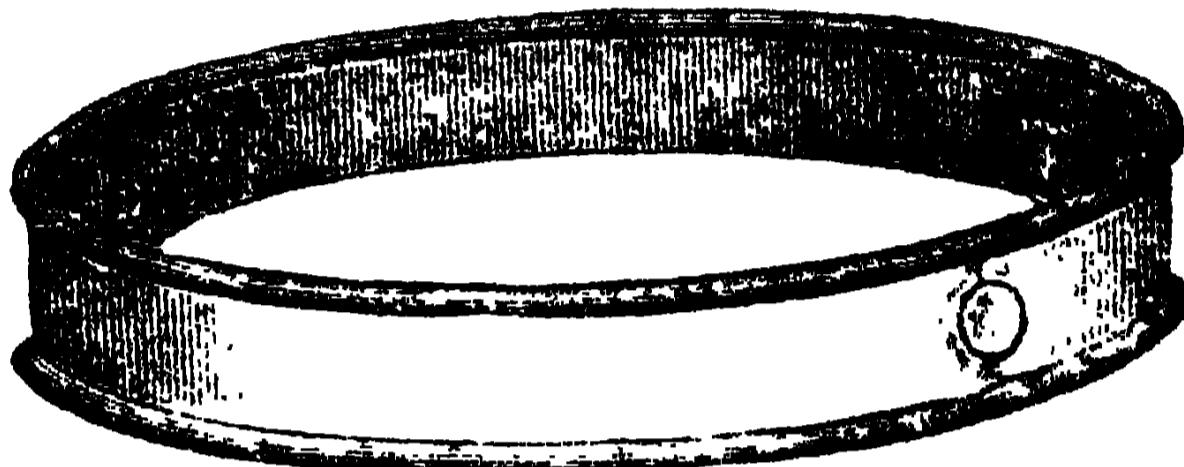
উৎকৃষ্ট হস্তিদণ্ড ও বিশুল্ক তাত্ত্বের উপর

গিনি সোনায় শাখার শাখা ।

কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনী হইতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ।

সোনা ৩০, টাকা ভরি হিসাবে শাখার মূল্য লেখা হইল ;

(সোনার বাজার অনুসারে মূল্য কমবেশী হয়) ।



হস্তিদণ্ডের উপর তামার উপর

চারি আনা সোনায় প্রস্তুত :—	১৪॥০	...	১১॥০
-----------------------------	------	-----	------

ছয় আনা „ „ :—	১৯॥০	...	১৫৬০
--------------------------	------	-----	------

আট আনা „ „ :—	২৪৯	...	২০৯
-------------------------	-----	-----	-----

তিন আনা „ „ (ছোট) ১০॥০	...	৯
----------------------------------	-----	---

ভিঃ পিঃ তে মাণ্ডলাদি ১ জোড়া ॥০ আনা, ৩ জোড়া ৮০ আনা ।

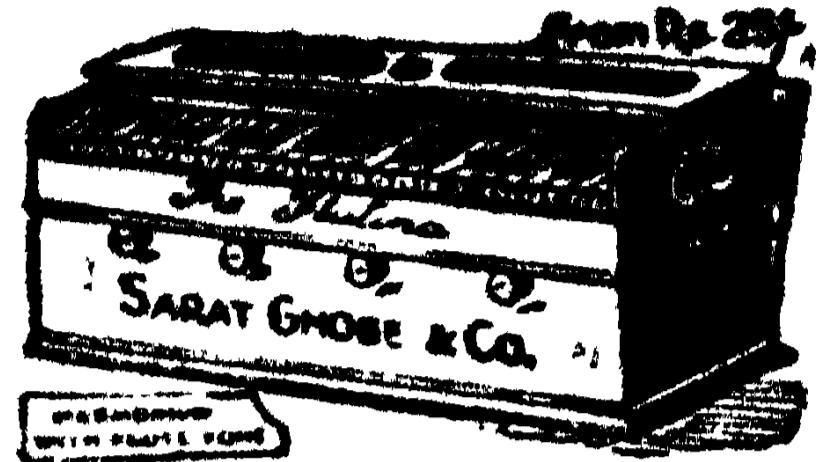
প্রত্যেক শাখার সহিত গ্যারান্টি দেওয়া হয় । ১০ দিবস মধ্যে শাখা বদল করা বা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে, গ্যারান্টি পত্রে তাহা লেখা থাকে । শাখার নমুনা দেখিতে আসিলে যত্ত্বের সহিত দেখান হয় ; মূল্য ডিপজিট রাখিয়া শাখা স্থানান্তরে দেখিবার অন্য লাইন যাইতে পারিবেন । শাখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া অঙ্গার লিবেন । প্রমাণ শাখার ভিতরের মাপ ২ ইঞ্চি আধ স্থূল (৮ স্থূলে ১ ইঞ্চি) । কোন বিষয় জানিবার অন্য পত্র লিখিলে উক্তর দেওয়া হয় ।

ইকনঘিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্ ;

৩৩ নং কর্ণফুলিস্ট্রীট, কলিকাতা—এক খুলনা ।

SARAT GHOSE'S SONORA HARMONIUMS

INDIA'S ACKNOWLEDGED BEST



No. 5—3 Octaves, 2 sets of reeds, 5 stops,
large size, special hollow reeds.

Price Rs. 40.

RECOMMENDED TO BEGINNERS,

আমরা বেহালা, বাঁশী, হারমোনিয়ুম, পিয়ানো প্রভৃতি বিলাতী যন্ত্ৰ
ও সেতাৱ এস্কুল প্রভৃতি বাদশী যন্ত্ৰও বিক্ৰয় কৰি। আমাদেৱ
ষৈক ভাৱতবৰ্ষেৱ মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা বুহু এবং আমাদেৱ জিমিফেৱ
উৎকৰ্ষ সৰ্বজন-বিদিত।

সেতার, এস্রাই, স্কেল, বীণা প্রভৃতি স্বদেশী যন্ত্রের উপযোগী বিলাতি ইস্পাতের tempered music wire আমরা আমদানী করি। একপ সন্তোষজনক তার পূর্বে কখনও আসে নাই।

সঙ্গীত বিষয়ক যে কোন যন্ত্র সরঞ্জাম বা পুস্তক, ফোন ও
রেকর্ড আমাদের নিকট পাইবেন।

“ଆଲିବାବାର” ଗାନେର ସ୍ଵରଲିପିର ଘୂଲ୍ୟ ୧୧୦ ।

SARAT GHOSE & CO.

4, DALHOUSIE SQ. CALCUTTA.

ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥେବ ଗାନ ।

“অন-প্রয়োগ অধিবাসক”, “দেশদেশ নম্বিত”, “অয়ি ভূবন যন”

ଅଭ୍ୟାସ କରିଲିପି ମହ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୫୦ ।



“যেদিন কুটুম্ব কমল কিছুই জানি নাই আমি ছিলেম অন্যমনে !”
—রবীন্দ্রনাথ ।

* * * অনবস্থ গুরুতৈল * * *

“পুষ্পল”—অযুতপুষ্পোথ হীরকদ্রব । ॥

“নবপুষ্পল”—হরকতঙ্গাম পুষ্পমুহু । ॥

* * * বেজল-ব্রেহিকাম * * *

বিলে জঙ্গলে শীকার।*

————— :- —————

কলিকাতা, ৯ই অগস্ট, ১৯১৭।

স্বেহের কল্যাণ,

বর্ষার সময়, বিশেষত ভৱা শ্রাবণে, এক একটা বাদলার দিন আসে, যেদিন আকাশ মেঘে ছাওয়া, অনবরত টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি করছে, কোথাও কোনখানে আলোর দেখা পাওয়া যায় না। এমন দিনে শুচ্ছ সবল মানুষের জীবনও দুর্বল হয়ে উঠে। আজ ঠিক তেমনি একটি দিন এসে দেখা দিয়েছে, চারিদিক ভিজে স্যাত স্যাত করছে—আকাশে মেঘের ভার যে কখন হাঙ্গা হয়ে যাবে, তার কোন শুদ্ধ লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আজ আমার মনে কত দিনের কত পুরাণ স্মৃথের কথা ভিড় করে আসছে। মানুষ কত কি ভুলে যায়, কিন্তু “পুরাণে সে দিনের কথা” ভোলা হয়ে উঠে না ! ছ’বৎসর পরে, আমি বনের মধ্যে বড় বড় বাঘ, ভালুক, হরিণ শীকার করতে নিয়ে গিয়ে তোমায় মৃগয়া-ত্রতে দৌক্ষিত করব, কথা আছে। আমার এই অঙ্গীকার বার বার তুমি আমায় শুরণ করিয়ে দাও। ষথন আমার বস্তস নাবালকের গশী পেরোয় নি, সবে সতের কি’ অঠার, সেই সময়, আমি আমার প্রথম চিতাবাঘ শীকার করি ! “চিতা”

* শীমতী প্রিয়বদ্ধা দেবী কর্তৃক শৈশুক কুমুদনাথ চৌধুরী অণীত “Sport in Jheel and Jungle” মাসিক ইংরাজী শীকার গবেষণা বন্দীশুব্দাম।

বলে মনে কোরনা সেটি ছোট্ট—তার রাঙ্গসপ্রমাণ শরীর। রামায়ণে
চন্দুভি রাঙ্গসের হাড়ের বর্ণনা পড়েছে ত? এই বাঘের চামড়া না
নিয়ে, হাড় যদি নেওয়া হত, তাহলে হয়ত তার পরিমাণ, চন্দুভির
হাড়কেও হার মানত। একরাশ কটাশে রঁয়োয়া, জন্মটি এত কাছে
এসে পড়েছিল যে, অতটা সামিধ্য কথনই নিরাপদ নয়! কিন্তু না
জানা থাকলে, অনেক ভয়নক জিনিসও তয় দেখাতে পারে না।
ভাগো, তাক ঠিক ছিল, এক গুলিতেই ফরসা,—তারপর তার পিছন
পিছন রৌড় দিলাম! আহত বশ্য জন্মকে এমন তাবে তাড়া করে
যাওয়া শীকারের সব আইনের বিরুদ্ধ; বিশেষত এদের চালচলন
সবই ষধন আমার অজ্ঞান। তবে “সব ভাল যার শেষ ভাল”,—অয়ী
আমিই হলাম। আজ এই বিশ্রী বর্ষার দিনে ঘরে বসে বসে সে
দিনের পাগলামির কথা নতুন করে মনে পড়ছে। সে দিনের সেই
অপূর্ব আনন্দ, আজকার সব প্রতিকূলতার মধ্যেও উজ্জ্বল মুর্তিতে
এসে দেখা দিয়েছে—শুধু সে একা আসে নি, অনেক সাথীও সঙ্গে
আনেছে। নিজের শক্তিসামর্থ্যের উপর নির্ভর করে, বড় বড়
জানোয়ার ঘা-কিছু শীকার করেছি, তা পায়ে হেঁটেই করেছি। এতে
বিপদের খুবই সন্তাননা, তবু আমি জোর করে বলতে পারি এই
পছাই সব চেয়ে নিরাপদ। যদি এদের ধৱণ-ধারণ, মেজাজ ও
খেয়াল সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা না থাকে, যদি এদের পিছু পিছু
খুঁজতে ঘাবার, পায়ের দাগ দেখে খুঁজে বার করবার কায়দা কিছু না
জান, কিন্তু কষ্ট স্বীকার করে এ বিষ্ঠা আয়ত্ত না করে থাক, তাহলে
স্ববিধাৰ চেয়ে বিভাট ঘটবারই সন্তাননা বেশী। তবে এ বিষ্ঠা বই
পড়ে পাওয়া যায় না, হাতে-বন্দুকে-বলমে শিখতে হয়। তা যদি

শিখতে পার, আর এ পথে চলবার জন্যে একজন যোগ্য সঙ্গী আর উপদেশ দেবার লোক পাও, তাহলে দেখবে, মুগয়া তোমার ব্যসন না হয়ে আনন্দের উপকরণ হবে, শীকারের খেয়াল বজায় রাখতে গিয়ে ছঃখে পড়বে না। এ বিষয়ে তোমায় অনেক কল-কোশল শিখিয়ে দিতে পারব। চারদিকের সব অবস্থার উপর তৌক্ষ ও সতর্ক দৃষ্টি দেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকলে, চর্চার ফলে সহজে সে শক্তি যে আরো বাড়ে তাতে আর সন্দেহ কি? আজকালকার দিনে ছেলেদের যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে তাদের অনেক বিধিবন্ত শক্তির উৎকর্ম সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অবনতি হয়। এই কথা মনে করেই, সর্বসা ষে-সব জীবজন্ম পাখী দেখতে পাও, তোমার মনে তাদের সম্বন্ধে কোতুহল জাগিয়ে রাখবার জন্যে আমি বিশেষ চেষ্টা করে আসছি। তুমি আর ছোট অলকা, (যদিও তুমি মনে কর এ ক্ষেত্রে মেয়েদের কোন অধিকারই নেই) অনেকবার হাতির উপর চড়ে স্নাইপ (Snipe) শীকার দেখেছ। যখনি ডিঙিখানা বিলের পদ্ম আর শরবনের উপর দিয়ে নিঃশব্দে সরে চলেছে, পাখীটি উড়েছে, আমি মারতে যাচ্ছি, অমনি ছেলেবয়সের অদ্য উৎসাহে চীৎকার করে, হাততালি দিয়ে, সেটিকে উড়িয়ে নিয়েছ! তোমরা এখন জান, স্নাইপ কত অল্প সময়ের জন্যে বাঁচলা দেশে বেড়াতে আসে। তাদের লম্বা স্টোরের পাশে, (চোখের পাশে নয়) কান যেখানটিতে থাকে, সেই সংস্থানের বিশেষ সার্থকতা আছে। কথাটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার পর থেকে, আমার কথা ঠিক কি না, বার বার তার পরাখ করে নিয়েছ। আমি যতদূর জানি বুনো মোরগ হচ্ছে আর একমাত্র পাখী, যার এই বিশেষত্ব আছে। এ তত্ত্ব তোমাদের

এখনও আনতে বাকী আছে। কৃষ্ণপক্ষের চেয়ে চাঁদনী রাত
এদের বেশী পছন্দ। তাই বোধহয় শীগুগিরই পেঁচবে, তোমরা
সহজেই তাদের চিনতে পারবে। তাদের মধ্যে কার ছুঁচের মত লেজ
আর কার পাখার মত লেজ, সে প্রভেদ চিনতে তোমাদের বিশেষ বেগ
পেতে হবে না ! তোমাদের কাঁচা বয়সের ঝকঝকে উজ্জ্বল চোখে,
এ প্রভেদ অনায়াসেই ধরা পড়বে। এবটি প্রবীণ চিত্রকর কিন্তু সে
প্রভেদটি আবিষ্কার করতে পারেন নি। স্বামী স্ত্রীকে এক চেহারা দিয়েছেন,
কিন্তু তাও কি কথনো হয় ? আর এক কথা, এই পাথীর বরক'নের
মধ্যে এমনি ভাব যে, একেবারে মাণিক-জোড়। পুরুষ ধরা পড়লে
মেঘেটিও ধরা দেয় ; কাজেই আমি যখন শীকারে যাব, তখন তোমরা
দুই ভাই বোনে দুটি পেতে পারবে। এদের সংখ্যা বেশী নয়, আর
আমার বংশবৃক্ষের অনুপাতে, তাদের নস্বর ঠিক রেখে গ্রেপ্তার করে
আনবার সাধ্য হচ্ছে না। তাই এবারে প্রথম যেটি ধরা পড়বে, সেটি
আমাদের বাড়ীর ছোট-লাটসাহেব ওরফে কালীবাবুকে নজর দিতে
হবে, তা নাহলে তিনি নিশ্চয়ই মানহানির দাবীতে মহারাজীর দরবারে
নালিশ রুজ্জু করবেন, তখন আমার অবস্থা যে কি হবে, তা তোমরা
বেশ আন্দাজ করতে পারছ ।

স্নাইপ, আর স্নাইপ শীকারের কথা এখন বেশী বলব না। আমা-
দের হরিপুরের পৈতৃক বাড়ীর আঙিনা হতে, অনেক সন্ধায় তোমরা
চিাবাঘের করাত-চলার মত আওয়াজ শুনেছ—আর যতদিন না
আমার গুলি লেগে সে মরেছে, ততদিন আর সে শব্দের বিরাম হয়
নি। তোমরা হয়ত দেখেছ, আমি যখন শীকার করতে যাই, তখন
আমার বসবার টুলের সম্মুখে পাতায় ভরা ডালপালা দিয়ে একটা

আড়াল করে নিই। সে আড়ালটা যথেষ্ট ঘন কিন্তু মজবুত নয়, তবু নিজেকে লুকিয়ে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। তোমার মোহনলাল হাতিতে চড়ে বাঘের যাওয়া-আসার গলিপথ আবিকার করে ফিরবার আগেই কতবার হয়ত বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে, তারপর তাড়াতাড়ি সেখানে পৌছে দেখেছ মন্ত্র একটা চিতাবাষ ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে—গুলি একেবারে তার গলার নলি ঝুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। আমাকে শীকার করাই ছিল তার মতলব, কিন্তু কপালে লেখা ছিল অস্ত কথা, তাই তার মনের সাধ পোরবার আগেই সে লুটিয়ে পড়ল, আর যম-রাজা তার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। জানিত যমের বাহন মহিষ, জীয়ন্ত থাকলে ব্যাঘবীর মহিষটার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পিছ-পা হত না বোধ হয়। যাই হোক তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের মত লক্ষ্য-বেধ করবার শক্তি আমার ছিল, তাই যমরাজার স্ববিধা হয়ে গেল, তা নাহলে বাহনটি মারা গেলে উদ্ভূতের চলাফেরার মুক্তি হ'ত !

হরিপুরের চারদিকেই বুনো-শূয়োরের বসতি, পাবনার বুনো-শূয়োর তার বিপুল বপুর জন্মে বিশ্যাত। চতুর চিতা এদের লোভে লোভে চারিদিকে ফেরে, আর স্ববিধা পেলেই অসহায় বরাহশিশুদের হত্যা করে উদ্বর পূরিয়ে দিব্য হস্তপুষ্ট হয়ে উঠে। বনের ভিতরে যে সব গলিপথ দিয়ে জানোয়ার আনাগোনা করে, তাদের ঝুঁজে পাওয়া শক্ত নয় ; তাড়া খেয়ে কোথায় গিয়ে তারা আশ্রয় নেবে, সেটাও অনুমান করা সহজ। আমি তোমাকে এ বিষয়ে আজ যা বলে দেব, তাতে কাল তোমার জ্ঞানলাভের স্বয়েগ হতে পারে। আর তার প্রসাদে পায়ে হেঁটে নির্বিঘ্রে তুমি বেশ শীকার করতে

পাৱেন আমৱা যে শুনতে পাই, শীকাৱ কৱতে গিয়ে অনুক লোকটা হঠাৎ মাৱা গিয়েছে, কিন্তু ঘায়েল হয়েছে, এ সব অনৰ্থ কিন্তু অকাৱণে ঘটে না, দৈবাং তো নয়ই ! মূলে থাকে অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা কিন্তু দুঃসাহসিকতা,—চল্লতি কথায় যাকে বলে বোকামি আৱ গোপ্তাৱতমি !

মৃগয়া শুধু খেলা নয়, এৱ মধ্যে বিপদও অনেক, তাই সাহস আৱ
বুঝি দু'য়েৱি বিশেষ দৱকাৱ। তা না হলে, এ খেলায় কোন আমোদই
থাকত না !

“No game was ever yet worth a rap
For a rational man to play,
Into which no accident, no mishap
Could possibly find its way.”

আমি তোমাকে এখন যে সব চিঠি লিখছি, তা হতে তুমি প্ৰথম
যেদিন বন্দুক হাতে শীকাৱক্ষেত্ৰে নামবে, সেদিন অনেক দৱকাৱী
জিনিস তোমাৰ জানা থাকবে, অনুত্ত থাকা উচিত। আৱ তুমি যদি
পাকা ছসিয়াৱ শীকাৱী হতে না পাৱ, তাৱ অন্তে আমি দায়ী হব না।
শুধু পশুপাদীৰ প্ৰাণহানি কৱবাৱ ক্ষমতা দক্ষ শীকাৱীৰ পৱিত্ৰ
নয়। ইংৰাজীতে যাকে gentleman বলে, তাৱ ঠিক প্ৰতিশক্তি
আমাদেৱ বাঙলা ভাষায় খুঁজে পাওয়া সহজ নয়, তবু কথায় না বলতে
পাৱলেও ভাবতি যে কি তা আমৱা সবাই বুঝি। আমাৱ মতে বে
লোক জীবনেৱ সব ব্যাপাৱেই যথাৰ্থ gentleman, সেই ঠিক চৌকোৰ
শীকাৱী (sportsman). জীবনটা ত সহজ ব্যাপাৱ নহু, বিশেষ

করে আমাদের ভারতবাসীদের জীবনের আশেপাশে চারিদিকেই কত বাধাবিপত্তি। শীকার করতে গিয়েও দেখবে সেখানে কত ঈর্ষা বিহুষ, কত ক্ষুদ্রতা, কত দলাদলি, সহজ ভদ্রতাবিরোধী কত হীন ব্যবহার, এক কথামূল বলতে গেলে কত অভদ্রতা বিরাজ করছে।

তোমার বয়সী ছেলেদের মধ্যে, বোধহস্ত তোমার মত মহাভারতের কথা আর কেউ অত ভাল করে আনে না, তাই তুমি জীবনে কি ভাবে চলতে পারবে, সে বিষয় আমার মনে বিশেষ কোন বিধাই নেই। ইংরাজীতে একটি কথা আছে, তাৰ অর্থ তোমার মনে ভাল করে বসিয়ে দিতে চাই,—সেহচ্ছে “you must play the game”—অর্থাৎ খেলার নিয়ম মেনে খেলা চাই। চেনা ভাঙ্গণের যেমন পৈতার দরকার হয় না, তেমনি ভাল খেলওয়াড়, হাতিয়ারের পরোয়া রাখে না। সব হাতিয়ারই তাৰ হাতে চলে ভাল। এই যে জৰ্ম্মান-ইংরাজে যুদ্ধ হচ্ছে, এতে খুব ভালো করেই প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ভালো sportsman-ৱাই সব চেষ্টে ভাল যোগ্য। যুক্তক্ষেত্ৰে তাৱা যে বৌদ্ধ সাহস আৱ উপস্থিত বুদ্ধিৰ পৱিচয় দিয়েছে, তাৰ অনেক গুণই তাৱা মৃগয়া-ক্ষেত্ৰে অঙ্গুল কৱেছিল। এই বিপুল সমৱাভিনয়েৱ নান্দী মৃগয়াতেই হয়েছিল। ফুটবলেৱ ছড়োছড়িতেও তুমি খুব মজবুত, তা আমি দেখেছি, ক্রিকেট খেলাতেও বেশ সতৰ্ক। এই দুই খেলাতেই লক্ষ্য ঠিক ব্লাথবাৰ ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা, কোশল ও কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ে, শৱীৰ সবল, অশ্বি মজ্জা পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে। পুৰুষেৱ যা পৌৰুষ, তাৱি সুচনা হয়। ইংৰাজীৰ বাচ্চাৰ মধ্যে, এই যে খেলাৰ উৎসাহ, আগ্ৰহ আৱ একাগ্রতা আছে, ইহাই পৱে তাকে জীবনেৰ ঝড়োপটায় তৱিয়ে দেয়, আৱ যুক্তেৱ এই সঙ্গীন বিপদ্ধেৱ মধ্যেও খাড়া রেখেছে।

এই বৈশুণ্য, সাবধানতা, ব্যায়ামচর্চার ফলে দৈহিক উৎকর্ষ, আজকার সংগ্রামের প্রাণস্তুতি পৱীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় আৱ কুলেৱ ছাত্ৰদেৱ যে কৃত বড় আৱ কেমন অটল সহায় হয়েছে, তা আৱ আমি তোমায় কি বলব ? বৃহত্তর জীবনসংগ্রামেও এই সুকৃতিৰ ফলে, তাদেৱ অয় অবস্থ-স্থাবী। এই জন্মেই আমি তোমাকে আৱ তোমাৱ ছোট ভাইটিকে বোৰাতে চাই যে, রাজাৱ আৱ স্বদেশেৱ সম্মানৱক্ষাৱ জন্মে যদি যুক্ত কৱতে চাও, তাহলে সে যহং কৰ্তব্যেৱ আৱস্তু কৱতে হবে এই খেলাৱ আখড়াৱ, শৈশবেৱ এই খেলাঘৰে। একদিন আমাৱ জীবনেও এই আকাঙ্গা আগ্রাত ছিল ; বৎসৱেৱ পৱ বৎসৱ চলে গেল, কামনা আৱ কৰ্ম্ম পৱিণ্ড হল না। এখন সে স্বপ্ন আৱ আমাৱ আশাৱ রাজো নেই, ক্রমশ সুকৃতিৰ মধ্যে মিলিয়ে আসছে। তবে তোমৱা আমাৱ জীবনে এসেছ, তাই আশা আবাৱ দেখা দিয়েছে, আমাকে দিয়ে যা হয়নি, তোমৱা তা কৱবে। যতক্ষণ না অমুভব কৱ যে তোমাৰি দক্ষিণ হস্তেৱ দৃঢ়তাৱ উপৱ দেশেৱ কল্যাণ নিৰ্ভৱ কৱছে, যতক্ষণ না তুমি জাতিবৰ্ণনিৰ্বিশেষে এই বিশাল রাজ্যেৱ অস্তাৰ্থ্য প্ৰজাদেৱ সঙ্গে পাশাপাশি ও সমকক্ষ হয়ে দাঢ়াতে পাৱ, ততক্ষণ যথাৰ্থ স্বদেশভক্তি তোমাৱ মনে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৱবে না। তোমাদেৱ এই শক্তিতে প্ৰাণবান আৱ এই যোগ্যতাৱ অধিকাৰী হ'তে দেখাই এখন আমাৱ জীবনেৱ পৱম আকাঙ্গা, তাই আমি চাই, সংসাৱেৱ এই বুজ্জুমিতে সব রকমে তোমৱা হৃসিয়াৱ খেলোয়াড় আৱ মজবুত পালোয়ান হবে।

এ চিঠি শেষ কৱবাৱ আগে, তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। বহুকুৱা তাৱ প্ৰকৃতিৰ ষে সুন্দৱ বইধানি আমাদেৱ চোখেৱ সুমুখে

দিনরাত খুলে রেখে দিয়েছেন, এর চেয়ে ভালো পড়বার বই আর পুঁজে পাওয়া যায় না, পড়ে শেষও করা যায় না। রোজই নতুন কথা লিখছেন, একঘেঁষে হয় না বলেই বুঝি এমন ভাল লাগে। বৈজ্ঞানিক তাঁর ঘরের কোণে ঘূপ্সি হয়ে বসে আপন খেয়ালমত চলেন,—অনেক সময় ভুল করে' চশমাটা যে চোখে পরবার নয়, তাতেই লাগান, তাই যা সত্যি, তা তাঁর সম্মুখে ভিন্ন মুর্তিতে দেখা দেয়, তিনি যা হওয়া উচিত মনে করেন তাঁর উল্টো কিছু দেখলে তাঁর মন বিস্রূত হয়ে ওঠে। কিন্তু মাঠে বনে ঝঁরা প্রকৃতির তত্ত্ব নিয়ে ফেরেন, তাঁরাই ঠিক খবরটি পান। সত্ত্বক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখো, আর যা দেখলে তা মনে রেখো। যে সব অস্ত্র শীকার করা হয়, শুধু তাদের রৌত-চরিত নয়, সব অস্ত্রের অভ্যাস ব্যবহার তাঁরী আশ্চর্য। পাখীদের সম্বন্ধে একই কথা থাটে।—যখন শীকারের খবর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, বসে বসে দিন আর কাটে না, তখন যদি চারদিকের অপরাপর অস্ত্রের চলাফেরা লক্ষ্য করবার অভ্যাস তোমার থাকে, তাহলে ধিয়েটার দেখতে দেখতে মানুষের যেমন সময়ের জ্ঞান থাকে না, তেমনি তোমারও দিন যে কোথা দিয়ে চলে গেল তা বুঝতেও পারবে না।

কৃষিকাজ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বনজঙ্গল যত কাটা পড়ে যাচ্ছে, শীকারও তেমনি অল্প হয়ে আসছে। যে সব স্ববিধা আমরা পেয়েছি, সে সুযোগ তোমরা খুব সন্তুষ্ট পাবে না। ধাল বিল শুকিয়ে আসছে—নদীর ধারার সে প্রবল শ্রেণি আর নেই; এর প্রধান কারণ দেশের বড় বড় বন কাটা পড়ে মাঠে পরিণত হয়েছে। এ বিষয় বেশী জোর করে কিছু বলবার অধিকার আমার নেই, তবে শীকার

বে কমে আসছে, সেটা এমন প্রত্যক্ষ সত্য যে, তাও অস্বীকার করবার যো নেই। যে সব দেশে আগে বুনো-মোষ আৱ হৱিণ দলে দলে চৰে বেড়াত, এখন আৱ তাদেৱ সেখানে দেখা যায় না, তাৱা অন্তৰ চলে গেছে, তাদেৱ খুঁজে খুঁজে বাঘ ভালুকও দেশান্তরী হয়েছে। সেই অন্তে তোমাকেও হয়ত অনেক দূৰ দেশে যাত্রা কৱতে হলে, তবে যাত্রা যে নিষ্কল হবে এমন কথা বলা যায় না। যা' চাও তা' পাৰার অন্তে বহু ধৈৰ্যেৱ আবশ্যক। জীবজন্মৰ জীবনচৰিত সম্বন্ধে একটু জ্ঞান সঞ্চয় কৱে নিৰ্মো। খাল, বিল, নদী, নালা, মাঠ, বন, পাহাড় পৰ্বত মানুষেৱ মন ভোলাৰ অনেক ফন্দী জানে, এত আনন্দ দিতে পাৱে যা জীবনেও ফুৰোয় না। একটা উদাহৰণ দিলেই বুঝবে : এই যে পশু পাথাৱ গায়েৱ রং, এ যে কেন এমন, এ রহস্য ভেদ কৱবার আগে অনেক বুদ্ধি থৰচ কৱতে হয়, অনেকখানি ধৈৰ্যেৱ আবশ্যক। শুনতে পাই সূর্যোৱ আলো বনেৱ রাশি রাশি পাতাৱ মধ্যে দিয়ে গোল হয়ে আসে, আৱ বেখানে গাছপালা ছাড়া ছাড়া, পাতাৱ মধ্যে অনেক খানি কৱে ফাঁক সেখানে লম্বা হয়ে পড়ে। এই অন্তে চিতাৱ গায়ে গুল বসান, আৱ বাঘেৱ গায়ে ডোৱা কাটা। একজন থাকেন গভীৰ বনে, আৱ একজন বনেৱ ধাৰে ; এমনি পোষাক পৱেন বলেই অলঙ্কাৰ শীকাৱেৱ উপৱ গিয়ে পড়তে পাৱেন। তণজীবি জন্মদেৱ গায়েৱ রং তাদেৱ বাসন্তানেৱ সঙ্গে এমনি মিশ খায় এবং পৰ্দাৱ মত আড়াল কৱে ঢেকে রাখে যে, শক্তিৰ চোখ সহসা সেখানে গিয়ে পৌছতে পাৱে না। কিন্তু এটা কি একেবাৱে বাঁধা নিয়ম, এৱ আৱ নড়চড় হয় না ?—হয় বৈকি, বহুশক্তিবেষ্টিত একই জায়গায় হয়ত ঝলমলে পোষাকপৱা অনেক পশুপাদী দেখা যায়—যাদেৱ রং দূৰ হতেই

চোখে পড়ে। ঝাতুপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে পশুপাখীর গায়ের স্বাভাবিক
রং আবার বদলাতেও দেখা যায়। যে দেশে শক্রর সংখ্যা কম,
সেখানে তাদের সঁজপোষাকের জাঁক-জমক বেড়ে ওঠে। যেমন
আজকাল যুক্তের দিনে খাকি পরা হয়েছে, শান্তির দিনে সেপাইরা
রক্তের মত রাঙা পোষাক পরে' বেড়াত। দেশভেদে আর বিয়ের
মতলবেও পশুপাখীরা রং বদলায়। যেমন বুড়ো-বুর গৌপে চুলে
কলপ দিয়ে কাঁচা ছেলে সেজে মন ভোলাতে চায়, তেমনি আর কি !
আমি তোমাকে গোড়ার কথা দু'একটা বলে দিতে পারি, কিন্তু এগোতে
হলে সাবধান হয়ে দেখতে হবে, সতর্ক হয়ে বিচার করা চাই, তবে ত
প্রকৃতির গুচ্ছ রহস্য ভেদ করতে পারবে।

(২)

কলিকাতা, ১২ই অগস্ট, ১৯১৭।

স্বেহের অলকা,

প্রথম চিঠিখানিতে উকি দিয়েই বুঝেছি সেখানি তোমার ভাই
কল্যাণকে লেখা হয়েছে, এই দেখেই তোমার পুটপুটে রাঙা টোট
দু'খানি একটু ফুলে উঠল, তার অর্থ—এ চিঠি ত দু'জনকেই লেখা
যেতে পারত। কল্যাণকে আরণ্যবিদ্যা শেখান আৱ তোমাকে আমাৰ
শীকাৱেৰ গল্ল শোনান, এক ঢিলে দুই পাথীই শীকাৱ কৱা চলত।
কয়েক বৎসৰ পৱেই তোমাকে আমাদেৱ হিন্দুজীবনেৰ যোগ্য গৃহ-
লক্ষ্মীৰ কাজ কৱতে হবে। এ সাধ তোমার মনে হয়ত একটু আধটু
আছে, আৱ তা ছাড়া, আমাদেৱ প্ৰাচীন কাৰ্য-সাহিত্যেৰ সাহায্যে
এই সহজ সৱল ইচ্ছাটি বিহৃত না হয়ে পৱিপূৰ্ণ হয়েছে। আজ-
কালকাৱ দিনে পাশ্চাত্য সভ্যতাৰ প্ৰভাৱ এড়ান বড় সহজ কথা নয়,
কিন্তু স্বদূৰ ইউৱোপে তোমার বিদেশিনী বোনেদেৱ জীবন যে বড়
সুখে কাটে তা নয়, বৱং অনেকেৱি জীবন বৃথা কাঞ্জে ব্যৰ্থ হয়ে যায়।
অনেককেই আৰাৰ নতুন কৱে শেখাতে হয় যে, শ্ৰী হঁয়ো, ছেলেৱ
মা হওয়াই সচৱাচৱ নামীজীবনেৰ শ্ৰেষ্ঠ সুখ আৱ পূৰ্ণতা। আগে
যে-পথে শুধু পুৰুষৱাই যাত্রা কৱতেন, এখন কালেৱ গতিকে সেখান-
কাৱ মেয়েদেৱ জন্মেও সেই পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। যে ভাবে,
যে স্বনিপুণ দক্ষতাৱ সঙ্গে তাঁৱা এই নতুন পথেৱ যাত্ৰী হয়েছেন,
বিপদেৱ মুখে তাঁৱা যে নিষ্কিততা অৰ্থচ নামী-স্বলভ সৌকুমাৰ্য্য

ও সহস্যভাব পরিচয় দিয়েছেন, তা দেখে অশ্রদ্ধ্য না হয়ে, তাঁদের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। কিন্তু তবুও সমস্ত কর্তব্য পালন করে' শুধী হলেও, স্ত্রীলোকের সবথানি মন যে এতে ভরে না, সে কথা অস্বীকার করা ঠিক নয়। পুরুষের যদি জীবনসঙ্গীর আবশ্যক থাকে, স্ত্রীলোকের আবশ্যক যে তাঁর চেয়েও অধিক, তাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের দেশে পরিবারই সমাজের অঙ্গ, সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তি এককই সমাজের অংশ। আমাদের দেশে ইতিহাসের শুদ্ধুর অতীত আবার এতই শুদ্ধুর যে, তাঁর অনেকথানি আমাদের চোখে ঝাপ্সা হয়ে এসেছে। এই শিক্ষাই আমরা পেয়েছি যে, পরিবারই সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, তাঁর দ্রুব পদ। স্ত্রীলোকেরা শুধু যে এই সভ্যতা গড়ে তুলেছেন তা নয়, তাঁদেরি যত্নে, তাঁদেরি প্রভাবে, আমরা কখনো বর্বরতার ক্ষেত্রে পা বাঢ়াতে পারি নি। গৃহস্থানিকে শুন্দর পরিপাটি পরিছেন রাখা, জীবনের আদর্শ উন্নত পরিত্র রাখা, গৃহ বলতে যে আনন্দধার্ম আমাদের চোখের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাকে চিরস্থায়ী করা,— এই কর্তব্যই স্ত্রীলোকের বিশেষ কর্তব্য; এর কাছে বিদেশী অঙ্গুকরণে “ফ্যাশানেবল” (fashionable) রূপণীর জীবন কত তুচ্ছ, কি পর্যাপ্ত শ্রীহীন, একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে। এই নতুন জীবনের স্বোত্ত ক্ষীণ-ধারায় এ দেশেও এসে পৌঁছেছে— তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না সত্যি, তবু সাবধান করে দেওয়ায় দোষ কি? কেননা অনেক পরিবারেই বিদেশী আবহাওয়া দেখা দিয়েছে, অনেকে বিনা বিচারে এই স্বোত্তে গা ঢেলে দিচ্ছেন। আসল কথায় ফেরা ভাল;— এখন হতে সব চিঠ্ঠি তোমার আর কল্যাণের ছ’জনের নামেই লেখা হবে। তুমি শীকারের জীবনের

আনন্দ ও বিপদ ছই-ই বোৰ, কেন যে তোমাকে তাৱ মধ্যে নিয়ে
ষাণ্যা সন্তুষ্ট নয়, তা তোমাকে বলবাৰ বেশী দৱকাৰ নেই। তোমাৰ
সব চেয়ে অচুৱাঙ্গ বৃক্ষ ভজ্জটিও এ দুঃসাহসেৱ কাজে অগ্ৰসৱ হৰাৱ
সম্ভতি দেবেন না। যে দিন আলোয় আকাশ উজ্জ্বল, বাগানে কত
ৱং-এৱি ফুলেৱ বাহাৱ, নীল আকাশেৱ গায়ে কত টিয়ে চন্দনা ঝাঁকে
ঝাঁকে উড়ে যায়, ছোট ছোট ছেলে মেয়েৱা আমাৰ শীকাৰেৱ গল্ল
শুনবাৰ জন্মে ভিড় কৱে দাঁড়ায়, তখন সে গল্ল কৱতে আমাৰ মনে
যে গোৱব অনুভব কৱি, তা আৱ কাৰো কাছে হয়ত ছেলেমানষি বলে
বোধ হতে পাৱে—তা হ'ক। সেই পুৰাণ গল্লই আমি আজ আবাৰ
তোমাদেৱ নতুন কৱে বলছি।

(ক্রমণ)

আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবনসমস্তা।*

— - : ০ : —

এ স্কুলের কর্তৃপক্ষদের অচুরোধে আজি এ ক্ষেত্রে যে বিষয়ের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি—সে বিষয়ের আমি ব্যাবসায়ী নই। ছেলে-পড়ানো এবং স্কুল-চালানো সম্বন্ধে আমার কোনরূপ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। প্রথমত আমি কখনও স্কুলমাস্টারি করি নি; তার পর আমি নিজে নিঃসন্তান, স্বতরাং ঘরেও কোন ছেলের শিক্ষার ভার আমাকে নিজের হাতে নিতে হয় নি; এবং অবস্থার ক্ষণে পরের ছেলেরও প্রাইভেট-টিউটরি আমাকে কশ্মিনকালে করতে হয় নি। এ সব কারণে যদি কেউ বলেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কথা কওয়া সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চা, তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, অনেক সময়ে দর্শকের চোখে অনেক জিনিস ধরা পড়ে, যা যাঁরা কোনও বিশেষ কর্মে একান্ত ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়। এ সত্ত্বেও পরিচয় দাবা খেলায় নিত্যই পাওয়া যায়। পাকা খেলোয়াড়েরাও আনাড়ির উপরচাল অনেক সময়ে গ্রাহ করেন। আমি শিক্ষা বিষয়ে পরের ছেলের উপর কখনো কোনও experiment করি নি—কিন্তু বহুকাল থেকে মনোযোগ সহকারে

* বালিগঞ্জ জগদ্বক্ষ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত আলোচনা সমিতির প্রথম অধিবেশনে পঢ়িত।

সে experiment-এর পক্ষতি এবং ফলাফল observe করে আসছি। সেই নির্লিপ্ত observation-এর ফলে আমার মনে শিক্ষার প্রকরণ-পক্ষতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিং অভিজ্ঞতা জমেছে বলে আমার বিশ্বাস, এবং কতকটা সেই বিশ্বাসের বলে এ সভায় মুখ খুলতে সাহসী হয়েছি।

এ সাহসের অন্ত কারণও আছে। আমি একটি বিশেষ ছাত্রকে খুব ভালুকমই জানি, এবং সে ছাত্র হচ্ছেন স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী। আমি বহুকাল পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছি, কিন্তু অস্ত্রাবধি বিদ্যার্থীই রয়ে গিয়েছি। এই বিদ্যার্থীটির শিক্ষার ভার আমি পর্যবেক্ষণাতেই অনেকপরিমাণে নিজের হাতে নিই,—তার পর থেকে যিনি ছাত্র তিনিই তার শুরু হয়েছেন। এ সূত্রেও শুরুগিরিম সার্থকতা ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে আমার কতকটা জ্ঞানলাভ হয়েছে। তাই বলে অবশ্য এ ভুল আমি কখনও করে বসি নিয়ে, শিক্ষার যে পক্ষতি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উপযোগী, সেই পক্ষতি সকলের পক্ষে সমান উপযোগী। জ্ঞানের ক্ষুধাও সকলের মনে সমান নয়, তারপর এ বিষয়ে মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন, অধীত-বিদ্যা জীর্ণ করবার শক্তি ও ক্ষমতাশৈলি,—সেই জ্ঞান আমার ছিল বলে, আমি ইউরোপের নব-শিক্ষাশাস্ত্রেরও কিঞ্চিং চর্চা করেছি।

(২)

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্বন্ধে সকল দেশেই পণ্ডিতে পণ্ডিতে মানাঙ্গপ মতভেদ আছে। মানুষের মন নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে

সকলের পক্ষে একমত হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব ; তা সত্ত্বেও ইউ-রোপ ও আমেরিকার বহু শিক্ষাচার্য ও দার্শনিকদের বছদিনের সমবেত চেষ্টায় শিক্ষার্থু একটি Science এবং Art ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে । এ শাস্ত্রকে Science নামে অভিহিত করা নিয়ন্ত্র অসম্ভব নয় । কেননা ছেলেদের মন ও দেহ সম্বন্ধে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী এমন কতকগুলি সূত্য আবিষ্কার করেছেন যা, দেশকালনির্বিচারে বালকমাত্রেই সম্বন্ধে সমান সূত্য । এবং এই সত্ত্বেও উপরেই শিক্ষার নব-পঙ্কতি গড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে । শিক্ষার এই নব আর্টের সাৰ্থকতা হচ্ছে এই যে, এ আর্টের জ্ঞান ধীকলে শিক্ষকেরা ভুল পথে যান না । অর্থাৎ তাঁরা এর সাহায্যে ছেলেদের সুশিক্ষা দিতে পারুন আৱ নাই পারুন—কুশিক্ষা দেন না । এও একটা কম লাভের কথা নয় । শুচিকিংসার গুণে রোগী রক্ষা পাক আৱ না পাক, কুচিকিংসার ফলে সে বেচারা মারা যায় । এই শিক্ষা-শাস্ত্রের চৰ্চা কৱলে স্কুলমাষ্টারেৱা আৱ হাতুড়ে থাকেন না ।

আমি আজকের সভায় এই Science এবং আর্টের আংশিক পরিচয় দেব প্রিয় কৱেছিলুম ;—এই মনে কৱে যে, সে পরিচয় দিতে গিয়ে আমি বিপদে পড়ব না, অর্থাৎ বিবাদের সৃষ্টি কৱব না । ইংৱাজি ও ফ্ৰাসী গ্রন্থ থেকে শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্ৰহ কৱেছি, সে তথ্য বাঙ্গলা কৱে আপনাদেৱ কাছে নিবেদন কৱলে, আমি প্ৰথমত আত্মত প্ৰকাশেৱ দোষে দোষী হতুম না, দ্বিতীয়ত Professor Janies, Professor Findlay, Professor Dewey, Alfred Fouille প্ৰভৃতি বড় বড় মণীষীদেৱ বাক্যাবলীতে আমাৱ প্ৰবন্ধ অলঙ্কৃত কৱতে পাৱতুম ; তাতে আমাৱ প্ৰবন্ধেৱ যে গৌৱৰ বৃক্ষি হত, সে বিষয়ে আৱ সন্দেহ নেই ।

সে যাই হোক, যে-কোন বিষয়েরই হোক না কেন, বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রধান গুণ হচ্ছে এই যে, সে আলোচনার আমাদের রাগবেষ প্রকাশ করবার তেমন সুযোগ পাওয়া যায় না, এবং তার ফলে শ্রোতাদের অন্তরেও ভাদৃশ রাগবেষ আমরা উদ্বেক করি নে। আর ধর্ম এবং পলিটিক্সের মত, শিক্ষাও যে এ যুগে মানুষে মানুষে একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার হয়ে উঠেছে, ইউরোপের আজ একশ বৎসরের ইতিহাস পাতায় পাতায় এই অপ্রিয় সঙ্গের পরিচয় দেয়। বিশেষত শিক্ষার সমস্তা যখন হয় ধর্ম নয় পলিটিক্সের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, তখন সেই সমস্তা নিয়ে লোক-সমাজকে যে কি পরিমাণ উদ্বেজিত করা যায়, তার প্রমাণ এই যে, বর্তমান যুগে ফ্রান্স জর্স্যানো বেলজিয়াম ইতালি প্রভৃতি দেশে, মধো মধো গুলিগোলার সাহায্যে সে সমস্তার আশু মীমাংসা করা হয়েছে। আর এ কথা আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, জাতীয় শিক্ষা জিনিষটে অতি সহজেই ধর্ম পলিটিক্স ইকনমিক্স প্রভৃতি জাতীয় আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক সমস্তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এর অল্পজ্যান্ত প্রমাণ আমাদের দেশেও স্বদেশী আন্দোলনের সময় পাওয়া গেছে। তখন পর্লিটিক্সকে মুখ্য করেই আমরা শিক্ষা-সমস্তার একটা নৃতন মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছিলুম। তার ফল কি দাঙিয়েছে, তা আপনারা সকলেই জানেন। আমরা গড়তে চেয়েছিলুম একটি নব-নালন্ড— আমাদের হাতে কিন্তু সেটি হয়ে উঠেছে একটি workshop, এ ব্যর্থতার কারণ কি?— এর কারণ, আমরা শিক্ষাকে একটি বিশেষ পলিটিক্যাল উদ্দেশ্যসাধনের উপায়-স্বরূপ গণ্য করায়, যথার্থ শিক্ষার কোনও স্বীক্ষ্যবস্থা করতে পারি নি। উক্তজনার মুখে কোনও কাজ করতে গেলে আমাদের পক্ষে লক্ষ্যাত্মক

হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়, বিশেষত সেই সকল ব্যাপারে, যে ব্যাপারে সাফল্য লাভ করতে হলে কিঞ্চিৎ প্রিরুক্তি ও দুরদৃষ্টির সহায়তা দরকার। বলা বাহ্যিক লোকিক আন্দোলনের প্রসাদে লোকের দৃষ্টি একমাত্র বর্তমানের উপরেই আবক্ষ থাকে, এবং সে অবস্থায় লোকের অন্তরে হৃদয়াবেগ, বিচারবৃক্ষের স্থান অধিকার করে।

(৩)

এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার উদ্দেশ্য এই যে, যে-তর্ক আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলুম—আপনাদের সেক্রেটারি মহাশয় আমাকে পরোক্ষভাবে সেই তর্কে যোগদান করতেই আন্দোলন করেছেন। আজকাল আমাদের বিশ্বিদ্যালয়ের কৃতকার্য্যতা নিয়ে দেশে একটা মহা আন্দোলন চলেছে। ফলে একটা দলাদলি দৃষ্টি হবারও উপক্রম হয়েছে। এ আন্দোলনে লিপ্ত হতে হলে, এর এক পক্ষ নয় আর এক পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, নচেৎ কোন পক্ষই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না, ত'পক্ষই সমান নারাজ হবেন। তার ফলে কোন পক্ষই আমার কথার কিছুমাত্র দাম দিতে রাজি হবেন না। অথচ এ ক্ষেত্রে কোন একটা দিক নিয়ে ওকালতি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বিশ্বিদ্যালয়ের ঘরের খবর জানি নে,—না তার আয়ব্যায়ের হিসাব, না তার অধ্যাপক-মণ্ডলীর গুণাগুণ। বিশ্বসরস্তৌর মন্দিরে তাঁর পূজো অথবা আক্ষে দেশের টাকা পণ্ডিতবিদায় কিম্বা কাঙালীবিদায়ে বরবাদ হচ্ছে, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অস্ত। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে অজ হয়ে বসবার পক্ষে আমার একটু বিশেষ বাধা আছে। আমি হচ্ছি বিশ্বিদ্যালয়ের একজন ঠিকে অধ্যাপক। এ অবস্থায় আমার রায়ের নিরপেক্ষতায়

কেউ বিশ্বাস কৱবেন না। সে রায় যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটুও
স্বপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি ইউনিভার্সিটিৰ মূল
খাই বলে তাৰ গুণ গাছি; আৱ সে রায় যদি উক্ত বিদ্যালয়ের একটুও
বিপক্ষে হয়, তাহলে লোকে বলবে যে আমি নিমক-হাৱাম। এই
উভয়সংকটে পড়ে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে না-ছুঁয়ে বিশ্ব-
বিদ্যালয় সম্বন্ধে হু'-চাৱটি সাধাৱণ কথা বলতে চাই।

এ কালে একটি ইউনিভার্সিটি চালানো বহু বায়সাধা—এবং
ইউরোপ আমেরিকাৰ সকল শিক্ষাচার্যোৱ মতে দিনেৱ পৱ দিন সে
ব্যয় বেড়েই যাবে। এক উচ্চ-শিক্ষা বন্ধ কৱা ছাড়া, এ ক্ষেত্ৰে
ব্যক্তাবল লাঘব কৱাৱ উপায়ান্তৰ নেই। ইউনিভার্সিটি কমিসনেৱ
রিপোর্ট অন্তাবধি আমাৱ দৃষ্টিগোচৰ হয় নি, স্বতন্ত্ৰাং তাৰ ভিতৱ সাপ
ব্যাঙ কি আছে, আমি কিছুই বলতে পাৰিনে। কিন্তু আমি ভৱসা কৱে
বলতে পাৰি যে, কমিসনেৱ মতে, আমাৰে বিশ্ববিদ্যালয় যে যথোৰ্ধ্ব
বিদ্যালয় হয়ে উঠতে পাৰে নি, তাৰ অন্তত একটি কাৱণ— তাৰ দারিদ্ৰ্য।
দৱিজ্ঞ বিদ্যালয় যে কি কৱে বিদ্যাৰ ব্যৱহাৰ কৱবে, তাৰ হিসেব
পাওয়া কঠিন।

এৱ উভয়ে অনেকে বলেন যে সু-গৃহিণীৰ কাজ হচ্ছে আয় বুৰো
ব্যয় কৱা। আয় বাড়াবাৱ চেষ্টা না কৱে ব্যয় কৱাৰ দিকে যত্ন
কৱা যঁৱা সুবৃক্ষিৰ কাজ মনে কৱেন, তাঁৱা বিশ্ববিদ্যালয়েৱ অজচ্ছেদেৱ
ব্যবস্থা দিচ্ছেন। Post-graduate শিক্ষা চেঁটে দেবাৱ প্ৰস্তাৱ চাৱিদিক
থেকে শোনা যাচ্ছে। এৱাপ অন্ত-চিকিৎসাৰ ফলে ইউনিভার্সিটিৰ
দেহভাৱ অবশ্য অনেকটা লাঘব হৰে আসবে, তবে তাতে তাৰ স্বাস্থ্য ও
শক্তি বাড়বে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এ প্ৰস্তাৱেৱ

অর্থ কি জানেন ?—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চমাস ছেদন করা। উচ্চশিক্ষার উচ্চতা নষ্ট করা যে সে শিক্ষার উন্নতির সদুপায়, এ জ্ঞান আমার পূর্বে ছিল না ; আমার চিরকেলে বিশ্বাস এই যে, উচ্চ শিক্ষার সার্থকতা উচ্চ থেকে উচ্চরোস্তর উচ্চতর হওয়ায়। উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই যথার্থ সুব্যবস্থা, যার ফলে সমাজের অবস্থাস্তর ঘটে, যার সহায়তায় মানুষ জীবনের নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে আরোহণ করে। উচ্চশিক্ষা জিনিসটিকে আমরা যে এতদূর বহুমূল্য মনে করি, তার এক মাত্র কারণ—আমাদের বিশ্বাস যে শিক্ষার প্রসাদে মানুষ উচ্চতর জীব হয়।

আমার এ কথার উচ্চরে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে যাঁরা বায়-কুণ্ঠ নন তাঁরা বলবেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগটি আগাগোড়া ফাঁকি ও ভুয়ো। এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের জটি নেই, অথচ কাজে কিছু হয় না। এ বিভাগের কোন কোন ক্ষেত্রে নাকি অধ্যাপক আছে কিন্তু ছাত্র নেই ; এবং যে সকল ক্ষেত্রে ছাত্র আছে, সে সকল ক্ষেত্রে অধ্যাপকেরা নাকি একেবারেই অকর্মণ্য।

এ কথার প্রতিবাদ আমি করতে পারি নে, বাস্তিগত অভিজ্ঞতার অভাববশত। তবে বিনা প্রমাণে অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ গ্রাহ করে নিতে আমার মন সরে না। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা শতকরা নিরনববই জন হচ্ছেন আমাদের স্বজাতি। তাদের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের জাতীয় বিশ্ববুদ্ধির অঙ্কার একদম চূর্ণ হয়ে যায়। সমাজ যদি শিক্ষকদের দূরছাই করে, তাহলে শিক্ষার কি সদগতি হয় ? এই অধ্যাপকদের মধ্যে অন্তত এমন জনকতক যদি থাকেন, যাঁরা অধ্যাপনার কাজটি ত্রু

হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাহলেই আমাদের সন্তুষ্টি থাকা উচিত। বাইবেলের সেই পাকা কথাটা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, many are called but few are chosen, এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে chosen few আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই।

তারপর উচ্চশিক্ষার কোন কোন বিভাগে যে ছাত্র জোটে না, সে দোষ কি বিশ্ববিদ্যালয়ের না সমাজের? B. L. পড়ার অন্ত হাজার হাজার ছেলে জোটে, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শেখবার জন্ম যে দুই চারটির বেশি অগ্রসর হয় না, তার কারণ আমাদের মতে আইন অর্থকরী বিদ্যা; কাজেই সে বিদ্যা এতটা অনর্থকরী হয়ে উঠেছে। এটা অবশ্য খুব আনন্দের বিষয় নয়।

আসল কথা এই যে, উচ্চ শিক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তার উচ্চতার উপর। এছলে আমি আমার দার্শনিক গুরু Professor William James-এর গুটিকয়েক কথা উক্ত করে দেবাৰ লোভ সম্বৰণ কৱতে পারছি নে। তিনি আমেরিকার শিক্ষকমণ্ডলীকে এই সত্য সর্বদা স্মরণ রাখতে বলেন যে—

“The renovation of nations begins always at the top among the reflective members of the State, and spreads slowly outward and downward.”

ইউনিভার্সিটি মাত্রেই উদ্দেশ্য জনকতক reflective members of the State তৈরি কৱা, এবং তার জন্ম উপযুক্ত ব্যবস্থা ও রাখা চাই।

(৪)

আমরা যে আন্দোলনের সূষ্টি করেছি, সেটির আসল বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ত লর্ড কার্জনের University Act-এর ঠেলায় বহুদিন যাবৎ এই পথেই চলেছে। এতদিন ত কৈ আমরা এর হালচালের বিকল্পে উচ্চবাচ্য করি নি। আজ কেন হঠাতে আমরা এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলুম ?—

এর কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফী ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে জনকতক ছেলের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ পাছে বন্ধ হয়, এই ভয়ে আমরা বিচলিত হয়ে উঠেছি। সম্ভবত তাই হবে। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, উচ্চ-শিক্ষা জিনিসটৈই হচ্ছে আক্রা। ধরুন যদি বিশ্ববিদ্যালয় একদম অবৈতনিক হয়ে যায়, তাহলেও দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে সেখানে শিক্ষালাভ করা একেবারে আনায়াসসাধ্য হবে না। কেননা প্রবেশিকা পরীক্ষা উভৌর্ণ হ্বার পরও আরও অস্তুত চার-বৎসরের জন্য তার ভরণ-পোষণের ভার তার পরিবারকেই নিতে হবে। ঘোল বৎসর বয়সে পৃথিবীর সকল দেশের ছেলেই উপার্জনক্ষম হয়,—সে বয়সে তাকে কর্মক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা একমাত্র অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু কি ধর্মী কি দরিদ্র, সকলেই যদি নিজ নিজ ছেলেদের কর্ম হতে লম্বা অবসর দেন, তাহলে দেশের আর্থিক দুরবস্থা বাড়বে বই কমবে না। এ সমস্যা পৃথিবীর সকল দেশেই উঠেছে, এবং সকল শিক্ষা-চার্যের মতে প্রতি জাতিকেই এ বিষয়ে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এ সমস্যা পৃথিবীর কোন দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার

সমস্তা নয়। এ হচ্ছে Secondary education-এর সমস্তা। ইউ-রোপ ও আমেরিকার মধ্যবিত্ত! সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলে ১৬ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে' কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। স্বতরাং এই বয়সে তাদের কতদূর সুশিক্ষিত করা যায়, এই হচ্ছে সে দেশের শিক্ষার প্রধান সমস্তা। Secondary education-এর সঙ্গে সামাজিক জীবনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, স্বতরাং এ শিক্ষার ব্যবস্থা অবস্থা বুঝেই করতে হয়। উচ্চশিক্ষার কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার অবশ্য যোগ আছে, কেননা স্কুলের চৌকাট ডিঙ্গিয়েই কলেজে চুক্তে হয়। কিন্তু তাহলেও এ দুই শিক্ষার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, উপায়ও স্বতন্ত্র। আমি পূর্বে বলেছি যে, উচ্চেজ্ঞার মুখে বাণ নিক্ষেপ করলে সে বাণ লক্ষ্যভূক্ত হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। আমরা বিশ্বিদ্যালয়ের কাছ থেকে যা না বী করছি, আসলে তা আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার নিকট প্রাপ্য। আমার এ কথা যে সত্য, তার প্রমাণ আমরা post-graduate শিক্ষা বন্ধ করতে চাচ্ছি। ধরুন তা যদি বন্ধ করা যায়, তাহলে যাকে আমরা বিশ্বিদ্যালয় বলি, তা একটি দু-ভাগে বিভক্ত Secondary School-য়ে পরিণত হবে। আমাদের দেশের B. A. এবং B. Sc. দু'জনে পৃথকভাবে যে শিক্ষা অর্জন করেন, জর্মানী প্রভৃতি দেশে যারা School-leaving certificate নিয়ে বিশ্বিদ্যালয়ে নয়, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তারা প্রতিজ্ঞনে এ উপরোক্ত দু'জনের শিক্ষার সম্বল নিয়ে জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। স্বতরাং আমাদের বন্ধ-পরিকল্পনা হওয়া উচিত, উচ্চ শিক্ষার মাথা হেঁট করবার অন্ত নয়, মাধ্যমিক শিক্ষাকে ধাঢ়া করে তোলবার অন্ত। আমাদের বিশ-

বিদ্যালয়ের শিক্ষা যে অনেকপরিমাণে নিষ্ফল হয়, তার মূল কারণ
এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার কাঁচা ভিত্তের উপর উচ্চ শিক্ষার পাকা
এশোরত গড়া যায় না।

(৫)

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার
এ প্রবক্ষের বিষয় নির্বাচন এবং সেইসঙ্গে নামকরণও করে দিয়েছেন।
সে বিষয়ের নাম হচ্ছে আমাদের “শিক্ষা ও বর্তমান জীবনসমস্যা”।
আমার মতে নামটা উচ্চে দেওয়াই শ্রেয় ছিল, অর্থাৎ আলোচা বিষয়টি
যদি “জীবন ও বর্তমান শিক্ষাসমস্যা” হত, তাহলে তার আলোচনা
করকটা আমার আবশ্যের মধ্যে আসত। জীবন জিনিষটি চিরকালই
একটা সমস্যা; আর একমাত্র বিদ্যালয় কোন দেশে ক্ষিনকালে
সে সমস্যার মীমাংসা করতে পারে নি; কেননা শিক্ষা জিনিষটে
হচ্ছে জীবনেরই একটা বিশেষ অঙ্গ, এবং শিক্ষা-সমস্যাটা জীবন-
সমস্যারই অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষার প্রভাব জীবনের উপর অবশ্যই
আছে, অস্তুত ধারা উচিত,—কিন্তু সেইসঙ্গে একথা ও স্মরণ রাখা
কর্তব্য যে, আতীয় শিক্ষার উপর জাতীয় জীবনের প্রভাব প্রচলন
হলেও প্রচণ্ড। বলা বাহ্যিক যে, বিদ্যালয় জাতীয়-জীবন হতেই
তার রূপ রূপ্ত সংগ্রহ করে, সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যায়
যে, শিক্ষার সার্থকতা কিন্তু ব্যর্থতা অনেকপরিমাণে জাতীয় জীবন ও
জাতীয় মনের ঐশ্বর্য কিন্তু দৈন্যের উপর নির্ভর করে। স্কুলমাস্টারের
হাতে এমন কোনও পরিশপাথর নেই, যার স্পর্শে ছেলেমাত্রেই সোনা
হয়ে ওঠে। কি র্তোতিক জগৎ কি মানসিক অগৎ, উভয় কেবেই

আলকেমিতে বিশ্বাস আমরা হারিয়ে বসে আছি। এ বিষয়ে মনে দুরাশা পোষণ করলে, অবশ্যে আমাদের হতাশ হতেই হবে। প্রচলিত শিক্ষার দৌড় কর্তৃ, সে বিচার না করেই দেশস্বক্ষ লোক তাঁদের ছেলেদের শিক্ষার সেই চল্লতি পথটা ধরিয়ে দেন, তাঁরপর যখন দেখেন যে সে পথ ধরে তাঁরা কোন একটা সিদ্ধি কিম্বা ঝঙ্কির নাড়ে পেঁচতে পারলে না, তখন তাঁরা স্কুল কলেজের উপর খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন। এক কথায়, তাঁদের মনে স্কুলকলেজের উপর এক সময়ের অগাধ এবং অযথা ভঙ্গি আর এক কালে সমান অগাধ ও অযথা রোধে পরিণত হয়। ছেলে পাস না করতে পারলে স্কুলকলেজের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, এমন বাপ-মা এদেশে দুর্লভ নয়। বলা বাহ্যিক একুশ মনোভাবের মূলে যতটা পুরোভাস্ত্র আছে, ততটা বিচারবুদ্ধি নেই। আর এ কথাও নিশ্চিত যে, একমাত্র সুদয়াবেগের বলে পৃথিবীটিকে জয় করা যায় না। কামনা স্থু আমাদের সাধনার পথ নির্দেশ করে দিতে পারে, তাঁর বেশি কিছু পারে না। সুতরাং শিক্ষার কাছ থেকে কি ফল আমরা কামনা করি, প্রথমেই সেটি জ্ঞান দরকার।

(৬)

বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে প্রশ্ন সাধু ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁর সাদা বাঙ্গলা হচ্ছে—“আমাদের লেখাপড়ার সঙ্গে আমাদের পেটের সম্বন্ধ কি” ? এ প্রশ্নটা অবশ্য মানুষে না জিজ্ঞাসা করে থাকতে পারে না, কেন না পেটের ভাবনা আমাদের অধিকাংশ লোকেরই আছে, তাঁরপর আমাদের সম্প্রদায়ের লোক, অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্ত

জ্ঞানোক্তের পক্ষে এ ভাবনা সব চাইতে বড় ভাবনা এবং তাঁদের আশা যে স্কুল কলেজের শিক্ষার ক্ষেপায় তাঁদের ছেলেরা হয় ব্যবসনা, নথি লেখনীর সাহায্যে, স্থধু যে ছবিভাবে থাকবে তাই নয়, গাড়ি-যোড়াও চড়বে। আর যদি তা না হয় ত সে স্কুল কলেজের দোষ। বলা বাহ্যিক যে, এ ইকনমিক-সমস্যার পূরণ, বিশ্বালয় একাহাতে করতে একেবারে অসমর্থ।

আমাদের আতীয় দৈনন্দিন কারণ অনুসন্ধান করতে হলে স্কুল কলেজের বাইরে বহুদূরে যেতে হবে, এবং জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে হবে। যুবকদের জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে গড়া অবশ্য শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ, কিন্তু একমাত্র অর্থের দিকে নজর রাখলে আমরা শিক্ষার সকল অঙ্গ এবং সম্ভবত উত্তমাঙ্গই দেখতে পাব না। দেশশুক্র স্কুল কলেজকে রাতারাতি Technical School-রে পরিণত করলে আমরা সভ্যতার উচ্চতম শিখরে এক লক্ষ্য যে আরোহণ করব না সে কথা বলাই বুঝা, যে কথা বলা প্রয়োজন সে হচ্ছে এই যে, উক্ত উপায়ে আমরা যে শিল্প-বাণিজ্য চোখের পলক না ফেলতেই ইউরোপের উপর টেক্কা দেব তার কোনই সন্তোষনা নেই। একমাত্র Technical School-এর শিক্ষা ও যে বিশেষ কোনও কাজের হয় না, এ হচ্ছে ইউরোপের পরীক্ষিত সত্য। টেকনিকাল স্কুলে শিখে নাকি লোকে স্থধু টেকনিকাল স্কুলের মাট্টারি করতেই শেখে! হাতে কলমে শিল্প শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে কারখানা। আর তার বৈজ্ঞানিক অংশ শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে বিশ্ববিশ্বালয়। এই কারণে যারা কারখানায় কাজ করে তাঁদের সেই কাজের Science শেখবার অঙ্গ কোন কোনও ইউনিভার্সিটিতে এক একটি বিশেষ বিভাগ খোলা

হয়েছে। কেননা একদিকে যেমন হাতে ধরে না শিখলে যথার্থ শিল্পী হওয়া যায় না, অন্য দিকে তেমনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। এই সব কারণে আমার মতে শিক্ষা সম্বন্ধে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের মন্ত্রিক্ষের সম্বন্ধটা কি?— ইহলোকে মন্ত্রিক্ষই আমাদের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ, ইন্দুপদাদি সব তার আজ্ঞাবহ অনুচর মাত্র।

(৭)

শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাকে মানব-জীবনের কোনও একটি সক্রীণ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ মনে করলে সে শিক্ষা হয় নিষ্ফল হয়, নয় তার ফল ভাল হয় না। আমাদের মনোমত কোনও একটি বিশেষ ছাঁচে সকলকে ঢালাই করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, কেন না সে উদ্দেশ্য সাধন করবার এ যুগে কোনও উপায় নেই। ইউরোপে দেখা গিয়েছে যে, ও-হেন চেষ্টার ফলে শিক্ষকদের সেই মনগড়া ছাঁচ অধিকাংশ ছলে ভেঙ্গে গিয়েছে এবং যেখানে ভাঙ্গে নি, সেখানে যারা তাতে ঢালাই হয়ে এসেছে তারা মানুষ না হয়ে জড়পদার্থ হয়েছে, এবং তাদের নিয়ে সমাজকে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। মানুষ ধাতু নয়, কিন্তু দেহমনে একটি organism, এবং এই organism-এর স্ফুর্তির সহায়তা করাই শিক্ষার একমাত্র কাজ ; এক কথায় শিক্ষার ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সাধনের ধারা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। মনে রাখবেন যে, আমরা যাকে জাতি বলি সে হচ্ছে আসলে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি এবং তাছাড়া আর কিছুই নয়। আর বাস্তিতে ব্যক্তিতে

যথন মনের ও শক্তির পার্থক্য এবং তাঁরতম্য আছে তখন শিক্ষার ও এক উদ্দেশ্য হতে পারে না। শিক্ষার সেই ব্যবস্থাই স্বব্যবস্থা ধাতে বহু লোকের ব্যক্তিত্ব স্ফুর্তি লাভ করে এবং যার ফলে জাতীয় শক্তি নানা দিকে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং জাতীয় জীবন অপূর্ব বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য লাভ করে। সকলের মাথাই যে ইউনিভার্সিটির ক্ষুরে মোড়াতে হবে এমন কোনও কথা নেই। দেশস্বক লোকের মানুষ হওয়া চাই, কিন্তু সকলেরই পণ্ডিত হবাব দরকার নেই। শিক্ষার এ উদ্দেশ্য যে সকলে সহজে মানতে চান না, তার কারণ, এদেশে আজও সকলে মানুষকে জীব হিসেবে দেখেন না, অনেকেই যন্ত্র হিসেবেই দেখেন।

তাঁরপর অপরাপর জীবের সঙ্গে মানুষের একটি প্রকাণ্ড তক্ষণ আছে। মানুষের অন্তরে মন বলে একটি পদার্থ আছে, জীবজগতের অপর কোনও প্রাণীর ভিতর যা নেই। পশু পক্ষীরা আজ তিন হাজার বৎসর পূর্বে যে যেখানে ছিল, সে আজও ঠিক সেইখানেই রয়েছে। কিন্তু মানব-সমাজ এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পকলায় অঙ্গে বস্ত্রে ধনে রঞ্জে যে এতটা ঐশ্বর্যবান হয়ে উঠেছে, মানুষ যে আজ এ পৃথিবীর অধিতীয় প্রভু, সে পরিণতির মূলে আছে তাঁর মানস-বল। মানুষের উন্নতির কারণ এই যে তাঁর মনকে শিক্ষা দেওয়া যায়, অর্থাৎ তাঁর আত্মশক্তিকে ফোটানোও যায় বাড়ানোও যায়। আমরাই হচ্ছি একমাত্র সেই শ্রেণীর প্রাণী যারা তাঁদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করতে পারে, এবং তা পরস্পরকে আদান প্রদান করতে পারে। আমরাই স্বধূ মনের কারবার করতে পারি এবং সেই সঙ্গে জ্ঞানের মূলধন বাড়াতে পারি। শিক্ষার একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, আজ যাই হৈলৈ আৱ কাল যাই মানুষ হৈব, পূৰ্বে
পুৱেৰ সংক্ষিত জ্ঞানেৱ তাৰেৱ উত্তোধিকাৰী কৰা, এবং সেই সমে
তাৰেৱ অন্তৰে নৃতন জ্ঞান সংগ্ৰহ কৰা ও নৃতন কৰ্ম-কৰ্মশল লাভ
কৰিবাৰ প্ৰয়োগ ও শক্তিৰ উৎসোধন কৰা। যে যতটা জ্ঞান আৱস্থাৎ
কৱতে পৱে, এবং যতটা কৰ্ম-শক্তি লাভ কৱতে পাবে, সে ততটা
শিক্ষিত। কিন্তু দুই-ই হচ্ছে আসলে মনেৱ জিনিষ এবং এ-দু'য়েৱ ভিতৰ
সমন্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞান ও কৰ্মেৱ সমন্বয় কৱাই বৰ্তমান শিক্ষা-
পৰ্যাপ্তিৰ সৰ্বপ্ৰধান উদ্দেশ্য। একটা ইংৰাজি বচন আমাদেৱ মনেৱ
উপৰ এ যুগে অযোৱা রকম অধিপত্য লাভ কৱেছে, সে হচ্ছে struggle
for existence. এ কথা নিত্য শুনতে পাওয়া যায় যে, সেই শিক্ষাই
যথাৰ্থ শিক্ষা যা আমাদেৱ struggle for existence-এৱ সহায়।
ঐ মন্ত কৰাটাৰ সাদা অৰ্থ হচ্ছে “আৱৰক্ষাৰ প্ৰচেষ্টা”। এ প্ৰচেষ্টা
জীব-মাত্ৰেৱই অস্থি মজ্জাগত, এবং যেহেতু আমৰা ও জীব সে কাৰণ
ও-প্ৰয়োগ আমাদেৱ পক্ষেও বৈসৰ্গিক। কিন্তু পশু-পশুৰ সমে
আমাদেৱ প্ৰভেদ এই যে আমাদেৱ ভিতৰ উপৰন্তু আৱ একটি প্ৰয়োগ
আছে, যাৰ নাম আত্মোৱতিৰ প্ৰয়োগ। আমাৰ স্বধু আৱৰক্ষা
কৱেই সন্তুষ্ট থাকিবে, মনে ও চৰিত্বে মনুষ্যাহৰ নিষ্পন্ন হতে
উচ্চতৰে উঠিবাৰ প্ৰচেষ্টাৰ আমাদেৱ প্ৰকৃতিতে স্বাভাৱিক। এবং
শিক্ষা হচ্ছে এই প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰধান সহায়। যদি কেউ বলেন যে তা
বটে, তবে আগে আৱৰক্ষা পৱে আত্মোৱতি। এৱ উচ্চতৰে আমাৰ
বক্তব্য ও দুয়েৱ ভিতৰ ওৱৰপ পূৰ্বাপৰ সমন্বন্ধ নেই। আত্মোৱতিৰ
প্ৰচেষ্টাই যে আৱৰক্ষাৰ প্ৰকৃষ্ট উপায়, এৱ প্ৰমাণ মানবজীৱতিৰ
সভ্যতাৰ ইতিহাস স্পষ্টকৰে দেয়।

(৮)

মানবজাতির যুগবুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানে মানুষ মাত্রেই যে অধিকার আছে এবং সে অধিকারে অধিকারী হলে, মনুষ্যত্ব যে স্ফূর্তি লাভ করে এই বিশ্বাসের বলে ইউরোপ ও আমেরিকায় কেটের থরচায় প্রতি বালককে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থুত তাই নয়, প্রতি বালক শিক্ষিত হতে বাধ্য। এরই নাম Compulsory primary education.

তারপর বার চৌদ্দবৎসরে এদের মধ্যে অধিকাংশকে জ্ঞান-জ্ঞনের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এর প্রধান কারণ economic,—দরিদ্রের সন্তানের এই বয়সেই জীবিকা অঙ্গনের প্রয়োজন হয়, কেননা তাদের বেশি দিন নিষ্কর্ষা রাখায় তাদের এবং সমাজের সমান ক্ষতি হয়। আরও একটি কারণ আছে। যাঁরা ছেলের মনের খোজ রাখেন তাঁদের মতে কৈশোরে পদার্পণ করবামাত্র অনেক ছেলের মনে কাজ করবার প্রয়োজন এবং সেই সম্মত জ্ঞান-চর্চার অপরূপ জন্মায়,—অর্থাৎ তাঁরা দাঁধা না ধেয়ে সংসারে চরে খেতে চাই। সুতরাং ও বয়সে তাদের জোর করে কর্মক্ষেত্র হতে দূরে রাখার কোনই সার্থকতা নেই। নিষ্ক্রিয় হলে যে জ্ঞানী হতেই হবে এমন কোনও বৈমার্গিক নিয়ম নেই। আমাদের যত ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তাঁর ভিতর অনেকে যে যুগপৎ অশিক্ষিত ও অকর্মণ্য হয়ে বেঁচে তাঁর অন্তর্ম কারণ এই যে চৌদ্দ পোনেরো বৎসর বয়সে তাঁদের মনোমত কাজে তাঁদের লাগতে দেওয়া হয় নি।

তারপর চৌদ্দ খেকে আঠারো বৎসর বয়েস পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত

অন্নসংখ্যক ছেলেদের শিক্ষার জন্ম যে ব্যবস্থা করা হয় তাৰ নাম secondary education. ইউৱোপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছেলেদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এইখানেই শেষ হয়। যৌবনে পদার্পণ কৱা মাত্ৰ তাৰা কৰ্মক্ষেত্ৰে প্ৰবেশ কৰে। আমাদেৱ সম্প্রদায়েৱ লোকেৱ পক্ষে এই Secondary education-ই সব চাইতে মূল্যবান, কাৰণ এই শিক্ষাই আমাদেৱ অধিকাংশ লোকেৱ জীবনযাত্ৰাৰ প্ৰধান সহায়। আঠাৰ বৎসৱ বয়সে বিদ্যালয় থেকে নানা বিষয়ে সেই শিক্ষালাভ কৰে বহিৰ্গত হওয়া আমাদেৱ পক্ষে শ্ৰেষ্ঠ, যে শিক্ষার ফলে জীবনেৱ যে কোনও কৰ্মক্ষেত্ৰে আমৱা কৃতিত্ব লাভ কৰতে পাৰিব। আমাদেৱ economic অবস্থাৰ সঙ্গে এই শিক্ষাই যথৰ্থ ধাপ ধায়। স্মৃতিৱাং এ শিক্ষার যাতে স্বব্যবস্থা হয় সেই বিষয়েই আমাদেৱ একান্ত যত্নবান হওয়া কৰিব। আৱ এই বয়েসেৱ মধ্যেই যে যথেষ্ট সুশিক্ষিত হওয়া যায় তাৰ প্ৰমাণ ইউৱোপেৱ সকল দেশেই পাওয়া যাবে।

তাৱপৱ যে ক'টি বাকী থাকে তাৱাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষা লাভ কৰতে চেষ্টা কৰে। এও কতকটা অবস্থাৱ গুণে। উচ্চ-শিক্ষা ইউৱোপেৱ অবস্থাপন্ন সম্প্রদায়েৱ এক রকম একচেটে বলমেও হয়। বাইশ তেইশ বৎসৱ বয়েস পৰ্যন্ত এক পয়সা রোজগাৱ না কৰে পৱিবাৱেৱ অন্মে প্ৰতিপালিত এবং পৱিবাৱেৱ অৰ্থে উচ্চ শিক্ষিত হতে পাৱে এমন যুবকেৱ দল সকল দেশেই দুৰ্লভ। যদি কেউ জিজ্ঞাসা কৰেন যে তবে কি দৱিজনসন্তান উচ্চ-শিক্ষা লাভেৰ স্বৰূপে বঞ্চিত থাকবে? তাৱ উত্তৰ—অবশ্য হবে যদি না তাৰেৱ নিজগুণে Scholarship নেবাৱ ক্ষমতা থাকে। দৱিজ সমাজও যদি পৃথিবীৱ সকল ভাল জিনিষে ধনীৱ সঙ্গে সমান অধিকাৰী হত তাহলে দাবিজ্য ত আৱ

কষ্টের কারণ হত না। একুপ হওয়া উচিত কি না, সে হচ্ছে শিক্ষার নয় সমাজের সমস্যা। ইউরোপের বহুলোকের মতে কোনও সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের এতটা অর্থগত পার্থক্য থাকাটা মোটেই মজল-জনক নয়। এঁদের চেষ্টায় যদি Socialistic State গড়ে ওঠে তাহলে হযত mass education এবং high education একাকার হয়ে যাবে। কিন্তু যতদিন সমাজে বড় ছোটর প্রভেদ থাকবে ততদিন শিক্ষারও উচ্চ নীচ প্রভেদ থাকবে। তবে এ সব প্রশ্ন আমাদের মুখে শোভা পায় না। এই জাতিভেদের দেশে আমরা সমাজে ছোট বড়র প্রভেদ মোটেই দূর করতে চাই নে, তার উপর এদেশে ধনীর অপেক্ষা দরিদ্রেগাই যে বিশ্বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে বেশি লালায়িত, তার কারণ অধিকাংশ ছেলের বাপ ছেলেকে উচ্চ-শিক্ষিত করতে চান না, স্বধূ ধনী করতে চান। এবং সেই কারণ উচ্চ-শিক্ষাকে যতদূর সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট করবার জন্য সকলে ব্যগ্র। এ মনোভাব স্বাভাবিক হলেও প্রশ্ন পাবার উপযুক্ত নয়। আমার বিশ্বাস এইকুপ পারিবারিক মনোভাব দিয়ে জাতীয় শিক্ষার-সমস্যার সমাধান করা যায় না। ঘরের প্রদীপ ধুই আলো করতে পারে কিন্তু বাইরের অঙ্ককার ঘোচাতে পারে না ; তার জন্য চাই বাইরের আলো। বিশ্বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষা যে কৃটা অকিঞ্চিত্কর সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞান তবে আমার দুঃখের কারণ এই যে, আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটেই স্বশিক্ষিত সম্প্রদায় নয়। যদি তাঁরা সত্যই স্বশিক্ষিত হতেন তাহলে কোন আপশোষের কারণ থাকত না, কেননা আমার দৃঢ় ধারণা যে যে-জাতির অনেকে স্বশিক্ষিত সে জাতির কি আর্থিক কি আধ্যাত্মিক দুই ক্ষেত্রেই উন্নতি অনিবার্য।

(৯)

এ সত্য নিঃসন্দেহ সর্ববাদী সম্মত যে, যে-শিক্ষা মানুষের মনকে
মুক্তি দেয় না শক্তি দেয় না, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। আর যে মনের
জীবনের উপর কোন স্থ-প্রভাব নেই সে মন মুক্তও নয়, শক্তিশালীও
নয়, এক কথায় শিক্ষিতই নয়।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে জীবনকে চেপে ধরতে পারেন
নি, এবং নিজ শক্তিতে তা যে মনোমত করে গড়ে তুলতে পারছেন না,—
তার প্রমাণ আজকের দিনের এই অন্ত-সমস্ত। এই ব্যর্থতার পরিচয়
একমাত্র economic ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমান পাওয়া
যাবে। এই নব-শিক্ষার প্রভাব যে আমাদের সামাজিক জীবনের উপর
এক রুকম নগণ্য—তা কে অস্বীকার করবে? আর এ কথাও নিঃসংশয়
যে আমরা যাকে ইকনমিক-সমস্তা বলি সেটি আমাদের সামাজিক
মরোভাব, সামাজিক চরিত্র ও সামাজিক বিধি নিষেধের, এক কথায়
সামাজিক জীবনের বিশেষরূপে অধীন। যদি কোন সমাজের প্রিয়
প্রথা ও চিরাগত সংস্কার সকল বর্তমান যুগে Struggle for exis-
tence-এর অনুকূল হওয়া দূরে থাক প্রতিকূল হয় তাহলে সে প্রথা
ও সে সংস্কার বজায় রেখে জীবন-সংগ্রামে কি করে জয়ী হওয়া যেতে
পারে? একমাত্র রুসনা ও লেখনীর বলে? লেখনি ও রুসনার
শক্তিতে আমি অবিশ্বাসী নয়—কিন্তু সে শক্তি সত্ত্বের আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠা
মাত্ত করে ও বৃক্ষি পায়। মনোজগৎ ও বস্তুজগৎ এ উভয় রাজ্যের যথার্থ
জ্ঞানের উপরই মানুষের আজ্ঞাশক্তি প্রতিষ্ঠিত। রুসনা ও লেখনি দুইই
অবশ্য মিথ্যাকে অন্ত দিতে পারে এবং তাকে প্রশ্রয়ও দিতে পারে,

কিন্তু তার আরা ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা জাতি বিশেষকে হৃষি করতে পারে না, সজ্ঞান করতে পারে না, সক্রিয় করতে পারে না। আর সভ্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সত্যপ্রিয় হওয়া চাই, সত্যসঙ্কীর্ত্তন হওয়া চাই, সত্যসন্ধ হওয়া চাই।

বিদ্যালয় ছেলেদের কাছে যুগঘুগান্তর-সংক্রিত জ্ঞানের ডাঙুর খুলে দেয়, সে জ্ঞান আহ্বাসাং করা আর না করা সম্পূর্ণ ছেলের এক্সিয়ার। উচ্চ-শিক্ষা যুবকদের সঙ্গে মনুষ্যহের উচ্চ মনোভাব উচ্চ আইডিয়ালের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে—কিন্তু সে ভাব সে আইডিয়াল, যুবকদের মনে চুকিয়ে দিলেও সম্পূর্ণ বসিয়ে দিতে পারে না ; যদি বাপগাঁ শিক্ষকের এবং সমাজ বিদ্যালয়ের সহায়তা না করে। ভুলে যাবেন না যে বিদ্যালয় একমাত্র শিক্ষালয় নয়—প্রতি পরিবার এক একটি শিক্ষালয় আর সমাজ হচ্ছে একটি মহাবিদ্যালয়। সমাজ যদি বিদ্যালয়ের উল্টো টান টানে তাহলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ফল কি হবে ? স্কুল কলেজে অর্জিত জ্ঞান আমাদের মনের উপর একটা বোঝামাত্র হয়ে থাকবে, এবং সে ক্ষেত্রে সংগৃহিত আইডিয়াল স্থুল বস্তু গত হয়ে থাকবে।

এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, সমাজ কি সত্যাই চায় যে স্কুল কলেজের শিক্ষা সত্য সত্যাই দেশের ছেলের মনে বসে যাক এবং তারা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে স্বাধীন ভাবে জীবন ধাপন করতে শিখুক ? অপর পক্ষে এই কথাটাই কি সত্য নয় যে, সমাজ চায় এই নব-শিক্ষা যেন ছেলেদের মন স্পর্শ না করে ; এবং যে মন দিয়ে স্কুল কলেজের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে আর যে মন দিয়ে জীবনের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে—এ দুই মন সমান্তরাল রেখায় ইংরাজিতে যাকে বলে

parallel lines-য়ে চলুক। আমরা চাই যে আমাদের ছেলেরা স্কুলে মালবে পৃথিবী গোল, আর ঘরে এসে মানবে যে পৃথিবী ত্রিকোণ। কেননা একবার বদি তারা তাদের শিক্ষার দ্বারা আমাদের সামাজিক সংস্কার গুলোকে যাচাই করতে সুরু করে তাহলে তারা হয়ত দেখতে পাবে যে অনেক জিনিস যা আমরা চোকোশ বলে ধরে নিয়েছি তা স্থু গোল নয়, মহাগোল। এরপ মনোভাবের মূল কি তা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমাদের শিক্ষা একে বিদেশী, তায় আবার নৃতন—আবার আমাদের সমাজ একে স্বদেশী তায় আবার প্রাচীন, সুতরাং এর একটিকে টিঁকিয়ে রাখতে হলে অপরটিকে হীনবৌধ্য করে দিতেই হবে। তাই অঙ্ক সংস্কারের সাহায্যে আমরা শিক্ষাকে পঙ্ক করে ফেলতে সদাই যত্নবান !

আমি পূর্বে বলেছি যে, যে শিক্ষায় মানুষের মনকে যুগপৎ শক্তি ও শক্তি না দেয়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়, কেননা তাতে মানুষকে person করে তোলে না। বহুকাল পূর্বে জগৎ-পূজ্য জর্মান দার্শনিক এই মহসত্যের আবিষ্কার করেন যে, person শব্দের অর্থ হচ্ছে Self consciousness self-determining individual. মানুষে পশ্চতে এই খানে তফাং যে, পশ্চ মাত্রেই কতকগুলি নৈসর্গিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত, তাদের ভিত্তির personality বলে কোনও জিনিস নেই। এইখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের মনে এবং চরিত্রে Self consciousness and self-determination-এর শক্তি উন্মুক্ত করতে হলে তাকে চিন্তা করবার ও কাজ করবার স্বাধীনতা দেওয়া একান্ত দরকার। তারপর আর একটি কথা ;—আমরা যাকে শক্তি বলি তার অর্থ হচ্ছে reality-র উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা—বলা বাহ্যিক

reality-র জ্ঞান না জমালে কেউ আর তার উপর প্রভুত্ব করতে পারে না। আমাদের নব-শিক্ষার প্রসাদে আমাদের reality-র জ্ঞান বাড়া দূরে থাক ক্রমে কমে যে আসছে তার কারণ আমাদের নব-শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষা জিনিসটি সব দেশেই একটি সমস্যা কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটি যে এত ভীষণ সমস্যা হয়ে উঠেছে তার প্রধান কারণ সে শিক্ষা আমাদের জীবনের পক্ষে অস্পৃশ্য। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, ইকনমিক অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা সবই এমন, যে আমাদের শিক্ষালক্ষ জ্ঞান-বুদ্ধি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই খাটাবার আমরা সুযোগ পাই নে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা খাটাবার আমাদের অধিকার পর্যন্ত নেই।—

এ অবস্থায় মনের সুখে থাকতে পারেন শুধু তাঁরা যাঁরা নিজের জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে গেলেই পরের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, এবং পরের দুরবস্থা বন্দি কালেভদ্রে চোখে পড়ে ত এই বলে মনকে আশ্রম করেন যে, সে দুরবস্থা তাদের পাপেরই শাস্তি। কিন্তু এদেশে এমন লোকেরও অভাব নেই যারা এই অতিনিন্দিত নব-শিক্ষার প্রসাদে স্বজ্ঞাতির এই বর্তমান দুর্গতি মনুষ্টিচ্ছে গ্রাহ করে নিতে পারেন না, কিন্তু মোটার গাড়ীতে চড়ে কলেজপ্রীট দিয়ে যাবার সময় ইউনিভার্সিটি Buildings নামক বুরোক্রাট এবং পেট্রিয়টের সমান চক্রঃশূল সরস্বতীর মন্দিরটিকে অঘ্নন বদনে ভূমিসাং করে দেবারও প্রস্তাব করতে পারেন না। দেশ উকারের অত সহজ মীমাংসা করবার পক্ষে তাঁদের জ্ঞান ও বুদ্ধি উভয়েই প্রতিবাদী হয়। ভবিষ্যতে বাঙালী জাতি, আমাদেরই অনুরূপ হবে, আমাদেরই মত তারাও নিষ্ঠীব, নিরানন্দ এবং

পরভাগ্যোপজীবী হয়ে থাকবে, আমাদেরই মত তারা স্বধূ ধনে নয় মন ও চরিত্রেও মধ্যবিত্ত হবে, আমাদেরই মত তারা জীবনের উৎসবের দর্শক মাত্র থাকবে, কিন্তু তাতে যোগদান করবার অধিকার লাভ করবে না ; এ কথা মনে হলে এ শ্রেণীর লোকদের মন নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তখন জীবনের সাধ তাদের মুখে তিতো লাগে। কিন্তু এ নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দিতে আমরা মোটেই চাই নে। একটি ইংরেজ লেখকের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলছি যে, খানায় পড়ে থাকলেও আকাশের তারা দেখবার অধিকারে মানুষ বঞ্চিত হয় না। আমাদের ভবিষ্যতের গগনে সেই তারা দেখতে পাই বলে আমরা শিক্ষার উন্নতির জন্য এত লালায়িত। যদি কেউ বলেন যে আমরা যা দেখছি সে তারা নয়—আকাশকুসুম, তার উপর তথাস্ত—কিন্তু তাই বলে খানায় পড়ে থাকাটাই যে বুদ্ধিমানের কাজ, এ কথা মানতে আমরা প্রস্তুত নই। উঠবার চেষ্টা আমাদেরই করতেই হবে, ফলাফল অন্তের হাতে।

(১০)

আমি বরাবর শিক্ষার উন্নতি, সমাজের উন্নতি, জাতির উন্নতি প্রভৃতি নানাকৃত উন্নতির কথা বলে আসছি কিন্তু কি উপায়ে সে উন্নতি সাধন করা যেতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ কোনও কথা বলি নি। বর্তমান শিক্ষার সর্বাত্মে কোন্ সংস্কার করা প্রয়োজন, সংক্ষেপে সেই কথাটা বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। কারণ আমার ধারণা যে, সে সংস্কার না করে অপর সংস্কার করতে যাওয়া হচ্ছে শিক্ষার গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া।

উন্নতি অবশ্য পরিবর্তন স্বাপেক্ষ। জড়পদার্থের ধর্ম এই যে তার নিজের ভিতর থেকে কোনও পরিবর্তনের তাগিদ আসে না। লোকাঞ্চল অনন্তকাল পর্যন্ত এক অবস্থাতেই থাকতে পারে, যদি বাহ্যিক তার পরিবর্তন না ঘটায়।

জীবের ইতিহাস হচ্ছে নিত্য তার অবস্থার পরিবর্তনের কাহিনী। প্রথমত বৃক্ষের তারপর হ্রাসের। বীজ হতে বৃক্ষ জন্মায়, বড় হয়, একটা সৌমা পর্যন্ত বাড়ে তারপর উভরোভৱ তার জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়ে এসে শেষে তার মরণ দশ। উপস্থিত হয়। কিন্তু এই হ্রাসবৃক্ষ হয় নৈসর্গিক কারণে, এ অবস্থাস্তুর ঘটার ভিতর তার মনের কিন্তু ইচ্ছার কোন কার্য নেই। তার জীবন-মরণ দুই-ই দৈবাধীন, সে বেচারা অপমৃত্যুকেও এড়াতে পারে না, আত্মহত্যাও করতে পারে না।

মানুষের ধর্ম কিন্তু স্মতন্ত্র। আমাদের দেহের হ্রাসবৃক্ষের উপর আমাদের বিশেষ কোনও হাত নেই। আমরা ইচ্ছা করলে পর্বত প্রমাণ উচুও হতে পারি নে, চিরদিন দেহে ছোট-ছেলেও থেকে যেতে পারি নে। কিন্তু মনের হ্রাসবৃক্ষ অনেকটা আমাদের আয়ত্তাধীন। আমরা ইচ্ছা করলে মনে ছোট ছেলেও থেকে যেতে পারি, জ্ঞানী গুণীও হয়ে উঠতে পারি। তাই সমাজ সভ্যতা প্রভৃতি জিনিস মানুষ তার মনোমত করে গড়তে পারে এবং সে গড়ার ভিতর মানুষের ইচ্ছা-শক্তি আসল শক্তি। সংক্ষেপে মানুষে আত্ম-চেষ্টায়—তার অবস্থার অশেষ পরিবর্তন ঘটাতে পারে, এবং মানব-সমাজের উন্নতি তার অভিপ্রায়কে অনুসরণ করে—সে উন্নতি অদৃষ্ট নয়, পুরুষকারের উপর নির্ভর করে। অপর পক্ষে মানুষ আত্মহত্যাও করতে পারে।

মানুষ শ্বেচ্ছায় নিজেকে বদলাতে পারে বলে সে বদল উন্নতির সহায়ও হতে পারে অবনতির সহায়ও হতে পারে। প্রতি বদলের মুখে এ উভয় সক্ষটে মানুষকে যে পড়তে হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে এ কথাও নিঃসন্দেহ যে অবনতির ভয়ে যদি মানুষের আত্ম-পরিবর্তনের চেষ্টা বন্ধ করো তাহলে সেই সঙ্গে তার উন্নতির পথও রোধ করা হবে। স্বতরাং এ বিষয়ে মানব-সমাজকে experiment করতে দিতেই হবে, ফলে উন্নতি কি অবনতি হবে তার প্রমাণ ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে।

মন ও জীবনের এই লড়ালড়ি পৃথিবীর সকল দেশে চিরদিনই চলে আসছে, কারণ মন চিরকালই জীবনকে নৃতন পথ দেখাতে চায়, আর জীবন চিরকালেই তার অভ্যন্তর পথ ত্যাগ কয়তে আপত্তি করে। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক Bergson বলেন যে, জীবনের পক্ষে এক জ্ঞায়গায় জমে পিয়ে জড়-পদার্থে পরিণত হবার দিকে একটা সহজ প্রবণতা আছে সেই অন্ত মনের কর্তৃব্য হচ্ছে তাকে ক্রমান্বয়ে টেনে তোলা, নৃতন নৃতন পথে তাকে চালিত করা।

বর শিক্ষার সহিত প্রাচীন সমাজের এই লড়াই সব দেশে সব যুগেই হয়ে আসছে। আমাদের দেশে যে হচ্ছে তার তিতির কিছুমাত্র নৃতন হনেই। এমন কি দু-পক্ষ সকল দেশে একই বুলি আওড়ান। নৃতন জ্ঞান এবং, তৎপ্রসূত নৃতন আইডিয়াল জীবনকে ডেকে বলে আমাকে অনুসরণ কর, তোমাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাব, আর প্রথা-গ্রন্থ জীবন বলে যে-পথে বহুদিন চলে আসছি সে পথ ত্যাগ করলে সর্বনাশ হবে, কেননা তোমার ঐ নৃতন পথ ত্রিদিবের নয়, রসাতলের পথ।

তবে মুতনভেন্ন মধ্যে এইটুকু যে অপর দেশে নবশিক্ষা সামাজিক জীবনকে ছাড়া করে তোলে আর আমাদের দেশে সামাজিক জীবন নবশিক্ষার কোমর ভেঙে দেয়। এর কারণ কি? সহজ উত্তর আমাদের নবশিক্ষা বিদেশী শিক্ষা বলেই, জীবনের উপর তার প্রভাব কম। কিন্তু এ উত্তর, সহজ হলেও সত্য নয়। পৃথিবীর ইতিহাস যুগ যুগ ধরে, এই সত্যেরই পরিচয় দিচ্ছে যে, এক আতির মন অপর আর এক আতির মনের স্পর্শে জেগে ওঠে, সংঘর্ষে সজ্ঞান হয়। কালজ্ঞমে আতীয় মন ষথন নিবে আসবার উপকৰণ হয়, তখন বাইরে থেকে তাকে উস্কে দেওয়া দরকার। সত্য তা সে দেশীই হোক বিদেশীই হোক সত্য, এবং সত্য ছাড়া আর বিচ্ছুই নয়। এদেশে শিক্ষার এ-দুর্গতির কারণ যে সে শিক্ষা বিদেশী ভাষাতে দেওয়া হয়।

আমরা এই বলে জাঁক করি যে ইংরাজি আমরা যেমন শিখ পৃথিবীর অপর কোনও জাত তেমন শিখতে পারে না। কথাটা কিন্তু সত্য নয়। অপর জাতের সঙ্গে নিজেদের তুলনা না করে, যদি নিজেদের বিচ্ছের বহরটা মেপে দেখি ত, দেখতে পাই যে আমাদের অধিকাংশ লোকের ইংরাজি জ্ঞান যেমন মুষ্টিমেয় তেমনি খেলো। অধ্যাপকেরা বই না পড়িয়ে নোট দেন বলে তাঁদের উপর চারধার থেকে আক্রমণ হচ্ছে। কিন্তু এ নোট-দানের কারণ কি? বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যার্থীদের অধিকাংশের ইংরাজিভাষার দখল এত কম যে তাঁরা Text-book পড়ে তার মর্শ উক্তার করতে পারেন না,— নিজের ইংরাজিতে সে মর্শ প্রকাশ করা ত তাঁদের একেবারে সাধ্যের অতীত। এ অবস্থায় অধ্যাপকদের দায়ে পড়ে, বিশ্ববিদ্যার সার সংগ্রহ করে তার এমন সব নিরেট বড়ি পাকিয়ে দিতে হয়, ছেলেরা

যা কলেজে গিলে সেন্ট ইলে উগলে দিতে পারে। ফলে দাঢ়িয়েছে এই যে, যে যত বেশি বড়ি গিলিয়ে দিতে পারে সে—তত ভাল অধ্যাপক, আর যে যত বেশি বড়ি ওগলাতে পারে সে তত ভাল ছেলে। তারপর আর একটি কথা, হাজার অপ্রিয় হলেও সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য। অধ্যাপক মহাশয়দের মধ্যে অনেকের ইংরাজি-জ্ঞান ছাত্র-বাবুদের জ্ঞানের চাইতে বড় বেশি প্রবৃক্ষ নয়। এর কারণও স্পষ্ট। কাল যাঁরা শিশু ছিলেন আজ তাঁরা গুরু। হতে পারে যে জর্মান ফরাসী ইতালীয়দের চাইতে আমাদের ইংরাজি জ্ঞান বেশি। তার কারণ এ শিক্ষার আমরা যে দাম দিই সে দাম তাঁরা দেয় না। সে দাম হচ্ছে স্বভাষাকে ভাসিয়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে বাহ্যজ্ঞান হারানো। বিদেশী ভাষার মারফৎ পাওয়া শিক্ষা আমাদের মনে বসে না, কথার কথা থেকে যায়। আমি এ সম্বন্ধে পূর্বে এত বক্তৃতা করেছি যে এস্তলে তাঁর পুনরুক্তি নিষ্পত্তিযোজন। আমাদের ক্ষুলে ছেলের মন এবং বস্তুজগতের মধ্যে, ইংরাজি ভাষা একটি পূরু পর্দার মত ক্ষুলে থাকে, ফলে তাঁদের মনে reality-র জ্ঞান এক প্রকার নষ্ট হয়েই যায়। বস্তুর সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ যে বাচ্য বাচকের সম্বন্ধ, বালককালে বিদেশী ভাষা শিখতে গেলে সে জ্ঞান হারানো অবশ্যস্তাবী হয়ে পড়ে। কারণ, বিদেশী ভাষার শব্দের সঙ্গে বস্তুর কোনও সাক্ষাৎ ঘোগাঘোগ নেই, আছে শুধু স্বদেশী শব্দের সঙ্গে। Translation এবং re-translation-এর প্রসাদে শুধু এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মে। ভাষার সঙ্গে reality-র ঘোগাঘোগের জ্ঞান জন্মে না।

আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবন সমস্যা
কুলে এজন একবার হারালে কলেজে এসে আর তার পুনরুদ্ধার
করা যায় না। এর প্রমাণ স্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সম্প্রতি আমি
এ বৎসরের প্রাথমিক B.L.-এর কাগজ পরীক্ষা করছি, শ'ধানেক কাগজ
দেখা হয়েছে, তার মধ্যে পাঁচখানিতে moveable এবং immovable
property-র কি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে জানেন?—হ'দিন পরে যাঁরা
উকিল হবেন তাদের ধারণা যে-সম্পত্তি অচল, তাই immovable
property, যথা—পর্বত এবং যে-সম্পত্তি সচল তাই হচ্ছে moveable
property, যথা—নদী। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা যে কি তা
বাড়ীর চাকর দাসীরাও জানে, কিন্তু কুলের ইংরাজি শিক্ষার কৃপায়
B.A. B.Sc. রাও জানেন না। একজন লিখেছেন যে, incorpo-
real property হচ্ছে সেই সম্পত্তি which has no physical
existence। জবাব ঠিক হয়েছে, কিন্তু তিনি তার উদাহরণ দিতে
গিয়ে, copyright ইত্যাদির নাম উল্লেখ না করে, উল্লেখ করছেন
“air.” কিমার্শ্যমতঃপরম? কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্যের বিষয়
আছে। যিনি লিখেছেন air হচ্ছে সেই বস্তু যার কোনও physical
existence নেই শুনতে পাই তিনি হচ্ছেন B.Sc. পাশ! এই
কি যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে, কুলে সকল শিক্ষা ইংরাজি ভাষার
মাল্লক হওয়াতেই আমাদের শিক্ষা এতটা নিষ্ফল হচ্ছে?
আপনারা যদি Secondary School-য়ে ইংরাজিকে Second
language করতে পারেন তাহলে আমার বিশ্বাস দশ বৎসরের
ভিতর বাঙালী ভাতির মনের চেহারা ফিরে যাবে, এবং তখন
দেখা যাবে আমাদের শিক্ষায় ও জীবনে আর আকাশ পাতালে
প্রভেদ নেই।

আমি এই বলে এ প্ৰবন্ধ আৱস্থা কৱেছি যে, আমি একজন
ষ্টুডেণ্ট এবং সেই ষ্টুডেণ্ট হিসেবেই আমি বৰ্তমান শিক্ষা সমস্তাৱ
আলোচনা কৱেছি, অৰ্থাৎ এ ক্ষেত্ৰে সমস্তাটা কি তাই বুৰুতে
চেষ্টা কৱেছি, তাৰ কোনও কাটা-ছাঁটা মৌমাংসা কৱে দিতে সাহসী
হই নি। আমি মানি যে পেটেৱ ভাবনা অবশ্য আমাদেৱ সৰ্ব-
প্ৰধান না হলেও সৰ্বপ্ৰথম ভাবনা কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি
যে পেট যদি মন্তিক্ষেৱ চালক হয়, তাতে পেটেৱ কিছু লাভ হয় না,
কিন্তু মন্তিক্ষেৱ অশেষ ক্ষতি হয়। বাঙালী যে মাৰোয়াড়ি নয় এ
হুঃখ আমৱা আগেও কৱেছি। রামমোহন রায় ও রামীনুনাথেৱ
স্বজ্ঞাতিৰ সৰ্বনাশ যে literary education-এৱ ফলে হয়েছে, এই
বিশ্বাসেৱ বলে আমৱা তথাকথিত Scientific education-এৱ
জন্ম লালায়িত হয়ে উঠেছিলুম। ফলে কলেজে একদল ছেলেদেৱ
গোড়াধৰেকেই একমাত্ৰ বিজ্ঞান শিক্ষা দেৰাৰ বন্দোবস্ত কৱা হল।
সে শিক্ষাৱ প্ৰসাদে আমৱা কি লাভ কৱেছি? আমাদেৱ আশা
ছিল, যে ছেলেৱা কাৰ্য দৰ্শন ইতিহাস ব্যাকরণ ত্যাগ কৱে বিজ্ঞান
ধৰলেই, এক কথায় লাইভ্ৰেৰী ছেড়ে লাবৱেটৱিতে ঢুকলেই বঙ্গমাতা
অন্নপূৰ্ণা হয়ে উঠবেন, অন্তত B. Sc.-দেৱ ঘৰে টাকা রাখিবাৰ
আৱ জায়গা থাকবে না। কিন্তু আজ কি দেখতে পাচ্ছি? দেশ
'ধন ধান্তে পুল্পে ভৱা' হয়ে ওঠা দূৰে থাক, B. Sc.-ৱ অন্ধচিকিৎসা
B. A-ৱ চাইতে একচুলও কম নয়, এবং উভয়েৱ বাজাৰ-দৱ এক,
বড় বাজাৰেও, ৰো-বাজাৰেও।

আপনাৱা এই কথাটা স্মৰণ রেখে শিক্ষাৱ নৃতন ব্যবস্থা কৱবেন
যে বাঙালী আসলে সৱস্বতীভৰ্তা জাত এবং তাৱা যেদিন ভাবেৱ চৰ্চা

খুব সন্তুষ্ট আপনি আমাকে কথনও দেখেন নাই। দূর হইতে কাগজ পত্রের খ্যাতিতেই আমার পরিচয় পাইয়াছেন। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইতেন আমিও সাধারণ ক্ষুদ্র-মানবের স্থায় অতি দুর্বল ও ক্ষীণপ্রাণ জীব—আমাতেও কোনরূপ অসাধারণ নাই। আপনিও যেরূপ জীবন সমস্যার সমাধান না পাইয়া সংশয় সমুজ্জে হাবুড়ুবু থাইতেছেন, আমার দশাও ঐরূপ। মরণের রহস্যের সম্মুখে জীবের প্রাণ ব্যাকুল—কোনো মীমাংসা পাইবার কোন উপায় বোধ করি নাই।

আপনার প্রশ্নগুলির আমি যে আলোচনা না করিয়াছি তাহা নহে। মনুষ্যমাত্রেই করে, আমিও করিয়াছি—হয়ত অনেকের চেয়ে একটু বেশী মাত্রাতেই করিয়াছি। কিন্তু উভয়ের আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা একখানি ক্ষুদ্র চিঠিতে কিরূপে প্রকাশ করিব ?

আমি যতদূর বুঝিয়াছি, যতক্ষণ মানুষের জীবভাব থাকিবে, ততদিন মরণের ভয় হইতে নিঙ্কতি নাই—ততদিন religiousness-ই একমাত্র উপায় ;—এই religiousness-এর মোটামোটি দুইটা লক্ষণ, একটা optimistic.

—তাহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা—ইহা রামপ্রসাদের ভাব,—আমি যখন মায়ের চরণ আঁকড়াইয়া আছি তখন কি তয়—শমন বেটো কি করিবে ? এইরূপ attitude কোনরূপ যুক্তিক সংশয়ের ধার ধারে না—জোর করিয়া যুক্তিক ঠেলিয়া ফেলা আবশ্যিক। যে পারে সেই সফল হয়।

আর একটা দিক্ দৈন্তের দিক্—আমি পাপী তাপী দীন, আমার

কি হইবে—ত্যরি তিনি দয়া করিয়া টানিয়া লইবেন—যদি তিনি কূলে ধরিয়া উদ্ধার করেন তবেই রক্ষা। ইহাতে একটা নৈরাশ্য, Despondency আনে যে অতি উৎকট অবস্থা।

বৈষ্ণব ও Christian সাধুদের মধ্যে অনেককে এই পথে Slough of the despond-এর ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে—কেহ কেহ সম্পূর্ণ acquiescence দ্বারা শাস্তিলাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত খৃষ্টানদের মধ্যে John Bunyan. আমাদের মধ্যে চৱম দৃষ্টান্ত স্বয়ং চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের পক্ষে মরণের বিভীষিকা ছিল বলিলে অমুচিত হইবে—এখানে বিরহের যাতনা—প্রাণ স্বরূপের সহিত বিরহ সন্তাননায় তিনি কেবলই হা হা করিয়া গিয়াছেন—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শাস্তি অমুভব করেন নাই। তাঁহাকে যদি ভগবান বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে তিনি মামুষকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য অভিনয় করিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু যাঁহারা সাধনার পথে পথিক তাঁহাদিগকে অন্ধ-বিস্তর এই বিরহব্যথা ভোগ করিতে হয়।

ইহা সাধনোন্মুখ জীবের অবশ্যস্তাবী বিধিলিপি। তাঁহারা মরণ জানেন না, বিরহ জানেন—অমরত্ব তাঁহাদিগের নিকট অর্থহীন, তাঁহারা মিলনের ইচ্ছায় ব্যাকুল।

মনে যতক্ষণ জীবত্বাব থাকিবে ততক্ষণ সংশয় যাতনা থাহা মরণ ভয় হইতে উৎপন্ন তাহা থাকিবেই। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যতক্ষণ আপন্যার ব্রহ্মস্বরূপতার উপলক্ষি না ঘটে, ততক্ষণ মরণ ভয় থাইবার নহে। আমিই ব্রহ্ম—আর কোনো ব্রহ্ম নাই—আমিই জগৎকর্তা ও জগৎ-বিধাতা,—এই যে জন্ম মৃত্যু জীবন—এ সমস্তই আমার লীলা-

ভিনয়—এইটুকু উপলক্ষি না হইলে বিরহভাব ঘুচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাও উপলক্ষির ব্যাপার—কোন চেষ্টা করিয়া তর্কস্থান্না এ উপলক্ষি ঘটিবে না।

আমার রচনার মধ্যে, “জিজ্ঞাসা”র ও “কর্মকথা”র শেষ দিকে—এই কথাটি বুঝাইবার যৎকিঞ্চিং চেষ্টা করিয়াছি। যে চেষ্টায় স্বয়ং শক্তরাচার্য কৃতকার্য হন নাই, তাহাতে আমার মত কৌট কতদূর করিবে !

যাহাই হোক আপনার মনের অবস্থা যেনেপ দেখিতেছি, আপনাকে দু'একখানা গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি। যদি না পড়িয়া থাকেন, পড়িতে পারেন। বাংলায় ৩ঙ্গেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “অভয়ের কথা” গ্রন্থখানি পড়িবেন। ইংরাজিতে William James-এর Varieties of religious Experience (Clifford Lectures) খানি পড়িতে পারেন। আমি religiousness-এর বেছইটি মৃষ্টান্ত দেখাই তাহা আপনি এ পুস্তকে পাইবেন। এ বিষয়ে আলোচনার অন্ত নাই—আমি নিজে অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত নিজের মনে থাঢ়া করিয়া তাহাই আশ্রয় করিয়া কতকটা শান্তিতে আছি। কিন্তু কুস্তিপত্রে আপনাকে তাহা কিরূপে বুঝাইব? উহা আমার জীবনব্যাপী চেষ্টার ফল—এখন উহা অঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। জীবন সমস্যার সম্বন্ধে আমি আপনাকে একটা attitude-এ বসাইয়া রাখিয়াছি—আপনাকে সহসা কিরূপে সেই attitude-এ আনিব?

আমি কয়েক বৎসর হইতে মন্ত্রিক দৌর্বল্যে কাতর—সক্ল সময়ে চিঠি লিখিতে পারি না। আমার হস্তাক্ষর অতি অস্পষ্ট। এজন্তু আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পত্ৰদ্বাৰা এই দুরুহ বিষয়েৰ আলোচনা ত অসম্ভব বটেই, আমাৰ শাৱীৱিক অবস্থা মন্তিক দোৰ্বল্যেৰ হেতু আমি উহাতে একেৰাৰেই পৰাবৃথ। “ভাৱতবৰ্ষ” পত্ৰিকায় আমাৰ যে প্ৰবন্ধাবলি গত দুই বৎসৰ ধৰিয়া বাহিৰ হইতেছে, উহার শেষভাগে এই বিষয়ে কিছু আলোচনাৰ ইচ্ছা আছে।

আপনি আমাৰ প্ৰতি যে শ্ৰদ্ধা দেখাইয়াছেন তজ্জন্ম আমাৰ নমস্কাৰ লইবেন।

শ্ৰীৱামেন্দ্ৰসুন্দৱি।

মুক্তি।

—::—

যে সময়ের কথা ব'লছি তখন দার্জিলিং-এ মানুষের অভাব না থাকলেও দেবতার প্রভাব একেবারে হ্রাস হয় নি ; এবং বাচ্ছিলে একালের শিশু-মানবের দোলনার পরিবর্তে সে কালের শিশু-দেবতার পুস্পধনুটাই ছিল একমাত্র খেলবার জিনিস—যদিও দেখবার নয় ।

এ কহিনীটি আর কিছুই নয়—সেই আদিযুগের বাচ্ছিল-ইতি-হাসের একটা অধ্যায় মাত্র ; এবং এটা রচিত হ'য়েছিল শুক্র তিনটি প্রাণীকে নিয়ে—একটি পুরুষ, একটি নারী এবং একটি গাধা ।

পুরুষটি থাকত চৌরাস্তার কাছে একটা হোটেলে—নিতান্ত অনাজ্ঞীয়দের মধ্যে ; নারীটি থাকত জলাপাহাড়ের একটা বাড়ীতে—আজ্ঞীয়স্বজনের মধ্যে ; এবং গাধাটি থাকত ভুটিয়া-বন্তির একটা আস্তাবলে—আজ্ঞীয়-অনাজ্ঞীয় উভয়বিধ চতুর্পদেরই মধ্যে ।

নিয়তির বিধানে এই তিনটি প্রাণী একদিন বাচ্ছিলে একত্রিত হ'য়েছিল—এবং তারই ফলস্বরূপ এই আখ্যায়িকার স্ফুরণ ।

(২)

সে দিন শরতের অপরাহ্ন । বাচ্ছিলের সর্বোচ্চ চুড়োটার পশ্চিমে থানিকটা নীচের দিকে একখানা নাকবারকরা পাথরের

উপৱ নাৱী ব'সেছিল এবং পুৰুষ তাৰ পায়েৱ তলায় আৱ একখানা পাথৰে ঠেস্ দিয়ে দাঢ়িয়েছিল।

নাৱীৰ পৱিধেয়েৱ আগুন-ৱংটা তাকে মানিয়ে ছিল ভাল। এই থেকে তাৰ রূপেৱ এবং বয়সেৱ পৱিচয় পাওয়া যেতে পাৱে। পুৰুষেৱ রূপেৱ পৱিচয় অনাবশ্যক এবং তাৰ গুণেৱ পৱিচয় দেবাৱ মতন বয়স তথনও হয় নি।

পুৰুষ ব'লছিল—“সমস্ত বন্দোবস্তই ঠিক কৱে ফেলেছি। রাত্ৰিৰ দেড়টাৰ সময় ডাঙি অপেক্ষা ক'ৱবে—তোমাদেৱ বাড়ীৰ সেই উপৱকাৰ রাস্তাটায়। রাত্ৰিৰ থাকতেই ঘূৰ ঢাঢ়িয়ে যাবো এবং কাল এমন সময় আমৱা কালিম্পং-এ”।

পুৰুষেৱ স্বৰ স্নায়বিক উভেজনা ব্যঙ্গক। নাৱী কিন্তু স্বভাব-সিদ্ধ কোমল স্বৰেই একটু অশ্বমনস্ত ভাবে প্ৰশ্ন ক'ৱলে—“এৱ মধ্যেই” ? তাৱপৱ কিছুক্ষণ চুপ্ ক'ৱে থেকে ব'ললে—“কিন্তু তোমাৰ দিক থেকেও তো কথাটা একবাৱ ভেবে দেখতে হয়। সমস্ত জীবনটা নষ্ট ক'ৱবে একটা চা-বাগানে কাটিয়ে” ?

পুৰুষ যা’ উভেৱ ক'ৱলে তাৱ মৰ্ম্ম হ'চ্ছে এই যে, সে যদি তাৱ প্ৰেমেৱ সৌৱতে নাৱীৰ নষ্ট গৌৱবটা ঢেকে দিতে পাৱে—তাতেই তাৱ জীবনটা সাৰ্থক হ'য়ে উঠবে।

“এৱ বেশি উচ্চাকাঞ্চকা আমাৱ আৱ নেই”।

উভেজনা সত্ত্বেও পুৰুষেৱ স্বৰে এমন-কিছু ছিল যা’ নাৱীকে একেবাৱে স্বপ্নেৱ মত আচ্ছন্ন ক'ৱে রেখেছিল। সেটা পৱিপূৰ্ণ প্ৰেমেৱ আবেগ, গভীৱ সমবেদনাৱ প্ৰকাশ, তীব্ৰ কামনাৱ প্ৰেৱণ—অথবা এই তিনেৱ মিশ্রন-সংংঘাত একটা কিছুও হ'তে পাৱে।

নারী কিন্তু ঠিক পুরুষের কথাই ভাবছিল না। তার নিজের ব্যথাটা যে কোথায় সেইটেই বারবার মনে প'ড়ছিল। সংসারের অপমান-অত্যাচার সে বরণ ক'রে নিতে পারত; কিন্তু অভিমানের দাবীটা যেখানে বড় বেশি, অবহেলাটা যে সেখানে তেমনিই অসহ !.....
বন্ধমানটা যাই হোক না কেন—ভবিষ্যৎটাই কি খুব আশাপ্রদ? সমাজ-সৌরচক্র থেকে গতিভ্রষ্ট হ'য়ে কোন্ অনিদিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে বাকী জীবনটা কাটাবে সে? প্রেম তো একটা নেশা মাত্র। যদি নেশা কেটে যায়, তা'হলে.....?

মুখ ফুটে ব'ললে—“এ-রকম ভাবেই যদি চলে তো চলুক না কেন”?

“না—তা’ আর চলতে পারে না”।

কেন চ'লতে পারে না পুরুষ সেটা বুঝিয়ে ব'ললে না। কিন্তু তার স্বরে পৌরুষ-অভিমানের একটা আভাস ছিল।

নারীর তখন মনে প'ড়ল—গৃহত্যাগ-কল্পনাটা তো প্রথম তারই মন্তিকে স্থান পেয়েছিল। পুরুষ সেটাকে নিজের উৎসাহে সন্তুষ্ট ক'রে তুলেছে বৈত নয়।

তাই লজ্জিত-কাতর স্বরে ব'ললে—“যেতেই হবে আমাকে। তবে আর একটু সময় চাই। আজ রাত্রির ন'টার সময় তোমায় শেষ জানাব”।

নারীর এই দ্বিভাবে পুরুষের দায়িত্বারটা বাড়ল বৈক'ম্বল না।

নারী তারপর বাড়ী ফেরবার প্রস্তাব ক'রলে এবং নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল। “কাল কোথায় বা বাড়ী আর কোথায় বা

কি”? পুরুষ এই পরিহাসভাবটা আর নিবিড়ে দিলে না এবং নারীর
কলহাস্তে কেরুবার পৰটা মুখরিত হ'য়ে উঠতে লাগল।

(৩)

সেই কেরুবার পথেই গাধার সঙ্গে দেখা।

যেখানে জিম-নামক কুকুরটার গোর আছে সেইখানে গাধাটা
দাঢ়িয়েছিল। তার মুখে ছিল এক গোছা ঘাস এবং পিঠে ছিল
একটি ছেলে। নারীর হাস্তরবে সে কান খাড়া ক'রে মুখ কিরিয়ে
দাঢ়ালে এবং পরক্ষণেই নারীকে দূরে দেখতে পেয়ে তার দিকে
ছুটল। সইস-বালকটা তার পিছনে ধাওয়া ক'রলে এবং পিঠের
ছেলেটি প'ড়ে ঘাবার ভয়ে চর্ম-বেক্টনীটা ছ'হাতে আঁকড়ে ধ'রলে।

পুরুষ নারীকে আগলাবার জন্যে এগিয়ে এল। কিন্তু তার
কিছুই দরকার ছিল না। গাধাটা নারীর কাছে এসে শাস্তিভাবে মাথা
বাঢ়িয়ে মুখ নীচু করে দাঢ়ালে—যেমন করে’ গাধারা দাঢ়ায়।

নারী ছেলেটিকে আশ্রম করে’ গাধার দিকে চেয়ে আশ্রম্য হ'য়ে
গেল। ব'ললে—“এ বে সেই পেমা”!

এ বে তার মৃত সন্তানের চড়বার ডকি এবং খেলবার সঙ্গী ছিল।
গেল বৎসর এমনি সময় রোজ ছবেলা সে পেমাৰ পিঠে চ'ড়ে
বেড়াত। তার সঙ্গে কথা কইত, বাগড়া কৱত। কখন মারত, কখন
গলা জড়িয়ে আসুৱ কৱত। এই মুক প্রাণীটি সে সমস্তই নীৱৰ্বে সহ
কৱত এবং তার পুরুষার অৱলুপ নারীর কাছ থেকে কখন কখন
বিক্ষিক উপহার পেত।

এখনও তো এক বৎসর হয় নি।

“সন্দুর পত্র” মাসিকের নতুন বই

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দীর জুন মাহ

১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দীর জুন মাহ

১। “নানা-কথা”——ইহাতে প্রথম বাবুর ২১টি প্রবন্ধ, আকা।
ভিসাই আটপেজী, ৩৬২ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট আইভরি কিলো
কাগজে ছাপা—মূল্য দেড়টাকা মাত্র।

২। “আছতি”——ছোট-গল্লের বই, ইহাতে ছয়টি গল্ল, শুদ্ধশু
বাঁধাই, প্রায় ২০০ শত পৃষ্ঠা—মূল্য পাঁচজিকা মাত্র।

৩। “পদ-চারণ”——কবিতা সমষ্টি, উৎকৃষ্ট আইভরি কাগজে
ছাপা—মূল্য বাবু আনা মাত্র।

৪। বীরবলের হালখাতা—মূল্য এক টাকা মাত্র।

(ইহাতে বীরবলের সবচ প্রবন্ধ সমিবেশিত হইয়াছে।)

৫। চার-ইয়ারী কথা (কবিতা)—মূল্য বাবু আনা মাত্র।

৬। সন্দেক-পঞ্জাশ (কবিতা)—মূল্য আট আনা মাত্র।

সন্দুর পত্র—সন্দুর পত্র, “সন্দুর পত্র”, ১. অন্ত হেটিংল. প্রিস,
কলকাতা ১৩, বাবু এন্ড সি, সন্দুর পত্র প্রকাশন এবং সন্দুর
পত্র প্রকাশন প্রেস, কলকাতা ১৩।



“ଦେଖିଲ ହୃଦୟ କମଳ କିନ୍ତୁ ଆମି ନାହିଁ ଆମି ହିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ।”

—ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ

• * • ଅଧିକ ପାଇଁ • * •
“ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ”—ପ୍ରକାଶନାଥ ପାତ୍ର

କବିତା ।

ମାୟର ଧାର୍ତ୍ତି ନିଜା । ତାର ଆନନ୍ଦର ଖୋଜେ କାହିଁ ପରି,
ଦେଖେ କୌଣସାକ୍ଷାତ୍ ଏହା କାଳିକାକରା ହବି ମେଘତେ ପାଞ୍ଚା
ଧାର ।

ଏକନିମ କଲେଜର ଗୋପ ହେବେ ମେହିଁ କବିତାର ତୋଷ
ପଢ଼ନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପ ପଡ଼ନ ତାର କାହାଣ, କେ ବାଡିର କରନ୍ତିର
ପୁରୋହୀ ପୁଟେର ଉପର ହୁଅନ ନହୁନ ଲୋକେର ହବି କୁଟେ ଉର୍ଦ୍ଦ୍ଧ ।
ତାହାର ଏକବିନ ଯିବା ଏବିନା, ଆରେକଟି ମେଘର କରନ ମୋର ବୟେ
କି ପଢ଼େଥୋ ।

ଶେଷିନ ହେବା ଗେଲ ମେଇ ଅବୀଶା ଆନନ୍ଦର ଧାରେ ବସେ ଦୁଃଖିତିର ଚାଲ
ବୈଶେ ମିଳେ, ଆର ମେଘର ଗୋପ ବେଶେ ଅଳ ପଢ଼ନ୍ତି ।

ଆରେକବିନ ମେଥା ଫେଲ ଚାଲ ବୀଧିର ଲୋକଟି ବେଇ । ମେଟେଟି
ଏକଳା ଘେସେ ନିଜାଜେ ଶେବ ଆଲୋରେ ବୋବ ହଲ ବେଳ ଏକଟି ପୁରୋହୀ
କୋଟେ ଆକେର ଶିଖିଲର କେବ ବର କୁରେ ଝାଁଚିଲ ଦିରେ ମାଜୁଚି ।

ଆରଗର ଦେଖା ହୋଇ ଆନନ୍ଦର ହେବ ଉପିନିର ମଧ୍ୟେ ନିଜେ ୪୩ ପାଇଁ
ଦିବେର କାହିଁର ଧାରା । କହନେ କା କୋଣେର କାହିଁ ଧାରା ନିଜେ ତୁଳ
ଦାହେ; କହନେ କା କୌଣସି ହାତେ ଦେଖୁବି କାଟେ; କହନେ କା ମାନେର କାହିଁ
କା ହାତ ଦିଲେ କେବ କେବ ନିଜେ ତୁଳ ପୁକୋଇ । କହନେ କା କାହିଁର କାହିଁ
କାହିଁର କାହିଁର କାହିଁର କାହିଁର କାହିଁର କାହିଁର କାହିଁର କାହିଁର କାହିଁର କାହିଁର

দুপুরবেলায় পুরুষেরা আপিসে ; মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা তাস খেলে ; ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্বকম্ বিষর্ষ হয়ে আসে। সেই সময়ে এই মেয়েটি ছাতের চীলে-কোঠায় একলা পা-শেলে কোনো দিন কোলে বই রেখে পড়ে, কোনো দিন বা বইয়ের উপর চিঠির কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে থমকে থাকে, আর তার আঙুল যেন চলতে চলতে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে খানিকটা চিঠি লিখছিল, খানিকটা কলম নিয়ে খেলা করছিল, আর আলসের উপরে একটা কাক আধ-খাওয়া আমের ঝাঁঠি ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছিল।

এমন সময়ে এক প্রোটা নিঃশব্দে তার পিছনে এসে দাঁড়াল। তার মোটা মোটা হাতে মোটা মোটা কাকন। তার সামনের চুল বিরল, সেখানে সিঁথির জায়গাটাতে মোটা সিঁদূর ঝাঁকা।

বালিকার কোল থেকে তার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচম্ভা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাখী হঠাৎ যেন পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখতে পাওয়া যায় না। কখনো বা গভীর রাত্রে কখনো বা সকালে বিকালে এই বাড়ি থেকে এমন সব আভাস আসে, যার থেকে বোৰা যায় এই সংসারটার তলা কাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার জন্যে মাথা ঠুকচে।

অথচ জানলার ভিতর দিয়ে দেখা যায় তেমনিই চলচে ডাল বাছা, আর পান সাজা,—মাঝে মাঝে দেখা যায় দুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেচে উঠোনে কলজলায়।

এমনি কিছুদিন যায়। সেদিন কাঞ্চিক মাসের সক্ষ্যাবেলা ; ছাতের

উপর আকাশপ্রদীপ জলেচে, আন্তর্বন্দোর ধৌয়া যেন অঙ্গর সাপের
মত পাক দিয়ে আকাশের নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচে।

বনমালী বাইরে থেকে ফিরে এসে যেমনি তার ঘরের জানালা
গুল্ল, অমনি তার চোখে পড়ল সেই মেয়েটি ছাদের উপর হাত জোড়
করে হির দাঢ়িয়ে। তখন গলির শেষ প্রাণে মল্লিকদের বাড়ি
ঠাকুরঘরে আরতির কাসর ঘটা বাজ্চে। অনেকক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ
হয়ে যেবেতে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার সে প্রণাম করলে; তারপরে
চলে গেল।

সেদিন বনমালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখলে। লিখেই নিজে গিয়ে
তখনি ডাকবাকসে ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগ্ল সে
চিঠি যেন না পৌছয়। সকালবেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন
মুখ তুলে চাইতে পারলে না।

সেই দিনই বনমালী মধুপুরে চলে গেল, কোথায় গেল কাউকে
বলে গেল না।

কালেজ খোল্বার সময় সময় ফিরে এল। তখন সক্ষ্যাবেল।
সামনের বাড়ির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অঙ্ককার। ওরা সব কোথায়
চলে গেছে।

বনমালী বলে উঠল, “ষাক, তালই হয়েচে! স্বপ্নের বোঝাৰ
মত এমন বোঝা আৱ নেই!”

ঘৰে গিয়ে দেখে ডেক্সের উপরে একবাশ চিঠি। সব নীচের
চিঠিৰ শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অঙ্কে,
তাতে পাড়াৰ পোষ্ট-আপিসেৰ ছাপ।

ଚିଠିଖାନି ହାତେ କରେ ସେ ସେ ରଇଲ । ଲେଫାଫା ଥୁଲ୍‌ଲେ ନା ।
ଏକବାର କେବଳ ସେଟୀ କେରୋସିନେର ଆଲୋର ସାମନେ ତୁଲେ ଧରେ ଦେଖିଲେ ।
ଆନାଲାର ଭିତର ଦିଯେ ଜୀବନଧାତ୍ରୀର ଯେମନ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଛବି, ଆବରଣେର
ଭିତର ଦିଯେ ଏଇ ତେମନି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ।

ଏକବାର ଥୁଲ୍‌ତେ ଗେଲ, ତାରପରେ ବାଙ୍ଗେର ମଧ୍ୟେ ଚିଠିଟା ରେଖେ ଚାବି
ବଞ୍ଚି କରେ ନିଜେର ମାୟେର ନାମେ ଶପଥ କରେ ବଲ୍‌ଲେ—“ଏ ଚିଠି କୋନୋ
ଦିନ ଥୁଲ୍‌ନ ନା ।”

ଶ୍ରୀରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ।

বিলে জঙ্গলে শীকাৰ ।

—::—

কলিকাতা, ২০শে অগস্ট, ১৯৪৭ ।

মন্তেহের অলকা কল্যাণ,

শীকাৰের রাজ্যে বাস্তুবীৱকেই সম্মানেৰ প্ৰথম পদবী দেওয়া
উচিত, তিনিই এ-রাজ্যেৰ অধিনায়ক । যদি ও এ-রাজকীয় আতিৱ
সংখ্যা ততো অধিক নয়, তবুও আমাদেৱ বিশাল অৱণ্যপ্ৰদেশ
সকলে, তাদেৱ নিৰ্বিংশ হৰাৰ সন্তোষনা খুবই কম । অনেকে মনে
কৰেন শ্বাপনজাতিৰ বংশক্ষয়েৰ জষ্ঠে শীকাৰীৱাই বিশেষকূপে
দায়ী ; একথা আফ্রিকা আৱ আমেৰিকাৰ সম্বন্ধে হয়ত বা সতা ।
চতুৰ্থপদ রাজ্যেৰ সাধাৱণ প্ৰজাৰ্বগেৱ, যেমন হৱিণমহিষেৰ সংখ্যা,
আমাদেৱ দেশে এতই হুস হয়ে গিয়েছে যে, সেটা একটা ভাবনাৰি
বিষয় সম্বেহ নাই । যে ব্যক্তি মৃগয়াৰ নিয়ম মেনে চলে, আৱ
যথাৰ্থ যাব এ সম্বন্ধে অনুৱাগ আছে, সে কখনো নিৰ্বিচাৰে জীবহত্যা
কৰে না ; যাদেৱ সঙ্গে শক্রতাচৱণ কৰে, তাৱা প্ৰায়ই প্ৰলয় জোয়ান,
আৱ যাতে অধিক সংখ্যা মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, সে বিষয়েও দৃষ্টি
ৱাখে । কিন্তু শীকাৰ যাদেৱ ব্যবসায় আৱ আবিকা উপাৰ্জনেৰ
উপায়, তাৰাই কোন নিয়ম গ্ৰাহ কৰেনা, জীবহত্যাকাণ্ডে সংখ্যা
নিয়মিত কৱবাৰ চেষ্টা তাদেৱ আৰ্দ্দা নাই । এই অত্যাচাৰ রহিত

করবার অঙ্গে অনেক বিধিবিধান প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে আরও সতর্ক সাবধান হওয়া আবশ্যিক, তা নাহ'লে আমরা যে-সকল দৃঢ় আর যে আনন্দ উপভোগ করে গেলাম, আমাদের বংশধরদের ভাগ্যে আর তা' ঘটবে না।

বহুবৎসর পূর্বে কটক জিলায়, এখনও তার ব্যতিক্রম হয়নি, এক একটা শীকারযাত্রায় প্রায় তিনিশত অনুচর সহযাত্রী হত—এর মধ্যে আবার অনেকে সেকেলে-ধরণের বন্দুক ধাড়ে করে আসত। দিনের শেষে আমরা যখন তাঙ্গুতে ফিরতাম, তখন এই অনুচরগণ সবাই প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে দেখলে, আমরা আপনাদের ভাগ্যবান বলে জ্ঞান করতাম। এরা এক এক অন, ত্রিশ ত্রিশ গজ তফাতে, বন্দুক ধাড়ে জঙ্গল ঘিরে থাড়া হয়ে যেত; যে হতভাগারা উত্তরাধিকারী সহে কিন্তু পয়সার জোরে এমন সব দানব-অন্ত সংগ্রহ করতে পারে নি, তারা গিয়ে পাহাড়ের মাথার উপর চড়ত, আর সেগুল হতে মহাদেবের ভূত-প্রেতের মত অমানুষিক চৌঁকার করে, ঢিল পাটকেল, বড় বড় পাথরের চাঁড়, ছুঁড়ে, গড়িয়ে, শীকার খেদিয়ে এক আয়গায় জড় করবার চেষ্টা করত। কিন্তু সে চেষ্টার ফল কিছুই হ'ত না। ময়ূর, চিকারা হরিণ, শূকর ছানা, সজাঙ্গ—ষাই পাশ দিয়ে যাক না কেন, অমনি এরা সেই সেকেলে বন্দুকগুলো ছুঁড়ত। বদি ও বেশী কোন বিপদ ঘটতে আমি এপর্যন্ত দেখিনি, সে কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষের পুণ্যের জোরে; মরতে মরতে অনেকে কোনক্ষণে বেঁচে এসেছে। বিশ্বস্তসুত্রে দেখেছি যে এ অবস্থায় বিপদ ঘটাই নিয়ম, আর অরের ছেলে নিরাপদে যাবে ফিরে আসাটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। বেশ যোৰা যায়, এই সব বুনোলোক যারা অঙ্গলের

অঙ্গিমাকি খুব ভাল করেই আনে, তারা যে সময়ে-অসময়ে নির্বিচারে অনেক জীবহত্যা করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কারণেই ভারতবর্ষের অরণ্যপ্রদেশে আরণ্যজন্মুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হয়ে যাচ্ছে। যে প্রধান শীকারী আমার মৃগয়া-ব্যাপারে সাহায্য করবার অংশে নিযুক্ত হয়েছিল, সেও দেখলাম এ প্রলোভন এড়াতে পারল না ; যে দিন আমি পৌঁছেছি, সেইদিন সকালেই সে এ মৃগয়া-রীতিবিন্দুক কাজটি করলে। ভাল করে ভোর হবার আগেই বনের পথে সে বাষের পায়ের দাগ খুঁজতে গিয়েছিল ; কথা ছিল থোকথবর করে, ব্যাস্ত্রবীর কোথায় শিবির স্থাপন করেছেন, তার সংবাদ নিয়ে আসবে। একটা মহফিয়া গাছের ছায়ায়, বোপের আড়ালে, শীকারীর সেকেলে বন্দুকটি, একখানি গামোছা, রাতের জুলি, আর তার খেঁথলান অর্কেক-থাওয়া শরীরটা পাওয়া গেল। পরে আমরা জানলাম, এ ভৌষণ হত্যাকাণ্ড, একটি মানুষপাৰ্শ্বী বাঘিনী আৰ তাৰ কন্দু বৎশেধৰেৱা কৰেছে।

খুব সন্তুষ্টতঃ শীকারী একটি চিত্তল হৰ্থাং গুলবাহার (Spotted deer) হরিণের আশায় আশায়, সেইখানটিতে লুকিয়ে বসেছিল,— যৎক্ষেত্রে, যদি দেখা হয় তবে সেটিকে ঘেরে আনবে—ইতিমধ্যে বাঘিনী এসে তাকেই শীকার করে ফেললে। সে অঞ্চলে যতগুলি বাঘ ও বাঘিনী এসে বসত করেছিল, তাৰা সবাই মহামাংসের পক্ষপাতী, মৃগমাংসেও তাদেৱ অৱচি ছিলনা, কাজেই মানুষটিকে আগে পেয়ে তাকে আৰ ছেড়ে কথা কইল না। এসব শীকারীৱা যেমন নির্বিচারে বনৱাঞ্জে জীবহিংসা কৰে বেড়ায়, মনে হল বনেৱ অধিষ্ঠাত্ৰীদেৱতা এৱ প্রাণ নিয়ে তেমনি তাৰি প্রতিশেধ তুললেন। নৱ-মাংস আৱ

মৃগমাংসলোভী বাষেদের কথা বলতে গেলে, বলা উচিত, তারা জিন্ম গোত্রীয় হলেও, একজাতীয়।

তাদের বিপুল শরীর, দৈর্ঘ্য দশফুটের কিছু উপর (রোগণ সাহেবের পরিমাপরীতি অনুসারে) ; শম্ভুষ্ঠামলা বঙ্গমাতা তাদের নামকরণ করেছেন, “বাঙ্গলার বাস্ত্ররাজ”। বঙ্গভূমির অলবাতাসের শুণে তাদের বরবপু শুধু দৈর্ঘ্যে নয়, আয়তনেও বৃক্ষ পায়, তাই তারা দেখতে সহজের কাঞ্জাল কেরাণীদের মত নয়, মকংস্বলের মহিমাপ্রিয় অমিদার ও রাজাৱাজড়ার মত মেদমাংসবহুল, চালচলনও বিশেষ গন্তৌরুরকমের। কিন্তু যে সব বাষ শীকারের সঙ্গাবে শুধু মাঠে-বনে নয়, পাহাড়ে আৱ পাহাড়তলীতে চলাকেগু কৰে, তাদের দেহগুলি, ক্ষিপ্রগতি রাজপুত বৌরের মত দীর্ঘকায়, বসামাংস-বর্জিত, অস্থিমজ্জাৰ সাম্যে দেখতে ঝুঠায় শুন্দর। তারা চতুর, সতর্ক, স্তুতগতি, সহসা তাদের শীকাৰ কৰা কঠিন ; কিন্তু ব্রহ্মপুত্ৰের উপত্যকায় কালুন চৈতে কিন্তু তার কিছু পূৰ্বেই, যখন নদীীৰ আৱ বনভূমি মৱকতশ্শামলত্ত্বে শুসজ্জিত হয়, বাথাবের মহিষের দল সেখাবে স্বেচ্ছায় স্বস্ত্বন্দে আহাৰবিহাৰ কৰে’ দিবি হটপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তাদের শীকাৰ কৰে’ কৰে,’ ব্যাস্তবৌৱেৰা ও শীত্বই বৃঢ়োৱশ্শ শালপ্রাংশু মহাভুজ হয়ে ওঠে ; তখন তাদের দিঘিজয়ী, অশ্বযৈথ যজ্ঞকাৰী বংশবাজ বলে ভৱ হওৱা বিচিৰ নয়। পাহাড়েৰ দেশে ব্যাস্তেৰ ভাগ্যে পশুলাভ সহজ ব্যাপাৰ নয়, অনেক পরিশ্রমই কৰতে হয় ; হরিণ শুকুৰ ভাৱি চতুর, পাইতপক্ষে ধৰা দেৱনা, দিন শুভৱান কৰতে অনেক যেহেতু দৱকাৰ। তাই প্রাণধাৰণ শুধু চলে, ভুঁড়িটি গড়ে তোলা আৱ হৱে ওঠে না, কাজেই নতুন কৰ্মক্ষেত্ৰ খুঁজে বিতে

হয়। এইদের সুস্মক্ষে যা ব'লাম, চিতা ও নেকড়েদের বিষয়ও সেই কথা বলা চলে। এই রকম ব্যাপ্তি-রাজন্যস্পতি যেখানে রাজহ করে, সেখানে অশ্ব কেউ আর অনধিকার চর্চা করতে আসে না, তারা ভিন্ন রাজ্য অধিকারচেষ্টায় দূরে যায়। এছাড়া আরও এক কারণ আছে, যে রাজ্য কোন এক ব্যাপ্তি-অধিকার করে থাকে, সেখানকার পক্ষপক্ষে আভ্যন্তরীন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হয়ে ওঠে। কাজেই সেখানে মৃগয়ার স্ববিধা বড় একটা ঘটে ওঠে না। সেখানে থাকলে রাজায় রাজায় যুক্ত হতে পারে, কিন্তু উলুখড়ের প্রাণ যায় না, পেটও ভরে না। তাই স্বার্থসাধন করবার অন্যে স্বতন্ত্রদেশই শ্রেয়। এছাড়া, দেশবিশেষে এই সব জন্ম বাস করতে একটু বেশী ভালবাসে। তোমাদের মনে আছে বোধহয়, আমাদের হরিপুরের কাছাকাছি জঙ্গলে, তিন তিনটা চিতা, তিন মাসের মধ্যে, উপরি উপরি, আমার শুলিতে মারা পড়েছিল।

এদের স্তৌ-পুরুষের প্রভেদ, আঘাতনে এবং চাতুরতায়। মেয়েরা চালাক বেশি, এমনি করে বোধ হয় তারা গায়ের জোরের অভাবটা পূরিয়ে নেয়। তা নইলে পুরুষদের কাছে স্তৌজাতিকে খাটো করে কোন কথা বলি, এমন সাধ্য আমার নেই। অলকমণি, তোমার এ বিষয়ে ভীত হবার কিছু নেই, নাহয় তোমার পতি-দেবতাকে এইটুকু পড়ে শুনিয়ো না, তাহলেই কোন গোল হবে না! সন্তান পালন আর রক্ষণের অন্যেও বাধিনীকে অনেক সময় বেশি সর্ক হতে হয়। কেননা বাপেদের গ্রাস হতে তার পেটের ছেলেদের রক্ষা করবার জন্যে অনেক বুদ্ধিমত্তা, অনেক ফন্দীজ্ঞান দরকার হয়। শুধু তাই নয়, এই সময়ে তার ছেলেদের আর আপনার ভরণপোষণের ভার নিজেকে

না নিলে চলে না। যিনি অস্মদাতা তিনি কিছুই করেন না, উল্টে ছেলেগুলিকে কেমন করে মারবেন, সেই মংলবে ফেরেন। ছেলেগুলি কিছু বড়সড় হয়ে যথন আত্মরক্ষা করতে পারে, তখনি তাদের মায়ের ভাবনা যায়। তোমরা সবাই জ্ঞান বোধ হয়, বেড়ালের মত বাঘেরাও শুধিদ্বা পেলেই ছানাদের খেয়ে ফেলে। তাই মা তাদের অনাহারে, অনিদ্রায়, রাতদিন প্রাণপণ করে পাহাড়া দিয়ে থাকে। একবার আমি মন্ত্র একটা বাঘের সঙ্গানে ফিরছিলাম, কিছুতেই আর নাগাল পাই নে, তারপর সাবালক পুত্র-হত্যা-পাপের বমালসাক্ষীতেই সে বাঁধা পড়ল। গ্রামের কোন লোক একদিন ভোর হবার কিছু আগেই তার বাড়ীর কাছে বাঘের ডাক শুনে জেগে ওঠে। তার বাড়ীখানি গ্রামের এক টেরে, বনের কাছাকাছি ছিল। শেষ রাতের উভ্জল চাঁদের আলোতে, সে দেখলে দুটি মন্ত্র চিতা মাঠের উপর খেলা করছে। হঠাৎ ভয়ানক গর্জন শুনতে পেয়ে বেরিয়ে দেখে কি, দুয়ের মধ্যে যে বয়েসে বড়, আকারে আয়তনে বোৰা গেল সে পুরুষ, অন্তিম উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর কুকুরে যেমন ঈদুরকে নাকড়ানি দিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি তাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিলে। বেচারী জলে ভরা একটা নালার মধ্যে গিয়ে পড়ল, করণাময় পিতা আর তার খোজ খবর নেওয়া দরকার বোধ করলেন না, সে পড়েই রইল। এ খবর ভোর-রাতে আমার কাছে পৌঁছল, কাজেই এর পরে তাকে খুঁজে বার করা আমার পক্ষে কিছুই কঠিন হল না—এই ক'রিন ধরে ব্যাস্তবীরের তলাসে আমাকে ভারী হয়রান হতে হয়েছিল কিন্তু। বাচ্ছাটি মায়ের কাছে একটুখানি আদরের চেষ্টায় পিয়েছিল, বাবামশায়ের বুকে আর সে-টুকু সইল না—পুরুষব্যাস

ভালবাসার প্রলে কারো আধিপত্য সইতে পারে না—এমন কি নিজের
পুত্রেরও নয় !

তোমরা মনে কোরনা বাঘ কিন্তু চিতা, অলের ধৰ্ষ নিতে চায় না ;
সচরাচর তারা জলে পা দিতে চায় না সত্য, তবে দরকার হলে শ্রেতে
গা ভাসাতে আপত্তি কিন্তু অনিচ্ছা দেখায় না । আমার বন্ধুবর্গ—
ঝাঁদের সকলেরই সঙ্গে তোমরা বিশেষ পরিচিত—আমায় বলেছেন
আসামে, শ্রীহট্টে বাঘশীকারের সময় তাঁরা দেখেছেন—এরা সাঁতার
দিয়ে বড় বড় খাল বিল বেশ পার হয়ে যায় । একবার একটা বাঘ
দেখে, তার অমুসরণ করে যেতে হঠাতে দেখলেন, সে যেন ধোঁয়ার মত
কোথায় মিলিয়ে গেল, তার আর চিন্মাত্র দেখা গেল না । সম্মুখে
ঘাসেটাকা মাঠ, তার চারদিকে হাতৌর উপর শীকারী, এর মধ্যে
কোন্ যাদুতে এমন অসাধ্য সাধন ঘটল, কারো বৈধগম্যই হ'ল না ।
ক্রমে আবিকার হল মাঠের একটি খাল—বাঘটি টুপ্প করে
তারি জলে নেমে, শুধু মাথাটি জলের উপর জাগিয়ে রেখে, কিনারার
একটি বনঝাউগাছ মরিয়া হয়ে আঁকড়ে ধরে আছে—সেই অবস্থাতেই
সে মহারাজাৰ—গুলিতে মারা পড়ল ।

একবার একটা বাঘ, কিন্তু চিতা, যাই বল, (এদের মধ্যে আমিত
কিছু প্রভেদ দেখি নে, যদিও অনেকে এসম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন)
মন্ত্র একটা বেতবনে ঘনঝোপে কোণ-ঠাসা হয়ে আটকা পড়েছিল,
পালাবাৰ পথ তার একটিমাত্র ছিল, তাও আবার খালের ধারে ।
হেঁটো-ধূতিৰ মত কম-চওড়া একটা খুঞ্চি পথ, আমি তারি পাশে টুল
নিয়ে লুকিয়ে, তার আবির্ভাবের আশায় বসেছিলাম । শীকারীৰা
চারিদিক হতে বন ঘেৱাও কৱে' পিটতে পিটতে আসছিল, আমি

একান্ত উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম—তখন আমার অবস্থা “পততি পততে, বিচলিত পতে, শক্তি ভবদ্বৃপ্যান্ত”!—কিন্তু কৈ, কাঁও দেখা নেই—আর আমাকে এড়িয়ে সে পথ দিয়ে কেউ যে পালিয়ে যাবে, তাৰও কোন উপায় ছিল না। শুধু একটিবার জলে ভারী কিছু পড়ুবার ক্ষীণ একটা শব্দ আমার শ্রতিগোচর হয়েছিল, কিন্তু সে এমন অস্পষ্ট যে, তাতে করে অমন প্রকাণ্ড জানোয়ার যে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, একথা মনে করবার কোন কারণ ঘটে নি ; আর সে শব্দ এতই ক্ষীণ যে, কিছুতেই ভাবতে পারি নি যে অৱণ্য-সম্মাট শার্দুল প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে জীবননন্দীতে শেষ সন্তুষ্যণে প্ৰবৃত্ত। নৈরাশ্য আৱ বিশ্ময় যুগপৎ আমার মনকে অধিকার কৱলে।—হঠাতে প্ৰহৱী একজন চীৎকাৰ কৱে উঠল, অন্ত শীকাৰীদেৱ নিয়ে সেই শব্দ অনুসৰণ কৱে গিয়ে দেখি, সন্তুষ্যণে ঝাঁপিয়ে নিঃশব্দে সাঁতাৱ দিয়ে ওপাৱে পোঁছে, সে চুপি চুপি পলায়নেৱ চেষ্টায় আছে,—শীকাৰীৱ চীৎকাৱে বাধা পেয়ে, সবে থম্বকে দাঢ়িয়েছে!

এমনও দেখা যায়, বায় ১২০ হাত চওড়া খৱস্তোতা নদী সোজা সাঁতাৱ দিয়ে পাৱ হয়ে গিয়েছে, নদীৱ কিনাৱা পৰ্যান্ত তাৱ পায়েৱ দাগ ছিল, তাৱপন্ন ধাৱে ধাৱে অনেকদূৱ সাবধানে হেঁটে গেছে, নিৱাপন পাৱঘাট বেছে নিয়ে তবে জলে নেমেছে। সাঁত্ৰে অন্ত পাৱে গিয়ে, যেখানে একটি গাছ জলেৱ উপন একেবাৱে ভুম্ভি খেয়ে পড়েছিল, সেইখানে কঠিন মাটি পেলে ডাঙায় উঠা যে অপেক্ষাকৃত সহজ হবে, তা সে ঠিক অনুমান কৱে নিয়েছিল। যদিও সোজা সেখানটিতে পৌছবাৱ জন্যে শ্রোতোৱ মুখে সাঁতাৱ দিতে বিশেষ কষ্টই হয়, তবুও লক্ষ্যত্ব হয়নি, প্রাণপণ চেষ্টায় আপন অভৌত সাধন কৱে নিয়েছিল।

এই সব নদীকে সর্বত্র সর্বথা বিশ্বাস করা চলে না, তবুও হিতো-পদেশের ঐতিহাসিক বাঘের চেয়ে, আমি যার কথা বলছি, তার বুক্তি তীক্ষ্ণ ছিল,—তাকে আর পথচলা পথিকের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে হয় নি। অন্য একটা বাঘ আর একবার সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে গিয়ে, জেলের জালে আটকা পড়ে বেঘোরে মারা যায়। পরদিন তার মৃত দেহটা জেলের আমাদের বাড়ী নিয়ে এসেছিল। এরা কই মাত্রের ধরণে বলেই জাল পেতেছিল, কিন্তু এমন নতুন শীকার পেয়ে তারা ভাস্তু খুসি হয়, লাভও করেনি মন্দ ! তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই, আমাদের বাড়ীর উত্তরে যে বিল আছে, চওড়ায় এক মাইলের উপরে হবে। যথাকালে এখানে ইঁস চৰাচৰি, আর স্লাইপের মন্ত্র মেলা বসে যায়। কথায় বলে “গাঁ দেখ্বিত কলম, আর বিল দেখ্বিত চলন”;—এ বিল সেই বিখ্যাত চলন-বিলের শাখা, এরি ধারে জলাভূমিতে বছর কুড়ি আগে বুনো গোঘের দল চরে বেড়াত। একবার দুর্গা পূজার সময়, তখন আমরা ছেলেমানুষ, নবমী পূজার দিন, ব্রাহ্মণ ভোজনের দই ক্ষীর আর এসে পৌছয় না, ফলারেবামন পাত পেতে বসে গেছেন; কর্ত্তারা ঘৰ-বার করছেন, এদিকে যেখান দিয়ে নৌকা করে গোয়ালাৱা দই ক্ষীর নিয়ে আসবে—একপাল বুনো মোষ সেখানটিতে পথ আটক করে দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িমাঝির সাধ্য কি যে নৌকা যেয়ে আসে। এ গোঘের পাল তো স্বৰোধ বালকের দল নয় যে তাদের বুঝিয়ে পড়িয়ে কিছু স্ববিধা হবে! তাই যতক্ষণ এই মহিষাসুরগুলি আপনা হতে পথ ছেড়ে না দিলে, ততক্ষণ মহিষমন্দিনীকে ভোগের জন্তে মুখটি বুঁজে প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়েছিল। এখন আর সে জলাভূমি নেই, বিলগুলি মাঠ হয়ে

ଚାଷବାସ ଚଲିଛେ, ମହିଷାସୁରଙ୍କ ତାର ମୋସାହେବେର ଦଳ ନିଯେ ଅଗ୍ରତା
ଚଲେ ଗେଛେ ।

ପାହାଡ଼ଭଲୀର ବନଜଙ୍ଗଲେ, ବୈଶାଖ କୈୟିଷ୍ଠ ମାସେର ଅମହ ଶ୍ରୀମ୍ବେ, ବାସନା
ପ୍ରାସ୍ତରି ନାଲାଯି ଗିଯେ ପଡ଼େ ଥାକେ, ତବେ ଭିନ୍ନ କାରଣେ, (ମାନୁଷେ ଯେ କାରଣେ
ନାଲାର ଆଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏଥାବେ ତା ନୟ !) ; ଆମରା ଯେମନ ଗର୍ବମେର
ଦିନେ ନାହିଁତେ ନେମେ ଆର ଉଠିଲେ ଚାଇନେ, ଏଓ ତେମନି ଆର କି ।

(କ୍ରମଶ)

পত্র।

—*—

শ্রীযুক্ত সবুজ পত্র সম্পাদক মহাশয়

সমীপেরু—

সবুজ পত্রের মূল্য বৃক্ষির সম্পর্কে দু'একটি কথা, পাঠকদের তরফ
হতে নিবেদন করছি। অবশ্য পাঠকমাত্রেই যে আমুর মতের সঙ্গে
সাময়িক দিবেন, এমনতর প্রত্যাশা করি নে।

সবুজ পত্র যখন প্রথম প্রকাশিত হল, তখন প্রবীণদের নিকট হতে
যে ও পত্রিকা আশীর্বাদ ও সমাদর লাভ করবে, সে হুরাশা অবশ্যই
কেউ করেন নি ; কিন্তু নবীনরা যে ওকে অস্তরের সহিত অভ্যর্থনা
করবেন, সে আশাটা করা গিয়েছিল। ভরসা হয়েছিল আমাদের
সামাজিক দুর্গতির দিনে এ পত্রিকাধানার পশ্চাতে আমাদের বিক্ষিপ্ত
ও বিকৃক্ত সবুজ মনগুলি rally করে, মুক্তির গগনচূম্বী ধৰ্জা
এমনি শক্ত করে তুলে ধরবে যে, নবারক্ত crusade-এ জয় না হওয়া
পর্যন্ত সে পতাকা কখনো নামানো হবে না ;—মুক্ত হাওয়ায় কম্পিত
পতাকার তালে তালে স্বাধীন বক্ষের ভিতর সতেজ প্রাণগুলি ও
স্পন্দিত হতে থাকবে। সে আশা অনেকাংশেই ফলবত্তী হয় নি,
কেননা তাহলে যাঁরা সবুজ পত্রের মতে subscribe করেন তাঁরা,
একেবারে অক্ষম না হলে, পত্রিকাধানাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্ত তাঁতে

subscribe করতেন। গ্রাহকদের নিকট হতে একটু বেশি মূল্য পেলে, ও পত্রের পেট ভরলেও প্রাণ ভরবে না। অতএব পাঠকদের দিক থেকে কিছু বলা আবশ্যিক বোধ করছি।

বাংলা দেশের প্রায় কোনো পত্রিকারই একটা বিশেষ ভঙ্গী নেই। একখানা পত্রিকাকেই হরেকরকম মনের খোরাক জুগিয়ে চলতে হয় ;—যে ভাবতে চায় তাকে ভাবাতে হয়, যে কাঁদতে চায় তাকে কাঁদাতে হয়, যে হাসতে চায় তাকে হাসাতে হয়, তহুপরি আর্টগ্যালারি খুলতে হয়, এবং স্বরলিপি সরবরাহ করতে হয়। সাতমিশালি রং সাদা হতে বাধ্য, কাঞ্জেই আমাদের দেশের অনেক পত্রিকারই, ওজন কিংবা পরিমাণ যতই থাকুক, রঙের অভাব বড় বেশী। অবশ্যই এ অবস্থার জন্ম আমাদের যে দারিদ্র্যাই অংশতঃ দায়ী তা অস্বীকার কচ্ছ নে, কেননা একাধিক পত্রিকা নেবার মতো সঙ্গতি আমাদের দেশের বেশি লোকের নেই ; কিন্তু এর জন্ম প্রধানতঃ দায়ী যে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন, তা অস্বীকার করলে সত্ত্বের অপলাপ করা হবে। কোথায় আমাদের মনের সেই দুর্নিবার পিপাসা, যার দুরস্ত তাগিদে নব নব বার্তা নিয়ে নব নব পত্রিকার অভ্যন্তর হবে ? কোথায় সে চিন্তার বিশিষ্ট ধারা, যার সাহায্যে আমাদের মনের শ্রেণীবিভাগ করতে পারি ? আমাদের মনের বিশিষ্টতা থাকলে, পত্রিকারও থাকত। পাশ্চাত্যে যে তা আছে তার প্রমাণস্বরূপ, কি সাহিত্যে, কি বিজ্ঞানে, এমন অনেক কাগজের নাম করা যেতে পারে, যা বহুকালাবধি কোন বিশেষ শ্রেণীর চিন্তা-ধারা বিতরণ করে জন সাধারণকে পরিপূর্ণ করছে, এবং নিজেও পরিপূর্ণ হচ্ছে।

সাতমিশালি সাদা রং থেকে—সোন-কিরণ যে সাতমিশালি তা

সকলেই জানেন—সবুজ ঝঁঠা বেৱে কৱে চোখে পড়িয়ে দেৱাৰ চেষ্টা
যে বাৰ্ষ হচ্ছে, তাৱ কাৱণ আমি যা বুঝতে পাৱছি তা এই. যে, সাদা
আলোয় গন্তব্যস্থানটা সুস্পষ্ট কৱে, আৱ সবুজ আলোয় তা বাপসা
হয় ; আবাৰ সবুজ আলোয় নৃত্য কৱৰাৰ যদি একটু প্ৰবৃত্তি হয়, সাদা
আলোয় তা নিবে যায়। নৃত্যশিল্প আমাদেৱ নয়,—পাশ্চাত্যেৱ ;
আৱ বাঙালী মূৰক বায়োক্ষোপে Shackleton Expedition-এৱ ছবি
দেখতে যতই ভালোবাসুক, একটি স্থান ব্যতীত অপৱ কোন বাপসা
জায়গায় লাফিয়ে পড়তে সে একান্তই নাৱাজ। সে স্থানটি হচ্ছে
বিবাহ-বাসৱ। অবগুণ্ঠনেৱ ভিতৱ্বকাৱ সম্পূৰ্ণ অপৱিচিত বস্তুটি আহাৱ
ও পানীয় সন্ধৰাহ কৱৰাৰ উপযুক্ত হলে, সে আৱ কিছুৱ জন্মই
কেয়াৱ কৱে না। একুপ বাপসাৱ প্ৰতি সংস্কাৱগত অনুৱাগ সন্তুষ্টঃ
আমাদেৱ জাতিৱ কবিহেৱ প্ৰমাণ। এ অবস্থায় যাঁৱা পাটেল বিল
সমৰ্থন কৱছেন তাঁৱা যে পাটকেল পাঞ্চেন, তাতে আশৰ্য্য হৰাৱ কিছুই
নেই। সৱকাৱ বাহাদুৱ যদি পাটেল বিল তুলে না নেন, তবে পাটেল
বিলেৱ বিৱোধীৱা যে পটল তোলবাৱ কাছাকাছি যাবেন তা অসন্তুষ্ট নয়।
কেননা উক্ত বিল যে শুধু অসৰ্বণ বিবাহ আইন সিদ্ধ কৱবে তা নয়,
নৱনাবীৱ পূৰ্ববৰাগকেও প্ৰশ্ৰয় দেবে একুপ আশা কৱা ষেতে পাৰে ;
কাৱণ যাঁৱা বিবাহ কৱবেন তাঁৱাই অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে এই বিলেৱ
স্মৰণ গ্ৰহণ কৱবেন,—যাঁৱা বিবাহ কৱাবেন তাঁৱা নয় ; এবং যাঁৱা
একুপ বিবাহ কৱবেন, তাঁৱা পৱন্পৰকে দেখেশুনেই বিবাহ কৱবেন।

যাঁৱা বিবাহ বায়ক এত বড় বাপসা জিনিসটিকে এক মুহূৰ্তে আয়ত্ত
কৱে ফেলবাৱ আমানুষী শক্তি লাভ কৱেছেন, তাঁৱাই আবাৱ অপৱ
কোন বাপসা জিনিস দেখলে যে একদম পিছ-পা হয়ে পড়েন কেন, তা

মনস্তুষ্টিবিদুরো বলতে পারেন। সবুজ পত্র যে পথ দেখাচ্ছে সে, পথে অগ্রসর হলে কোথায় গিয়ে পড়ব তাৰ ধাৰণা আমাৰ নেই, অথচ দশেৱ পথে চললে কোথায় গিয়ে পঁচিব তা বিলক্ষণ জানা আছে;—সে হচ্ছে ষেখানে রায়েছি, সেখানেই। ক্রব ছেড়ে অঙ্গুষ্ঠেৱ পানে ছোটবাৰ পৱিণ্ম হিতোপদেশে দেখেছি। এতএব সবুজ পত্ৰেৱ আহ্বানে কৰ্ণপাত কৱৰাৰ যুক্তি-যুক্তি প্ৰমাণিত না হলে, যুবকবৃন্দ যে অমনি অমনিই অকুলেৱ পানে ছুটে চলবে, এমনতৰ প্ৰত্যাশা আমাদেৱ দেশে কৱা চলে না।

মানবজীবনেৱ লক্ষ্য কি?—এৱ জবাৰ নিঃসংকোচে দিতে পারেন, এমন স্পৰ্কা যে কেউ রাখেন না, তা জোৱ কৱে বলা যেতে পারে। অবশ্যই “ধৰি মাছ, না ছুঁই পানী” নীতিৰ অমুসৱণ কৱে “যা ভালো তা-ই লক্ষ্য” জবাৰটা দেওয়া চলে। দার্শনিকেৱাও দেখতে পাছি হোচেট খেতে খেতে স্থিতিৰ লক্ষ্য সম্বন্ধে ঐ নিৱাপন উত্তুটিই দিয়েছেন। ইতিমধ্যে দার্শনিকদিগৰ মুখব্যাদান দেখে, এৱ পৱে পাঠকেৱাও “ভালো”ৰ মানে সম্বন্ধে আৱ প্ৰশ্ন কৱৰাৰ ভৱসা পাচ্ছেন না।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ও প্ৰশ়াটি দুৱুহ হলেও, মৌমাংসা কৱৰাৰ চেষ্টা অবিশ্রাম চলেছে; কেননা মামাংসাটা এতই জুকুলী যে, এৱ একটা কিনারা না হলে জীবনেৱ প্ৰতি পদবিক্ষেপ অৰ্থহীন বলে মনে হৈব। এধিকসেৱ স্তুপাকাৰ পৰ্বত ক্ৰমেই উঁচু হয়ে উঠছে, এবং মানবেৱ এ চেষ্টাৱও যে কোনকালে অবসান হবে, এমন লক্ষণ মোটেই দেখা বাচ্ছে না;—কেননা দিনেৱ পৱ দিন মাসুষেৱ “angle of vision” বদলে বাচ্ছে।

এই ভাঙ্গড়াৱ ভিতৱ্ব বাঙালী জাতিৱ আদৰ্শটি চিৰহিৰ রঘেছে
বলে যে গৰ্ব কৱা হয়ে থাকে, বিশ্বেৱ মাপকাঠিতে সে গৰ্বেৱ মূল্য
নিৰূপণ কৱা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। প্ৰশ্ন হতে পাৱে—যেটা
এতদিন আবশ্যক হয় নি, আজ হঠাৎ আবশ্যক হয়ে পড়ল কেন?
উত্তৱ নিতান্ত সোজা। ক্ষিত্যপতেজোমুলৰোম—এ গুলিৱ প্ৰায় সব
ক'টিকেই জয় কৱে মানবজাতি দেশ দেশস্তুৱে অবাধে ষাঠায়াতেৱ
পথ একেবাৱে উন্মুখ কৱেছে। পুৰুৰে স্থায় জীবনসংগ্ৰাম আৱ
দেশথণ্ডে আবক্ষ নয়,—একেবাৱে বিশ্বব্যাপী হয়ে পড়েছে।

আতীয় বিশিষ্টতা রক্ষা কৱতে হলে আমাদেৱ কয়েকটি রত্নকে
যে সঘনে রক্ষা কৱতে হবে, এমন কোনো যথাৰ্থ হিতকামী সমাজ
সংস্কাৱক নেই, যিনি তা অস্বীকাৱ কৱেন। তবে এখন কেন নৃতনেৱ
আবশ্যকতা বেশি, যাঁৱা “অৱণ্যেৱ বাণী” পড়েছেন তাঁদেৱ আৱ
বুঝিয়ে বলতে হবে না, এবং ওৱ চেয়ে শুন্দৱ কৱে বোঝানো সম্ভব
বলে মনে হয় না।

কিন্তু যে, সকল চিৱাগত সংস্কাৱেৱ স্তুপীকৃত জালজঞ্জলি আমাদেৱ
একেবাৱে চেপে রেখে এক পা'ও অগ্ৰসৱ হতে দিচ্ছে না, সে
গুলোকে আৱ কতকাল এমনি কৱে পোৰণ কৱে রাখিব?

একটা প্ৰচণ্ড অবাব প্ৰায়ই শুনতে পাৰওয়া যায় যে, মনু পৱাশৱ
যে-সকল ধাৱা গভীৱ চিক্কাৱ ফলে প্ৰণয়ণ কৱলেন, কাৱ একপ স্পৰ্কা
যে স্বীয় সীমাবদ্ধ তক-বুদ্ধিৱ উপৱ নিৰ্ভৱ কৱে সে-সকল ধাৱাৱ
সমীচীনতা ও দূৱদৰ্শিতা সহকৈ প্ৰশ্ন কৱে?—যুক্তিটি যে প্ৰবল তা
মানতেই হবে! বিধাতাৱ শ্ৰেষ্ঠ দান মানুষেৱ ব্যক্তিহকে অপমান কৱে
যিনি ভাববাৱ ও চিক্কবাৱ দায় হতে অব্যাহতি লাভ কৱেছেন, তাঁকে

তর্ক করে বোকাবার দুঃসাহস সম্ভবতঃ কেউ রাখেন না ; তবে তাঁর পক্ষে
একথাটি মাঝে মাঝে স্মরণ করা সম্ভবতঃ শক্ত হবে না যে, ষে-সকল
মহাপুরুষ আমাদের জাতীয় জীবনকে কিছুমাত্র সত্য ও সৌন্দর্য দান
করেছেন, তাঁরা সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন—

“ঘাঁরা সবল, স্বাধীন,
নির্ভয়, সরলপ্রাণ, বঙ্গনবিহীন,
সদর্পে ক্রিয়াছেন বীর্য জ্যোতিশ্চান,
লভিয়া অরণ্য নদী পর্বত পাষাণ,

* * * *

কোনখানে না মানিয়া আত্মার নিষেধ
সবলে সমস্ত বিশ্ব করিছেন তেন ।”

ঘাঁদের চোখে সত্ত্বের শুভ আলোক একেবারে নির্বাপিত হয়
নি, ঘাঁরা স্বমুখ হতে বিচারপ্রয়তিকে একেবারে নির্বাসিত করে
জীবনযাত্রাকে নিন্দিত ও নিশ্চেষ্ট করেন নি, অথচ সমস্ত হৃদয়
দিয়ে সত্যকে আহ্বান করবার শক্তি হতে বঞ্চিত ; আশা করা ষেতে
পারে তাঁদের sophistry-র মুছ-গুঞ্জন সবুজ পত্রের মর্মের কলতানের
নীচে চাপা পড়ে থাবে ।

ষে sophistry-র বিষয় উল্লেখ করা গেল তা যে মনঃকলিত
নয়, তা দু'একটি দৃষ্টান্ত মিলেই স্পষ্ট হবে । কোন এক প্রলে
সামাজিক কুসংস্কারকে প্রাণীদেহের Vestigial organs-এর সঙ্গে
তুলনা করা হয়েছে । প্রাণীদেহের Vestigial organs-এর কোনো
প্রয়োজনীয়তা না থাকলেও, তাঁতে অঙ্গপ্রয়োগ করলে যেমন প্রাণীর

মৃত্যু ঘটতে পারে, তেমনি আবহমান যে সকল কুসংস্কার চলে আসছে, অর্থহীন হলেও তাদের উপর হঠাৎ হস্তক্ষেপ করলে সমাজ-শরীর একেবারে ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। অতএব কি জীবদেহের Vestigial organ, কি সমাজিক কুপথ—উভয়ের তিরোধানের জন্য নৌরবে অপেক্ষা করাই বিজ্ঞেনোচিত। আর এক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, evolution একটি একটানা উদ্ভগামী ব্যাপার নয় ;— মোটের উপর তার গতি উন্নতির দিকে হলেও তাকে উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে, টেউয়ের মতো, অগ্রসর হতে হয়। অতএব সমাজ-শরীরের কোন সাময়িক দুর্গতি দেখে ভয় পাওয়া অনুচিত, কেননা তা evolution-নিয়মের অপরিহার্য অঙ্গ।

কালের উপর বরাত দিয়ে সহিষ্ণুতার দাবী করা অবশ্যই সে জাতির পক্ষে শোভনীয়, যে জাতির অপরিসীম ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায় বালবিধবার দুঃসহ নির্জলা উপবাসে ও লাঢ়িত পত্নীর নৌরব অঙ্গপাতে।

জীবদেহের সহিত সামাজের সাদৃশ্য ষেরুপ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তাতে দু'একটি কলমের র্থোচায় তাকে টলানো সম্ভব নয়। আমাদের সামাজিক জীবনে এ সাদৃশ্যের শাখা-প্রশাখার ঘননিবিড় ছায়াকে আশ্রয় করে কোন কোন অর্থহীন সংস্কার নির্বিবাদে বসবাস করছে। উদার আকাশের শুভ্রআলোক তাদের উপর পড়লে তারা পালাবার জন্য ছুটোছুটি করে মরতো। প্রাচীন সংস্কারের সে কালিমা সামাজিক বন্ধুরতার উপর ছায়া ফেলে জীবনযাত্রার পথ অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব রূক্ষ ঝজু করে ফেলেছে।

উপর্যুক্তিটি কাজ করে চমৎকার তত্ত্বণ, যত্ত্বণ ওকে ওর

সীমানার মধ্যে আঁটকে রাখা যায়। উপরার কাজ হচ্ছে অটিল বিষয়কে
বুঝিয়ে সহজ করা ;— যুক্তির point বের করা নয়। ভূমণ্ডল কমলা-
লেবুর মতো দু'দিক চাপা বলে, উক্ত ফলের শায় টক বা মিষ্টি নয়।
মনুষ্যদেহকে বাঙ করে forked radish বলা হয়েছে বলে, উক্ত
মেহ মূলোর মত মাটি ফুঁড়ে নির্গত হয় না।

সমাজমন বলে যে বস্তুতঃ কোন জিনিষের অস্তিত্ব নেই, তা আপনি
পূর্বে এই পত্রিকাতেই বলেছেন। Social organism জিনিষটিও
যে আকাশকুমুমের চেয়ে খুব বেশী সত্য নয়, তা বুঝতেও বেশ
চিন্তা করবার দরকার নেই। স্থলেখক Sir Leslie Stephen বহু
পূর্বেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশের ভিতর যে
যোগ (abiding unity) থাকে, সমাজের ভিতর সেন্সেপ কোন যোগ
নেই, যার অস্ত তাকে social organism বলা চলে ; তিনি তৎ-
পরিবর্তে social tissue শব্দটি প্রস্তাব করেছেন। তাঁর প্রস্তাব
গৃহীত হলে আমাদের সামাজিক দুর্গতিকে যে উক্তপ্রকারে সমর্থন করা
চলেনা, তা বলা বাহ্যিক।

আসল কথা হচ্ছে যে, মানসিক জড়ত্বার পরিমাণটা যখন বেশি
হয়ে ওঠে, তখন যুক্তিধারার গতিটা ও স্বচ্ছতা থাকে না ;— ব্যাধিভাবে
ঝুঁ হয়ে চলতে না পেরে তাকে বেঁকে চলতে হয়।

সত্য হচ্ছে আলোক—মনের searchlight। সে আলোক এত
নির্মল ও স্বচ্ছ যে, যার উপর সে আলোক পড়ে তা একমুহূর্তেই
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু শিশুর মতো উশুক, নির্বীক, সরল
দৃষ্টিতে তাকানো চাই। আমাদের ব্যক্তিগত ঔবনে সেই সহজ
দৃষ্টির অভাবে সোজা জিনিষও বাঁকা হয়ে থায়। বিখ্যাত “সহজ”

পন্থী Charles Wagner সহযোগি গুনকৌণ্ডন করতে করতে
বলেছেন—

Too many hampering futilities separate us from that ideal of the true, the just and the good, that should warm and animate our hearts. All this brushwood, under pretext of sheltering us and our happiness, has ended by shutting out our sun. When shall we have the courage to meet the delusive temptations of our complex and unprofitable life with the sage's challenge : "Out of my light" ?

চির অভ্যন্তর পথে বাঁধি-বোল আউড়ে চলা সোজা হলেও, সেটা সহজ অবস্থা নয়। "সোজা" আর "সহজ"—এ দুয়ের পার্থক্য বোঝানো সম্ভবতঃ অনাবশ্যক। তৎপরায়ণ উর্জবাহন অভ্যন্তর অবস্থাটি যতই সোজা হোক, ওটি যে তার সহজ অবস্থা নয়, তা বলা বাহ্যিক।

সেই সহজ পথ আবিষ্কারের নিম্নণ নিয়ে সবুজ পত্র আবিস্তর হয়েছে। Brushwoodগুলি কেটে ছেঁটে পরিষ্কার করে, ভাঙা গড়ার ভিতর দিয়ে সত্যশিবস্বন্দরের আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে এবং চিরকাল চলবে;—বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। হঠাৎ চলা থেমে গেলে কি দুর্গতি হয়, আমরা সবুজ পত্রের পাতাতেই অনেকবার তা জানতে পেরেছি। তাইতো লেখা হয়েছে—

"যদি তুমি মুহূর্তের তরে ক্লাস্তিভরে
দাঢ়াও ধৰকি
তখনি চমকি

উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঁজি পুঁজি

বস্তুর পর্বতে ;

পঙ্কু মুক কবন্ধ বধির অঁধি

সৃলতমু ভয়কঠী বাধা

সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঢ়াইবে পথে ;

অগুতম পরমাণু আপনার ভারে

সঞ্চয়ের অচল বিকারে

বিন্দ হবে আকাশের মর্মমূলে

কলুষের বেদনার শূলে ।”

মানবসভ্যতার এমন একটি স্তর নেই যেখানে পেঁচলে বলতে
পারা যায় “Thus far and no further !” কি মনোজগতের, কি
অড়জগতের, সব চেয়ে যে ধৰ্ষটি সত্য, তা হচ্ছে চলার ধৰ্ষ। স্থিত
লৌলার গোড়ার কথাটিই গতির কথা, তাই বলা হয়েছে “Action
was the beginning of everything,” এবং এই মূল সত্যটি
উপলক্ষি করেই দার্শনিকরা causality-কে category-র অন্তর্ভুক্ত
করতে বাধ্য হয়েছেন, কেন না কার্যকারণসম্বন্ধ-বোধটি পরিবর্তন-বোধ
অর্থাৎ গতি-বোধ হতেই উন্নত ।

অতএব সবুজ পত্রের কাছথেকে যে চলবার আহ্বান আসছে,
তাতে কর্ণপাত না করে যিনি আভিজ্ঞাত্যগর্বে চতু-মণ্ডপের স্তুপটাকে
আশ্রয় করে স্থানু হয়ে বসে থাকবার প্রত্যাশা করছেন, তাঁর প্রতি
নিবেদন এই যে, একদিন প্রত্যাখ্যে যখন তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করবেন
যে স্তুপটা অস্তিত্বে কৌটুম্ব হয়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে,
এবং সে স্থানের মাটি ফুঁড়ে এক লক্ষ্মীছাড়া আগাছা অলঙ্কিতে নির্গত

হয়ে তার কণ্টকাকীর্ণ দেহখালি সঞ্চালিত করে চতুর্দিকে ধিরোহ
যোগ্য। করছে,—তখন যেন তিনি অদৃষ্টকে ধিকার না দেন।

সংস্কার-কার্য নানা প্রকারে চলতে পারে,—ধৰ্ম প্রচার করে,
বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করে, মিশন স্থাপন করে, ইত্যাদি; কিন্তু এ সকল
সংস্কার সে-পরিমাণে সার্থক হবে, যে-পরিমাণে তাদের গ্রহণ ও
প্রচার করবার পক্ষে অনসাধারণের মন অমুকুল হবে। অতএব
গোড়ার কথাটা হচ্ছে মনের সংস্কার। সেই সকলের-সেরা সংস্কার
অর্থাৎ একেবারে vital point-এ হস্তক্ষেপ করেছে বলে সবুজ পত্রকে
বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করা উচিত। ইতি।

৩২শে আবণ, ১৩২৬।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

ইঞ্জ সবুজপত্র।

—————*————

শ্রীমান চিরকিশোর
কল্যাণীয়েষু।

আজ তোমাকে একটি স্মৃতির দিচ্ছি।

সবুজপত্র এতদিনে বাতিল হবার উপক্রম হল। সম্প্রতি এই কলিকাতা সহরে, ইঙ্গ-বঙ্গ দল থেকে আর একটি তরুণ সবুজপত্র বেরিয়েছে, যার তুলনায় প্রথম চৌধুরীর সবুজপত্র যেমন আধ-পাকা, তেমনি আধ-মরা। এই নবপত্র প্রথমত আকারে ছোট, বিভৌয়ত ইংরাজিতে লেখা। তালপত্রের চাইতে তেজপত্র যেমন ঝাঁঝালো, বাঁশের চাইতে কঞ্চি যেমন দড়,—বাঙ্গলা সবুজপত্রের চাইতে ইংরেজি সবুজপত্র তেমনি বেশি ঝাঁঝালো, তেমনি বেশি দড়।

তা ত হবাই কথা। কে না জানে বাঙ্গলা ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার সেই তফাও, দেশী ওয়ুধের সঙ্গে বিলেতি ওয়ুধের যে তফাও। লোকে বলে আলোপ্যাথি হচ্ছে ফোঁঅদারী চিকিৎসা, ও কবিরাজি—দেওয়ানি। অর্থাৎ কবিরাজের হুন সয়, ডাক্তারের সয় না। কবিরাজ রোগ জিনিসটিকে মূলতবি রাখতে জানে, তারপর তার চিকিৎসার আপিল আছে, খাস আপিলও আছে, এমন কি শেষকাণ্ডে হোমিওপ্যাথি নামক বিলেত আপিলও আছে।

ডাক্তারের কিন্তু সব তড়িষড়ির ব্যাপার। আলোপ্যাথি যেমন-তেমন

কৌজদারী আদালত নয়, একেবাবে Martial Law Tribunal,—
সেখানে মানুষ পার হয় বেকশুর খালাস, নয় প্রাণদণ্ড—যার উপর আর
আপিল নেই। এছাড়া আরও মিল আছে। ইংরেজি ওষুধ সব কটু কষায়,
তারপর ঘেমনি স্বাদ তেমনি গন্ধ। কুইনিন আর কেষ্টেরজাইল
হচ্ছে ডাক্তারথানার সেরা ওষুধ। আর তার গন্ধ স্পর্শ রাশের
সঙ্গে সবারই পরিচয় আছে। ইউরোপের ধারণা—যে-বস্তু ইন্দ্রিয়কে
নিগ্রহ করে, সে-বস্তু শরীরকে অনুগ্রহ করতে বাধ্য। আমাদের
ধারণা কিন্তু ঠিক উল্টো। আমাদের বিশ্বাস ইন্দ্রিয়ের উপর অভ্যাচার
করলে আজ্ঞার উপকার হয়, কিন্তু দেহের হয় অপকার। আমাদের
ওষুধের নাম শুনলেই কান জুড়িয়ে যায়—যথা রসসিন্দুর, স্বর্ণপট্টপটি,
মুক্তাভঙ্গ, মকরধ্বজ ইত্যাদি। তারপর এদের ঘেমন নাম তেমনি চেহারা,
—কোনটি স্বর্ণবর্ণ, কোনটি শুকস্ত্রাম, কোনটি হিঙ্গলপারা; সব চিক্কিক্
করছে, চক্কক করছে, দেখবামাত্র মন নেচে ওঠে। ইংরাজিতে যাকে
বলে love at first sight—কবিরাজি ওষুধের উপর চোখ পড়ামাত্র
সকলেরই সেই মনোভাব হতেই হবে। তারপর দেশী ওষুধের অনুপান
আছে, বিলেতি ওষুধের নেই। আর সে অনুপানের বালাই নিয়ে রোগীর
মরতে ইচ্ছে যায়। স-মধু মরিচের গুঁড়া, মিছুরিন সরবৎ ও জামিরের
রস, পানের রস প্রভৃতির সংযোগে পৃথিবীর কোন্ বস্তু না পান করা
যায়, লেহন করা যায়, চিবোনো যায়, চোষা যায়। সমাজদেহকে
রোগমুক্ত করবার উদ্দেশ্যে বাঙ্লা সবুজপত্র কবিরাজীর আশ্রয়
নিয়েছেন—আর ইংরেজি সবুজপত্র মায় সার্জারি আলোপ্যাথির।
মহাকবি রাজশেখের সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতের যে পার্থক্যের উদ্দেশ্য
করেছেন, ইংরেজিয় সঙ্গে বাঙ্লার প্রভেদও তাই। স্বতরাং তার

ভাষায় বর্ণনা করতে গেলে, ইঙ্গ সবুজপত্র হচ্ছে “পুরুষ-পুরুষ”, আর বঙ্গ সবুজপত্র “মহিলা-মহিলা”।

এক্সপ হবার কারণও আছে। বলতে ভূলে গিয়েছি ষে, এই অবপত্তের নাম হচ্ছে Bulletin of the Indian Rationalistic Society। এই নামই প্রমাণ ষে, এ পত্র বৈজ্ঞানিক সত্য ছাড়া আর কিছুই মানে না। যেমন আলোপ্যাথির, তেমনি এ সাহিত্যের ভিত্তি হচ্ছে Biology, Physiology, Botany, Chemistry প্রভৃতি। ষে কোন সামাজিক সমস্তা উঠক না কেন, এ পত্র এর একটি না একটির সাহায্যে তার হাত হাত মৌমাংসা করে দেবে। অপর পক্ষে বাঙ্গলা সবুজপত্র নিঙড়ে কি বেরবে?—কিঞ্চিৎ কাব্যরস। আর হামান-দিস্তেয় কুটলে?—কিঞ্চিৎ মর্শন-চূর্ণ। এবং এ দুয়েরই অনুপান হচ্ছে—হাস্তরস। খোঁজ নিয়ে দেখ বাঙ্গলা সবুজপত্তের লেখকমাত্রেই সেই শিক্ষায়, শিক্ষিত ইংরেজিতে যাকে বলে literary education; আর ইংরেজি সবুজপত্তের লেখকেরা সব বিজ্ঞানবিং। শুনতে পাই যে, ইউরোপের জনৈক মহা-দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন—পৃথিবীতে আগে আসে কাব্য, তারপরে মর্শন, আর সর্বশেষে বিজ্ঞান। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ইংরেজি সবুজপত্তের আবিষ্কারের পর বাঙ্গলা সবুজপত্র যে পিছনে পড়ে যাবে, তাতে আর আশচর্যা কি? যে পত্র মহিরাবণের পুত্র অহিরাবণের মত তৃমিষ্ঠ হতে মা হতেই লড়াই শুরু করে দিয়েছে, সে পত্তের আর মার নেই,—অবশ্য যদি বেঁচে থাকে। আমি এই নবোদ্যোগ পত্রকে সর্বান্তঃকরণে এই আশীর্বাদ করি ষে, তুমি শতাম্বুঃ হও, আর তোমার ইস্পাতের মোষাত কলম হোক।

(২)

এখন এ পত্রের মতামতের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। মনে আছে যে পাটেল-বিল নিয়ে দেশে যখন একটা পণ্ডিতের তর্কের সূর হয়, তখন সনাতনপন্থীর দল অসর্ব বিবাহের বিপক্ষে eugenics নামক একটি নেহাঁ কচি ও কাঁচা বিজ্ঞানের দোহাই মেন। সে দোহাই আমরা অমাশ্চ করতে পারি নি,—কেননা বিজ্ঞানকে আমরা রাজার মত মান্ত করি এবং রাজার মতই ডরাই। তারপর এই নব সবুজপত্রে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহের প্রবক্ষে eugenics-এর ব্যাখ্যান পড়ে আমার চক্ষঃপুর হয়ে গেল,—পণ্ডিত ম'শায়েরা পড়লে তাদের মন্তকের শিথা যে যথার্থ অকর্ফলা হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। Eugenics-এর বাঙ্গলা জানিনে, কিন্তু তার একেলে সংক্ষিপ্ত হচ্ছে স্ব-জনন বিষ্ণা। এ বিষ্ণার সঙ্গে শাস্ত্রমতের অর্কেক মিল আছে—কিন্তু বাকী অর্কেকের ফারাক আশমান-জমিন। “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাষ্যা”—এ সত্য স্বজনন-শাস্ত্রীরা ও মানেন ; কিন্তু “পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্”, এ বচন শোনামাত্র এ শাস্ত্রের সিংহব্যাঘ্রেরা মহা গর্জন করে উঠবেন, এবং এ কথা যারা মুখে আনে, তাদের পিণ্ড চট্কাতে প্রস্তুত হবেন।

এঁদের মত হচ্ছে “পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্”—কেননা তার কৃপায় আত আপনাহতেই বড় হয়ে উঠবে, উঁচু হয়ে উঠবে। অর্থাৎ দেশের ছেলেমেয়েরা সব স্বজন ও স্বজাতা হয়েই ভূমিষ্ঠ হবে। এ বিজ্ঞান নরনারীকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে দেখে না, দেখে শুধু অনক জননী হিসেবে ; স্বতন্ত্রাং আমরা যাকে বিবাহ ঘলি, এ মতে সে হচ্ছে

ଶୁଦ୍ଧ ଜୋଡ଼ିକଳମ ବାଧବାର ହିସେବ । ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରମତେ ଗୋରୀଦାନେର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗରୁଦାନେର ଚାଇତେ ଓ ବେଶ, ସେଇ ପୁରୋନୋ ଶାସ୍ତ୍ରେର ହିସେବେର ସଙ୍ଗେ ଏହି ନତୁନ ଶାସ୍ତ୍ରେର ହିସେବେର ଯେ କୋନ୍ତିମିଳ ନେଇ, ସେ କଥା ବଲାଇ ବାହଳ୍ୟ । ତବେ ଏମେଣ୍ଟେ କୋନ କଥାଇ ବଲା ବାହଳ୍ୟ ନୟ । ଅତଏବ ଉତ୍ତର ପତ୍ର ହତେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆର, ସି, ମୌଲିକ ମହାଶୟ କର୍ତ୍ତକ ରଚିତ ଆର ଏକଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ହତେ କ'ଛତ୍ର ଉଚ୍ଛ୍ଵୃତ କରେ ଦିଛି—

“Putrarthhē kriatē varjya”

(One marries a woman for begetting sons). Poor little thing ! She is forced into the bed of a hulking youth, and he inculcates on his “phantom of delight” on the propedeutics of the metaphysics of love, inside a comfortable curtain. Before reason and judgment gather strength, before any principles are formulated, the epithemetic impulses are precociously provoked, by the presence of an object calculated to inflame them, and the shameful connivance of an agent interested in their premature development”.*

ଏଇ ଚାଇତେ ପଦିକାର କଥା ଆର କି ହତେ ପାରେ ?—ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏତ ମିଥେ ଆର ଏଇ ବେଶ ଏତ ବେଶି ସେ, ଏ କାଗଜେର ନାମ Bulletin ନାହଯେ Bullet ହେଯାଇ ଉଚିତ ଛିଲ ।

* (Bulletin of the Indian Rationalistic Society. Vol I. No 3. p. 43).

(৩)

এই বিজ্ঞান-তাত্ত্বিক বীরাচারীদের শাস্ত্রের কানিবার যে শুধু
রক্তবাংস নিয়ে তা নয়—তাঁরা মানুক দ্রব্যেরও সঙ্গানে ক্ষেত্রেন। এঁরা
চতুর্বেদ ঘেঁটে সোম যে কি পদাৰ্থ, তাৱ পৱিচয় নিতে চেষ্টা
কৱেছেন। “ঐতৱেয় আক্ষণেৱ” পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমি
একদিন হঠাৎ আবিষ্কাৰ কৱি যে, পুৱাকালে যখন ক্ষত্ৰিয়েৱা এক
সঙ্গে শুৱা ও সোম পান কৱতেন, তখন আক্ষণেৱা এই স্বষ্টি বচন
পাঠ কৱতেন—

“ওহে শুৱা ও সোম, তোমাদেৱ জন্ম দেবগণ পৃথক
পৃথকৰূপে স্থান কল্পনা কৱিয়াছেন।

তুমি তেজস্বিনী শুৱা, আৱ ইনি রাজা সোম, তোমৱা
আপন আপন স্থানে প্ৰবেশ কৱ”।

সেই অবধি শুৱা ও সোম যে এক বস্তু নয়, এ জ্ঞান আমাৰও ছিল;
কিন্তু সোম বিনিষ্টি কি, তাৱ সঠিক খবৱ আমি ইতিপূৰ্বে পাই নি।
এই নবপত্ৰেৱ একটি অশেষ গবেষণাপূৰ্ণ প্ৰবন্ধে আবিষ্কাৰ কৱলুম যে,
সোম ব্ৰহ্মায়নেৱ অধিকাৰভূক্ত নয়—ও পদাৰ্থ হচ্ছে আসলে ভেৰজ,
যাকে আমৱা হৱিতানন্দ বলে থাকি। কিন্তু এতে আমাৰ মনে একটু
খটকা লগল। আফিং ও মদ যে জুড়িতে চালানো যায়, সে ত
সকলেৱি দেখা-সত্য। এবং এ জুড়ি কদম কদম চলেও ভাল,

ଯେହେତୁ ଏଇ ଏକଟି ଆର ଏକଟିକେ ରୋଥେ, ଛାରୁତକେ ଉଠିଲେ ଦେଇ ନା । ତବେ ଗଞ୍ଜିକା ଓ ଶୁରୀର ତ ଏଇକମ ଜୁଡ଼ି ମେଳାନୋ ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ନୟ । ଏକସଙ୍ଗେ ଏ ଦୁଇର ଏକମାଳ କରଲେ ମାନୁଷେ ଯେ “ବୁଦ୍ଧ ହେଁ ଯାବେ, ବୋଇ ହେଁ ଯାବେ, କିମ ହେଁ ଯାବେ, ତାରପରନା ହେଁ ଯାବେ” ! ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପାଇଦଶୀ ଆମାର ଅନୈକ ଶ୍ଵାସନାଲିଷ୍ଟ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବୁ ଆମାର ଏ ମନ୍ଦେହେର ନିରାସ କରେଛେ । ତିନି ବଲେନ ଯେ, ମାନୁଷେର ମତ ମାନୁଷ ହଲେ, ସେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରକେ ସକଳ ଧର୍ମର ସମସ୍ତରେ କରିବାକୁ ପାରେ, ଆର ଆମାଦେର ବୈଦିକ ପିତାମହେରା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ୟଯୁଗେର ତାରା ତ ମାନୁଷ ଛିଲେନ ନା, ଛିଲେନ ସବ deui-god, ଶୁତରାଂ ତାଦେର ପକ୍ଷେ ଉତ୍ତ ଉତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧ ଯୁଗପଥ ଅବଲୌଲାକ୍ରମେ ଆଜ୍ଞାସାଂ କରାଟା ମୋଟେଇ ଆଶର୍ଦ୍ୟେର ବିଷୟ ନୟ । ତାର କଥା ହଜ୍ଜେ ଏହି ଯେ, ଦେବତାରା ଯେ ନନ୍ଦନ କାନନେ ଚିର-ଆନନ୍ଦେ ବାସ କରେନ, ସେ ଏକମାତ୍ର କଲ୍ପତରର ପ୍ରସାଦେ ; କେନନା କଲ୍ପତର ହଜ୍ଜେ ସେହି ଗାଛ — ଯାର ପାତା ମିଳି, ଫୁଲ ଗୀର୍ଜା, ଫୁଲ ଧୁତରା, ଆଠା ଆଫିମ, ଛାଲ ଚରସ, ବୁଦ୍ଧ ମଦ, ଆର ଶିକଡ଼ କୋକେନ । ଏକଥା ଶୁନେ ଆମି ଅବାକ ହେଁ ତାର ଦିକେ ଚେଯେ ବାଇଲୁମ । ତିନି ବଲ୍ଲେନ—“ତୁମି ଭାବଛ ଯେ ଏମନ ଗାଛ ଥାକିତେ ପାରେ ନା, ଯାତେ ଏହି ସକଳ ତେଜକର ଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଏକାଧାରେ ପାଓଯା ସାଧ୍ୟ ? ଅମରାପୁରୀର କଥା ଛେଡ଼େ ଦାଓ, ଯଦି Botany ଜ୍ଞାନରେ ତାହଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ଯେ, ଏହି ଭାରତବର୍ଷେଇ ଏକ ଗାଛ ଆଛେ, ଯାର ପାତା ହଜ୍ଜେ ପାନ, ଫୁଲ ଜାହିରୀ, ଫୁଲେର ବୋଟା ଲବନ୍, କୁଣ୍ଡି ଏଲାଚ, ଫୁଲ ଆୟଫୁଲ, ଛାଲ ଦାରଚିନି, ଆଠା ଥୟେର, ଆର ଶିକଡ଼ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଚୂନ” । ଆମି ବିଜ୍ଞାନକେ ବ୍ରାଜାର ମତ ମାନ୍ତ୍ର କରି ଓ ବ୍ରାଜାର ମତ ଡରାଇ, ଶୁତରାଂ ଏ botany-ର ଦୋହାଇ ଦେବମାତ୍ର ଆମି ବିନାବାକ୍ୟବ୍ୟୟେ ମେନେ ନିଲୁମ ଯେ, ମୋମ ହଜ୍ଜେ କରିଭାନନ୍ଦ ।

তবে ও বস্তু সিকি কি গাজা, সে বিষয়ে আমাৰ মনে এখনও
ধোকা রয়েছে—কেননা গঞ্জিকা মানুষে শুলে থায় না, টানে। অতএব
আমি ধৱে নিছিঃ যে, সোম হচ্ছে সিকি। আমাৰ অনুমান যদি সত্য
হয়, তাহলে সকলকেই মানতে হবে যে বঙ্গ সবুজপত্রেৰ রস হচ্ছে
সোমৰস। সিকিৰ পাতাৰ সঙ্গে উক্ত পত্রেৰ ছুটি অবৱ মিল আছে।
প্ৰথমত ও দুয়োৱি রঙ সবুজ, বিভৌগত ও দুয়োৱই রস পান কৱলে
মানুষেৰ বুকি বাড়ে। অপৱপক্ষে ইঙ্গ সবুজপত্রেৰ রস যে শুৱা, সে
বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই—কেননা ও হচ্ছে একদম বিলোতি মাল।
অতএব আমাদেৱ যুবকসপ্তদিব্য যদি এই উভয় সবুজপত্রেৰ রস
একাধাৰে স্বচ্ছন্দে ও আনন্দে পান কৱতে ব্ৰতী হন, তাহলে প্ৰমাণ
হবে যে তাঁৱা সব সত্যযুগেৱ লোক ; এবং তাও আবাৰ যে-সে লোক
নয়—একদম ক্ষত্ৰিয়।

এ ক্ষেত্ৰে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুধু এই যে—

“ওহে শুৱা ও সোম ! তোমাদেৱ জন্ম দেবগণ পৃথক পৃথক স্থান
কল্পনা কৱিয়াছেন। তুমি তেজস্বিনী শুৱা আৱ ইনি রাজা সোম,
তোমৱা আপন আপন স্থানে প্ৰবেশ কৱ”।

এ প্ৰাৰ্থনা যে কতদূৰ সঙ্গত, দুকথায় তা বুঝিয়ে দিচ্ছি।
শুৱা যে তেজস্বিনী, এ কথা অগ্ৰবিদ্যাত, আৱ অৱিভাবিক রাজাৰ
নেশা না হলেও নেশাৱ রাজা। তাৱপৱ দেবগণ সত্যসত্যাই এ
দুয়োৱ জন্ম পৃথক পৃথক স্থান কল্পনা কৱেছেন। সিকিৰ গন্তব্য
স্থান হচ্ছে cerebrum এবং শুৱাৱ cerebellum—অৰ্থাৎ এৱ
একটি হচ্ছে জ্ঞানমার্গেৱ, আৱ একটি কৰ্মমার্গেৱ নেশা।

এরা যদিংপথ ভুলে এ ওর আৱ ও এৱ ঘৰে গিয়ে চোকে, তাহলে
মনোৱাঙ্গে যে কি উৎপাতেৱ স্থষ্টি হয়, তা সকলেই আন্দাজ কৱতে
পাৱেন। আৱ এ দুটি যদি মিলে মিশে এক হয়ে যায়, তাহলে এৱ
ৱসে আৱ ওৱ বৱসে কাটাকাটি গিয়ে বাকী থাকে শুধু শৃঙ্খ।

বীৱিবল।

২৪শে অগষ্ট, ১৯১৯।

ବୁପ୍-ବୁପ୍-ଚୁପ୍।

—*—

(ଢାକା—ମାଣିକ ଗଣେର ମୌଖିକ-ଭାଷାଯ ଲିଖିତ)

ଆଷାଢ଼ ପାର ହେଯା ଶାଓନ ମାସ ପୈରଚେ, କିନିଇ ବିଲେର ମାଠଥାନ
ଅଳେ ବୈଦୋକାର । ଆଗେର ଖ୍ୟାତେର ଆଉମଧାନ ପରାୟଇ କାଟା ହେଚେ,
ନାମୀ ଖ୍ୟାତେର ପାକା ଧାନେର କାଳା କାଳା ବାଇଲ(୧) ଗୁଲା ଡଳ ହେତେ
ହେତେ କୋନ ମଡେ ଅଳେର ଉପର ଜାଇଗା ରୈଚେ ମାତ୍ର । ତାମାନ ଦୁଫୁର
ଶୁରାନି ବିଛିର ପରେ ଶେସ ବେଳାର ନିଭାଜ(୨) ଆକାଶେ ରୁଗୀର ମୁଖେ
ହାସିର ମଲକେର(୩) ରକମ ଏକ୍ଟୁଖାନି ରୈଦେର ଜିଲ(୪) ଦେଖା ଦିଚେ; ତାତେ
ଆଶାର ଥିକା ଆଶକ୍ତାଇ ହେତାଚେ ବେଶ । ତିର୍ଭିରା ହାଓସ୍ତାଯ ଅଳେର
ଧଲି ଢାକଳା(୫) ଜୁଇରା ଚେଳା-ଚେଉ(୬) ଉଠ୍ଟଚେ । ମାଠେର ଇଖାନେ-ଓଥାନେ
ଗିରସ୍ତଗୋରେ ପାରା-ଗାଡ଼ା(୭) ଡିଙ୍ଗି ନାଓ । କୋନ କୋନ ନାୟେର ଲଗିର
ମାଥାଯ ଚାଷାଲୋକେର ଶୁକାବ୍ୟାର-ଦେଓଯା ଖାଟ-ବହରେର କାପର ନିଶାନେର
ରକମ ବାନ୍ଧା । ବେବାକ ନାଓ ଥାଲି । ଚାଷାରା ସକଳେଇ ଅଳେ ଖାରାଯା
ଧାନ କାଟିଭାଚେ; ଆଇବ କେଉର ମୁଖ ଦିଯାଇ ଭାଇଟାଳ ଗାନେର ଶୁର
ବାଇରଯ ନାହିଁ । ସଗଲେଇ ବାଡ଼ସ୍ତ ଜଲେର ଝୋଯାରେର ମୁଖେ ଥିକା

(୧) ଶୈମ । (୨) ପରିଷାର । (୩) ଆଲୋର ରେଖ । (୪) ରଞ୍ଜି । (୫) ମୌଖ । (୬) ଶୁତ୍ର ।
(୭) ଧାଧୀ (anchored) ।

আপন আপন বছরকার মিহানতের খন—পাকা আউস, ছিনায়া
রাখনে ব্যস্ত।

চাইরবিগের ঈৎ ঈৎ জলের পূর্বপারে সেওরাতলি গাঁও। মাঠের
মধ্যখান থিকা দেইখলে মনে হয় যান গাঁওখান জলের উপর ভাস্ত্বাচে।
ধনুকের মতন গাছের একটানা ব্যাকা(১) একটা সাইর(২), তারি
আবডালের নীল ফাসা(৩) দিয়া খানকয়েক কুড়া ঘরের খোলা দুয়ার,
চাষার মনের মমতা-মাখা চইথের(৪) মতন মাঠের দিগে একদিক্ষে
তাকায়া রৈচে।—আর, গেরাম-লক্ষ্মীর সবুজ গাছের সোয়াগ-আচল
ছির্যা দিয়া গায়ের বুকের উপর চাষাগোরে কলিজাৱ রক্তে লাল
হৈয়া-ওঠা মহাজনের দোতালা দালানটারে ঠিক একটা দেমাকি দৈত্যের
মতন দেখা যাত্যাচে। তার খোলা দুরজার মস্ত হাঁ'র মধ্যে সে যান
সারাটা মাঠের বেবাক ফসল তর্বার চায় !

মাঠের ফসুলি ধ্যাতগুলারে দো-আধ্লা(৫) কৈয়া দিয়া বিলখের(৬)
দিগে চৈলা-যাওয়া হালটের ধলিখান ঘুমের আলসের মতন বিভাজ
হৈয়া পর্যা রৈচে। তারি এক কিনারে পাগা-গাড়া ডিঙি না-ও-
খানের ধারে বুক-সমান জলে খারায়া ফজু সেক জলে তল্লতল্ল-হওয়া
আউস ধান কাটব্যার লাইগচে। তামান দিন না-না-ওয়া-খাওয়ার
আগুনের ঝালা তার দেহের মধ্যে ধপ্ধপায়া জৈলা উঠ্যা আপুনেই
নিব্যা গেচে,—কেবল মাখাৰ আতেল্যা(৭) ভুল্কা(৮) চুল আৱ
গাধায়(৯) পড়া-চইথে তাৱ না-না-ওয়া-খাওয়াৰ সকল তাপ মাখা। তাৱ
মন আৱ দেহে নাই, ধানেৰ ঈ বাইলগুলাৰ মধ্যে আইজ তাৱ বাসা,

(১) বাকা। (২) সারি (Line)। (৩) কাক। (৪) চকু। (৫) বিধি-বিভক্ত। (৬) দিক
চক্ৰবল। (৭) তৈলহীন। (৮) খাঁকড়া। (৯) কোটুৱগত।

তার চইথের সবথানি নজর খালি ঐ খাতের ব্যার টুকের মধ্যেই লাইগা রৈচে। গায়ের বেবাক ঝোর সে আইজ তার হাত দুইটির লগে লগে চালায়। দিচে। নাকের নিয়াস(১) বিরাম মাইনা চলে, তার হাতে কামের আইজ আর থামন নাই। হাস্যে—তার ঘদি আর দুইটা হাত থাইকৃত !

দুই রোজ একজায় ডাওয়ারে(২) পর আইজকার বিষ্টি-থামা বিকালে বাবুগোরে ছেটু পান্সীধান মাঠে বাইর'চে। এতদ্বন্দ্ব চকের(৩) দক্ষিণে বিলের আন্দাজলে(৪) বাইচ-খেলা হালটের ধলি দিয়া বাড়ী ফিরনের মুখে নাশ্বথান ফজুর খ্যাতের কিনারে আইসা পৈল। মাঝি-গোরে থালি হাতে বসায়। থুয়্যা মাইজা বাবুর ছাওয়াল পাছানায় হাইল ধৈরচেন, আর বড় তরপের চশমা-আলা বাবুর লগে সেনেগো বাড়ীর আর মিস্তির বাড়ীর দুই ছাওয়াল আগা-নায়(৫) বৈঠা হাতে বসা।

মাজাজলে(৬) থারায়া উপুর হৈয়া ধান কাটনে লাগা ফজু সেকেরে দেইখা মাইজা বাবুর ছাওয়াল তার নাম ধৈরা ডাইক্লেন। আইজ পাচ দিনও পানয় নাই ফজুর ম্যায়।(৭) তিনির কাছে থিকা বাপের লাইগা জ্বর ছাড়নের ওষুধ নিয়া গেচে !

ইদিগে—শেষ বেলাৰ রৈদেৱ জিল্টুক ঢাইকা কাজ্জলা(৮) মেঘেৱ মন্ত্র একটা থাণ্ডাৱা(৯) তামান আকাশ ছায়। ফেলাল্য। তার কালা-ৱং-এৱ ছাপে সারা পিৰ্ব্বিমি মসিমাথা(১০)। খেইতাৱা(১১) সগলে

(১) নিয়াস। (২) আবণ-বৰ্ষা, ঘন-বৰ্ষা। (৩) মাঠ। (৪) স্টোভীন (stagnant)।
 (৫) বৌকার সশুধ দিক। (৬) কোমুৰ জল। (৭) মেঘে। (৮) কাজল বৰ্ণ। (৯) থঙ।
 (১০) কালো রং। (১১) কৃষক ভৃত্য, যাৰা কৃষকদেৱ মাঠে সহায়তা কৰে।

সার্. সার(১) কৈরা কাটা-ধান নায় ভৱব্যার লাইগ্ল, কেউ ধান-
বোঝাই নাও তরাতরি বায়া বাংড়ী ফির্যা চৈল। ফজুর আইজ
আৱ কিছুতেই ভুৱথেপ্ নাই। সে ক্যাবল জলেৱ উপৱ জাগা,
অঙ্ককাৱে পৰায় মিলায়া-যাওয়া কালা কালা ধানেৱ বাইলগুলাৱে
হাত্ৰায়া হাত্ৰায়া কাট্যাচ,—এখনো যে তাৱ অঙ্কেক খ্যাত
বাকী।

মাইজা বাবুৱ ছাওয়ালেৱ ডাকে সে তিনিৱ দিগে মুখ ফিরায়া
তাকাল্য, ঠিক সেই লগে হাতেৱ বৈঠা নামায়া। রাখনেৱ অবসৱে-
ভৱা ছয় ছয়খান হাতেৱ উপৱে তাৱ চইখেৱ বেৰাক নজৱ অনাৱ(২)
হৈয়া লুটায়া পৈল। বাবুগোৱে দেখন মাত্ৰেই তাৱ হাতে রোজকাৱ
মতন সেলামটা ও যে আইজ উঠল না। মাইজা বাবুৱ ছাওয়াল যে তাৱে
এন্নিভাৰে জলে ভিজনেৱ নিষেধ কৈৱলেন, নিয়ম মতন ও মুদ
খায়া বেৱাম ভাল কৱণেৱ উপদেশ দিলেন, ই-সগলেৱ কিছুই তাৱ
কানে চুক্ল না। জল দেইথা তিষায়-কাটা পৱাণেৱ মতন তাৱ মন
যে বৈচে—ক্যাবল এই নায়েৱ উপকাৱ হাত ছয় খানিৱ দিগে হাপুস
হৈয়া তাকায়া!

ঝৰু ঝৰু কৈৱ্যা বিষ্টি পৱায় নামে নামে, বাবুগোৱে বাইচেৱ নাও
ফজুৱ খ্যাত ছাৰায়া। খানিক তকাতে গেচে। আকাশ-জোৱা নিষ্ঠতি(৩)
আঙ্কাৱ আৱ বিষ্টিৰ আৰহিৱ(৪) ঝৰায় দিগ্দিশা বেৰাক বুজায়া(৫) দিল,
—ক্যাবল, ফজুৱ খ্যাতেৱ কালু কালা ধানেৱ বাইলগুলা আঙ্কাৱেৱ

(১) অস্তিত্বে। (২) অনড়। (৩) নিষ্ঠত। (৪) অনবৱত। (৫) ঢাকিয়া, আবৃত
কৱিয়া।

সেই কল্পি কাজলের মধ্যে থিকাও তার অলে-ভৱা চইথের দিগে
একদিক্ষে চায়া বৈচে ! .

* * * * *

থেইভাবা সব চৈলা যাওয়নে সাবা মাঠ নিটাল(১)—নিভাঙ্গ, জন-
প্রাণীর কাসির আওয়াজটাও নাই, ক্যাবল দূরে শুনা ষাপ্প ছয় থান
হাতের বৈঠায় অলের বুক আগ্লায়া-ষাওয়া—বুপ্প-বুপ্প-চুপ !

(১) নিম্নক, জন মানব শুন্ত।

শ্রীমুরেশানন্দ ভট্টাচার্য ।

ମାନୁଷ ଓ ସମାଜ ।

—*—

ମାନୁଷକେ ଶୃଦ୍ଧି କରେଛେ ଭଗବାନ—ଆର ସମାଜକେ ଗଡ଼େ' ତୁଲେହେ ମାନୁଷ । ଶୁତରୀଃ ମାନୁଷେର ଜୀବନ ସମାଜେର ଦାବୀ ଚାଇତେ ଚିରକାଳ ମହତ୍ତର ସୁହତ୍ତର, ଓ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ହୟେ ଥାକବେଇ । କେବଳ ମାନୁଷ ସର୍ବ କାଳେର କିନ୍ତୁ ସମାଜେର କୋନ ଏକଟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦାବୀ କେବଳ ଏକଟା ବିଶେଷ କାଳେର—ସା-ଗଡ଼େ' ଉଠେଛେ ବିଶେଷ ଏକଟା ପ୍ରୟୋଜନେର ତାଗିଦେ—କିନ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଟା ମନେର ଭଙ୍ଗୀତେ ।

କି ଆଗେ ? ମାନୁଷ ନା ସମାଜ ? — ମାନୁଷହି ଆଗେ—ମାନୁଷହି ସମାଜ ଗଡ଼େ' ତୁଲେହେ—ମାନୁଷେଇ ପ୍ରୟୋଜନେର ତାଗିଦେ ସମାଜ ଦାନା ବେଂଧେ ଉଠେଛେ ! ଆଜ ଆମରା ସେଇ ମାନୁଷକେଇ ଖାଟୋ କରେ' ସମାଜେର ବିଧି ନିଷେଧକେଇ ବଡ଼ କରେ' ତୁଲେଛି—ଅର୍ଥାଃ ସମାଜେର ପୂର୍ବପୂରୁଷେରା ସେ ମନ ନିଯେ ସେ ପ୍ରୟୋଜନେର ତାଗିଦେ ଜୀବନେର ସେମନ ଭଞ୍ଜିମା ଗଡ଼େ' ତୁଲେ-ଛିଲେନ, ସେଇ ଭଞ୍ଜିମାଟାକେଇ ଆଜ ଆମରା ବଡ଼ କରେ' ଦେଖଛି—କାରଣ ସେଇଟେଇ ସେ ଆମରା ଚର୍ଚିଚୋଥେ ଦେଖିତେ ପାଇ—ସେଇ ବିଶେଷ ଭଞ୍ଜିମାର ପିଛନେ ସେ ଏକଟା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ ଛିଲ ତା ଆମାଦେର ଆଲୋଚନାର ମଧ୍ୟେଇ ଆସେ ନା—ତାଇ ସେଇ ବିଶେଷ ଭଞ୍ଜିମାଟା ଦିଯେଇ ଆଜ ଆମାଦେର ପ୍ରୟୋଜନକେ ଆମାଦେର ମନକେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିତେ ଥାଇଁ । ସାତା ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ସମୟେ ଆମରା ଗରୁ ଦିଲେଇ ଗାଡ଼ୀ ଟାନିଯାଇଁ, ଯାକି ପଥେ ଏସେ

আজ আমরা গাড়ী দিয়ে পক্ষ টানাবার পরামর্শ সভা বসালেম। এই পরামর্শ সভায় মন্ত্রনাদাতা তাই যাই নিষ্ঠণ ভঙ্গের সঙ্গে সাক্ষপ্রাণ করবার কাছাকাছি এসে পৌছে গেছেন, যাদের প্রাণ নির্বাণের রাস্তা ধর-ধর। তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যেন হলুদ বরণ প্রোট্ৰ বটপাতাটা তাৰ বোঁটা থেকে খসে পড়তে পড়তে, তাৰ পাশেই নতুন বেয়িয়ে-আসা সবুজ বরণ কিশলয়টাকে চোখ উল্টে উপদেশ দিচ্ছে—দেখ, তোৱ ঐ সবুজ রঙের কোনই মানে নেই—ঈ আকাশের পানে চাওয়া আৱ ঐ বাতাসের স্বরে গাওয়া সে কেবল চোখের ও গলার ক্লান্তি—আৱ ঐ সবগুলোকে অড়িয়ে রঘেছে মনের একটা বিৱাট ভাস্তি।

কিন্তু প্রাণ যে জানবেই—সে ত “মোহমুদগৱের” সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে শক্রভাষ্য পড়ে নি। সে ত যুক্তি দেয় না, আয়ের পাতা উল্টোয় না। কোন দিক থেকে একদিন সে মৱা গাঙ্গের-ডাকা বানের মতো হড়মুড় কবে’ এসে পড়ে—তাৰ সে উচ্ছল চলচক্ষল নৃত্যশীল শ্রোতৃৰ বেগ হাস্তে হাস্তে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—সে শ্রোতৃৰ বেগে তাৰ দু'পাৱে যেখানে যত আলগা মাটিৰ চাপ স্বীকৃত কৰে’ অলে পড়ে’ কোথায় অদৃশ্য হ’য়ে যায়। মানুষের প্রাণ যেদিন আগে, সেদিন পুঁথিৰ পৃষ্ঠাৰ সঙ্গে সে প্রাণকে মিলিয়ে নেবাৱ অংশে সে ঘোটৈই বাকুল হয় না—কাৰণ সে জানে যে তাৰ নিজেৰ মধ্যেই প্রাণকে মন্তলোৱা পথে নিয়ে যাবাৰ দেবতা জাগ্রত হ’য়ে আছেন—সে সেদিন এক শান্তিৰ শ্লোককে খণ্ডন কৱবাৰ অংশে আৱ এক শান্তিৰ শ্লোক খুঁজে বেড়িয়ে সময় নষ্ট কৰে না—তাৰ যুক্তি নেই, প্রমাণ নেই—কাৰণ তখন যে আৱ সত্য আছে—তাই সে

আপনার মুখের ভাষায় সোজা কথায়, সহস্র বিপদ যুক্তি থাকলেও
তার মাঝে নির্ভয়েই 'বলে' ওঠে—

“মনের পথে যাত্রা নিষেধ ?—লক্ষ্মীছাড়ার যুক্তি ও,
লক্ষ্মী আছেন সিদ্ধ মাঝে মুক্তাভরা শুক্তি ও ।”

ডেকে যখন বান আসে তখন ত নদীর সেই সংকীর্ণ
পুরোনো খাতেই আর চলে না। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তার
সে দু'পাশেও পাড়ির পাড় ভেঙে কতদিনকার আনাগুন্ডো নিবিড়
ঝাউয়ের তিমির বন উপড়ে ফেলে, কত শতাব্দী পরিমিত মাধায়
একটা বটগাছটার গহন ছায়া মুছে নিয়ে, তখন নদীকে একটা বৃহত্তর
খাত করে' দিতেই হয়। একটা জাতির অস্তরে যখন তেমনি প্রাণের
বান ডেকে আসে তখন ত তার সেই পুরোনো মনের খাতেই আর
চলে না—তখন সেই জমাট বাঁধা মনের খাতের আশেপাশের হাজার
পরিচিত সামগ্ৰীর মাঝা ছেড়ে, সে মনের খাতকে বড় করতেই হয়—সে
মনের খাতকে বড় হতেই হবে—আর তবে হবে আতির পক্ষে মজল।
কেননা পুরোনো মনের খাতকে বড় করলে তার আশেপাশেরই
কিঞ্চিৎ ভাঙ্গড়া করতে হবে—কিন্তু সেই মনের খাতকে কিছুমাত্র
বড় না করলে প্রাণের বান উপচে উঠে এমনি একটা লগুভগু করবে
যে তাতে সে পুরোণো মনের খাতকে ত চেনাই যাবে না, অথচ তার
জায়গায় আর কোন নতুন শৃঙ্খলাকেও আমরা পাব না। প্রাণ
যেখানে জেগেছে সেখানে সংকীর্ণতাকে মাথা নত করতেই হবে,
সঙ্কোচকে কুঠিত হ'য়ে থাকতেই হবে। প্রাণের এই সন্মান ধৰ্মকে
মেনে যে সমাজ এই প্রাণকে অভিন্নিত করে' তাকে প্রশংস্ত কর-

পাইয়ে দেবে, সেই সমাজই মঙ্গলকে পাবে—নইলে ঐ প্রাণের শ্রোতের ছলছল হাস্ত কলকল অট্টহাস্যে পরিণত হ'য়ে মিথ্যার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকেও, অমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকেও, অধর্মের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মকেও ভাসিয়ে নেবে—তখন আর কালিয়-নাগকে বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যশীল চরণের তলে ফণ-বিষ্টা'র করে' থাকতে দেখব না—দেখব তখন তা ক্ষণের মন্ত্রকে আসন নিয়েছে।

ভগীরথের শৰীরবে ষেমন ভাগীরথী নেমে এসেছিলেন, তেমনি করে শৰীরবে যে বাঙ্গলার স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রাণের শ্রোত চারিয়ে পেল—এটা ত আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই। অসংখ্য শুক পত্র, শুক পত্র, পীত পত্রের তিতির থেকে যে “সবুজ পত্র” জেগে উঠল, আকাশের ভৱা আলোর দিকে চোখ মেলে দিল, বাতাসের খোলা শুরোর পানে কান খুলে দিল—সেই জেগে-ওঠা'র পিছনে ষে কার্যা কারণ দুই-ই রয়েছে—বাঙ্গলীর কবি যে জমাট-বাঁধা বিজ্ঞতার বয়েসে খুব-উষ্ণ মতো তাজা ঠোঁট নিয়ে “ফান্তনী”র বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে বসন্ত-উষ্ণ মতো তরুণ শুরে গাইলেন—

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।

ভেবে ছিলেম ফিরব না রে।

এই ত আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-বারে।

এত কবির একলার কথা নয়—এর পিছনে যে সমস্ত দেশের মুব-অশ্মের বেদনার আনন্দ রয়েছে—লক্ষ তরুণ তরুণীর মুক মুখের নীরব

ভাষা কবি-হস্তয়েন—শৃঙ্খল-হীন বিরোধ-হীন সহামুভূতির ভিতর দিয়ে
 তাঁর অন্তরে জমা হয়ে উঠে তাঁর বাঁশীর গানে মুর্ত হল—তাই না
 ও-গানকে আজ আমরা সত্য করে' পাচ্ছি, অমৃত বলে মানছি। এই
 নবীন কিশলয়গুলোকে যে আজ বাড়তেই হবে। জমাট-বাঁধা পাকা
 পাতার রাশের ভিতরে যেখান দিয়ে একটুকু আলোর রেখা আসছে,
 একটুকু বাতাসের আভাস ভাসছে সেই দিক দিয়ে যে তাদের কচি
 কচি মাথা ঠেলে তুলতেই হবে। কিন্তু মানুষ ত উদ্ধিদ নয়। গাছের
 পাতাকে যেখানে একটুকু আলো একটুকু বাতাসের অপেক্ষায় বসে
 থাকতে হবে—মানুষ সেখানে সেই আলো বাতাসের অন্তে আকুল
 হয়ে উঠলে তখনই তাঁর চারিদিকের দেয়ালের গা ভেঙ্গে মন্ত্র মন্ত্র
 জানালা বসিয়ে দেবে। এই জানালা বসাবার কথা মুখে আনতেই ত
 বিজ্ঞ মহলে মহা মাথা নাড়ানাড়ি পড়ে গেল। তাঁরা অবস্থা সঙ্কীর্ণ
 বুঝে দু' আঙুলের বদলে চাঁর আঙুলের ফাঁকে প্রকাণ এক টিপ
 নিষ্ঠ নিয়ে বলতে শুরু করলেন—না, না, জানালা ?—তা হতেই
 পারে না—এমনি নিরেট দেয়ালের মাঝে আমরা পাঁচ শ' সাত শ'
 হাজার বছর কাটিয়েছি, আর আজ কিনা সেখানে মেঝের অনুকরণে
 একটা বিশ্বি হাঁ-করা জানালা বসিয়ে দেবে—এ হতেই পারে না।
 আর এ জানালা দিয়ে শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই কখন কি যে
 চুকবে তাঁর ঠিক কি ? আলো বাতাসের জন্মে বাকুল ঘাঁরা তাঁরা
 বিজ্ঞ মহলের ও-কথা ঘোটেই কানে তুলছেন না ও-কথা মান্বার
 তাদের উপায়ই নেই। তখন বিজ্ঞ-মহল সেই দেয়ালের ধারে ধারে
 হাজার হাজার শাস্ত্র-পুলিশকে ঘোতায়েন করে' দিলেন—বুক ফুলিয়ে
 বললেন এখন এসো দেখ দিবি' কে এই সন্মান দেয়াল ভাসে। সেই

শান্তি-পুলিশৱা দাঙিয়েই রাইল—ভারী ভারী মোটা জাঁদুরেলি
চেহারা—তাদের কাঁধে অনুস্বারের সঙ্গীন—পিঠে ঝুলোনো বাগে
বিসর্পের “গ্রেনাদ”—চ’-গালে লক্ষ্য বছরের বর্ধিত মিশমিশে কালো
গালপাটা—গালপাটা দাঙি গেঁফে তাদের চেহারা যে কেমন তা
দেখাই যায় না—তারা দাঙিয়ে জ্বরুটি করছে না অভয় দিছে তা
বোঝবারই উপায় নেই—সে চেহারা দেখে বিজ্ঞ-মহলের সাহস বেড়ে
গেল—বড় আর এক টিপ নশ্চি নিয়ে নাথাটা তেজালো করে’
জোরালো গলায় হাঁকলেন—এইবার এসো দেখি কে এ দেয়াল
ভাঙবে—এ আমার বাড়ী আমার ঘর—আমি এ কাউকে ভাঙতে দেব
না। সবুজ পাতারা বসন্তের বাতাসে দোল খেতে খেতে অতি
অপ্রতিভ ভাবে অকুণ্ঠিত কঢ়ে বললে—মহাশয়ৱা গোড়াতেই একটা
বড় ভুল করে’ বসবেন না—এ আমাদেরও বাড়ী বটে।

যুক্ত বাধল—অর্থাৎ বাকের। চক্ৰবৃহ রচিত হল—অর্থাৎ তকের।
প্ৰবীন দল নবীন দলকে চোখ রাঙিয়ে বললেন—তোমাদের প্রাণের
শ্রোত না অশ্বডিষ্ট—আসল কথাটা হচ্ছে ছেলেমানুষী, উভৱে
নবীন দল প্ৰবীন দলকে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে—আপনাদের
বিজ্ঞতা না হাতি—আসল রোগটা হচ্ছে আৱামী মেজাজ। প্ৰবীণৱা
গেলেন চটে। তাদের মুখ দিয়ে তথন গাদা গাদা অনুস্বার বিসর্গ
ছুটে বেরুতে লাগল। নবীন তা মহা কৌতুহলী হয়ে এক কান দিয়ে
শুনে আৱ এক কান দিয়ে বেৱ কৰে দিতে লাগল। মনে মনে
প্ৰবীণদেৱ উদ্দেশ্য করে’ বললে—আপনাৱা অনুস্বার-বিসর্গেৱই
চৰ্চা কৰুন, আমৱা এদিকে জানালা বসাই।

কিন্তু নবীনৱা যে শুধু গায়ের জোৱেই জানালা বসাবে, এই এত

বড় অভ্যন্তর কথাটা ত আজ কিছুতেই চোখ খুলে সমর্থন করা যায় না। স্মৃতিরাং প্রশ্ন ওঠে—বাড়ীর রঙ ঢঙ কার ব্যবস্থামুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে? এ আরামী মেজাজের মতলবে? না—ছেলে-মানুষের খেস খেয়ালে? এর বিচার কেবলমাত্র একই উপায়ে হতে পারে। সেটা হচ্ছে এই যে, এই দু'দলকেই আলোচনার বাইরে রেখে এই বাড়ীর চিরস্মৃতি মঙ্গলের পথ কি, নির্দ্ধারণ করা—এই বাড়ীর এক যুগের লোকের আরামের ব্যবস্থা নয়—কিন্তু এক দল লোকের খেয়ালের সার্থকতা নয়—সেটা হচ্ছে সকল যুগের লোকের কল্যাণের পথ। স্মৃতিরাং আমাদের সত্য দেখতে হবে কেননা একমাত্র সত্যেই কল্যাণ রয়েছে। দেখতে হবে আমাদের মানুষের সত্য, সমাজের সত্য—ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যেকার বে ঘোগ সেই ঘোগের সত্য-সমষ্টি।

(২)

মানুষের অন্তরে সবাই চাইতে আদিম সম্পদ হচ্ছে তার স্বাধীনতা। একদিন মানুষ ছিল বাতাসের মতোই স্বাধীন—কিন্তু না—বাতাসের চাইতেও বেশি। কেননা বাতাসের মন বলে' কোন জিনিস নেই—কিন্তু মানুষের ছিল। বাতাসের চলা-ফেরা নির্ভর করে অনৈসর্গিক কারণের ওপরে—কিন্তু মানুষের চলাফেরা নির্ভর করে তার নিজের উপরেই—তার ইচ্ছা, তার will-এর উপরে। সেই আদিম-কালে মানুষের যে কেমন জীবন ছিল তার ইতিহাস আমাদের জানা নেই।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগ্ন, ততই দেখা গেল যে মানুষের অন্তরে এই স্বাধীনতার পাশে পাশে আর একটা নতুন জিনিস গড়ে'

উঠছে—সেটা হচ্ছে অপুর মানুষের সঙ্গাতের ইচ্ছা। নিতান্ত একা থাকাটা তার কাছে ধীরে ধীরে রসহীন হ'য়ে উঠল। এমন কি তার মদৃচ্ছা স্বাধীনতা ও সেটার ক্ষতি পূরণ করতে পারলে না। নিজেকে সে অন্তের ভিতরে দেখতে চায়—নিজের মনের ভাব সে অন্তকে জানাতে চায়। তার স্বত্বে হৃৎখে আমোদে আহ্লাদে একজন অংশীদার না হ'লে আর তার চলে না। যেদিন মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হ'ল সেই দিন সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হল। সেদিন নিশ্চয় দেবলোকে দুর্ভুতি বেজে উঠেছিল—স্বর্গ থেকে দেবতারা পুন্পুষ্টি করেছিলেন। কেননা সেই যে কোন্ আদিম কালে কোন্ গহন ঘন অরণ্যের অন্তরালে দুটি মানুষের মিলন, সে হচ্ছে মানব-সভ্যতা-সৌধের প্রথম প্রস্তর-স্থাপনা। এই দুটি মানুষের একদিন মিলন হয়েছিল বলে’ অঙ্গল কেটে পল্লী বসল, পল্লী ক্রমে নগর হল, নগর নগরী ক্রমে রাজ্য হল, রাজ্য ক্রমে সাম্রাজ্য পরিণত হ'য়ে মানুষের মনুষ্যত্বের বিচ্ছিন্নতম বিলাসের পথ করে’ দিলে—বিচ্ছিন্নতম বিকাশে সার্থক করে তুললে।

কিন্তু এই যে অসীম স্বাধীনতার অধিকারী দুটি মানুষ—যে মুহূর্ত থেকে সেই দুটি মানুষ একত্র বসবাস করতে আরম্ভ করল—সেই মুহূর্ত থেকে তাদের সেই অসীম স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাতেই হল। কেননা তখন তাদের এই একত্র বসবাস চিরকাল সন্তুষ্ট করে’ তুলতে চাইলে তাদের দুজনকেই পরম্পরের মন রেখে চলতে হবে—পরম্পরের স্বত্ব স্ববিধা দেখতে হবে—পরম্পরের কুচি বিশ্বাস ভাব সমস্তকে সম্মান করে’ চলতে হবে। প্রতি মুহূর্তে যদি তাদের পরম্পর পরম্পরকে আঘাত করে’ চলতে হয়, তবে তাদের একত্র

বসবাস যে রাত্তিরও পোয়াবে না এটা' নিশ্চয় করে' ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। আঘাতের উপরে কিছুই গড়ে ওঠে না, তার নীচে যা কিছু সবই তেঙ্গে যায়। স্মৃতরাং এ দুটি মানুষ যদি বাস্তবিকই পরম্পর পরম্পরের সঙ্গলাভের একান্ত অভিলাষী হন তবে তাদের মনের ভাব প্রাণের বেগ ইত্যাদিকে একটা সংযমের মধ্যে আবক্ষ করতেই হয়— এক কথায় তার যদৃচ্ছা স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাতেই হয়। অপরের সঙ্গলাভের ইচ্ছা সার্থক করতে চাইলে মানুষকে এই মূল্যই দিতে হয়। এই হচ্ছে সমাজ সম্বন্ধে ভিতরের আসল কথাটা।

স্মৃতরাং আমরা যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যান্ত জীবনটাকে একটা সংযমের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাই—আমাদের মনকে প্রাণকে বাক্কে কার্যকে একটা সংযমের বাঁধ দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করি, সে-সবের আদিম সত্যটা—অর্থাৎ যে-সত্য থেকে তা উত্তৃত হয়েছিল - সেটা নৈতিক শিক্ষাও নয় বা আধ্যাত্মিক দীক্ষাও নয়—সেটা হচ্ছে কেবল মানুষের একটা ইচ্ছার সার্থকতা সাধন করবার জন্যে, আর একটি ইচ্ছার সঙ্কোচ। রামের সঙ্গে যদি আমার বন্ধুত্ব করবার নিতান্তই গুরুজ হয়ে থাকে তবে অবশ্য রামের পাকা-ধানে মই দেওয়াটা তার প্রকৃষ্ট পন্থা নয়—এটা বোববার জন্যে পদ্মাসন করে' ধ্যানে বসে যেতে হয় না।

কিন্তু সেই প্রথম যেদিন দুটি মানুষের মিলন হয়েছিল, সে দিন থেকে আজ কত লক্ষ লক্ষ বৎসর কেটে গিয়েছে—আজ মানুষের সমাজ দুটি মানুষের নয়—লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের। এতদিন বেঁচে এসে আজ আমরা মানুষ নামক জীবটিকে অনেক পরিমাণেই জানি— তার মনের ভাব, প্রাণের ভঙ্গী, বুদ্ধির গতি ইত্যাদি অনেক রহস্যই

আজ আমাদেৱ চোখেৱ সামনে খুলে গেছে। আজ আমৱা জানি তাৱ
দুঃখ কিসে, শুখ কোথায়। এই মানুষকে আজ আমৱা জানি বলে
আজ আমাৱ প্ৰতিবেশী কিসে আমাৱ প্ৰতি বিৱৰণ না হয় তাৱ অন্তে
প্ৰতি পদে পদে আমাকে আৱ চিন্তা কৰে' কৰে' পা ফেলতে হয়
না—তাৱ সন্ধে আমাৱ একটা ব্যবহাৱ জমাট বেঁধে উঠেছে। কিন্তু
আমাদেৱই এই জমাট-বাঁধা ব্যবহাৱেৰ পিছনকাৱ আসল সত্যটা
সবাই ভুলে গিয়েছি—আজ আমৱা এই ব্যবহাৱেৰ পিছনকাৱ একটা
মানসী মূল্লিকে সত্য-দেবতা রূপে দাঢ় কৱিয়ে দিয়েছি—এই দেবতাৱই
নাম হচ্ছে বৌতি। কিন্তু এই বে বলেছি আমাদেৱ জমাট-বাঁধা
ব্যবহাৱ, এ আমাদেৱ এমনি অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে—এমনি second
nature হ'য়ে উঠেছে যে, এই ব্যবহাৱেৰ অন্তৱালে যে আমাদেৱ
স্বাধীনতাৰ সঙ্কোচ রয়েছে তা আমৱা কেউ মনেও কৱতে পাৱি নে—
কেননা সেই আদিম, মানুষেৰ মতো সেই উদাম স্বাধীনতা আজ
আমৱা কেউ অনুভব কৱতে পাৱি নে—অশিষ্ট মনেৰ চাঞ্চল্যও আজ
আৱ আমাদেৱ জীবনে নেই। এসব অত্যন্তই ভাল কথা সন্দেহ
নেই—কিন্তু—

এই “কিন্তু”টাকে নিয়ে বত মুক্তি। কেননা সমাজেৰ উপরে
যেমন ব্যক্তিবিশ্বেৰ অভ্যাচাৱ আছে তেমনি ব্যক্তি বিশ্বেৰ উপরেও
সমাজেৰ অভ্যাচাৱ বলে' একটি পদাৰ্থ আছে। আৱ এ দুই অভ্যা-
চাৱেৰ বিভীষণ আভ্যাচাৱটিই ভীষণ। কেননা একটা মানুষ যখন
সমাজেৰ উপরে অভ্যাচাৱ কৰে' তখন তাকে শাস্তি দেৰাৰ অন্তে ত
লক্ষ লোকেৱ মন বুকি হাত পা রয়েছেই—ধাৱ শক্তি অবৰ্দ্ধ। কিন্তু
যখন লক্ষ লোকে মিলে একটা ব্যক্তিৰ উপৱে অভ্যাচাৱ কৰে'

তখন আর তার কোন আপিল নেই। এই ব্যক্তির উপরে সমষ্টির অভ্যংচারের সম্ভাবনা ও সুবিধা বর্তমান হিন্দুর সমাজে অনেক। হিন্দুর সমাজে মানুষের মনে নীতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক রীতিও এসে ঝোগ দিয়েছে—এই রীতিনীতিই বর্তমানে ধর্ম নাম নিয়ে হিন্দু সমাজে একাধিপত্য রাজত্ব বিস্তার করেছে—এই ধর্ম যেমন তেমন ধর্ম নয় একেবারে সনাতন ধর্ম। এই সনাতন ধর্মের দু'পাশে দুই অশুর দাঙ্ডিয়ে মোটা মোটা দু'জোড়া গোক পাকিয়ে চোখ লাল করে মানুষের আত্মা নামক জিনিসটিকে একেবারে চেপ্টা করে' ছেড়ে দিচ্ছে—এই দু'-অশুর হচ্ছে সমাজ-চুক্তি ও স্বর্গচুক্তির ভয়।

(৩)

এখন পূর্বে যা বলে' আসা গেল সেই কথাগুলো যদি স্বীকার করি তবে সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাটাও মানতে হয় যে, আমাদের যে প্রতিদিনকার আচার ব্যবহার—তা সে আচার ব্যবহার আমাদের মনে অধিষ্ঠিত নীতি-গুরুমহাশয়ের বেতের ভয়েই সোজা চলুক, বা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত রীতি-দেবতার মূরুবিয়ানার আদরেই “হন্দাবনং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি” বলে' মাটি গেড়ে বস্তুক—সে রীতিনীতির একটা মুসাবিদা মনুই লিখুন বা রঘুনন্দনই করুন—সে সবের একটা কোন বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক মূল্য বা অর্থ নেই—অর্থাৎ ইংরাজিতে ধাকে বলে spiritual significance ও intrinsic value, তা নেই। আর এ কথাটা এখানে মনে করিয়ে দেওয়া ভাল বো, সকল জিনিসেরই আধ্যাত্মিতার দিকটাই হচ্ছে মানুষের দিক থেকে সবার চাইতে বড় দিক।

উপরের এই কথা শুনে সমাজের অধিকাংশ ‘ব্যক্তিই বলে’ উঠবেন, খটা হচ্ছে একটা অতি সাংসারিক সিদ্ধান্ত—ও সিদ্ধান্ত সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে। মিথ্যা যদি হয় তবে ত এ-কথা বলাই পাপ, আর যদি সত্য হয় তবে অমন সব সাংসারিক সত্য দশজনের মধ্যে প্রকাশ করার মতো অবিবেচনার কাজ আর কিছু হ'তে পারে না। কেননা আমরা যদি রীতির পিছন থেকে নীতি ও নীতির পিছন থেকে নৱক-ভয়কে খারিজ করে’ দেই, তবে সমাজের রামশ্যামহরি অমনি সবাই উশ্বর্ণল হ'য়ে উঠবে—কাউকেই আর ঠেকান যাবে না। কিন্তু আসলে কোন ভয় পাবার দরকার নেই। কেন?—তা বলছি।

প্রথমত, এ-কথা সত্য নয় যে রামশ্যামহরি আজ সবাই উশ্বর্ণল হবার জন্যেই উদ্গৌব হয়ে রয়েছে—এবং তারা তাদের সে রোধকে সংঘ করে’ রেখেছে কেবল পরলোকের ভয়ে। সামাজে উশ্বর্ণল হবার অর্থ—অস্তত যে উশ্বর্ণলতায় সমাজের আর দশজনের প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু আসে যায়—সেটা হচ্ছে সমাজের অপর সত্যদের আঘাত করা—দেহে বা মনে। কিন্তু অপর মানুষকে আঘাত করাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম নয়। যদি বল যে সমাজে কেউ কাউকে কি আঘাত করে না?—অবশ্য করে। কিন্তু সেইটেই হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম। প্রত্যেক সমাজের হিসেব নিলে দেখা যাবে যে যারা আঘাত করে তাদের সংখ্যা যারা আঘাত করে না তাদের চাইতে অনেক কম।

দ্বিতীয়ত, মানুষ সাধারণত শাস্তিপ্রিয়—অ-সাধারণত সংগ্রাম-প্রিয়। যে উশ্বর্ণল সে সমাজে অশাস্তি আনবার সঙ্গে সঙ্গে আপনারও অশাস্তি ঘটায়—মুত্তরাঃ আপন গরজেই তাকে সংবাদ হতে হয়।

তৃতীয়ত, মানুষের অপর মানুষের সঙ্গাতের ইচ্ছা এমনি একটা প্রবল ইচ্ছা, এমনি একটা সত্য ইচ্ছা যে, কেবল ওর ভাগিনৈই তাকে অন্য দশজনের সঙ্গে মানিয়ে বনিয়ে চলতে হবে। মানুষের পক্ষে অপর মানুষের শ্রদ্ধা প্রীতি ইত্যাদি আকর্ষণ করবার ইচ্ছাও একটা অতি স্বাভাবিক ইচ্ছা—এই ইচ্ছাই মানুষকে অপরের প্রতি প্রাকাশন প্রীতিমান হ'তে শেখায়, কেননা এক প্রীতিই প্রীতিমান করতে পারে। অবশ্য এমন লোকও দেখা গেছে যারা প্রীতির ধার ধারে না কে শাস্তি-শোয়াস্তিরও তোয়াকা রাখে না—কিন্তু দেখা গেছে এমন লোকদের রৌতির পিছনে নীতি ও নীতির পিছনে আধ্যাত্মিকতার লক্ষা বকৃতা ভুড়ে দিয়েও তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। সুতরাং নতুন কোন একটা সামাজিক প্রলয়ের কারণ স্থষ্টি করা হবে না, যদি একথা কোন বাস্তবে আমাদের আচার ব্যবহারের পিছনকার অর্থটা আধ্যাত্মিক নয়, সেটা হচ্ছে নিচে সামাজিক—অর্ধাং ওর *Significance spiritual* নয়—*Sociological*.

আসলে মানুষ দেবতা না হলেও দানব নয়—মানুষের মধ্যে তার হিত হিত ইচ্ছা নিজ গুণেই বর্তমান। নিট্স্ক সভ্রেও মানুষের মধ্যে দয়া মায়া স্নেহ প্রীতি ইত্যাদি চিরকাল বর্তমান হ'য়ে রয়েছে এবং আশা করা যায় চিরকাল থাকবেও। মানুষের মধ্যে যদি এই নিজে তাল হিত হিত ইচ্ছা, পরের ভাল করবার ইচ্ছা না থাকত তবে এতদিনে মানুষের হাতে পায়ে বড় বড় ধারাল নথ দেখতে পাওয়া যেত। মানুষ এঞ্জিন নয় যে তাকে “রিলিজনের হাপরে পুড়িয়ে নীতির হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে গড়ে তোলা যাবে। মানুষের অন্তরে এমন একজন কেউ আছেন যিনি আপন আনন্দেই মানুষকে :

ভালিয়ে নিয়ে চলেছেন। আশুকে অভিযন্ত্র objective করে' দেখাই তুল দেখা। আশুকের আসল অভ্যাই হচ্ছে বে, সে Subject—কারণ সে তৈত্তিশ্চর পুরুষ। আশুকের অভ্যরে এই পুরুষকে অঙ্গ করে' বলে আমরা বাইরের নিয়ম কাশুমকেই চুক্তান করে' ভূলি, তখন আশাদের ব্যবহারটাও সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে রাজাৰ গবচ্ছন্দ অঙ্গীয় অঙ্গে হ'য়ে পড়ে। রাজা গবচ্ছন্দ একদিন কাশুনের পেছে প্রচণ্ড নিরাকৃ ও ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠেছিলেন। মহী গবচ্ছন্দ তৎক্ষণাতে দশমহাজার শোক লাগিয়ে সিলেন রাজবাগানের রাজাৰ আম পাহে উঠে আদেৱ ভালপালা ভীবণ আবে বাঁকাৰ্বাকি কৱতে। যদা বাহ্যিক উক্ত উপায়ে কোন কাতাল স্ফুট হয়ে গৌজুকে পীড়িত করে' নি—সাতেৱে মধ্যে সেবাৱ রাজাৰ আমবাগানে একটি আবগাছেও আম কল্পনা কৰা।

কেউ কেউ এইখানে বলে' উঠতে পারেন বে মহী গবচ্ছন্দ বাহি কৰুন বা কেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰ সকল পদাৰ্থকে বিশ্লেষণ করে' তাকে "ইজোকটুণ"-এ পৱিণ্ঠ করেন, তেমনি মীতি তিলিলটাকে অমু করে' বিশ্লেষণ করে' আকাশে উড়িয়ে সেবাৱ প্ৰয়োজনটা কি ? রীতিৰ পিছনে বীতি, বীতিৰ পিছনে স্বৰ্গলাভেৱ লোত থাকলাই বা— ওই অয়ে আৱ ওই জোভেই যদি সমাজে তু' একজনাও শিষ্ট হ'য়ে উঠে আবে অতিই যা কি আৱ অন্দই বা কি ? অবশ্য কথাটা অভ্যন্ত সমীকৃতি।

কিন্তু আশাদেৱ অমাজক্ষমকে ভার্যানিক খেকে যে বহুলিম হ'ল আমা ব্যাধি আক্ৰমণ কৱেছে এটা আজ আমৰা আশাদেৱ শৰীৰ একটুকু মাঝাঢ়া কলাতেই টেৱ পেয়েছি। আজ আমৰা বিশ অহামাজেৱ

ରାଜପଥେ ଏକଟୁକୁ ସଜୋରେ ପଞ୍ଜକେପ କରେ' ହ' ଏକପାଇଁ ଦେଖେଇ ଆମାଦେର ମନେର ନାମ ଦିକ୍ ଥିକେ ମୁୟୁଷୁର ସନ୍ଧାନାର “ଉଛୁ ଉଛୁ” ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରେସେଛି । ଏ “ଉଛୁ ଉଛୁ”-ତେ ଆମରା ଆଜ ସନ୍ତୃଷ୍ଟ । କାରଣ ଓଟା ହୁଅଛେ ଏହି ପ୍ରମାଣ ଯେ ଆମାଦେର ମନ ଏକବାରେ ଅମାଡି ହୁଯି ନି—ଅର୍ଥାତ୍ ମନେ ନି—ତବେ ବ୍ୟାଧି-ଆକ୍ରମଣ । କିନ୍ତୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ହରାର ଇଚ୍ଛା ମାନୁଷେର ଏକଟା ସ୍ଵଭାବିକ ଇଚ୍ଛା । ଆମାଦେର ସମାଜ ମନକେ ଆମରା ସକଳ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ହ'ତେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତେ ଚାଇ-ଇ । ଚିକିଂସା ଶାସ୍ତ୍ରେର ଏହି କୁଥାଟା ଆଜ ସବାଇ ଜାମେନ ଯେ ରୋଗୀକେ ଭାଲ କରନ୍ତେ ହ'ଲେ ସର୍ବ-ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ତାର ସର୍ବ-ପ୍ରକାର ଭୟ ଭାଙ୍ଗାନ । ଆମାଦେର ସମାଜ ମନ ଥିକେ ସର୍ବ-ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ସକଳ ପ୍ରକାରେର ଭୟ ଭାଙ୍ଗାନ । ନୀତିର ପିଛନେର ସେ ସତ୍ୟଟା ଯେ ମାନୁଷେର ପ୍ରତି ମାନୁଷେର ଶ୍ରୀତିର ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଇହଲୋକ ବା ପରଲୋକେର ଭୀତିର ଉପରେ ନୟ—ଏକଥାଟା ତାହିଁ ଆଜ ଆମାଦେର ପରିଷକାର କରେ ଦେଖିବେ । ଯେ ଛେଲେଟା ଅଭିରିତ ରକମେର ଦୁର୍ଦ୍ଵାନ୍ତ ସେ-ଛେଲେଟାର ପକ୍ଷେ ହ' ଏକଟୁ ଜୁଝୁ-ବୁଡ଼ିର ଭୟ ଥାକାଟା ହୟତ ମନ୍ଦ ନୟ—କିନ୍ତୁ ଯେ ପିଲେପେଟା ରୋଗ ଛେଲେଟି ବ୍ୟାତାସ ଏକଟୁ ଜୋରେ ବହିଲେଇ ଭୟେ କେକିଯେ ଓଠେ ତାର ମନେର ପିଠେ ଆରା ହ' ଏକଟୁ ଭୂତେର ଭୟେର ପୁଲଟିସ୍ ଲାଗିଯେ ଦିଲେ ସେ ଯେ ଅଭି ଶୀଘ୍ରଇ ପକ୍ଷଭୂତେର ସଜେଇ ମିଲିଯେ ଯାବେ ତାର କୋନ ସନ୍ଦେହ ନେଇ । ସକଳ ରୋଗୀରିଇ ସେ ଏକ ପଥ୍ୟ ନୟ ଏଟା କି ଆୟୁର୍ବେଦ କି ହୋମିଓପ୍ୟାଥି କି ଏଲୋପ୍ୟାଥି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେଇ ବଲେ । ଆର ଆମାଦେର ସମାଜେର, ଦୁର୍ଦ୍ଵାନ୍ତ ଛେଲେଟାର ଚାଇତେ ପିଲେ-ପେଟ ଛେଲେଟାର ସଜେଇ ସେ ସେଣ ସାହୁନ୍ତ ଆହେ ତା ନେହାଏ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୟ ।

ପୁନ୍ତ୍ରନ୍ତର ଉପରେ ଯେ ସବ କଥା ବଲା ଗେଲ ସେଇ ସବ କଥାର ଲିଙ୍ଗାତ୍

স্বরূপে এই কথাটা নির্বিশ্লেষে বলা বেতে পারে মনে করি যে, যিনি সমুদ্রযাত্রা করেন আর যিনি করেন না, তাঁদের ছ'জনের মধ্যে স্বর্গলাভের সম্ভাবনার কোনই তারতম্য নেই। বে-কোন সুমাজের যে-কোন আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও এ একই কথা। স্বতরাং হিন্দুর সামাজিক আইন কানুনের, মানুষকে বিশেষ করে' অঙ্গানন্দ লাভ করিয়ে দেবার, কোন ভগবানদ্বন্দ্ব ক্ষমতা নেই।

স্বতরাং এই কথাটা আজ আমরা নির্ভয়েই মনে করব যে আমাদের বাপ দাদাৰা টিকটিকিটাকে যতখানি সম্মান করে' চলতেন, আমরা যদি ততখানি সম্মান করে' না চলি, তবে আমাদের আত্মার অধোগতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

এই যে টিকটিকিটাকে সম্মান না-করবার স্বাধীনতা এই-ই হচ্ছে মানুষের আত্মার স্বাধীনতা ;—প্রাচীনের কবল থেকে, গতামুগতিকের শৃঙ্খল থেকে, অর্থাৎ অপর মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি, তা হোক সে “অপর মানুষ” নিজেরই বাপ-দাদা। এই স্বাধীনতা সেখানে অস্বীকৃত হয়েছে সেখানে মানুষের প্রাণের গতি মরে’ এসেছে, মন জমাট বেঁধে উঠেছে, বুদ্ধি অল্প হ’য়ে গিয়েছে—মানুষ ধীরে ধীরে সেখানে হয়ে ওঠে মেষ। এ অবস্থায় তারপর একদিন যখন এই নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে আমাদের মনুষ্যত্বের ডাক পড়ে তখন অস্তরের চারদিকে হাতড়ে হাতড়ে দেখি সেখানে কোন খানেই এক ছাটাক মনুষ্যত্ব আৱ অবশিষ্ট নেই।

এই মনুষ্যত্বের ডাক পড়েও—কেন পড়ে? তা’ বুঝলৈই ব্যাপারটা অনেক পরিষ্কাৰ হয়ে আসবে।

(৪)

যে-মানুষ বলে জগতে যা-কিছু জানবাৰ আছে তা তাৱ জানা হ'য়ে গেছে—এবং সে যা জানে তাই হচ্ছে সকল জানাৰ সেৱা জানা—এ-জগতেৱে একেবাৱে শেষ খবৱটা পিতামহ ব্ৰহ্মা তাৱ কাছে পাঁচ হাজাৰ বছৱ পূৰ্বে তাৱহীন টেলিগ্ৰাফেৱ কোডেৱ সাহায্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তাৱ আৱ কিছু জানবাৰও নেই বোৰবাৰও নেই, শোনবাৰও নেই শোনাৰও নেই—সেই মানুষটাকে আজি আমৱা এই হাজাৰ প্ৰশ়্না হাজাৰ সমতাৰ মাবে অবশ্য কৃপাৰ চক্ষেই দেখি এবং তাৱ তুল্য হাস্তান্তিক জীব আৱ আমৱা খুঁজে পাই নে। কিন্তু একটা ব্যক্তিগত মানুষেৱ পক্ষে যা হাস্তান্তিক মাত্ৰ একটা সমাজেৱ পক্ষে ঠিক সেইটেই মাৱাঞ্চক হয়ে উঠতে পাৱে।

মানুষেৱ উপজোক্ত মনোভা৬, দুটি কাৱণে ঘটতে পাৱে। একটি হচ্ছে তাৱ অস্তিক নামক স্থানটিতে বুদ্ধি নামক পদাৰ্থটিৰ কিঞ্চিং অজাৰ—ফিলৌয়াটি তাৱ হৃদয় নামক জায়গাটিতে আজ্ঞানৱিতা নামক জিনিসটিৰ প্ৰচুৰ সন্দৰ্ভ। ঐ দুয়েৱ পৱিণাম কলাই হচ্ছে মানুষেৱ পজন। সমাজ ও জাজিৰ দিক থেকে কল একই।

সেই প্ৰথম বেদিন দুটি মানুষেৱ প্ৰথম মিলন হয়েছিল—সেদিন থেকে লক্ষ বৎসৱ কেটে গেছে—আজি মানুষেৱ সমাজ যে কেবলই লক্ষ লক্ষ মানুষেৱ, শুধু তাই নহয়—আবাৱ লক্ষ লক্ষ ভিন্ন ভিন্ন সমাজও বটে—যা গড়ে' উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্মত্বে জাতিত্বে বা দেশত্বে। এই সব বিভিন্ন সমাজেৱ মধ্যেও আদান প্ৰদান চলেছে। মানুষেৱ ও মানুষেৱ মধ্যে যে আদান প্ৰদানেৱ ইচছাৰ সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে

মিলন হয়—ব্যক্তির বৃহত্তর রূপ সমষ্টিগত সমাজেও সেই সত্যই ফুটে উঠছে। ব্যক্তিতে যা আছে সমষ্টিতেও সেই ধর্মই ফুটে উঠে। ব্যক্তিগত ভাবে সবাই সামাজিক জীব—আর সমষ্টিগত অবস্থানে সবাই মৌনী-বাবা হন না। আবার অপর পক্ষে ব্যক্তিতে যা মোটেই নেই সমষ্টিতে হলেই তা গজিয়ে উঠে না। ব্যক্তিগত ভাবে সবাই উড়ে-মালি—আর তারা সমষ্টিগত হলেই নেপোলিয়ান বা চেঙ্গিস্থার মত ‘পৃথিবী জয় করে’ নিয়ে এলো—এমনটা হয় না।

সে যা হোক, দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সমাজে সমাজে এই যে আদান প্রদান তা হতে পারে—এবং চিরকাল যা হ'য়ে আসছে—চুটি রকমে। হয় প্রীতির ভিতর দিয়ে মিলনে, নয় দুন্দের ভিতর দিয়ে সংঘর্ষে। এই দুন্দের পিছনে আছে সমাজবিশেষের স্বার্থ বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বেষ। এই সংঘর্ষ যে কেন হয়, মানুষের স্বার্থ যে কত রকমের সে আর এক লম্বা ইতিহাস। বলা বাল্লজ তার আয়গা এখানে নেই। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই সংঘর্ষ হয়—এটা আমাদের প্রত্যক্ষ সত্য।

এই দু'-রকমের আদান প্রদানে মানুষের দু'-রকম মনের ভাব হতে বাধ্য। যখন কেউ প্রীতি সঙ্গে নিয়ে মিলন প্রত্যাশী হ'য়ে আমাদের দ্বারে আসে তখন আর তাকে আমরা ফেরাতে পারি নে—মানুষের সে স্বভাব নয়। কিন্তু যখন কেউ স্বার্থ বা দ্বেষ সঙ্গে নিয়ে আমাদের আঘাত করতে আসে, তখন আমরা সে আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যে প্রাণ কবুল করি—মানুষের এও স্বাভাবিক ধর্ম। তাই দ্বেষের সামনা সামনি দাঢ়িয়ে আমাদের বাধ্য হ'য়ে দেশের কথা কইতে হয়।

একটা হেশে জাতি বা সমাজের প্রতি আর একটা দেশ জাতি বা সমাজের যে আঘাত—এ আঘাতের দুটো দিক আছে—একটা অন্মের দিক আর একটা আঘাত দিক—হয় দেহ দিয়ে দেহকে আঘাত, নয় মন দিয়ে মনকে আঘাত। আমরা হিন্দুরা দেহের চাইতে আঘাতকে বড় বলে' মানি—স্মৃতরাং সমাজে সমাজে এই দ্বন্দ্বে মনের পরাজয়ই বড় পরাজয়।

এই পরাজয় থেকে বাঁচবারও আবার দুটী উপায়। তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে দশদিকের দিকপালগণকে সাক্ষী রেখে আততায়ীর কাছে হাতেকলমে প্রমাণ দেওয়া যে, আমার দেহ তার দেহের চাইতে দৃঢ় ; আমার মন তার মনের চাইতে বলিষ্ঠ—দেহের খংস ঘটতে পারে কিন্তু আমার আঘাত স্বাতন্ত্র্য তার আঘাত নিকট মাথা নত করবে না—করবে না। আর এই করতে গেলেই তখন ডাক পড়ে মানুষের মনুষ্যত্বের। কিন্তু আমি আগেই বলেছি এই মনুষ্যত্বই বজায় থাকে না, যদি না মানুষের মনের দিকটা মুক্ত থাকে।

আর দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে সমাজের চারিদিকে প্রকাণ “অচলায়তনের” দেয়াল তুলে দিয়ে অবরুদ্ধ দুর্গবাসীর মতো বাস করা। হিন্দু এই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করেছিল।

কিন্তু এই দ্বিতীয় উপায়টি একটা উপায় হলেও, ওই উপায়ের ভিতরে একটা মন্ত বিপদ আছে—যদি না সব সময়ে সজাগ থাকা থায় তবে সেই বিপদ মানুষকে জড়িয়ে ধরেই। কারণ “অচলায়তনের” এই দুর্গের মাঝে মানুষকে বাস করতে হয় সমস্ত বিশ্বকে বাইরে রেখে—তাকে চলতে হয় সমস্ত বিশ্বানবের সংস্পর্শ থেকে

আপনাকে বাঁচিয়ে। তার সামনে আর তখন কোন নতুন সমস্তা
নেই, নতুন চিন্তা নেই, নতুন প্রশ্ন নেই—জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত
শতাব্দীর পর শতাব্দী সেই “থোর বড়ি খাড়া” আর “খাড়া বড়ি
থোর”—এই অবস্থায় সব কিছুই পুরাতন হয়ে আসে—সেই পুরাতনে
সব একথেয়ে হয়ে ওঠে—তখন আর মানুষের নতুন উৎসাহ নতুন
উত্তম থাকে না—এই অবস্থায় মানুষের প্রাণ নিষ্ঠেজ হয়ে আসে,
বুদ্ধি জমাট-বাঁধা পাথরের মতো হয়ে যায়—চারিদিকে তার আরামের
আবেশ ঘিরে আসে—তখন সে চৈতন্যময় শক্তিময় আনন্দময় পুরুষ
নয়—সে হচ্ছে তখন অভ্যাসের চাবি দিয়ে দম-দেওয়া কলের এঞ্জিন
—মানুষের এই খানে জীবন্ত সমাধি—এই খানে মানুষের আস্থা
আপনাকে প্রকাশ করবার কোন পথই পায় না।

এই মৃত্যু থেকে বাঁচতে হ'লে চাই বিশ্বের সঙ্গে সমাজের সংঘোগ
—সমাজের মাঝে দিয়ে বিশ্বের আলোকের মুক্ত ধারা বিশ্বের বাতাসের
মুক্ত প্রবাহ—যে আলোক যে বাতাস সমাজমনকে নিত্য নব নব
স্বপ্ন দিয়ে নিত্য নব নব কর্মে নিয়োগ করে; নব নব উৎসাহে উদ্বীপ্ত
করে’ রখবে; স্বতরাং চাই চারিদিকে মুক্ত বায় মুক্ত আলোক,
কাজেই চাই সনাতন দেয়ালের গায়ে সারি সারি ওম্নি সনাতন
আনালা।

আর যদি আনালা না বসাই তবে মানুষ এই নিরেট দেয়ালের
মাঝে একদিন চোখ কচলিয়ে জেগে উঠবে, জেগে উঠে শিউরে
উঠবে, বলবে—এ কি করেছি—এ কি করছি—কোন মৃত্যু থেকে
বাঁচতে গিয়ে আবার কোন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছি। সেদিন জাগবে
মানুষের আস্থার বিস্তোহ। না না, চাই নে এই মৃত্যু—পলে পলে

তিলে তিলে এই হৃত্য। সেদিন মানুষকে হাজার দেয়ালও ঠেকিয়ে
রাখতে পারবে না—সেদিন সমাজের পাথর-বাঁধা শক্তি উঠানের বুক
চিরেই “সবুজপত্র” গজিয়ে উঠবে—“ফাল্গুনী”র বাঁশী বেজে উঠবে—
“পঞ্চকের” গলা কেঁপে উঠবে। সেদিন মানুষ দুর্বার ভরসা নিয়ে
বলে উঠবে—আমার যদি বাস্তবিকই কোন স্বাতন্ত্র্য থাকে তবে বিশ্বের
হাজার বিশ্বাদের মধ্যে তা আপনাকে স্পষ্টই করে’ তুল্বে উচ্ছবই
করে’ তুল্বে—আমি ভয় কর্ব না—ভয় করে’ আমার সেই স্বাতন্ত্র্যকে
অঙ্গীকার কর্ব না—আমি ভয় কর্ব না—কারণ আমি জানি যে
আমার মধ্যে যে পরম দেবতা আছেন তিনি মাটি নন পাথর নন—
তিনি শাশ্ত্র তিনি অমৃত। —

শ্রীশুরেশচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী।

তাইবোম।

—*—

জ্যৈষ্ঠ মাসের পুনর-বেলা ঘনের আনন্দ দক্ষা এক করে দিয়
আসায়ে যুযোগিলায়। কানের কাছে চোয়েচিতে শূন্য হঠাৎ
ভেঙে গেল—বুকলায় পাড়ার হেলেরা আম কুড়ুতে এসেছে। পাছে
উঠতে পারে বা অথচ আম আবার সোভ আছে, হোট হোট এবন পীচ
সাত দশ জন হেলে যেমন মিলে একটু বড় একজন কাকেও মুক্তি
ধরে সহজে বেই অসহজে বেই এই আবকলায় আবেঁহ। পাছে
উঠে মুক্তি বাহা বাহা আম দিয়ে দিয়ের এলি ভর্তি করে এবং
করমো বা দক্ষা কখনো বা সাম করে পানের বৌচের বা হাতের
মাসাজের একটা জাল দেতে দেয়। তাতে কাঁচা পাকা যে সব আম
ভলার পড়ে ধূলো মেখে অগুচ্ছ হয়ে যায়, তাই কুড়োবার অস্ত এই
বিস্তৃত বিলাক্ষণ্যধারু দিয়া তাঙ্গা কোলাহলে মুখরিত করে তোলে।
বাইরে করলে তাঙ্গা শোবে না—অম্বক দিলে তবই চলে যায় এটে কিন্তু
একটু এদিক ওদিক করে আবার ফিরে আসে ও মিথকে ইচ্ছিতে
ইসারায় কাজ আস্ত করে দেয়। ক্ষমে চাপা পলার আওয়াজ ও
সর্ক চাপা পলার পল উপতে পাওয়া যায় ও শেবে আবকলা আবার
তেবনি উলকার হয়ে ওঠে। কিন্তু তবন আবার ধূক দিতে
বনতা হয়।

প্ৰতিবাৰই এই রুকম হ'য়ে আসচে। এবাৰ জাম নাবি, এখনো তাতে ভাল পাক ধৰেনি। এখন থেকে গাছেৱ ওপৰ নিয়ে এই উপন্নৰ চললে পাকবাৰ আগেই জাম নিঃশেষ হ'য়ে যাবে। তাই একবাৰ মনে কৱলাম উঠে একটা দিই কিন্তু আবাৰ ভাবলাম তাতেই বা লাভ কি? আমতলায় ত পাহাৰা বসাতে পাৱব না।

শেষে পাশফিরে শুয়ে আবাৰ ঘুমেৱ সাধনা কৱাই সমধিক লোভনীয় মনে হল, কিন্তু গোলমালে ভাল ঘুম হল না যদিও মে আপা একেবাৰে ছাড়তেও পাৱা গেল না। সেই আধঘুম আধআগাৰ অবস্থায় বেকাৰ মন যে কথন আমতলাৰ বিচিৰ কোলাহলে আহুষ্ট হয়ে পড়েচে বুৰতে পাৱি নি—আড়ি, ভাৰ, আবদাৰ অভিযানেৱ আভাৰ কাৰে আসছিল এবং এবং বোধ হয় ভোলা যায় না এমন সব দিনেৱ কথা মনে আপিয়ে তুলছিল ব'লে ভালও লাগছিল।

শেষে হঠাৎ কান্নাৰ শব্দে চমক ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা স্তুপিৎ ভাৰ ও পৱন্তণেই ষোৱতৰ কোলাহল। ব্যাপাৰ কি জানবাৰ অন্ত তাড়াতাড়ি জানালা খুলে দেখলাম—তিনচাৰি বছৱেৱ মণ্ডু মাটিতে গড়াগড়ি দিছে আৱ কাঁদচে এবং পাশে দাঢ়িয়ে তাৰ দিদি খেদী অন্ত সকলেৱ সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে ঝগড়া কৱচে। আমি জিজ্ঞাসা কৱলাম—কি হয়েচে রে?

আমাৰ গলাৰ আওয়াজ পেয়ে ছেলে মেয়েৱ মল একবাকে নালিশ কৱলে—খেদী মিছিমিছি মণ্ডুৰ গালে চড় যেৱেচে—মা'ৱ সামান্ত হলেও মনে হল মাৰামারিটা ভাল নয় তাই ভাবলাম একটু শাসন কৱে দেওয়া দৱকাৰ। অতঃপৰ গন্ধীৱভাৱে খেদীৰ দিকে চেয়ে বললাম—

“ওকে মেরেচিম কেন”? র্থেদী কোন উপর কুল না বরং যেন বেশ করেচে এই ভাবে দাঢ়িয়ে রইল। সেথে আমি চেঁচিলে আবার বললাম—“তুই ও’কে মারলি কেন”—বল শিগুগীর—

এবাব র্থেদী কথা কইল কিন্তু সে প্রায় নিজের সঙ্গে। শুধু আমার ধূমক শুনে অস্ত সকলে একেবাবে চুপ করেছিল বলেই আমি কুনতে পেলাম র্থেদী বলচে—কেন ও কাচা জাম খা’বে কেন?

কাচা জাম খেয়েচে? তা তোর ভাইকে তুই কোন ছটো ভাল জাম কুড়িয়ে দিলি? “ছেলেমাঝুষ কি ছটোপুটির মধ্যে—ওরে দেবার জন্মেই ত আমি কুড়োছি নয়”—

ছেলেরা কেউ কেউ ব’লে উঠল—না অনিল দাদা, ভাল ভাল জাম ও নিজেই কুড়িয়ে খাচ্ছিল।

শুনে যুক্তঃ দেহির ভাবে তাদের দিকে ফিরে গেদী ব’লে উঠল—বেশ করেচি খেয়েচি—তোদের কি? আমার জাম আমি খেয়েচি—আমার ভাইকে আমি মেরেচি। বেশ করেচি—

আবার ঝগড়া করতে’ বসল—আরে মোল যা! যা সব তোরা এখান থেকে চ’লে যা। কের যদি আজ জামতলায় আসবি ত দেখবি মজা—আমি দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়ে দেখলাম সকলে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে আর শুনলাম গালছটো ফুলিয়ে মণ্টু দিমিকে শাস্তাচ্ছে—মা’কে আমি ব’লে দেব কিন্তু। তাৱ কামা ইতিমধ্যে থেমে গিঈছিল।

শুয়ে শুয়ে বিচারকের বিড়ন্বনার কথা ভাবতে ভাবতে বেলা প’ড়ে এল। মুখহাত ধোবার অস্ত উঠে অশুমনক্ষ ভাবে পেছনের দিকের জানালার কাছে গিয়ে দেখলাম জামতলা নিষ্ঠক শুধু একধারে

সন্দেশ

আগস্ট, ১৯৪৫

মন্তু মাটিতে পড়ে শুয়ুকে আর ঘূরতে ভাইটীর মুখের ওপর থেকে
পড়জ্জবোদ আড়াল ক'রে দাঢ়িয়ে খেলো নিজ অঙ্গল বীজনে মাছি
তাড়াচে ।

আমাৰ তখন মনে পড়ে গেল এৱা ভাইবোন—এককণ যে কথাটা
ভুলেই গিয়েছিলাম ।

প্ৰবেশ ঘোষণা ।

সবুজ পত্ৰ

সম্পাদক

শ্রীপদ্মথ চোধুরৌ

১৩২৬

বৈশাখ—আশ্বিন

বাবিক মূলা—তিন টাকা ছয় আনা
‘সবুজ পত্ৰ’ কাৰ্য্যালয়, ৩ নং হেটিংস ট্ৰি,
কলিকাতা

କଣିକାତ୍,
୩ ନଂ ହେଲ୍‌ଟିମ୍ ଟ୍ରିଟ
ପ୍ରୀଅମ୍ବ ଗୋଧୁରୀ ଏସ୍, ଏ, ବାବୁ-ଶ୍ରାଟ ଲ କର୍ତ୍ତୃକ
ଆକାଶିତ ।

କଣିକାତ୍
ଡିଇକଲୌ ନୋଟ୍‌ସ ପିଣ୍ଡିଂ ଉପାଦାନ,
୩ ନଂ ହେଲ୍‌ଟିମ୍ ଟ୍ରିଟ
ପ୍ରୀଅମ୍ବ ଗୋଧୁରୀ ଏସ୍, ଏ, ବାବୁ ଶ୍ରାଟ ।

“সবুজ পত্র” সম্পাদকের নৃতন বহি ।

- ১। নানা-কথা——ইহাতে প্রথম বাবুর ২১টি প্রবন্ধ, আকার
ডিমাই আটপেজী, ৩৬২ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট আইভরি ফিলিস
কাগজে ছাপা—মূল্য দেড়টাকা মাত্র ।
 - ২। “আঙ্গুষ্ঠি”——ছোট-গল্লের বহি, ইহাতে ছয়টি গল্ল, স্বচ্ছ
বাঁধাই, প্রায় ২০০ শত পৃষ্ঠা—মূল্য পাঁচসিকা মাত্র ।
 - ৩। “পদ-চারণ”——কবিতা সমষ্টি, উৎকৃষ্ট আইভরি কাগজে
ছাপা—মূল্য বার আনা মাত্র ।
-
- ৪। বীরবলের হালখাতা——মূল্য এক টাকা মাত্র ।
(ইহাতে বীরবলের সমস্ত প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট হইয়াছে ।)
 - ৫। চার-ইয়ারী কথা (গল্ল)——মূল্য বার আনা মাত্র ।
 - ৬। সটেট-পঞ্জাশৎ (কবিতা)——মূল্য আট আনা মাত্র ।

প্রাপ্তি স্থান :—ম্যানেজার, “সবুজ পত্র”, ৩ নং হেটিংস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ; রাস্ত এম্পি. সি, সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স ও
কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ।

SARAT GHOSE'S SONORA HARMONIUMS

INDIA'S ACKNOWLEDGED BEST



No. 5—3 Octaves, 2 sets of reeds, 5 stops,
large size, special hollow reeds.

Price Rs. 40.

RECOMMENDED TO BEGINNERS.

আমরা বেহালা, বাঁশী, হারমোনিয়ম, পিরানো প্রভৃতি বিলাতী বজ্ঞা
ও সেতার, ক্ষেত্রজ প্রভৃতি অস্ত্রীয় বজ্ঞাও বিক্রয় করি। আমাদের
ইক ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং আমাদের জিলিয়ের
গুরুত্ব সর্বজন-বিদ্যুত।

সেতার, এস্ট্রাইল, ক্ষেত্র, বীণা প্রভৃতি অস্ত্রীয় বজ্ঞার উপরের
বিলাতি ইস্পাত্তের tempered music wire আমরা আমেরা করি।
এস্ট্রাইল স্ট্রাইল ক্ষেত্র পুরুষ বজ্ঞাও আসে নাই।

সঙ্গীত বিময়ক যে ক্ষেত্র সরঙ্গায় বা পুরুষ, আমোর্দেন ও
রেকর্ড আসামুক লিফট পাইলেন।

“আমিয়ারা” জালের করলিপির বুল্য ১৫০।

SARAT GHOSE & CO.

4. DALHOUSIE SQ., CALCUTTA.

রবীন্দ্রনাথের গান।

“জন-গন মন অধিনায়ক”, “দেশজ্ঞেশ নলিনী”, “অমৃত-চুরুব শব্দ”



“যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই তাওঁ চিরে অয়ননে !”

—রামানন্দ ।

* * * অনবঙ্গ গৃহৈল *

“পুষ্পল”—অযুতপুষ্পোথ হীরকদ্রব ।

“গুণবন্ধু” বাসন্তবন্ধু পঞ্জীয়ন ।

কথিকা ।

—*—

ফোটা ফোটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে,—মাটির কাছে ধূরা
দেবে বলে'। তেমনি কোথা থেকে মেঘেরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা
পড়তে ।

তাদের জন্ম অঞ্জ জামগার অগৎ, অঞ্জ মানুষের। ঐটুকুর মধ্যে
আপনার সবটাকে ধরাবো চাই—আপনার সব কথা, সব ব্যথা, সব
ভাবনা। তাই তাদের মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া।
গেঝেরা হল সীমান্বর্গের ইন্দ্রাণী ।

* * * *

কিন্তু কোন দেবতার কৌতুকহাস্তের মত অপরিমিত চঞ্চলতা
নিয়ে আমাদের পাড়ার ঈ ছোট মেঘেটির জন্ম ? মা তা'কে বেগে
বলে “দল্লি,” বাপ তাকে হেসে বলে “পাগলী” ।

সে পলাতকা ঝরনার জল, শাসনের পাথর ডিঙিয়ে চলে। তার
মনটি যেন বেপুবনের উপরজালের পাতা, কেবলি বিরু বিরু করে
কাপচে ।

আজ দেখি সেই দুরস্ত মেঘেটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চুপ
করে দাঢ়িয়ে—বান্দলশেষের ইন্দ্রধনুটি বলেই হয়। তার বড় বড়
ছুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে বৃষ্টির দিনে ডামা-জেমা
পাখীর মত ।

কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রথম ; দিগন্তের মুখ বিমর্শ ;
গাছের হতাশাস পাতাগুলো শুকিয়ে হল্দে হয়ে গেছে ।

এমন সময় হঠাৎ কাল আলুগালু পাগলা মেষ আকাশের কোণে
কোণে তাঁবু ফেললে । সূর্যাস্তের একটা রক্ত-রশ্মি খাপের ভিতর
থেকে তলোয়ারের মত বেরিয়ে এল ।

অর্দেক রাত্রে দেখি দরজাগুলো খড়খড় শকে কাঁপচে । সমস্ত
সহরের ঘুমটাকে ঝড়ের হাওয়া কুঁটি ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে ।

উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা
চোখের মত দেখতে । আর গিজের ঘড়ির শব্দ এল যেন বৃষ্টির
শকের চাদর মুড়ি দিয়ে ।

সকালে জলের ধারা আরো ঘনিয়ে এল—রৌদ্র আর উঠল না ।

* * * *

এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ
করে দাঁড়িয়ে ।

তার বোন এসে তাঁকে বলে, ‘মা ডাকচে’ । সে কেবল সবেগে
মাথা নাড়ল, তার বেণী দুলে উঠল । কাগজের রোকে নিয়ে তার ভাই
তাঁর হাত ধরে টানলে । সে হাত ছিনিয়ে নিলে । তবু তার ভাই
শেলাব জগ্যে টানাটানি করতে লাগল । তাঁকে এক ধাপড় বসিয়ে
দিলে ।

* * * *

বৃষ্টি পড়চে । অঙ্ককার আরো ঘন হয়ে এল । মেয়েটি স্থির
দাঁড়িয়ে ।

আদি যুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাসায়,
হাওয়ার কণ্ঠে। লক্ষ কোটি বছর পার হয়ে সেই স্মৃতি বিশ্ববণের
অতীত কথা আজ বাদ্যনাম কলস্বরে ঐ মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে।
ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

কত বড় কাল, কত বড় জগৎ, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীব-
লীলা। সেই শুনুর সেই বিরাট, আজ এই দুরস্ত মেয়েটির মুখের
দিকে তাকাল, মেঘের ছায়ায় ঝুষ্টির কলশক্তে।

ও তাই বড় বড় চোখ মেলে নিস্তুক দাঢ়িয়ে রইল,—যেন অনন্ত-
কালেরই প্রতিমা।

শ্রীরবীশ্বনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন ব্লক্স।

—::—

শ্রীমতি সরূপজি সম্পাদক
সংগীপেয়।

এই আজ হ'তিন দিন হল একখানি স্বদেশী ইংরাজি-মাসিকপত্রে
পড়লুম যে, আপনি পথ-চল্তি ভাষাকে সাহিত্যে চালাবার অন্ত উঠে
পড়ে সেগেছেন। শুনে খুসি হংবেন যে, উক্ত পত্রের লেখক-সম্পাদক
উভয়েরি মতে আপনার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। চল্তি ভাষার
চল নাকি এখন সফল কাগজেই হয়েছে—শুধু তাই নহ, যে সফল
কাগজ মুখে চল্তি ভাষার অতি বিরোধী, তারাও নাকি এমন সব
লেখা প্রকাশ করে, যা আসলে গলিঘুঁজিতে চল্তি হলেও রাজপথে
অচল। এ কথা সম্ভবত সত্য, কেননা ইংরাজিতে বলে extremes
meet,—অর্থাৎ হৃ-মুড়োতে ঠেকাঠেকি হয়।

কিন্তু এর থেকে মনে করবেন না বৈ, সাধুভাষার পরমায় শেব
হয়ে এসেছে। ভাল কথা, ভাষা সম্বন্ধে সাধু বিশেষণটা কি শুন ?
আমার মতে ওটি সাধু না হয়ে সাধুবী হওয়া উচিত। তাতে
কেতোবী-ভাষার পিতৃকূল ও মাতৃকূল উভয় কুলের—অর্থাৎ সংস্কৃত ও
ইংরাজি উভয় ভাষারই মধ্যাদা সমান রাখিত হয়। সেদিন অবৈক

ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖେ ଶୁଣିଲୁଯ ସେ, ଆପନାର ଭାବାର ଜୀବନାବଳୀ, ବେଳତୁମ୍ବ, ହାଙ୍ଗଲାଙ୍ଗ ସବହି ଧାକତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଧାନ ଦୋଷ ଏହି ବେ, ତା obaste ନୟ ।

ମେ ସାଇ ହୋଇ, ଆମି ଐ ସାଧୁ ବିଶେଷଣଟିକେ ଏକେବାରେ ବାଦ ଦିଲେ ଚାଇ ନେ, କେବନା ଆମି ସାହିତ୍ୟ ଥେକେ କୋନେ ଚଲ୍ଲି କଥାକେ ସହିନ୍ତ କରିବାର ପକ୍ଷପାତ୍ର ନହିଁ । ତବେ ମେଇ ମଜେ “ସାଧ୍ୱୀ” ବିଶେଷଣଟିଓ ହୁଲିବିଶେଷେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ।

ବାଜେ ବକୁଳି ଛେଡ଼େ, ଏଥିନ କାନ୍ଦେର କଥାଯ କିମ୍ବେ ଆସା ବାହ୍ । ସାଧୁଭାବୀ ଏଥିନ ମାସିକ ପତ୍ରେର ବୁକେର ଭିତର ଥେକେ ସେଇରେ ଏଥେ ତାର ପୃଷ୍ଠେ ଡର କରିବେ । ଏକ କଥାଯ, ସାଧୁଭାବୀ ଏଥିନ ସାହିତ୍ୟକେ ଡ୍ୟାଗ କରେ ବିଜ୍ଞାପନେର ଆଶ୍ରୟ ନିଯେଛେ । ଏହି ବିଜ୍ଞାପନେର ଭାବାରି ଉଚିତ ନାମ ହଚେ ସାଧ୍ୱୀ । “ଆଶ୍ରୟ ନିଯେଛେ” ବଲାଟୀ ବୋଧ ହରି ଟିକ ହଲ ନା, କେବନା ବିଜ୍ଞାପନେର ଦେଶେ ଏହି ସାଧ୍ୱୀଭାବୀ ଏଥିର ମାନ୍ୟମାନେ ଅଭିଭିତ ହୁଁ ଅପ୍ରତିହିତ ପ୍ରଭାବେ ଦେଶେର ଲୋକେର ମନୋରଙ୍ଗର କରିବେ । ସାଧୁଭାବୀକେ ଲୋକେ କେବ ସାହିତ୍ୟର ଭାବୀ ବଲେ ?—ଏହି କାହିଁଣେ ସେ, ଲୋକେର ବିଶ୍ୱାସ ସାହିତ୍ୟର ଘା ଆସିଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ତ—ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଠକରେ କାନ୍ଦାନୋ ହାସାନୋ ଇତ୍ୟାଦି—ତା ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ଭାବାର ଧାରାଇ ଦାଖି ହୁଯାଇଲା । ଆପନି ସଦି ଏକମଜ୍ଜେ କାନ୍ଦିତେ ଓ ହାସୁତେ ଚାନ, ତାହଲେ ଏହି ପୂଜୋର ବିଜ୍ଞାପନଗୁଲି ପାଠ କରିବ, ତାହଲେଇ ସାଧ୍ୱୀଭାବୀର ଶ୍ରୀ ହୌ ଧୀ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆପନାର ସମ୍ଯକ ଜ୍ଞାନଲାଭ ହବେ । ଆର ଏ ଭାବାର ଯୋଗି ! ଶୁର୍ଯ୍ୟର ପାଶେ ଦୀପ ଯେମନ ନିଷ୍ପତ୍ତ ହୁଁ ପଡ଼େ, ବିହୁଭାବର ପାଶେ ଥିଲେ ଯେମନ ମିଟ୍‌ମିଟ୍ କରେ, ଏହି ବିଜ୍ଞାପନେର ସାଧ୍ୱୀଭାବୀର ପାଶେ ସାହିତ୍ୟର ସାଧୁଭାବୀର ଅବହାଓ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହର । ଏଥିର କିଂଚାରି

লেখার স্বিধ্যাত সাহিত্যিক, সাধুভাষার অধিতৌষ লেখক ৮ কালীপ্রসঙ্গ ঘোষের ‘প্রভাত চিন্তা’ ও নিষ্পত্তি হয়ে পড়ে, ‘সক্ষা চিন্তা’ মিট্টমিট্ট করে।

যদি বলেন যে আপনি ওসব পড়াত চান না, তার উত্তর এই,—

“উপেক্ষার উপায় নাই, অবজ্ঞার সুযোগ নাই। জানিতেই হইবে, পড়িতেই হইবে, বুঝিতেই হইবে, অক্ষবর্ণ অনিবার্য। কে আছ ব্যথিতের বক্ষ, আর্তের অবলম্বন, নিরাশয়ের আশয়, -এসো, তোলো, জাগো, এ ক্রন্দন, এ বিবেদন, এ হা-হতাশ গুনিতেই হইবে”—

উপরোক্ত বাক্যাবলী “পতিতা” নামক সামাজিক উপন্থাসের বিজ্ঞাপন হতে উক্ত। এ উক্তারের কারণ—“পতিতা” সম্বন্ধে বা সত্য, বিজ্ঞাপনের সাধুভাষা সম্বন্ধেও ঠিক তাই সত্য। আমি এ স্থলে উক্ত ভাষার কোনও বিশেষ নমুনা তুলে দিতে পারছি নে, কেননা আমা-গোড়া বিজ্ঞাপন এই একই ভাষায় লিখিত,—পড়া শেষ করবার আপনে বিজ্ঞাপিত বস্তু ওমুখ কি জুতো, শাড়ী কি সাহিত্য, কিছুতেই ধরা যায় না। আমি দুটি একটি উদাহরণ দিচ্ছিঃ—

“রৌপ্যমণ্ডিত রেশ্মী কিংখাপে মোড়া হইয়া অতুলন স্বর্ণ সংকুচরণ।”

এই বস্তুটি কি আনেন? —শাড়ী নয়, উপন্থাস। তারপর বলুন ত বক্ষ্যমান পদার্থটি কি?

“অতি মোলায়েম রঙিন রেশমের ক্রেপ পোতের ডুরেদোর চাকচিক্যমান।”

এজিনিষ্টি কিন্তু অপূর্ব উপন্থাস নয়, “আহামরি শাড়ী”; তাহলেও জিনিষ্টি পাওয়া যাবে কিন্তু বৌগাপাণি দেনোর কাছে। সাহিত্যের

গোরব অবশ্য কিঞ্চিৎ করে তার অলঙ্কারের উপর, আর অলঙ্কারের সেরা হচ্ছে উপমা আর অনুপ্রাস। এ দুই বিষয়েও বিজ্ঞাপনের কৃতিত্ব অপূর্ব। প্রথমে অনুপ্রাসের একটি নমুনা দিইঃ—

“মৃত্যুবনিকা, পরিণয় প্রহেলিকা, ভাস্তি কুহেলিকা, হত্যা বিভৌষিকা, লুক্মরৌচিকা, রহস্য কথিকা।”—উক্ত সাহিত্যের রচয়িতা কে জানেন?—মল্লিদার! মল্লিদার কে জানেন?—“বর্ণমান ঘুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক নক্তা” লেখক। আপনি মল্লিদারের “আপন পর” থানি কিনে এনে নয়ন মন সার্থক করুন, কেননা বইখানি “উপহারের রাজা” কিন্তু “না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই”। দামও সম্মা—মূল্য এক টাকা মাত্র। এ ক্ষেত্রে “আপন পর” কি সুত্রে আবক্ষ জানেন?—“বিলাত হইতে কেবলমাত্র আমাদের জন্য আনীত অপূর্ব রেশমী ফিতায়”। উক্ত নমুনার অনুপ্রাসের ছত্রাছড়ি এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখতে পাবেন। এখন উপমার গুটি দুই তিন উদাহরণ দিইঃ—

(১) মল্লিদারের “বিভ্রাট,” পাকা হাতের পাকা লেখা—ঠিক যেন রসের সোঁফুরা।

(২) আযুক্ত শুভেন্দুনাথ রায়ের “পঁতি,” নারীর ত্যাগের নায়েগো প্রপাত”।

(৩) “বঙ্গীয় উপন্যাসলেখকশিরোমণি প্রবীণ দার্শনিক পণ্ডিত শুভেন্দুমোহন ভট্টাচার্য প্রণীত, রেশমী কিংখাপে মোড়া “পাষাণী”, বিরহের বিস্মিয়াস অথচ প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বের এমন গোলকুণ্ডার মতির মালা,—অথচ দাম একটাকা। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে উপমা হচ্ছে অলঙ্কারের শিরোমণি, যেমন গহনার ভিতর মালা আর কুচুপুরুষের

মধ্যে শালা।” এ মত যে সত্য, উক্ত উপমাগুলির সাক্ষাৎ করে সে কথা কি আর কেউ সন্দেহ করতে পারেন? উপরোক্ত কবি-প্রতিভার চরম শৃষ্টিগুলি সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে একান্ত কর্তব্য। কিন্তু সাবধান!—শ্রীযুক্ত অগদানন্দ রামের “পোকামাকড়” যেন সেই সঙ্গে কিনবেন না, তাহলে দুদিনেই ও সব রেশমী বই কেটে রেশমী মিঠাই বানিয়ে দেবে।

(২)

আমি বিশেষ করে এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই জন্যে যে, আপনি গত পাঁচ বৎসর এ সাহিত্যকে সবুজপত্রে স্থান দেন নি। আপনি বলতেন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সত্য প্রচার করা, আর বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য মিথ্যা প্রচার করা। অতএব উভয়ের স্থান এক পত্রে হতে পারে না। আপনার কথা ছিল এই যে, বিজ্ঞাপনমাত্রেই মিথ্যাবাদী,—যেখানে তা স্পষ্ট মিথ্যে কথা বলতে সন্তুষ্টি হয়, সেখানে তা suggestio falsii-র আশ্রয় গ্রহণ করে। উব্ধু সম্বন্ধে যাই হোক, সাহিত্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনে আপনি যে উক্তিকে suggestio falsii-র দোষে দোষী করতেন, সেটি যে একটি আলঙ্কারিক গুণ, অর্থাৎ তা যে অতিশয়োক্তি, এ জ্ঞান আপনার ছিল না। “গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান শুধা নিরবধি”, সে রচনা যে গৌড়ী রীতিতেই রচিত হওয়া কর্তব্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে সে রীতির একটি উদাহরণ বিচিত্রিত হিসেবে আমার মত এই যে—

“অলং নির্শিতমাকাশম্ নালোচ্যেব বেধসা
ইদং এবৎবিধং ভাবি ভবত্যা স্তনজ্ঞনম্” ॥ (কাব্যানৰ্থ)

আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন এবশ্বিধ মহাকবিহ করে গেছেন,
তখন আমরাই বা কেন না বিরহের Vesuvius এবং ত্যাগের
Niagara Falls-এর স্মৃতি কর্ব ? শাস্ত্রেই আছে :—

“বাপ্ কো বেটো সিপাহি কো ঘোড়া
কুচ্ছ নহি ত খোড়া খোড়া।”

এতদিনে আপনার ভুল আপনি যে বুঝতে পেরেছেন, সে কথা
মুখে স্বীকার না করলেও কার্য্যত আপনি তার প্রমাণ দিচ্ছেন।
'সবুজপত্র' এখন বুকে পিঠে বিজ্ঞাপন নিয়ে বেরচ্ছে। তবে বইয়ের
বিজ্ঞাপনের পাঁচরঙ্গা ছাপ আপনার কাগজ আজও অঙ্গে ধারণ করে
নি,—অবশ্য আপনার স্বরচিত্ত পুস্তকের ছাড়া। এই সম্বন্ধেই আমি
আপনার কাছে একটি কথা নিবেদন কর্তে চাই। ঘুরিয়ে মিথ্যে
কথা দ্রু'রকম করে বলা যায়,—এক suggestio falsii-র সাহায্যে,
আর এক suppressio verii-র সাহায্যে। 'সবুজপত্র' জগ্নাবধি
বাঙ্গলা সাহিত্যের বিজ্ঞাপনকে প্রত্যাখ্যান করে, সত্যাগোপনের দোষে
দোষী হয়ে রয়েছে। এ যে কত বড় দোষ তার প্রমাণ, আমার মত মাত্র-
সবুজপত্রের পাঠকেরা বাঙ্গলা সাহিত্যে যে কত অমূল্য রত্ন আছে, সে
বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অপরাপর মাসিক পত্রের কৃপায় জানতে পেলুম
যে, বাঙ্গলা ভাষায় এমন অসংখ্য কাব্য আছে, যার প্রতিখানি একসঙ্গে
সর্ববশ্রেষ্ঠ এবং অভুলনীয়। আমি এর মধ্যে খানকতকের পরিচয়
দিচ্ছি :—

(১) নিরূপমা পুরক্ষাৱ—“সৱস ভাবেৰুল ভাষাসম্পন্নে
অতুলনীয়, বাজাৱেৱ কেনা গল্পপুস্তকে একত্ৰ এমন সৌন্দৰ্যসমাবেশ
কোথায়ও পাইবেন না।”—

(২) মণ্ডুৱী—“মুৱেন বাবুৱ ছেট গল্প না পড়িলে ছেট
গল্প পড়া অসম্পূৰ্ণ থাকে। প্ৰত্যেকটি গল্প থেন বাফেলোৱ জীবন্ত
চিত্ৰ”।—

(৩) পল্লী-সংসাৱ—“বৰ্তমান যুগেৱ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপন্থাস। ভাবে
ভাষায় চৱিতি-চিত্ৰণে ও মনস্তৰবিশ্লেষণে সৰ্ববাংশে অতুলনীয়।”

(৪) বন্দিনী—“ভাষায় ভাবে চৱিতি-চিত্ৰণে অতুলনীয়।”

(৫) দঞ্চকচু—“এমন অপূৰ্ব উপন্থাস বাঙলা সাহিত্যে আৱ
কখন হয় নাই।”—

(৬) গৃহলক্ষ্মী—“বাঙলা উপন্থাসে এক অপূৰ্ব স্থষ্টি।”

(৭) অভিসাৱ—“এমন বিয়োগান্ত উপন্থাস বাংলা সাহিত্যে
বহুকাল বাহিৱ হয় নাই।”

আৱ কত নাম কৱিব ?—“মাতৃদেবী”, “সহধৰ্ম্মিণী”, “নববধূ”
প্ৰভৃতি সবই অপূৰ্ব, সবই অতুলনীয়, সবই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। বিশ্বাস না
কৱেন, এৱ মধ্যে অন্তত ছুটি জাঁকড়ে কিনতে পাৱেন, যাচিয়ে
নেবাৱ জন্মে। বিজ্ঞাপনদাতা কথা দিয়েছেন যে “নববধূ মনোনীত
না হইলে কিৱাইয়া আনিবেন, মূল্য কেৱত দিব”। “বন্দিনী” সম্বৰ্দ্ধেও
ঐ একই কৱাৱ—“কিমুন, ভাল না হয় মূল্য কেৱত দিব”। এৱ চাইতে
সাধু প্ৰস্তাৱ আৱ কি হতে পাৱে ? অপৱৰ্থানি সম্বৰ্দ্ধে বিজ্ঞাপনদাতা
আদেশ কৱেছেন—“সহধৰ্ম্মিণী ক্ৰম কৱিতে ভুলিবেন না”,—তবে
ক্ৰেতাৱ তা অপচৰণ হলে কেৱত নেবাৱ কথাটা উহু রয়ে গিয়েছে।

বাস্তু ভাষার ঐশ্বর্য কিরকম বেড়ে গেছে, তাই পরিচয় পেয়ে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আপনি ত নানা সাহিত্যের পল্লবগ্রাহী। কি ইংলণ্ড, কি ফ্রান্স, কি ইতালি, ইউরোপের কোন দেশ দেখাকৃত এত অসংখ্য উপন্থাস, যা মুগপৎ ‘সর্বশ্রেষ্ঠ’ এবং ‘অতুলনীয়’। সর্বশ্রেষ্ঠ চাইলে তারা এক এক মুগের বড় জোর এক একধানি গ্রন্থ বার করতে পারবে।

এই বিজ্ঞাপন পাঠে প্রথমেই মনে এই প্রশ্ন উদয় হয়—

“একি স্বপ্ন ! একি মায়া ! একি বাস্তব ! একি বাস্তবের ছায়া ?”
কেননা, এই সব অপূর্ব উপন্থাসের লেখকেরা কে ?—এ প্রশ্নের উত্তর
“উপন্থাস সিরিজ” দিয়েছেন। সিরিজের বক্তব্য এই :—

“বাণীমন্ত্রের একনিষ্ঠ পূজারীগণের বঙ্গবিক্রিত সেই সকল সাহিত্যরথীবৃক্ষের
নামের একজৌভূত ভালিকা দৃষ্টি মুগপৎ বিস্ময়ে সকলকেই বলিতে হইবে—
ইহারা করিয়াছে কি ? ধৃত !”

“ইহারা করিয়াছে কি” ? এ প্রশ্ন আমার মনেও উদয় হয়েছিল—
এবং উত্তর পেয়ে আমি ও বলছি—ধৃত। উত্তরটি তবে শ্রবণ করুন—

“বিশ্বামৈর অবসর নাই—কেবল কার্য,—সারাটি বৎসর ধরিয়া
নিয়া-বব পূজার উদ্বোধন”।—এর পর আপনি আমি সকলেই বলতে
বাধ্য—ধৃত বঙ্গদেশ, ধৃত বঙ্গ-সরস্বতী।

অতঃপর আর একটি প্রশ্ন এই মনে আসে যে, এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের
স্থান কোথায় ?—বিজ্ঞাপনের কথা বিশ্বাস করতে হলে—অতি নৌচে,
প্রায় লাখট কেলাসে। তাঁর “বরে বাইরে” সম্বন্ধে বিজ্ঞাপনের মন্তব্য
এই—“প্রকৃতপক্ষে ইহা বাজালীর রহস্যমুকুর, এক্ষণ উপন্থাস আর
কখনও বাহির হয় নাই”।—মলিনারের “আপন-পরেন” বিজ্ঞাপিত

গুণাশুণের সঙ্গে তুলনা করলেই আপনার বুক্ততে থাকবে না যে “ধরে বাইরের” স্থান কোথায়। এখন নেথেছি ও উপস্থাসের বাইরে না বেরিয়ে ঘরে থাকাই উচিত ছিল। সে' যাই হোক, এ বিষয়ে বিশ্ব-মাত্র সন্দেহ নেই যে “বঙ্গ-বিশ্রান্ত সাহিত্যরণ্ধীবন্দের” পাশে দাঢ়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বেজোয় অপ্রতিভ দেখাচ্ছে! এ স্থলে আমি একটা কথা না বলে থাকতে পারছি নে। সবাই জানে যে, চেনা বামুনের পৈতৃর দরকার নেই, অপরপক্ষে রাঁধুনে বামুনদের যে ও সাটিকিকেটের দরকার আছে শুধু তাই নয়, সে সাটিকিকেট তারা দেখাতে বাধ্য—নইলে কেউ তাদের পাক-স্পর্শ করবে না। এখন বিজ্ঞাপন দাতা-মহাশয়দের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের এই বৃক্ষবয়সে মৃতন করে পৈতা দেবার কি আর কোনও দরকার ছিল?

এ ক্ষেত্রে, আমার নিজের একটা জবাবদিহি আছে। আজ থেকে ঠিক সাত বৎসর আগে, পূজোর বিজ্ঞাপন পাঠে উন্তেজিত হয়ে আমি “মলাট সমালোচনা” নামক একটি প্রবন্ধ হাতবেড়ে লিখি। সে প্রবন্ধ পড়ে পুস্তক-ক্রেতার দল শুনতে পাই খুসি হয়েছিলেন, কিন্তু বিক্রেতার দল বিরক্ত হয়েছিলেন।

আজ আমি বাঙ্গলার লেখক পাঠক উভয় দলের সমক্ষে মুক্তকষ্টে স্বীকার করছি যে, সেকালে আমি বিজ্ঞাপনসাহিত্যের মাহাত্ম্য মোটেই বুক্ততে পারি নি; কিন্তু এ বিষয়ে আজ আমার জ্ঞানচক্ষ উশ্বীলিত হয়েছে।

দার্শনিকেরা বলেন যে বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ, অতএব সাহিত্যের যুগ নয়। আমি এর প্রথম কথাটি সম্পূর্ণ মানি—কিন্তু শেষ কথাটি ঘোলআনা মানি নে। যদি কেউ বলেন যে বিজ্ঞানের

যুগে সেকলে সাহিত্য চলবে না, চলবে শুধু বিজ্ঞানজড়িত
তাহলে আর কোনও আপত্তি থাকে না।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বিশেষ করে জ্ঞানা, কিন্তু কোনকিছু বিশেষ
করে জেনে কোনই ফল নেই, যদি না সেই সঙ্গে তা' অপরকে বিশেষ
করে জ্ঞানানো যায়। এই উদ্দেশ্য সাধন করে বিজ্ঞাপন, কেননা ও
শব্দের অর্থই হচ্ছে, বিশেষ করে জ্ঞানানো। আমার এ যুক্তি যদি
অকটা হয়, তাহলে সকলকে মানতেই হবে যে, এ যুগের উপস্থুক্ত
সাহিত্য হচ্ছে বিজ্ঞাপনসাহিত্য। যাঁরা অনুপ্রকার সাহিত্য রচনা
করেন, তাঁরা যুগধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন, অতএব তাঁদের কথা
ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

তারপর সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করতে গেলেও দেখা যাবে
যে, এই বিজ্ঞাপনসাহিত্যের স্থান কত উপরে। আজ শ'-ধানেক
বছর ধরে ইউরোপের সাহিত্যজগতে Classic আর Romantic দলের
ভিতর একটা মহা লড়াই চলেছে। Classic দল বলেন সাহিত্যের
উপকরণ হচ্ছে বাইরের সত্য, আর তার কারণ হচ্ছে চোখে-দেখা ভাষা ;
আর Romantic দল বলেন সাহিত্যের উপকরণ হচ্ছে ভিতরকার
সত্য, আর তার কারণ হচ্ছে কানে-শোনা ভাষা। সংক্ষেপে Classic
দল গ্রাহ করেন শুধু মাথার ভাব আর বইয়ের ভাষা; আর Romantic-
দের কাছে গ্রাহ শুধু বুকের ব্যাখ্যা আর মুখের কথা। ইউরোপে এ
দুয়ের আজও মিল হয় নি। কিন্তু বাঙ্গলার বিজ্ঞাপনসাহিত্য এই
দু-পক্ষের মিলনকল্প অসাধ্য সাধন করেছে। এ সাহিত্যের ভাষা যেমন
খাঁটি সংস্কৃত—অর্থাৎ Classic, এর ভাবও তেমনি খাঁটি বাঙালী—
অর্থাৎ Romantic। আঙ্গণের ভাষায় এমন “রসের ফোয়ারা”

বাঙালী লেখক ছাড়া আর কে তুলতে পারে ? খাঁটি বাঙালী মনোভাবটি কি জানেন ?—সহজয়তা। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমাদের হৃদয়ে যে কতটা রসভার হয়েছে, তা কে না জানে ? এই ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মাতৃভূমির প্রতি মাতৃভক্তি যে কি পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, তার জোর প্রমাণ ত আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রের সাবেগ ও সকাতর অস্বারূপ। সেই সঙ্গে দেবীর প্রতিও আমাদের মাতৃভক্তি যে সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ? যে মাটিতে দেশ তৈরি, সেই মাটিতেই ত আমাদের দেবীও তৈরি। আমাদের দেবীভক্তি যে কতটা বেড়ে গেছে, তার প্রমাণ—সেকালে আমরা বিজয়ার দিন শুধু ভাঙ খেতেম, আর একালে আমরা আবাল-বৃক্ষ-বনিতা দেশসুস্ক লোক যে ঘটস্থাপনার দিন খেকে শুধু ভাঙ নয়, গাঁআও খেতে শুরু করি—তার পরিচয় এই পূজোর বিজ্ঞাপন। ইতি—১লা আশ্রিন।

বীববল।

পুঁঃ—এ পত্র আপনাকে ভয়ে ভয়ে পাঠাচ্ছি। আশা করি আমার উপর এ সন্দেহ করবেন না যে, আমি পুস্তকবিক্রেতাদের কাছে শুষ খেয়ে এই প্রবক্তৰের ছলে বিনা পয়সায় তাঁদের বইয়ের বিজ্ঞাপন সবুজপত্রে প্রকাশ করবার ফলি করেছি। আমার উদ্দেশ্য আপনার মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের এই স্বসংবাদটি আনানো, যে text-book লেখবার উপযুক্ত ভাষা বিজ্ঞাপনদাতারা ইতিমধ্যে নির্মাণ করে বসে আছেন কেননা—এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি যে, এর চাইতে একাধাৰে chaste এবং elegant ভাষা বঙ্গসাহিত্য আৰু কোথাৱাও শুঁড়ে পাবেন না।

ভারতের নারী ।

—*—

কয়েক দিন হলো বিলাতের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনে শ্রীমতী
মুণ্ডালিনী দেবী ‘ভারতের নারী’ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে-
ছিলেন। সেই প্রসঙ্গে সে-সভায় লর্ড সিংহ বলেছিলেন—যতদিন
রূমণীদের প্রতি ভারতের পুরুষদের মনের ভাবের পরিবর্তন না হবে,
ততদিন তার উন্নতির আশা স্বনৃপরাহত। যদিচ মন্তব্যটি আমা-
দের আজ্ঞসম্মানের গায়ে অঘাত করে—তথাপি সেটি যে
সত্য, সারবান এবং আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণজনক, সে
বিষয়ে সন্দেহ নেই। লর্ড সিংহ যে সাহস করে আমাদের
আতিক্রম একটা মহা কলক্ষের দিকে সভ্যসংগতের দৃষ্টি আকর্ষণ
করেছেন, তজ্জন্ম মনে মনে তাঁকে ধন্দ্যবাদও দিয়েছিলাম।
কারণ, আমাদের বিশ্বাস, যিনি যে-ভাবে যে-ক্ষেত্রে যতই কেন
চেষ্টা না করুন এবং আগ্রহ বাগ্রহ যাই কেন না বরুন—
জাতিভেদ ও জ্ঞানাতিক পরাধীনতা—এ দুটি মহাব্যাধি যতদিন
না আমাদের সমাজদেহ থেকে বিতাড়িত হবে, ততদিন পর্যন্ত
আমাদের পক্ষে জাতির বা জাতীয় উন্নতির কথা মুখে আনা
বাচালতা যাব ।

(২)

এখন দেখছি—মুখ্য আমরা, সব ভুল বুঝেছি। স্বদেশী-মন্ত্র প্রচারের আদি-গুরু শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল সেদিন বিলাত যাওয়ার পূর্বে তারস্বতে বক্তৃতা করে বলে গেছেন যে, লর্ড সিংহের উকিলের দ্বারা তারতের নরনারীর প্রতি অথবা অবমাননা প্রকাশ করা হয়েছে, এবং যার কিছুমাত্র আত্মর্ঘ্যাদার জ্ঞান আছে, তার পক্ষে এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানান উচিত। তিনি আরও বলেছেন, ইংরাজদের রূমণীসম্বন্ধে যা-কিছু ধারণা, তা sex-ভাব দ্বারা সৌমাবন্ধ ; আর আমাদের সকল ধারণা মাতৃত্বের মহান् ও পবিত্র কেন্দ্র হতে বিকশিত। তাঁর মতে ১৮৮২ সনে Married Woman's Act প্রবর্তিত হবার পূর্বে ইংরাজ-নারী নাকি chattel-এর সামিল ছিল ; এবং লর্ড সিংহের এসব বিষয়ে, অর্থাৎ বিলাতের আইন সম্বন্ধে অঙ্গতার জন্য তিনি তাঁর প্রতি দয়া প্রকাশ না করেও ধাকতে পারেন নি। দয়ারাই পাত্র বটে, কারণ তৃত্বাগ্র তাঁর—ঈদৃশ দেশ-হিতৈষীগণের তিনি স্বদেশবাসী !

(৩)

পোড়ো বাড়ীতে একটি শৃঙ্খল ডেকে উঠলে, রাজ্যের ষষ্ঠ শেষালের ছকাছয়াস্বরে কঠকণ্ঠে নিবৃত্তি করার আকাঙ্ক্ষা যেমন অক্ষমাঙ্গ খেপে উঠতে দেখা যায়—সেইপ্রকার পাল মহাশয়ের বক্তৃতার ক্ষেপন ধামতে না ধামতেই ‘অমৃতবাজার’ প্রমুখ তাঁর শিখ ও

ভক্তবুদ্ধের চীৎকারে আকাশ বাতাস পূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছে। এবং পাল মহাশয় যেমন আশা দিয়ে গেছেন—তাতে বিলাতি-বাসীদের কর্ণকুহরও যে শীত্বাই তাঁর কঠি-সঙ্গীতের দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে, তাঁরও সম্মেহ নেই।

এখন কথা হচ্ছে আমরা জনসাধারণ—অর্থাৎ যাঁরা রাজনীতি বা সমাজসংস্কার দুটির কোনটিকেই জীবনযাপনের বাবসা করে তুলতে পারি নি, স্বতরাং এসব বিষয়কে তেমন অনাবশ্যক জটিলতার আলে আবৃত করে দেখবার অভ্যাস করি নি—আমরা কোন পথে যাব ? নারী সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ মহান् ও সর্বোচ্চ ; তাদের অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই ; কোন পাশ্চাত্য ভাষের সংঘোগে তাদের জীবনকে উদ্বেলিত করার দরকার নেই ; এবং পুরুষের যেমন পুরুষের সঙ্গিনী অপেক্ষা তাদের দাসীস্বরূপেই তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে অশিক্ষিতা বঙ্গিনী অবস্থায় তাঁরা জীবন যাপন করে আসছে, সেইভাবেই তাদের রাখবার চেষ্টা করা উচিত—পাল মশায়ের সাথে ঝুঁক্যোগ হয়ে কি আমরা এইকথা প্রচার করে বেড়াব ? না, লর্ড সিংহের মতে মত দিয়ে বলব—রমণীও পুরুষেরই শ্রায় স্বাধীন জীব ; স্বাধীনভাবে তাঁকে বাড়তে দাও, শিক্ষা দাও ; পুরুষ তাঁর যে-সকল অধিকার জোর করে কর্তৃতলগত করে রেখেছে, তা তাঁকে ছেড়ে দাও ; অন্তত সুসভ্য দেশে যেমন, আমাদের দেশেও তেমনি পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও মানুষ হয়ে, জীবনযাত্রার পুরুষের প্রকৃত সঙ্গিনী হয়ে দাঢ়াক। এইলৈ বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, লর্ড সিংহের উক্তির সরল অর্থ এই যে, এ-দেশের পুরুষ, নারীর উন্নতি সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা, এবং অস্ত্রাল্প

দেশের স্তোলোকেরা যে-ভাবে চলে' উন্নত হয়েছে, নিজ স্বার্থের দিকে চেয়ে আমরা তাদের সে পথে চলতে দিতে অনিচ্ছুক।

(৪)

পুরাকালে ভারতবর্ষে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল—সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলবার কি প্রয়োজন আছে? বহুবিবাহ, বালবিবাহ, চিরবৈধব্য, সতীদাহ প্রথা, অবরোধ প্রথা প্রভৃতি ত আমরা উত্তরাধিকারীসত্ত্বে অতীতের কাছথেকেই পেয়েছি। এ-ছাড়া সেকালে নিয়োগ প্রথা, রাক্ষস বিবাহ (কন্তাহরণ), আনুর বিবাহ (কন্তাক্রম) প্রভৃতি ত শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবহার ছিল। একালে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ত আনুর বিবাহ আজও বজায় রয়েছে। আর সতীদাহ যে অপ্রচলিত হয়ে গেছে, সে ত ইংরাজের আইনের তাড়নায়। আজ একশ' বৎসর পূর্বে এ-হেন প্রথাকেও সমর্থন করবার জন্য কখনো লোকের অভাব হয় নি, এবং বর্তমান কালেও অশিক্ষিত সহায়শূল্য বালবিধবা স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কায় বা মৃত্যুর পর উন্ননে বা বক্সে অগ্নিসংষ্ঠোপের দ্বারা প্রাণত্যাগ করলে স্বামীর প্রতি হিন্দুনারীর অম্বগত প্রগাঢ় প্রেম ও ভক্তি সম্বন্ধে সাময়িক সংবাদপত্রে যে প্রশংসা উচ্ছলিত হয়ে ওঠে, তাতে মনে হয় যদি ইংরাজরাজ ধর্মের অঙ্গ বলে সতীদাহের প্রতি নিরন্পেক্ষতার ভাব অবলম্বন করে বসে থাকতেন—তাহলে এখনো এ প্রথা সঙ্গেরে প্রচলিত থাকত, এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ স্বদেশী বক্তব্যদের বিলেত গিয়ে এরও মাহাত্ম্য প্রচারের কোন বাধা থাকত না।

(৫)

বাবু বিপিনচন্দ্র ১৮৮২ সালের পূর্বে ইংরাজ রমণীগণের দুরবস্থার বিষয় বলেছেন ; কিন্তু এদেশে স্ত্রীলোকদের সম্পত্তি অর্জন ও দান করবার অধিকার সম্বন্ধে যাঁরা একটু বিশেষ ভাবে চর্চা করেছেন—তাঁরা জানেন, কি দুরবস্থা তাদের । প্রথমত, অশিক্ষিত অবস্থায় আজীবন গৃহে আবক্ষ ধাকার দরুণ, কোনও প্রকারে জীবিকা অর্জন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব । বাল্যকাল হতে ঘৃত্য পর্যাস্ত তাঁরা পরমুখাপেক্ষী । এক সামাজিক স্ত্রীধন লক্ষে একজনের কপালে জুটে ওঠে কিনা সন্দেহ, এবং তাও যদি ষেতুকস্তুপ বিবাহকালীন দানে পাওয়া গিয়ে থাকে—তাতেই কেবল আছে তাদের দান বিক্রয়ের অধিকার । তা ব্যতীত প্রায় কোনও সম্পত্তিতেই তাদের নির্বৃত্ত স্বত্ত্ব আছে বলা যেতে পারে না । যতদিন স্বামী বর্তমান, স্ত্রী সংসারের কর্তৃ ; তার অবর্তমানে সে দুষ্মুখ আস্তীয় বা পুত্রের মুখাপেক্ষী—আপন বলতে তাঁর কোনও সম্পত্তি নেই । একেও কি আদর্শ স্বর্ণের অবস্থা বলতে হবে ?

পূর্ববর্ণিত বিধিব্যাবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে—নিতান্ত সার্থাঙ্ক এবং ‘শুধু পুরুষের স্বর্ণের জন্মাই জগৎ স্ফুট’ এই মন্ত্রের উপাসক ব্যতীত কেউ কি বলতে সাহসী হবে যে, ভারতে রূমণীর প্রতি পূর্বাপর সম্বাদার হয়ে আসছে ?—মাতৃত্বের মহান ভাবকে কেন্দ্র করে যে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের ভাব সকল সমাজে বিকশিত হয়েছে—তাই বা প্রমাণ কোথায় ? যোট কথা, নারীর অধিকার বলে একটা জিনিস আমাদের সমাজে স্থান পায় নি বলেও অত্যন্তি হবে না ।

অনুত্তর ও ধেমন, ভারতে ও তেমন—মানুষ নিজের স্বার্থের দিক থেকেই

রূমণীকে দেখেছে। রূমণী যে chattel সদৃশ ক্রয় বিক্রয় ও অঙ্গন
করবার জিনিস—এ ভাব কি ভাবতে, কি রোমে, কি গ্রীসে, কি অন্যত্র
প্রত্যেক সমাজেরই আদিম অবস্থায় যে বিরাজ করত— ইতিহাসে তার
বহু নির্দর্শন পাওয়া যাবে। মানুষ মেঙ্গদণ্ডবিশিষ্ট (Vertebrate)
প্রাণীশ্রেণীর অন্তর্গত—পশুপক্ষী যে-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা এসব
বিষয়ে পর্যালোচনা করেছেন, তাঁরা একমত যে, আদিম অবস্থায় পুরুষ
ও রূমণীর মিলন-বিষয়ে অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের বিশেষ কোন
পার্থক্য ছিল না। তবে সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব ও ইতর প্রাণী সমাজের
ভিত্তির নানা পার্থক্য দেখা দিয়েছে। প্রাচীন সমাজসকলের ইতিহাস
পাঠ করলে দেখা যাবে, কি ভাবতে, কি অন্যত্র, বিপিন বাবু যাকে
Sex ভাব বলেন—অর্থাৎ পুরুষ ও রূমণীর মিলনের ভাব, তা হতেই
কালক্রমে পরিবার পরিজন সম্বন্ধীয় অন্যান্য ভাবসমূহ বিকশিত হয়ে
উঠেছে। এক-স্ত্রীগ্রহণ সভ্য সমাজের একটি বিশিষ্ট প্রথা কিন্তু
এ প্রথা যে আমাদের দেশে এখনও তেমন বক্ষযুক্ত হতে পারে নি,—
বিষ্ণাসাগরের বহুবিবাহপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং কোঁচিত
প্রথার অস্তিত্বেই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তবে ইহা স্বীকার্য যে, কালক্রমে
ভারতীয় সমাজে মাতৃত্বের ভাবটি যেমন ফুটে উঠেছে— এমন বোধহয়
কোনও সমাজেই হয় নি। সর্বত্রই মা ভক্তিশ্রীর পাত্র, কিন্তু
ভাবতে তিনি শুধু তা নন,—তিনি প্রত্যক্ষ দেবী, ভগবতী ; তিনি এবং
পিতৃদেব প্রীত হলেই সর্বদেবতা প্রীত হন। এই মাতৃত্বের ভাবটি
কালে এমন ভাবে বিস্তার লাভ করেছে যে এখন নারীমাত্রেই ভাবত-
বাসীর চক্ষে মাতাবিশেষ। ঝৌ আমাদের ধর্মপত্নী—ধর্মকার্যে

সজিমী। যচ্ছতে লিখিত আছে, যে-গৃহে শ্রী অর্থোপন্থুক্তঙ্কপে পূজিত মা হয়ে থাকে, সেখান হতে লক্ষ্মী পলায়ন করেন—শ্রী শ্রীরাম ক্রপাক্ষ। এইসবের দিকে দৃষ্টি করেই মনকে আমরা বোরাছি যে, নারীর প্রতি ব্যবহারে আমরা অস্ত্রাণ্য আতি অপেক্ষা সন্দয়ের উদারতা দেখিয়ে আসছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই? মাকে আমরা বিশেষ একটু ভক্তি করি বলেই, এবং ‘পর-শ্রীমু মাতৃবৎ’ ইত্যাদি শ্লোক নীতি-শাস্ত্রে স্থান পেয়েছে বলেই যে নারীর অধিকার সম্বন্ধে আমরা উদারমন।—প্রকৃত উক্তজ্ঞ ও দেশহিতৈষী কে সে কথা বলবে? মাকে ইউরোপীয়গণও কি ভক্তি করে না?—ইংরাজরা সাধারণত রমণীদের প্রতি গৃহে ও রাস্তাধাটে যাদৃশ সম্মান দেখিয়ে থাকে, তার দিকে দৃষ্টি করে অনেকসময়ই কি আমাদের নিজ বিপরীত ব্যবহারের দিকে চেয়ে হেঁট-মূখ হয়ে থাকতে হয় না?

শাস্ত্রলিখিত শিক্ষা বিনাযুক্তি ও বিনা আপনিতে প্রহণের কলে এ দেশের রমণীদের অবস্থা কি শোচনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছে! নেই বলতে কিছুই নেই তাদের। অর্থোপার্জনের কোন স্বৰূপ নেই স্বাধীনতা নেই; এবং আজীবন কুকুরামু-গৃহে বাসহেতু স্বাস্থ্য সামর্থ্যেরও অভাব। এক সতীছক্ষণ ডেমক্রেসির তরোয়াল সব সময়েই মাথার উপর ঝুলছে, যার দিকে চেয়ে চলতে ফিরতে তারা সর্বক্ষণ সন্তুষ্ট।

যা প্রাচীন তাকে প্রশংসা করাই এখনও সর্বত্রই স্বদেশহিতৈষণার প্রকৃষ্ট পরিচয়, এবং যশোলাভের সহজ উপায়। তার উপর দ্রুই এক জম ইংরাজ পুরুষ বা রমণী আমাদের প্রাচীন সভ্যতার উল্লেখ করে ‘যাহু বা বলে’ মাকে মাকে পিঠ চাপড়িয়ে দিছেন, আর আবরা

আবলে উৎকুম হয়ে মনে করছি—আমাদের যা ছিল বা যা আছে, এমন কাঠো ছিল না বা হবে না। পতিত বা পতনোশুধ জাতির সর্বজনই এ অবস্থা—অতীতের দিকে অত্যধিক দৃষ্টি। আমরা কিন্তু লর্ড সিংহের সঙ্গে এক মত হয়ে বলবো—যতদিন না রমণীদের অবস্থার পরিবর্তন হবে, ততদিন ভবিষ্যৎ আমাদের অঙ্ককারাচ্ছন্ন, লক্ষ্যঘন্ষণ সবই নিষ্ফল। মা'র চরণে প্রণত হলেই তাঁর প্রতি ভালবাসা ও অঙ্কাভক্তি প্রদর্শনের পরাকার্তা হল, তা' আমরা মনে করি নে। পরিচ্ছন্ন ও গহনায় ভূষিত করলেই স্তুর প্রতি সম্যক আদর দেখানো হয় না। এ সব হচ্ছে পুতুল-খেলা দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা। তাদের প্রকৃত মানুষ হবার অস্ত আমরা কি করছি? লঙ্ঘার ক্ষেত্রে বিষয় নয় কি—আমাদের স্বার্থ-বজেত তাদের শক্তি, বৃক্ষ, শুখ, মনুষ্যত, আগাগোড়া ভস্মীভূত হয়ে আসছে? বনের পশুপক্ষী, কৌটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা এবং মানুষের ভিতর পুরুষ—স্বাধীনতার মুক্তি বাস্তুতে সকলেরই আবন পূর্ণস্তু লাভ করে, শুধু ভারতের নারীই নাকি শ্রেণীষ্ঠ হয়ে ধ্বংসপথে অগ্রসর হয়। ভারতের পুরুষ! দেশ-শাসন ব্যাপারে সামাজিক স্বাধীনতাটুকু লাভ করবার জন্য মাথা কুটে তুমি মরছ, ছট্টকৃত করে সাগরের ও-পারে ধাচ্ছ আসছ;—কিন্তু নিজের ঘরের ভিতর তোমার আর এক মুক্তি। সেখানে পূর্ণ আঁধারের ভিতর, অজ্ঞানতার ভিতর, তোমার মা, স্তু, কন্যা, ভগ্নাকে আবক্ষ রেখে স্বদেশ-সেবার তুমি প্রকৃষ্ট পরিচয় দিছ! স্বদেশ তোমারই কেবল, তাদের কিছু নয়? প্রকৃতিদণ্ড শুণে যাবা তোমার অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়, তাদের স্বাধীনতা না দিয়ে মানুষ হবে—বৃথা এ অল্পনা কল্পনা তোমার। অশিক্ষিত মা'র পুত্র তুমি—অশিক্ষিত স্তোর স্বামী—বর তোমার অজ্ঞানতার আঁধার,—

মেঘের বাপ।

—::—

রাত প্রায় ১০টাৱ সময় ট্রামে শ্যামবাজার থেকে কিৱছিলাম।
রাস্তায় লোকচলাচল কমে এসেছিল—গাড়ীতেও ভিড় ছিল না। ষড়
জোৱে গাড়ী চলছিল তত জোৱেই দখিণ হাওয়া মুখের উপর এসে
লাগছিল। আৱামে চোখ বুজে আসছিল।

হাতিবাগানের মোড়ে একটি ভদ্রলোক উঠে আমাৱই পাশে তাঁৰ
পৱিত্ৰ একজনকে দেখে আলাপ আৱস্থা কৰে দিলেন।

—এই ষে কিৱণ বাবু! নমস্কাৱ মশাই, কেমন আছেন?

—নমস্কাৱ নবীন বাবু! তাৱপৰ আপনাদেৱ খবৱ সব—

—ভাল আৱ কই? মেঘেৱ বিয়েৱ ঠিক আৱও কোথাও কৰে
উঠতে পাৱি নি, সেই ধাক্কাপুৰি ঘূৱচি। আপনি ত কাজ লিতে
নিয়েছেন মশাই।

—আপনাদেৱ কল্যাণে কোনৱকমে দু'হাত এক হয়ে গিয়েছে।

একটু খেমে নবীন বাবু জিজ্ঞাসা কৱলেন—

—তা খৱচপত্ৰ কত হ'ল?

—সব স্বত আড়াই হাজাৱেৱ উপৱে বই নৌচে নয়। মেঘে
আমাইকেই ত দু'হাতাৱ লিতে হয়েছে।

—আঃ, তাৱ কমে কি আৱ মেঘেৱ বিয়ে হয় এখনকাৱ দিনে?
সে বাবোক, নিষ্ঠাবনা হয়েছেন আপনি, বেঁচেছেন, বুকেৱ পাৰে
নেবে পিয়েছে।

খিলসুরে কিরণ বাবু বললেন—তা আর নাম্বল কই মশাই—
নবীনবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন
—মেয়ে জামাই ভাল আছে ত ?

—বেঁচে আছে বটে, কিন্তু ভাল নেই। পয়সাকড়ির ষেখানে
অনটন, সেখানে ভাল থাকা যায় কি ?

—কেন আপনার জামাই ত B.A., আর শুনেছি চাকরি-
বাকরিও করেন।

—তা করেন, কিন্তু—

—এত কিন্তু করলে চলবে কেন ভাই, চাকরি ছাড়া অমিদাবী
আর ক'জনের থাকে ?

—কিন্তু বাড়ীটা ঘৰটা ত থাকে।

—তা নেই না ক ?

—সে না থাকারই মধ্যে। পুরোণো সরিকি বাড়ী একটু আছে,
তাও দেবার ডোবানো।

—বেহাই দেবা করে রেখে গিয়েছেন বুবি ?

—সে অনেক কথা ভাই, আর সে সব কথা আলোচনা করলে ত
এখন কোন লাভ নেই।

—তা সত্যি। কিন্তু বিয়ের আগে এই দেবার বিষয় কিছু আনতে
পারেন নি ?

—তা পারলে কি আর এমন কাজ করি ? দেখলাম ছেলেটি
ভাল। পাছে হাতছাড়া হয়ে যাব, তাই তাড়াতাড়ি করেই বিবেটা
দিয়ে ফেললাম। কে জানে তার ফলে এই হবে ?

—না আমাই, আমার মনে হচ্ছে আপনার মেঘের বিষে ভালই হয়েছে। ছেলে ভাল দেখে দিয়েছেন ত—বাস্তু আপনার কাজ হয়ে গিয়েছে। এখন মেঘের বরাং।

—কিন্তু তা বলে ত মন বোঝে না।

—কিন্তু এ রূক্ষ ভাবাও ঠিক নয়। আর তাও বলি, বিষে ত দিয়েছেন এই সে দিন, এরই মধ্যে জামাই কি মাতব্বর হয়ে উঠবে? এখন তার বয়সই বা কি?

—বয়স কম হয়নি—চুল-টুল পেকেছে দু'একটা।

—চুল পাকার কথা আর বলবেন না। আমার সম্মুক্তির ছোট ছেলে—তার বয়স এই ১৫ কি বড়জোর ১৬ হবে, কিন্তু এরই মধ্যে তার মাথার অর্কেক চুল পেকে গিয়েছে।

তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হই কি না দেখবার অনুই বোধ হয় নবীন বাবু গল্প শেষ করে' একবার চকিতের মত আমার দিকে চাইলেন, এবং তখনই মুখ ফিরিয়ে একটু মুক্তবিঘ্নানা করে কিরণ বাবুকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আপনার জামাইয়ের বয়স ২৫২৬ হবে, কেমন?

—তার বেশি হবে। দ্বিতীয় পক্ষ কি না, বয়স একটু বেশি হয়েছে, বোধ হয় বছর ত্রিশেক হবে।

—আঃ, ত্রিশ বছর আবার বয়স! কত লোকের যে ও বয়সে প্রথম বিয়েই হয় না। দ্বিতীয় পক্ষ যা বলচেন তা—

—সে ত আমি জেনেই দিইচি।

—ছেলে পিলে আছে কি সে পক্ষের?

—একটি মেয়ে আছে।

—তা সে জন্মই বা ভাবনা কি ? মেঝে—বিয়ে হলেই পরের ঘরে
বাবে। ভাবনা হ'ত যদি একটা ছেলে থাকত।

—সে জন্মও আমি ভাবছি নে নবীন বাবু। আমি ভাবছি এই
দিনকাল, তাতে সামাজিক চাকরি করে' সে সংসারধর্ম করবে কি করে ?
তার উপর দেনা যা আছে সে ত গোকুলে বাড়ছে।

—আপনি মিছিমিছি ভাবছেন এই দেনার জন্ম। এ ত আপনার
ভাববালাই নয়, তার উপর দেখুন, দেনা নেই কার ? রাজা মহারাজারা
পর্যন্ত দেনদার। শরীরটা ঈশ্বর ইচ্ছায় ভাল থাকলে, ছেলেমানুষ ও-
দেনা শোধ দিতে ওর ক'দিন লাগবে ?

—তাই শরীরটাই কি ছাই ভাল ? অস্বলের অস্ত্র ত লেগেই—

—অস্বল ত আমরা অস্ত্রের মধ্যেই ধরি নে, মশাই। অস্বল নেই
কার ? ঠক্ক বাছতে গাঁ উঞ্চোড় হয়ে যাবে—কি বলেন মশাই
আপনি ?—বলিয়া মধ্যস্থ মানার ভাবে ভদ্রলোক আমার দিকে
চাইলেন। কোন উত্তর না করে আমি শুধু বিজের মত হাসতে
লাগলাম। সেই হাসির ইঙ্গিত অমুমান করে প্রসমমনে ভদ্রলোক
তখনই কিরণ বাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—জামাইয়া আপনার
ক'ভাই ?

—ভাই-টাই আর কেউ নেই, থাকবার মধ্যে আছে এক মামা, কিন্তু
তার সঙ্গেও বনিবনাও নেই।

—আজকালকার ধরণই হয়েছে এই, নিজে নিজে থাকতে চায়,
মামা কি বাবাকে পর্যন্ত কেয়ার করে না।

কিরণ বাবু চিন্তিত ভাবে বললেন—সেই সব দেখেশুনেই ত
নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে। তাই ত এখন ভাবি, সেই অত দেরীই

যখন হয়েছিল, আরও না হয় দু'মাস দেয়ী হত ! মনের মত একটি ছেলেও পাওয়া গিয়েছিল—আজও তার বিয়ে হয় নি ।

—আচ্ছা দেখুন কিরণ বাবু, সে সন্দেক্ষটা আমায় করে দিতে পারেন ?

—আপনি কি, সে ছেলে পছন্দ করবেন ?

—কি যে বলেন আপনি ? কানা খোড়া না হয়, এমন একটি পেলেই বাঁচি আমি, আর আপনি বলচেন কি না অমন ছেলে পছন্দ করব কি না ?

—তা ছেলেটি ভাল, পছন্দ হওয়ার মত বটে । এদিকে পয়সা কড়িও চায় না তারা ।

—মেধো ভাই কোন দোষ টোষ নেই ত লুকোন ? এখনকার দিনে যে—

—দোষ থাকবে কোথায় ? ছেলে দেখতে শুনতে ভাল—অবস্থার কথাই নেই—

—স্বত্বাব চরিত্র ?

—বলছি যে তেমন ছেলে শতকরা একটা পাওয়া যায় । তামাকটি পর্যন্ত ছোয়া না সে—

—চাকরি বাকরি করে ত ?

—চাকরি করতে যাবে কেন ? বাপ তার যা রেখে গিয়েছে, বুঝে চলতে পারলে তিনি পুরুষ চাকরি করতে হবে না ।

—বুঝে চলতে পারবে ত ?

—পারবে না ? এই ত দু'বছর বাপ মরে' গিয়েছে, এই মধ্যে কত আয় বাড়িয়েছে জানেন ?

—আছা লেখাপড়া কতদুর করেছে?

—তা পাশ টাশ কিছু করে নি, তবে লেখাপড়া আনে। এখনো পড়াশুনো করে শুনেছি।

—বাড়লা নভেল নাটক পড়ে বোধ হয়।

—তা জানি নে, কিন্তু শুনেছি সেই উদ্যোগ করে একটা মৃত্যু ইংরাজি ঝুল করিয়েছে দেশে।

—দেশে?—কোথায় সে?

—এই হগলী জেলায়—

—ও হরি! কলকাতায় নয়?

—না, কলকাতায় নয়।

—ওঁ, সেই পাড়াগাঁয় ম্যালেরিয়ার মধ্যে—বাপ রে!—বলতে বলতে ভদ্রলোক হঠাৎ উঠে ট্রাম ধামাবার জন্তু শিকল টানতে টানতে বললেন—মাপ করবেন কিরণ বাবু, কথায় কথায় বাড়ীর রাস্তা অনেক দূর ফেলে এসেছি দেখছি। অমুমতি হস্ত এইবার নামি—নমস্কার কিরণ বাবু, নমস্কার মশাই!—ভদ্রলোক নেমে পড়লেন। কিরণ বাবু অবাক হয়ে তার পথের দিকে চেয়ে রাখলেন—এতক্ষণের মুলভূবি হাসিটা ও আমার মনের মধ্যে স্থান হয়ে গেল।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

ମିଳନାକାଞ୍ଜଳା ।

—————*————

ତୋମାରେ ବେସେହି ଭାଲ—ଏହି କଥାଟୁକ
ଧ୍ୱନିଷ୍ଠା ଉଠିଛେ ମୋର ଶୁଣେ, ବେଦନାସ୍ତି ;
ଅଞ୍ଚାନ୍ତେର ବାସନାଟୀ ପ୍ରେମ-ସାଧନାସ୍ତି
ଶୃତି କୁପେ ଜାଗି' ମୋର ଭଲି' ଉଠେ ବୁକ ।

ତୋମାରେ ବେସେହି ଭାଲ—ଡାଇ ଚାହି ଆଜ
ଶ୍ଵପ୍ନ ସାଥେ ବାନ୍ଧବେର ନିବିଡ଼ ମିଳନ,
ଅଶ୍ରୁରୀରି ଶରୀରିର ଗାଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ—
ନଗଭାର ଆବରଣେ ଢାକି ଦିଲା ଲାଜ ।

କୁପେତେ ଅନ୍ତପ ପୂଜା—ମିଳନ-ଦୁଲ୍ହାରେ,
ନବ ଶୃତି ତରେ ଦିବ ବଲି ଆପନାରେ ।

ଖୋଲ ଘାର—ଆଜି ମୋର ସାଧନାର ଶେବ,
ପୂର୍ଣ୍ଣହତି ଦିବ ଆଜି ସର୍ବ ଭୟ ଲାଜ ।
ଦେବତା—ପରାବ ତାରେ କାମନାର ବେଶ,
ଶୂରୁ-ରହଣେ ଘେରା ମଞ୍ଜିରେର ମାର୍କ ।

ଶ୍ରୀକାଞ୍ଜଳ ହୋଇ ।

বিরহকাঞ্জনা ।

—::—

তোমারে বেসেছি ভাল—তাই আগে ভয়,
মিলনের রজনীতে যদি বাহু ডোর
শুধু হ'য়ে খ'সে পড়ে কঠ হ'তে মোর,
অবসাদ-খিল প্রেম পায় যদি লয়—

প্রণয়েতে করি তাই বিরহ আরোপ,
চৃণি কেবা খুঁজি কিরে অচৃণির পুরে ?
মিলনের মুছ'নাতে কোন্ নব স্বরে
আসন্ন বিরহভয় করি দিবে লোপ !

বিরহ-সাধনে চাহি করিবারে অয়
মিলনের অবসাদ, বিরহের ভয় ।

তবে আসিও মা আজ কমযুর্তি ধরি',
দূরে রহি' বাহ্নিতেরে শুধু ভালবেসো ;
মিলনে কণিক চৃণি,—দিবা বিভাবনী
অযুর্ত লঘেতে তুমি কল্পনাতে এসো ।

শ্রীকাণ্তিচন্দ্র ঘোষ ।

সোহাগ ।

—::—

কুরূপ কেন বলিস্ তোরা আমাৰ খোকায় বল ?
রূপ ত তোৱা চিনিস্ নারে নিন্দুকেৱি দল ।
রঙ্গটি কালো, বয়েই গেল, ওই ত ভাল ঠিক,
কালো তোদেৱ কৃষ্ণ কালী, ভৰমৱ এবং পিক ।
নাকটি চাপা, শোন্নৱে ক্ষেপা, দেখেই দিগন্বর,
গুৰড় পাৰ্থী আসুতে নারে, পলায় পেয়ে ডৱ ।
গুন্বি তোৱা, নাইক কেন, ইহাৰ চোখে টান ?—
টান কে দেবে, ধনুক ফেলে মদন পেলে প্রাণ ।
কানটি নহে গৃহ্ণসম, তাতেই যত দোষ,—
অমদল যে দেখলে পৱে বাড়বে শিবেৱ রোষ ।
দন্ত নহে মৃত্ত্বাপাঁতি, তাতেই যত দায়,—
কুবেৱকে দেয় মাণিক ফেলে, মৃত্ত্বা সে কি চায় ?
নৱকো কঠি সিংহসম, তাই কি কভু হয় ?—
সিংহ তাহাৰ চিৱদিবস পায়েৱ তলে রুয় ।
সদাই কাঁদে, কণে কণে, কৱে বৃত্তন ছল,—
অটোয় শুধু ধৱবে কেন মন্দাকিনীৰ অল !
বলচি আমি—বতই পাৱিস নিন্দা তোৱা কৱ,
কৱছে উষা উপন্থা ঘোৱ, কিন্তে এমন বৱ !

কৈকুমুদুৱশন মলিক ।

কবি

—::—

কিশোর-কবির তন্দুলস চোখের সামনে স্বপ্নদেবী তার প্রিয়ার
রূপটাকে একটু একটু ক'রে ফুটিয়ে তুললে। তারপর পাপড়ি-শসা
ফুলের মতো রূপটা শৃঙ্খে মিলিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু একটী
মাধুর্যের স্মৃতি—ঝরা ফুলের গন্ধটুকুরই মতো।

কবি জেগে উঠল। কঞ্জনাদেবী তখন তার কানে কানে ব'ললে
—কবির তৃষিত হৃদয় সে স্নিফ করে দেবে—তার প্রেমে; কবির
দৈন্য, লজ্জা, ভয় সে দূর ক'রে দেবে—তার তাগে; কবির জীবন
পূর্ণ ও সার্থক হ'য়ে উঠবে—একমাত্র তারই সঙ্গে মিলনে।

কবি সেই স্বপ্নলক্ষ্মীর সঙ্গানে বেরুল—অরণ্যে নয়, পর্বতে নয়,
শ্রোতৃস্বিনীর ভীরেও নয়, নির্বারণীর ধারেও নয়—তাকে খুঁজে ফিরতে
লাগল—পৃথিবীর পরিচিত-অপরিচিতের মধ্যে, সমাজের বিলাস-
ব্যবসনের মধ্যে, শুশানের শোক-নীরবতার মধ্যে।

কিন্তু কোথাও তার দেখা মিলল না।

* * * *

এমনি ক'রে মাসের পৱ মাস, বছরের পৱ বছর কেটে গেল।
কবি কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে ঘোবনে প'ড়ল।

তার ঝোঙ্গার বিরাম ছিল না।

কত বরাবনী কবির পথে এসে দাঢ়াত। ব'লত—আমিই
তোমার সেই প্রিয়া।

ସଙ୍କାଳ-କ୍ଲାନ୍ଟ କବି ମନେ ଭାବତ—ହୟତ ବା ଏ-ସେଇ । ମୁଖେ ବ'ଲ୍ତ—
ଦେବି । ଆମାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହ'ଯେ ଉଠିଲ ।

ଦିନେର ପର ଦିନ—ହୟତ ବା ମାସେର ପର ମାସ କେଟେ ଯେତ ।

ନାରୀ ଏକଦିନ ବ'ଲ୍ତ—ତୃକ୍ଷା ମିଟେଛେ କି ?

କବି ବ'ଲ୍ତ—ନା ।

ନାରୀ ବ'ଲ୍ତ—ଆମାର ମିଟେ ଗେଛେ । ତୁମ ଏଇବାର ଯାଓ ।

କବି ଚ'ଲେ ଯେତ । ତାର ଭାଙ୍ଗା ବୁକେର ଚୋଯାନୋ ରଙ୍ଗେ ଗୋଲାପ
ଲାଲ ହୟେ ଉଠିଲ ; ତାର ବିଷଞ୍ଚ ମୁଖେର କରୁଣ ହାସିତେ ଡୋଃଙ୍ଗା ମାନ
ହ'ଯେ ଆସ୍ତ ।

ସମାଜ ଗଲା ଉଚ୍ଚ କ'ରେ ବ'ଲ୍ତ—ଛିଃ ଛିଃ !

କବି ମାଥା ନୀଚୁ କ'ରେ ଭାବତ—ଭାଇତ !

* * * *

କବିର ଘୋବନ୍ତ ଫୁରୋଲ, କବିଓ ଶ୍ୟାମ ଅହଣ କ'ରଲେ ।

ମୃତ୍ୟୁଦେବୀ ଶିଯରେ ଏସେ ବ'ସନ୍ତି ।

କବି ଜିଜ୍ଞାସା କ'ରଲେ—ଏଇବାର ତାକେ ପାବ ତ ?

ମୃତ୍ୟୁଦେବୀ ବ'ଲଲେ—ଏଥନ୍ତ ନଯ ।

କବି କ୍ଲାନ୍ଟସ୍ଵରେ ବ'ଲଲେ—ଆର କତଦିନ ତାକେ ଖୁଁଜେ କିନ୍ତୁ ହେ ?

ମୃତ୍ୟୁଦେବୀ ଶାନ୍ତସ୍ଵରେ ଉତ୍ତର କ'ରଲେ—ଶହୁର ସତଦିନ ।

କବିର ଚୋଖ ବୁଝେ ଏଲ । ତାର ଶେଷ ନିଃଶାସଟା ଶହୁରରେ ମଧ୍ୟ
କୋଥାଯି ମିଲିଯେ ପେଲ ।

ଶ୍ରୀକାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ।

উদ্বাদযন্তী জাতক ।

(জাতকমালা হইতে অনুদিত)

—*—

“তৌর দৃঃখে অভিভূত হয়েও সাধুজন আপনার অটুট ধৈর্যবলে
বীচমার্গের প্রতি উপেক্ষাপন্নায়ণ হয়ে থাকেন” —লোকমুখে এইরূপ
শোনা যায় । ষষ্ঠা :—

একসময় বোধিসত্ত্ব শিবিদের রাজা ছিলেন । তাঁর মধ্যে সত্য,
ত্যাগ, প্রজ্ঞা ও বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণের আতিশয্য ধাক্কায়, তিনি
লোকহিত সাধনে চির উদ্ঘোগী ছিলেন । মুর্তিমান ধর্ম ও বিনয়কল্পী
সেই রাজা সর্বদা প্রজাবর্গের উপকারে প্রবৃত্ত থাকতেন ।

প্রকৃতিপুঞ্জের চিতে দুষ্টজ্ঞাব না আসিতে দিয়া,
গুণের পরিমাবশে অদয় তানের বিকাশিয়া,
পিতা ষষ্ঠা তনুরে উভলোকে আনন্দিত করে,
সেইমত ক্ষিতিপতি পালিতেন প্রকৃতিনিকরে ।

দশনীতি ছিল তাঁর চিরকাল ধর্ম-অনুগামী,
পরিজন পরজন ছয়েরি সমান শুভকামী ।
অধর্মের পথ সদা আবরিয়া সকল প্রজার,
হইয়াছিলেন তিনি স্বর্গের সোপান সবাকার ।

ধৰ্মপালনেতে মাত্র লোকহিত ঘটে আনি মনে,
অমুরস্ত ছিলা তাই চিরকাল ধৰ্ম-আচরণে ।
সকলপ্রকারে সদা ধৰ্মপথে করি বিচরণ—
অপরে লজ্জিতে ইহা, কভু নাহি সহিত রাজন ॥

সেই রাজাৰ একজন পৌরজনেৱ পৱন রূপলাবণ্যাবতী একটি
কল্পা ছিল। তাকে দেখলে শ্ৰী, রতি, অথবা অপ্সরাগণেৱ একজন
বলে মনে হত। সবাৱ মতেই, সে ছিল পৱন দৰ্শনীয়া স্তৰীয়া ।

বীতৰাগ জন্ম ছাড়া, আঁখিপথে আৱ সবাকাৱ,
অমুপম তনু সেই চকিতে পড়িলে একবাৱ,
নয়ন অমনি সেই রূপেৱ রসিতে বাঁধা পড়ে—
নড়িবে কি, শক্তি নাই তাৱাটি যে এক ভিল মড়ে !

সেইজন্মে বাঙ্কবেৱা তাৱ নাম রাখলে উম্মাদয়স্তী। তাৱ বাপ
একদিন রাজাৰে গিয়ে জানালেন—“দেব ! আপনাৰ রাজ্যে একটি
স্তৰীয়া প্ৰাচুৰ্ভূতা হয়েছে, আপনি ইচ্ছামাত্ৰেই তাকে গ্ৰহণ বা বৰ্জন
কৱতে পাৱেন”।

রাজা স্তৰী-লক্ষণবিদ্ ব্ৰাহ্মণগণকে আদেশ কৱলেন—“আপনাৰা
গিয়ে দেখে আসুন মেয়েটি আমাৰ গ্ৰহণযোগ্যা কি না”। মেয়েৰ
বাপ ব্ৰাহ্মণদেৱ সঙ্গে কৱে বাড়ী নিয়ে গেলেন। বাড়ী গিয়ে তিনি
উম্মাদয়স্তীকে বললেন—“ভদ্ৰে, তুমি নিজ হাতে এঁদেৱ পৱিত্ৰেশন
কৱ”। বাপেৱ আদেশমত সে ব্ৰাহ্মণগণকে পৱিত্ৰেশন কৱতে
প্ৰবৃত্ত হল। তখন সেই ব্ৰাহ্মণদেৱ—

চাহিয়া সেই বয়ান পানে নয়ান নিশ্চল !
 মদনত্তত ধৈর্য সবে অবশ বিস্তল ।
 মাতাল সম সংজ্ঞাহারা হইল একেবারে,
 আপন অঁথি মনেরে তারা সম্ভরিতে নারে !

থাওয়া ত দুরের কথা—ধৌরস্থিরভাবে বসে থাকতে পর্যন্ত তারা
 পারলেন না । তখন গৃহস্থামী মেঘেকে তাঁদের স্মৃথ থেকে সরিয়ে
 দিয়ে, স্বহস্তে পরিবেশন করে তাঁদের থাইয়ে দাইয়ে বিদায় করলেন ।

পথে এসে আঙ্গণেরা বিচার করতে লাগলেন—মেঘেটির রূপ ঠিক
 যেন প্রতিমার মতন, দেখ্যামাত্রই মোহিত হতে হয় । একেতে,
 পত্রীরূপে গ্রহণ করা ত দুরের কথা—একে দেখাও রাজাৰ উচিত
 নয় । এৱ এই রূপচাতুর্যা রাজাৰ অদয় উন্মত্ত করে তুলবে, আৱ
 তিনি সেই রূপশোভায় মন থেকে ধৰ্মকার্যা ও রাজকার্যা সম্পাদনে
 শিথিলপ্রযত্ন হয়ে পড়বেন ; এইরূপে রাজকার্যসাধনে কালাতিজ্জম
 হওয়ায়, প্রজাৰ স্বথোদয় ও হিতসাধনেৰ পথ কুকু হয়ে যাবে ।

ইহারে দৱশ কৱিবামাত্র মুনিৱাও সাধনে বিস্ত হয়,
 রাজা ত শুবক, শুখেৱি সেবক, আগে হতে ভাবে মতিয়া রয় ।

এইরূপ মনে মনে স্থির করে তারা উপযুক্ত সময়ে রাজাৰ সঙ্গে
 দেখা করে বললেন—“মহারাজ ! মেঘে ত দেখে এসেছি । মেঘেটিৰ
 রূপচাতুর্য যথেষ্টই আছে, কিন্তু তাৰ অপলক্ষণও আছে ;—এবং সে
 লক্ষণেৰ ফল হচ্ছে, অপঘাত । সেইজন্তে মহারাজেৰ তাকে চোখে
 দেখাও অবিধি—পত্রীভে গ্রহণ কৰা ত দুরের কথা ।

ষেমন কৱিয়া সমেষা যামিনী টাঙ্গোৱে জুকাম্বে ব্ৰথে,
ধৰা আকাশেৱ শোভা শৃঙ্খলা একেবাৱে দেৱ ঢেকে,
ঠিক সেইমত নিষিদ্ধিতা হয় ব্ৰহ্মণী যে দেৱী নাশি
স্বামী ও শশুৱ উভয় কুলেৱি যশ ও বিভূতিৱাশি ।

এইসব শোনবাৱ পৱ, “এই অলক্ষণে নামী আমাৱ কুলেৱ
অনুক্রম হবে না” ভেবে রাজা তাৱ প্ৰতি নিৱজিলাব হলেন ।

এদিকে সেই গৃহস্থ, রাজা তাঁৱ মেয়েৱ প্ৰাৰ্থী নন জেনে, অভি-
পাৱগ নামক রাজাৱই একজন অমাত্যকে কন্তুসম্প্ৰদান কৱলেন ।
তাৱপৱ একদিন কৌমুদী-উৎসবেৱ কাল আগত হলে, নিজ রাজ-
ধানীতে উৎসবশোভা দেখবাৱ অন্ত রাজাৱ মন উৎসুক হল,—চমৎকাৱ
একটা রথে আৱোহণ কৱে তিনি নগৱঅমণে বেৱলেন । যেয়িয়ে
তিনি দেখতে পেলেন—ৱাজপথসকল জলসেচনে সিঞ্চ ও সুমার্জিত
হয়েছে, চাৱপাশেৱ দোকানগুলি ধৰজপতাকায় সুসজ্জিত হয়েছে,
নিকিপ্ত ফুলে পথেৱ ঘাঁটি সাদা হয়ে পিয়েছে ; ফুলেৱ মালা, মদিৱা,
ধূপ ও স্বানীয় অনুলেপনেৱ (প্ৰভৃতিৱ) গন্ধে বাতাস সুৱভিত, হাস্তে
লাস্তে ও বাদিত্ৰেৱ ধৰনিতে চাৱদিক মুখৱিত, বিবিধ পণ্যৱাশিতে
জৱা প্ৰসাৱিত ৱাজপথ উজ্জলবেশধাৱী পুষ্টদেহ তুষ্ট নাগৱিকগণে
আকীৰ্ণ হয়েছে । এই সব দেখতে দেখতে রাজা সেই অমাত্যেৱ
বাড়ীৱ স্থানে এসে পড়লেন ।

এদিকে অলক্ষণে বলে রাজা তাঁকে ত্যাগ কৱায়, উন্মাদযন্তীৱ মনে
বেশ একটু রাগ ছিল । ৱাজদৰ্শনেই যেন একান্ত কুতুহলী—এই ভাব
দেখিবো, আপনাৱ রূপশোভা যাতে ৱাজাৱ চোখে পড়ে সেই উদ্দেশ্যে,

মেঘের শিথরে বিহ্যাতের মত হর্ষ্যাতল উন্নাসিত করে সে দাঢ়িয়ে
ছিল,—আর মনে মনে ভাবছিল, আচ্ছা দেখি একবার এই অলঙ্কণে-
কে দেখে ইনি স্মৃতি ও ধৃতি অবিচলিত রেখে নিজেকে ধারণ
করতে পারেন কি না। রাজা সেই বাড়ীটীর শোভাসম্পর্কে
কৃতৃহলী হ্যামার্ত্তই সহসা তাঁর দৃষ্টির অভিমুখে স্থিত উমাদয়স্তীকে
দেখলেন। তখন—

আপন অন্দরে নিতি সুন্দরীদলের
শরীরবিলাসে যাঁর তিরপিত অঁধি,
ধর্মে চির অনুরাগী, ইন্দ্ৰিয়বলের
বিজয়ে নিরত যিনি, অনুকৃত থাকি ;
স্ববিপুল ধৃতিগুণ যাহার ভিতর,
পরযুবতীতে যাঁর নয়ন বিমুখ—
এ হেন রাজা ও হয়ে মদনে কাতৰ,
অনিমেষ চোখে তাঁরে নেহারে উৎসুক !

আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন—

এ বালা কি ঐ গৃহেরি দেবতা, অথবা অমাট চন্দ্ৰকর ?

মানবী ত নহে, দেবী কি দানবী আসিয়াছে এই ধৰণী 'পৱ ?

তাকে দেখে অত্যন্তনয়ন রাজা যখন এই ভাবে মনে মনে
আলোচনা করছিলেন—তখন রাজুর তাঁর মনোরথের একটুও অনু-
কূল না হয়ে সে স্থান অতিক্রম করে চলে গেল। সেই রমণীর প্রতি
একাগ্রমনা রাজা, শুভদৰ্শয়ে স্বভবনে উপনীত হয়ে, গোপনে সারুণী
স্বন্দরকে দিঙাসা করলেন—

“শ্বেত প্রাচীরেতে বেষ্টিত সেই গৃহটি কি তুমি চেন ?

কেবা সে, দাঢ়িয়েছিল যে শুভ মেঘেতে বিজলি হেন ?”

সারধী বললে—‘দেব ! অভিপারগ নামে আপনার একটি অমাত্য আছেন, ওটি তাঁরই বাড়ী। আর যাকে দেখেছেন, তিনি হচ্ছেন তাঁরি স্ত্রী, কিরীটবৎসের মেয়ে। নাম উম্মাদয়স্তী।’ এই কথা শুনে তাকে পরস্তী জেনে রাজাৰ মন ন্যাকুল হল, চিন্তাভাবে তাঁৰ চোখ নিমীলিত হয়ে পড়ল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তদর্পিতমনা রাজা আত্মগত হয়ে বল্লতে লাগলেন—

মৃহু শুমধুৰ হাসিতে যে মোৱে উম্মাদসম কৱেছে,
রম্য আখরনিকৰে ভৱিয়া যেইজন আহা গড়েছে
'উম্মাদয়স্তী' এ নাম তাহাৰ, কৱেছে মা হুওয়া উচিত তাই,
পাগল যে অন কৱে, নাম তার কিছু আৱ নাহি খুঁজিয়া পাই।

পাশৰিতে ইচ্ছা কৱি বটে,

অদয়ে দৱশ তাৱি ঘটে !

অথবা আমাৰ এই মন

তাৱি মাকে রয়েছে মগন !

আবাৰ কথনো মনে লয়—

এ মনেৱ প্ৰভু সে নিশ্চয় !

পৱ-ৱমণীতে মম এত অধৌৱতা,—

উম্মাদ হয়েছি আমি হায় !

ঘূম ত গিয়েছে মোৱে একেবাৱে ছেড়ে,

লজ্জাও কি ত্যজিল আমাৰ ?

দেহের বিলাসে তার, হাসিভরা চাহনৌর মাঝে,
অনুরাগে ভরা মগ মন যবে বিরাজে নিশ্চল,
তখন অপর কাজে ডাকিতে কাসর যেই বাজে—
সে কাজের প্রতি মোর মন হয় বিবেষ-বিকল ।

এইরূপে মদবিচলিত-ধৈর্য হলেও রাজা তার চিন্তকে ব্যবস্থিত
করলেন বটে, কিন্তু তার শরীর দিন দিন শ্রীণ ও পাণ্ডু হতে লাগল ।
চিন্তাকুলিত ভাব আর দীর্ঘশ্বাসত্যাগ প্রভৃতিতে তার আকৃতিতে
কামকাতরের ভাব বাস্তু হয়ে পড়ল ।

যদিও,

মহান् ধৈর্য্যের বলে আপনার মনের বিকার
গোপন করিলা নরবর,
চিন্তায় শ্রমিত অঁখি, শরীরের কৃশতায় তার,
বাস্তু তাহা হইল সত্ত্ব ।

আকার ইঞ্জিত লক্ষ্য করে লোকের মনের ভাব বুঝে নিতে রাজাৰ
সেই অমাত্য অভিপারগ ছিলেন খুব একজন নিপুণ ব্যক্তি । রাজাকে
দেখে, কি যে তার ঘটেছে তা অভিপারগের বুঝতে বাকী রৈল না ।
রাজাৰ এ অবস্থা হ্যার কারণটি তার বোধগম্য হওয়ায়, এতে রাজাৰ
অনিষ্ট ঘট্টে পারে এই আশঙ্কায় তার মন শক্তি হল ; কারণ
রাজাকে তিনি স্নেহ কৱতেন, এবং অতি বলশালী মদনের প্রভাবে
মানুষকে যে কি হতে হয়, তা ও তার আনা ছিল । তারপর রাজাকে
গোপনে কিছু আনাবাৰ অন্তে তার কাছে তিনি উপস্থিত হলেন, এবং
রাজাকৃতক কৃতাভ্যনুজ্ঞ হয়ে বল্লতে লাগলেন—

দেব আরাধনে, হেনরদেবতা, আজিকে যখন আছিলু রূত,
অস্মুদ-আঁধি যক্ষ সে এক হইল আমাৰ সমীপগত।

কহিল আমাৰে, ওগো তুমি কেন দেখিছ না আঁধি মেলিয়া চাহি,
উম্মাদয়স্তুপ্রতিনিবিষ্ট নৃপেৱ হৃদয়ে শাস্তি নাহি।

এই কথা বলে যক্ষ চকিতে হইল তিরোহিত,
সেই হতে, ওহে দেব, বিষাদ ঘিরেছে মোৱ চিত।
যাহা সে বলিয়া গেল, যদি প্ৰভু ঘটে থাকে তাই,
প্ৰসাদপ্ৰয়াসৌজনে আজো তবে কেন বল নাই ?

অতএব আমাকে অনুগৃহীত কৱাৰ জন্মে উম্মাদয়স্তুকে এখন
আপনাৰ গ্ৰহণ কৱা উচিত। তাঁৰ এই প্ৰস্তাৱে রাজা লজ্জানতবদন
হলেন। মদনবশগত হলেও চিৱাভ্যন্ত ধৰ্মবলে তিনি কথনো
ধৈৰ্যাচ্যুত হন নি। তিনি স্পষ্টাক্ষৰে সেই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যান কৱে
বল্লেন—না, তা হতে পাৱে না, কেন না :—

আমিত অমুৱ নহি,—পুণ্য হতে হইব পতিত,
তাৱপৱ পাপ এই সৰাকাৱই হইবে বিদিত।
আৱ, তাৱ বিৱহেতে হিয়া তব পুড়ে হবে ক্ষীণ,
জলিয়া জলিয়া যথা তৃণ তয় অনলে বিলৌন !

উভয় লোকেৱি ঘটে অহিতসাধন
ষেহেতু, অবোধে শুধু কৱে হেন কাজ।
একমাত্ৰ সেইহেতু ভ্ৰমে কদাচন
নাহি কৱে সেই কৰ্ম পণ্ডিতসমাজ।

অভিপারগ বল্লেন—মেব ! এতে আপনার ধর্ম অতিক্রমের
কোনই আশঙ্কা নেই, কেননা :—

আমি যে করিব দান, তাহাতে সাহায্য বিতরিয়া
ধর্মলাভই হইবে তোমার,
মা করি গ্রহণ তারে, বিপ্র মম দানে আচরিয়া
অধর্মই হইবে সংক্ষার ।

হে মেব ! এতে আপনার কৌট্টির উপরোধকও আমি কিছু
মেখছি নে ।

আমি আর তুমি ছাড়া এ বিষয়
জানিবে না কভু অন্ত কেও,
অতএব, জন-অপবাদ ভয়,
করিতে হবে না শক্তা সেও ।

আর এ কার্যে আমাকে পীড়া দেওয়া ত হবেই না, অমৃগৃহীতই
করা হবে । কারণ—

প্রতুর স্বার্থচক্ষচাজনিত তৃষ্ণিভরা যে চিন্ত,
আবাত বেদনা কোথায় সেখানে রয়,
অতএব দেব, নিষ্ঠতে কামের স্বত্ত্বভোগ কর নিত্য,
মোরে পীড়নের শক্তা সে কিছু নয় ।

ঘাজা বল্লেন—ছিছি, এ পাপ কথা আর নয় !

সকল দানেতে ওগো ধর্মের সাধন নাহি হয়,
মোর প্রতি অতি স্নেহে তুমি না জ্ঞাবিছ এ বিষয় ।

আমাৰ উপৱ বেৰা অতিশয় স্লেহে
 নাহি চায় পানে আপনাৰ,
 এ হেন পৱম বস্তু, এ হেন যে সখা,
 তাৰ প্ৰিয়া সখী যে আমাৰ ।

অতএব আমাকে একুপ প্ৰতাৱণা কৱা আপনাৰ উচিত নয় । আৱ
 এ বিষয় অপৱ কেউ জানবে না বলেই কি পাপ হবে না ?

আদেখায় নিমেবিত বিষেৱ সমান
 গোপনে আচৱি পাপ, কেবা সুখ পায় ?
 দেবতা ও যোগী, যাৱা নিৰ্মল-নয়ান,
 তাৱা নাহি দেখে—হেন কি আছে ধৰায় ?

আৱো মেথুন—

নহে সে যে তব প্ৰিয়া, হায়,
 প্ৰতায় কৱিতে কেবা পাৱে !
 ত্যজি তাৱে তুমি বেদনায়
 নহিবে না, বুঝাইবে কাৱে ?

অতিপারগ বল্লেম—

দারাপুত্ৰ সহকাৰে আমিত তোমাৱি দাস,
 দেবতা আমাৰ তুমি প্ৰভু,
 মেও ত তোমাৱি দাসী, অতএব ধৰ্মনাশ
 ইথে তব না হইবে কচু ।

হে কামদ, দিছ তুমি মোরে বছ কামনাৰ ধন,
 আমাৰ প্ৰিয়াৱে আজি তোমাৱে কৱিব সম্পৰ্ণ।
 ইহলোকে প্ৰিয় যাহা তাহাই কৱিয়া দান, নৱে,
 রমণীয় প্ৰিয় যাহা পৱলোকে তাহা লাভ কৱে।

অতএব, হে দেব, আপনি তাকে গ্ৰহণ কৰুন।

রাজা বল্লেন—না, তা, হ'তে পাৱে না, কোনক্ষমেই না।

কেন ?—

লেলিহান হৃতাশনে মৱিব পুড়িয়া,
 অধৰা মৱিব খৰ তৱৰারি ঘায়,
 যেবা শ্ৰী লভিনু চিৱ ধৰ্ম আচৱিয়া,
 শুক্রি নাহি মোৱ কৱি পীড়ন তাহায়।

অভিপারণ বল্লেন—আমাৰ ভাৰ্য্যা বলেই দেব, বদি তাৰ প্ৰতি-
 গ্ৰহণে অনিচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে আমি তাৰ প্ৰতি সৰ্ববজনেৱ
 অভিলাষেৱ অবিৱোধী বেশ্যাত্ৰিতেৱ আদেশ কৱব, তাৱপৰ তাকে
 আপনি গ্ৰহণ কৰুন।

রাজা বল্লেন—আপনি কি পাগল হয়েছেন !

মণি দিব, বিনা দোষে
 তাজিলে কলত্বে।
 ধিকৰুত হইবে পুনঃ
 হেথোয়, পৱত্বে।

অতএব একপ কার্য্যে আমাকে প্রযুক্ত করতে বিরত হয়ে, যা শ্যায় তারই প্রতি অভিনিবেশ প্রদান করুন।

অভিপারগ বল্লেন—

স্থখের বিলোপ মম, জন অপবাদ, আর ধর্ষ্মের অত্যয়,
তব সখ্য-স্মৃথ-পাওয়া হৃদয়ে হবে না বোধ এই সমুদয়।
মহীতে মহেন্দ্র তুমি, দানের আহবে কোথা হেন হতবহ?—
পুণ্যহেতু মোর, যথা ঝুঁকিকে দক্ষিণা লয়, তারে তুমি লহ।

রাজা বল্লেন—অবশ্য আমার উপর অতি স্নেহবশতঃই আপনি
নিজের হিতাহিত উপেক্ষা করে আমার স্বার্থ পরিচর্যায় উচ্ছত হয়েছেন।
বিশেষ করে এই জন্মেই আমি আপনার স্বার্থ উপেক্ষা করতে অক্ষম।
তারপর, জনাপবাদের বিষয়েও নিঃশক্ত হওয়া যায় না। কেন যায় না,
তা বল্ছি—

লোক-অপবাদে যারা আদর না করে,
নাহি ভাবে পরকাল, ধর্ম উপেক্ষিয়া,
বিশ্বাস থাকে না কারো তাহাদের 'পরে
অচিরে লক্ষ্মীও যান তাদের ত্যজিয়া।

অতএব আপনাকে বলি—

ধরমের অতিক্রমে দোষ যাহা—সেত স্ফুরিষ্ট,
যেবা অভ্যুদয় তাহে, সে কেবলি সন্দেহজড়িত।
জীবনেরও লাগি যদি ধর্ম্যত্যাগে হয় প্রমোজন,
তবুও তাহাতে যেন কঢ়ি তব না হয় কখন।

কি আর বল্ব—

নিম্না আদি দুখ মাঝে অপরেরে ক্ষেপিয়া,
নিজ শুধে রত নাহি রহে সাধুজন,
পরে নাহি নিপীড়িয়া, শায়পথে চলিয়া,
বেদনা আমার এক। করিব বহন।

অভিপারণ বল্লেন—“প্রভুর উদ্দেশ্যে ভক্তিপরায়ণ হয়ে আমি যে
কাজ করছি, তাতে করে আমার পক্ষে, আর দেব, দৌয়মানাকে প্রতি-
গ্রহণ করে আপনার পক্ষে অধর্ম সংঘারের অবকাশ আমি ত কিছুই
দেখছিনে—পরস্ত শিবিগণ, সামন্ত ও জানপদগণ সবাই ‘এতে অধর্ম
কোথায়’ এই কথাই বলবে। অতএব দেব, তাকে গ্রহণ করুন।

রাজা বল্লেন—“দেখুন, আমার স্বার্থচর্যায় আপনি অতিমাত্র
আসন্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে বেশ ভাল করে একটু চিন্তা করে দেখুন।
আর সামন্তগণ, জানপদবর্গ, শিবিগণ এবং আপনি আমি,—এদের
মধ্যে ধর্মবিস্তর কে ?

অভিপারণ অমনি সম্মত রাজাকে বল্লেন—

শ্রতিতে তোমার প্রভু অতি অধিকাব,
বুধজনে সেবি (তব জ্ঞান যে অপার)।
অতি পাঠকারী তুনি করি বহু শ্রম,
ত্রিবর্গ বিষ্ঠার তরুে বৃহস্পতি সম।

রাজা বল্লেন—তাই যদি হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে আপনি আর
আমাকে প্রতারিত করবেন না। কেন না—

নয়ের (স্বভাব) আৱ হিতাহিত যত,
হয়ে থাকে নৃপতিৰ চৱিতামুগত।
কীর্তিমান যেই রাজা, প্ৰজা তাৱে পূজে,—
শ্যামপথে রব আমি এই সব বুঝে।

সুপথ কুপথ কিছু না ভাবিয়া মনে
গাতো যথা বৃষত্তেৰ অনুগামী হয়।
নৃপে অনুসৱি তথা চলে প্ৰজাগণে
শুভ কি অশুভ কাৱো মনে নাহি লয়।

তাৱপৱ আপনি আৱো দেখুন—

নিজেৰে শাসনে রাখি—সে শকতি নাহি যদি হয়,
মোৱ হাতে মানুষেৰ কি ঘটিবে কহন না যায়।

অতএব হয়ে চিৱ প্ৰকৃতিৰ হিতমোক্ষমান,
নিজেৱও লাগিয়া চাহি ধৰ্ম আৱ যশ সুবিমল,
প্ৰজাৰ নেতা যে আমি, গাতৌদলে বৃষত্তপ্ৰধান,
আমি কি লভিতে পাৱি বাসনাৰ বশেৱ কৰল ?

রাজাৰ এই অবস্থা দৰ্শনে প্ৰসাদিতমন অভিপাৱগ অমনি রাজাকে
প্ৰণাম কৱলেন, আৱ কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন—

কি ভাগ্যসম্পদশালী এ রাজোৱ প্ৰকৃতিনিকৰ,
পালনে নিৱত তুমি যাহাদেৱ, হে নৱদেবতা !

বিসজ্জিতয়া সুখসাধ, ধৰ্ম-অনুগমনে তৎপৱ—
বনবাসী তাপমেও তোমা হেন সাধু মিলে কোথা !

‘মহৎ’ শব্দটি এই আজি মহারাজ,
তোমাতেই অর্থসহ করিছে বিরাজ ।
অগুণীয় যদি কেহ গুণগান করে
কৃত অতি ঠেকে তাহা আধুরে আধুরে ।

মহৎ তোমার এই আচরণে আছে বল বিশ্বয় কি আর,
সমুদ্র যেমন নানা রতনের, তুমি তথা গুণের আধাৰ ।

তাহলেই দেখা গেল তৌত্রছুঁথে অভিভূত হয়েও সাধুজন আপন অটুট
ধৈর্য আৱ স্মৃত্যস্ত ধৰ্মেৱ বলে নীচ মার্গেৱ প্রতি উপেক্ষাপৰায়ণ
হয়ে থাকেন । অতএব ধৈর্য-ধৰ্মেৱ অভ্যাসেৱ জন্ম বোগসাধন
কৰ্তব্য । ইতি—

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য ।

ମହାଦେବ ।

—*:—

ଭଗୀରଥ-ସ୍ତୁତିବାଦେ ଶୁରଧୁନୀ ଯବେ
ବାହିରି' ବୈକୁଣ୍ଠ ହତେ ବିଶାଳ ଗର୍ଜନେ
ଚଲିଲ ମହୀର ପାନେ—କାନନେ କାନନେ
ମୁଢ଼ୀ ଗେଲ ବିହଙ୍ଗମ ପଲକେ ନୀରବେ
ଶୁନି' ମେ ଗର୍ଜନ ; ବନେ ବନେ ଫୁକାରିଆ
ମୁଗେନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ଦୁଳ ଯତ ମାର୍ଜାରେର ମତ
ଲୁକାଇଲ—ହିମାଞ୍ଜିର ଶୃଙ୍ଗ ଶତ ଶତ
ତୁଳ୍ବ ବାଲିରାଶି ବେନ ପଡ଼ିଲ ଖସିଆ ।
ହ ହ ହ ହ ଶକେ ଛୁଟି' ଆସେ ବେଗବତୀ,
ମାତା ବନ୍ଧୁକରା ଶୁନି' କାପେ ଥର ଥର—
ମହୀ ବୁଝି ବ୍ସଂଶ ହୟ—କାହାର ଶକତି
ଧରିବେ ସେ ତୌମନ୍ତୋତେ ?—ତୁମି ଗଞ୍ଜାଧର !
ଆପନାର ଶିର ପାତି' ମେ କଲୁଷ-ହରା
ଧରିଆ ରକ୍ଷିଲେ ଏଇ ଦୀନ ବନ୍ଧୁକରା ।

(২)

তোমারে ডাকে নি কেহ, সুরাশুরে ঘবে
 দোহে মিলি আরস্তিল সাগরমন্থন,
 তোমারে ভুলিয়া কেহ চাহে নি, গরবে
 ঘবে তারা করি' নিল অমৃত বণ্টন।
 অবশেষে উঠি' এল তৌত্র হলাহল !—
 দেব যক্ষ রক্ষ নর কিম্বরের প্রাণ
 গেল কাপি' মহাত্রাশে ; পৃথুী কম্পমান,
 স্বর্গ মর্ত্য বুঝি আজি যায় রসাতল !
 কোথা যাবে কি করিবে নাহি জানে কেহ—
 দেব যক্ষ রক্ষ সবে শক্তি বিহুল !
 তুমি আসি' অবহেলে রক্ষিলে সকল,
 পান করি কালকৃটে ; ত্রিদিবে অভেয়,
 দেব মাকে মহাদেব বীলকৃষ্ণ তুমি,
 অপ্রমেয়, অরিন্দম, জ্ঞানশক্তি-তৃণি !

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্ৰবৰ্ণ।

নবীনের পতি ।

—————ঃ*ঃ————

হে নবীন, হে তরুণ ! পশ্চিম-অচলে
যেথা ধীরে ডুবিতেছে অস্তগামী রবি,
আগি সেথা বন্দ করি' বিষণ্ণ বিরলে
নাহি ফেল অশ্রঙ্গজল ; নবারুণ-ছবি
উদয় অচলে যেথা বিশ্ব-মহাকবি
আকিয়া দিতেছে চির পুলক-হিমোলে
সেথা থেঁজ সত্য তব ; প্রাণের কল্লোলে
যেথা ষত উঠিতেছে লয় তান, সবি
বিশ্বকবি-গীত গান ; মোরা তারি স্বরে
পুন্ষসম ফুটি' উঠি' পলকে পুলকে
সোহাগে স্ববাস টানি' দিগন্ত-আলোকে,
মূরছিয়া পড়ি' পুনঃ অস্তরীক্ষ-পুরে ;—
পশ্চিম-অচলে আস্ত ঢলি' পড়ি' স্বর্ষে
আবার উদয়াচলে জাগি' হাসিমুখে ।

ত্রিস্বরেশচন্দ্র চক্ৰবৰ্তী ।

ନତୁନ ରୂପକଥା ।

—::—

ଏକ ସେ ଛିଲ ରାଜୀ । ରାଜୀର ନାମ ଜୀବନଶ୍ଵର, ରାଜୀର ରାଜ୍ୟ
ଶାକଦ୍ଵୀପ, ରାଜୀର ରାଜଧାନୀର ନାମ ମନେ ନେଇ । ରାଜୀର ଧନୈଶ୍ଵରୀର
ଅନ୍ତ ନେଇ, ଲୋକଜନେର ଇଯତ୍ତା ନେଇ । ରାଜୀର ହାତୀଶାଲେ ହାତୀ,
ସୋଡ଼ାଶାଲେ ସୋଡ଼ା, ଦେଉଡ଼ୀଭରା ଦରୋଯାନ, ବାଗିଚାଭରା ଫୁଲ । ରାଜୀର
ସାତ-ମହଳା ପୁରୀ ପୃଥିବୀର ବୁକ ଆଁକଡେ ଧରେ' ଆକାଶ ଫୁଁଡେ ଏକେବାରେ
କୋଥାମ ଉଚ୍ଚ ହ'ୟେ ଉଠେଛେ—ଉପରେ ତାକିଯେ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଇ ଯାଯି ନା
କୋଥାଯି ତାର ଚାଡା କୋନ୍ ମେଘେର ଆଡ଼ାଲେ ଲୁକିଯେ ଗେଛେ । ସାତ-
ମହଳା ପୁରୀ—ତାର ମହଳେ ମହଳେ ଦାସ ଦାସୀ, ମହଳେ ମହଳେ ଚନ୍ଦନ-
କାଠେର ଦରଜା, ମେହଗନି କାଠେର ଜାନାଳା, ଦୁଧେର ମତ ସାଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ପାଥରେର ଥାମେର ଉପରେ ଉପରେ ଆବୀରେର ମତ ଲାଲ ରଙ୍ଗପାଥରେର
ଗନ୍ଧୁଜ—ଏକେବାରେ କତନୂର ଥେକେ ଦେଖା ଯାଯି ଯେନ ପଲାଶବନେ
ପଲାଶ ଫୁଟେ ଆଛେ । ସେଇ ସବ ଥାମେ ଥାମେ ଆବାର କତ କାରି-
କାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଇଯତ୍ତା ନେଇ । କୋଥାଓ ମୟୁର ତାର ପେଥମ ଫୁଲିଯେ ରଙ୍ଗୁ-
ବାହାର ଖେଳିଛେ, କୋଥାଓ ହାତୀ ତାର ଶୁଣ୍ଡ ଝୁଲିଯେ ଦିଯେଛେ, ସିଂହ
ତାର ପ୍ରକାଶ ଥାବା ପେତେ ବସେ ଆଛେ, ବାଘ ରାଗେ ବସେ' ଗର୍ ଗର୍
କରିଛେ—ଏମନି ସବ କତ କତ ଶ୍ରେଷ୍ଠପାଥରେର ଥାମେ ଥାମେ ଥୋଦାଇ କରା ।
ଦେଯାଲେ ଦେଯାଲେ କତ ଚିତ୍ର । କୋଥାଓ ସୀତାର ବନବାସ, କୋଥାଓ
ପଞ୍ଚବଟୀ, କୋଥାଓ ମାଯାମୁଗ, କୋଥାଓ ଅଶୋକବନ—ଏମନି ସବ କତ କତ

চির নিপুণ তুলিতে চিরিত হয়ে দেয়ালে দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। গম্বুজের ছাদে ছাদে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শতদল আঁকা—তারই পাশে পাশে আবার কতরকমের পাথী লতা পাতা। সাত মহলে রাজাৰ সাত রাণী। সাতরাণীৰ গলায় মুক্তোৱ মালা, নাকে হীৱেৱ ফুল, কানে পাঞ্চাৰ ঢুল; তাদেৱ মাথাভৱা চক্ষকে মিশমিশে কালো রেশমী চুলে গজমোতিৰ হাৱ; হাতে সোনাৰ কাঁকন রাণীদেৱ গায়েৱ রংডেৱ সঙ্গে একেবাৱে মিলিয়ে গেছে, আড়ুলে আড়ুলে লাল ডগড়গে চুণি-বসান আংটী; মাথা থেকে পা পর্যন্ত হীৱে চুণি পাঞ্চা জহুৱতে সাত রাণীৰ রূপ একেবাৱে জল জল কৱছে। সাতমহলা পুৰীতে সাত রাণীকে নিয়ে রাজা স্বুখে রাজ্য কৱেন।

রাজা প্ৰতি বৎসৱ বসন্ত এলে বনোৎসব কৱেন। যখন প্ৰথম কাঞ্জনেৱ হাওয়াৰ মাঝেৱ মদেৱ গন্ধ শীতবুড়িৰ নাকে ঢোকে, তখন শীতবুড়িটা যেন কিসেৱ স্মৃতিতে শিউৱে ওঠে, কিসেৱ বেদনায় জেগে ওঠে। তাৱ পৱণেৱ সাদা ধানেৱ কাপড়ে ধীৱে ধীৱে সবুজেৱ আমেজ লাগে, মুখেৱ বুকেৱ হাতেৱ ঢিলে চামড়া সব নিটোল হ'য়ে আসে, চোখেৱ শুকনো চাউনি বিদ্যুৎভৱা মেষেৱ মত হ'য়ে আসে—মাথায় কাশফুলেৱ মত সাদা চুলেৱ রাশ ভৱেৱ দলে হেঝে যায়—কাটা পা ছটো কমলদলেৱ মত হ'য়ে আসে, হাতেৱ কাঠিৰ মত আঙুলগুলো চাঁপাৰ কলি হ'য়ে জেগে ওঠে। তখন শীতবুড়িকে চেনে কাৰ সাধা; তখন তাৱ কালো চোখে বাঁকা চাউনি, পাকা ডালিমেৱ কোয়াৰ মত লাল টুকুকে ঠোটেৱ ঝাকে যুধীৰ কলিক মত দাত-দেখাৰ হালকা হাসিৰ রেখা, অৱি-পেড়ে চুণি পাঞ্চাৰ বুটিদাৰ গাঢ়সবুজ রংডেৱ সাড়ীতে আৱ তাৱ শৱীৰ বেন ধূৱেই না;

সে সবুজ সাড়ীর চাইতেও যে সে অনেকখানি বেশি—এই কথাটা সে
জ্ঞা-বুক নিম্নে ঘেন আনিয়ে দিতে চায়। প্রতি ফাল্গুনে এমনি করেই
শীতবুড়ির নবজন্ম হয়, আর রাজা ও তাঁর সাত রাণীকে নিম্নে এমনি
সময়েই বসন্তোৎসব করতে রাজধানী ছেড়ে চলে যান।

সেবার প্রথম ফাল্গুনের সঙ্গে সঙ্গে “ফাল্গুনী”র বাঁশী বেজে উঠল।
বনে বনে গাছে গাছে পাতায় পাতায় পুরুক লাগল। কোথা থেকে
একটা ভুঁইঁচাপা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তার কচি মাথা হেলিয়ে
ছলিয়ে আধ আধ কথায় গান শুরু করে’ দিলে :—

“বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে”।

কোথা থেকে একটা ছোট চড়াই তার ছেট বুক ফুলিয়ে গলায়
গিটকিরি কেটে গান ভুড়ে দিলে—

“আকাশ আমায় ভুল আলোয়
আকাশ আমি ভৱ গানে”।

আমের মুকুলের গঞ্জ ছোটার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি দলের ব্যস্ত
ব্যাকুলতা জেগে উঠল, ঘন পাতার আড়াল থেকে স-তান কোকিল-
ডেকে উঠল, বুলবুল লতার গায়ে দোল খেতে খেতে পিউ পিউ
করে’ গলা সাধতে লাগল, দোয়েল ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে
মতুন গৌক-ওঠা ছোক্রান মত শিষ দিতে লাগল, শালিখেরা পর্যন্ত
হলদে ঠোট দিয়ে তাদের গিরিমাটির গা ঠোক্রাতে ঠোক্রাতে মহা-
আনন্দে তাদের বেসুরো গলায় কিচিমাচিয়ে করতে লাগল। বনে

বনে লতা ছুলল—পাতা কাঁপল—বাতাস ছুটল—চারদিকে মহাসাড়া
পড়ে গেল। রাজা বললেন—“বসন্ত আগত, বনোৎসবের আয়োজন
কর”।

রাজা বসন্তোৎসবে ষাবেন। সাতমহলা পুরীর সাত মহল ডাক
ইাকে ভরে’ উঠল। রাজপুরীর চার তোরণের নহবতে সানাইয়ের
বুক চিরে তৈরবী শুর ফুটে বেরল। কাড়া নাকাড়া দামামা মুদঙ্গ
রবাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী করতাল জয়টাক সব একসঙ্গে বেজে
উঠল। ষোড়াশালে লক্ষ ষোড়া ঘাড় বাঁকিয়ে চি’ হি’ হি’ করে’
তাদের আনন্দ জানাল, হাতৌশালে হাজার হাতী তাদের শুঁড়
আকাশে তুলে বিশাল নাদ করে’ রাজাৰ জয়ধ্বনি করে’ উঠল। রাজা
ছধের মত সাদা একটা ষোড়াৰ উপরে সোয়াৱ হলেন; সাত মহল
থেকে সাত রাণী বেরিয়ে এসে সাত দোলায় উঠলেন। রাজপুরীৰ
বিশাল সিংহস্থার খুলে গেল। রাজা সাদা ষোড়ায় ষোড়-সোয়াৱ
হ’য়ে সাত দোলায় সাত রাণীকে নিয়ে সিংহস্থার পথে বেরলেন—এমন
সময় সেই সিংহস্থার দিয়ে এক পরম মুদ্রু পূরুষ প্রবেশ করে’
রাজাকে অভিবাদন করে’ দাঁড়াল।

—ওৱে থামা থামা কে কোথায় আছিস! থামা সব কোলাহল,
সব গীতবাঞ্ছ, সব ডাক ইঁক, সব হাসি গান! ইঙ্গিতে সব থেমে
গেল—কাড়া নাকাড়া দামামা মুদঙ্গ রবাব বেণু বীণা মুরজ মুরলী
করতাল জয়টাক সব ষেন ধাতুমন্ত্রবলে বৌরব হ’য়ে গেল। নহবতে
মহবতে সানাইয়ের হৃদয়-গলান শুর কানে কানে রেশ রেখে মিশিয়ে
গেল, তুরজ সব বাঁকান-ঘাড় সোজা কৱল, হাতীৰ দল শুঁড়
আশ্ফালন বন্ধ কৱল। বাহকেৱা সাত রাণীৰ সাত দোলা কাঁধ থেকে

মাটিতে মামালে ; রাজা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। রাজাৰ আৱ বনোৎসবে যাওয়া হ'ল না।

রাজা দেখলেন পৱন সুন্দৱ পুরুষ। দীৰ্ঘ শৱীৱ, উল্লত শিৱ, তেজভৱা চোখ, স্বাস্থ্যভৱা দেহ ; গায়েৱ রঙ, সে ষেন গলিত কাঞ্চন—গায়েৱ কোনখানে টিপি দিলে ষেন আঙুলেৱ দু'পাশ দিয়ে রক্ত ছুটে বেৱবে, এমন স্বাস্থ্য। মাথা মুখ মুণ্ডিত। মাথা থেকে পা পৰ্যন্ত কোন আবনণ নেই, কেবলমাত্ৰ একটুকু কৌপীন। রাজা বিশ্বিত হ'য়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েই রাইলেন। তাৱপৰ জিজ্ঞেস কৱলেন—“মহাশয় ! আপনি কে” ?

আগস্তক উত্তৱ দিলেন—“মহারাজ ! আমি সম্যাসী”।

রাজা বললেন—“মহাশয় অজ্ঞতা কৰা কৱলেন। সম্যাসী কি ? সম্যাসী কে” ?

সম্যাসী উত্তৱ কৱলেন—“মহারাজ ! সম্যাসী সেই, যে সৎ অসৎ নাশ কৱে’ নির্বিকাৰ হয়েছে। সেই পৱন সত্য একই সত্য—সেই সত্য হচ্ছে অক্ষ। এক অক্ষই সত্য, আৱ সব মিথ্যা। মহারাজ, এই বে অগৎ দেখছেন, এ কেবল আমাদেৱ মায়াৱ স্থষ্টি—আমাদেৱ দৃষ্টিৱ বিভ্রম”।

রাজা বিশ্বিত হ'য়ে জিজ্ঞেস কৱলেন—“মহাত্মন ! এ অপত সব মিথ্যা ? এই যে সংসাৱ, এই যে আকাশ, এই যে ঘোড়া, এই বে হাতৌ—সব মিথ্যা” ?

—“স্বপ্ন, মহারাজ, স্বপ্ন, ছায়াবাজী। হাতৌ কি থেকে বলছেন ? ঘোড়া কোনটোকে দেখছেন ? আপনাৱ যদি দৃষ্টি থাকত তবে দেখতে পেতেৱ, ত হাতৌও নহ, ঘোড়াও নহ—খালি “ইলেকট্ৰনেৱ” পুঁজীভূত সমষ্টি।

ଶୁଦ୍ଧର ଫୁଲ, ଶୁଦ୍ଧଗୌ ନାରୀ, ଶୁଦ୍ଧାଦ ସୋମ—କୋଥାଯି ମହାରାଜ ?—ଆମି ଦେଖିଛି କେବଳ ଈଶ୍ଵର । ଏହି ମିଥ୍ୟାକେ ଚରମ କରେ' ମେନେ ପରମ ସତ୍ୟ ଥିକେ ଆମରା ଦୂରେ ରଯେଛି ।”

ରାଜା ଏମନ ସବ କଥା କୋନଦିନ ଶୋନେନ ନି । ତାଇ ଏ ସବ କଥା ଶୁଣେ ଉତ୍ତଳା ହଲେନ । ତାରପର କିଛୁକ୍ଷଣ ମୌନ ଥିକେ ବଲଲେନ—“ମହାଜ୍ଞନ, କ୍ଷମା କରବେନ—ଆମାର ଏଥିନ ସମୟ ନେଇ—ବସନ୍ତୋଦୟରେ ବନେ ଯେତେ ହବେ । ଏ ରାତ୍ରୋର ଏହି ରାଜବଂଶେର କୋଟି ବଛରେର ଉଦ୍‌ସବ ଏ—ଯା କୋଟି ବଛରେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଛରଟିତେ ସମ୍ପାଦିତ ହ'ଯେ ଏସେହେ । ଆମାର ପୂର୍ବେ ଯିନି ଛିଲେନ, ଆବାର ତାର ପୂର୍ବେ ଯିନି ଛିଲେନ—ଆବାର ତାର ପୂର୍ବେ ତାର ପୂର୍ବେ ତାର ପୂର୍ବେ—ଏମନି ଲକ୍ଷ ରାଜାର ଉଦ୍‌ସବେର ଅୂତି ନିଯେ ଏହି ଉଦ୍‌ସବ ଗଡ଼େ ଉଠେଛେ । ଏ ଉଦ୍‌ସବ ବନ୍ଦ କରବାର କ୍ଷମତା ଆମାର ନେଇ । ମହାଜ୍ଞନ, ରାଜପୁରୀତେ ଅବଶ୍ୟାନ କରନୁଣ୍ଟ । ଏକ ମାସ ପରେ ଉଦ୍‌ସବ ଥିକେ ଫିରେ ଏସେ ଆପନାର କଥା ଶୁନବ । ରାଜ-ପୁରୀତେ ସଥିନ ବା ପ୍ରୋଜନ ହବେ ଅନୁଭା କରବେନ—ତେବେଳେ ତା ପାଲିତ ହବେ” ।

ସମ୍ବ୍ୟାସୀ ଉତ୍ତର କରଲେନ—“ମହାରାଜ, ଆମି ସମ୍ବ୍ୟାସୀ—ଆମାର କିଛୁବିନ୍ତି ପ୍ରୋଜନ ନେଇ । ଆପନି ଉଦ୍‌ସବ ଥିକେ ଫିରେ ଆଶ୍ରମ—ଆମି ଅପେକ୍ଷା କରିବ” ।

ସମ୍ବ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ୟାୟ ମିଲେନ ।

—ଓରେ ବାଢ଼ିକରେବା ଥିମେ ରଇଲି କେନ ! ତୋରା ସବ ବୋକାର ମତ ମଣେର ମତ ଦ୍ୱାରିସେ ରଇଲି କେନ ! ବାଜା ବାଜା—ଏ ସେ ରାଜା ଶୋଭାର ଉଠେବ—ଏ ସେ ସାତ ରାଣୀର ସାତ ଦୋଳା ବାହକେବା କାହିଁ ତୁଲେ ନିଲ—ବାଜା ବାଜା । ଚୋଥେର ଏକ ପଲକ କେଲତେ ଶୋନାର ଶୀରବ-

কাঠির স্পর্শে যেন সব জেগে উঠল—কাড়া নাকাড়া কাঁসি দামামা রবাব
বেণু বীণা মূরুজ মুরুলী মুদঙ্গ করুতাল অয়টাক—সব বেঞ্জে উঠল কাড়া
নাকাড়া ক—রঝুৰ করে' উঠল, কাঁসি খন্খন্খ করে' উঠল, দামামা ডিম্
ডিম্ করে' উঠল, মুদঙ্গ দম্দম দম্দম করে' উঠল, করুতাল ঝম্ঝম করে'
উঠল, বেণু বীণা রবাব নানা মুচ্ছ'না তুলল, অয়টাক ঢক্কা নিনাদ তুলল।
লক্ষ ঘোড়া আবার ঘাড় বাঁকিয়ে মাটির গায়ে খুর ঠুকতে প্রাচির
গায়ে লাগল, হাজাৰ হাতী শুঁড় ছলিয়ে তাদেৱ চাষ্টল্য আনিয়ে দিল—
রাজা সাদা ঘোড়ায় সোয়াৱ হ'য়ে সাত দোলাতে সাত রাণীকে নিয়ে
বনোৎসবে যাত্রা কৱলেন। রাজা সঙ্গীসহচৰ নিয়ে সিংহদৰজা দিয়ে
প্রশংস রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন;—রাজপুরীৰ চার তোরণে নহবতে
নহবতে সানইয়ে সানাইয়ে ঘুৱে ঘুৱে ফিরে ফিরে বসন্ত-বাহারে সুন
উঠতে লাগল—

“গক্ষে উদাস হাওয়াৱ মত
উড়ে তোমাৱ উভৰৌ,
কৰ্ণে তোমাৱ হৃষ্ণচূড়াৱ মঞ্জৰৌ।”

রাজা বনে এলেন। রাজাৰ পিছনে সাত দোলায় সাত রাণী,
তাৰ পিছনে লক্ষ ঘোড়া, তাৰ পিছনে হাজাৰ হাতী, তাৰ পিছনে
বাঢ়ভাণ্ড দাসদাসী অনুচৰ নিয়ে রাজা বনে এলেন, বসন্তোৎসব
কৱবাৰ অষ্টে।

বনেৱ অপূৰ্ব শোভা। বনেৱ বুক একেবাৱে পুৱে উঠেছে—
তালে তালে শালে শিয়ুলে আমে আমে বকুলে পারলে অশোকে
অশৰ্থে একেবাৱে উঠে' উঠেছে। লক্ষ রকমেৱ লক্ষ গাছ জাবেৱ

ঘন পাতার চামড় ঝুলিয়ে দিয়েছে ; কেবল সবুজ আৱ সবুজ আৱ
সবুজ—চোখ-জুড়োন সবুজে সবুজে একেবাৱে চারদিক অড়িয়ে গেছে,
চারিয়ে পেছে—সেই সবুজের বুকে বুকে আবাৱ রঙেৰ টেউ । সামা
লাল হল্দে গোলাপী বেগুনে নীল অৱদ—একেবাৱে রঙে রঙে
য়ত্বাহাৱ । ডাৱই মাখে আবাৱ মত বাতাসেৰ মাতামাতি, বাতাসে
বনে নতুন কৱে' পৱিচয়, নতুন কৱে' চিৱদিনেৰ প্ৰশ্নোত্তৰ । বাতাস
ছুটতে ছুটতে একখানে থমকে দাঢ়িয়ে যায়—ঘাড় বাঁকিয়ে প্ৰশ্ন
বৰ্ষণ কৱতে থাকে—

কে গো তুমি ? আমি বকুল !

কে গো তুমি ? আমি পাঙ্গল !

তোমৱা কেবা ? আমৱা আমেৱ মুকুল গো—

আবাৱ সেখান থেকে ছুট দিয়ে আৱ একখানে থমকে দাঢ়িয়ে
যায়—আবাৱ জিজেস কৱতে লেগে যায়—

তুমি কে গো ? আমি শিমুল !

তুমি কে গো ? কামিনী-ফুল !

তোমৱা কেবা ? আমৱা নবীন পাতা গো—

আবাৱ দেখান থেকে চঢ় কৱে' ছুট দিয়ে কোন এক অশ্ব
গাছেৱ আগডালে উঠে দোল থেতে থেতে গান ধৱে' দেয়—

“এই কথাটাই ছিলেম ভুলে

মিলুব আবাৱ সবাৱ সাধে

কাজনেৱ এই কুলে ফুলে ।”

“অশোকবনে আমার হিমা
 নৃতন পাতায় উঠ'বে জিমা,
 বুকের মাতন টুট'বে বাঁধন
 ঘোবনেরি কুলে কুলে,
 ফাঞ্চনের এই ফুলে ফুলে ।”

রাজা সম্মানীর কথা একেবারে ভুলে গেলেন। লক্ষ গাছের লক্ষ ডালে লক্ষ দোলনা চড়ল—মহানন্দে বনোৎসব আরম্ভ হল।

বনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরিচয় ত আজকার নয়, একদিনের নয় ; ও পরিচয় সেই আদিম কালেরও আগে হ'তে—সেই কাল, যে-কালে বনের মানুষ ছিল বন-মানুষ। বনের সবুজকে যখন মানুষ হৃদয় দিয়ে আবিক্ষার করে, তখন ত বন কেবল বনই নয়—বনের চাইতেও সে অনেকখানি বেশি। মানুষের হৃদয়ের রঙ যে তখন বনের সবুজকে উচ্ছ্বল করে’ তোলে। সে তখন নিজীব নয়, মুক নয়—তখন সে হাসে, খেলে, গান গায়। ওই গানই ত চান্দনী রাতে হাল্কা হাতে আকাশের গায়ে ঝোঁস্বার আলপনা টানতে টানতে বিদ্রোহীর পরীরা বেণু বনে বনে শুনতে পায়—

“ওগো দধিণ হাওয়া, পধিক হাওয়া
 দোহল দোলায় দাও দুলিয়ে !
 নৃতন পাতার পুলক-ছাওয়া,
 পরশ-খানি দাও বুলিয়ে ।

আমি পথের ধারের ব্যাকুল-বেণু,
 হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,”

“আহা এস আমাৰ শাখায় শাখায়
প্ৰাণেৱ গানেৱ চেউ তুলিয়ে ।”

ওই গানই ত অপ্সৱীৱা তাৰা-জাগা উষাৱ তাদেৱ সাৱা নিশাৱ
অভিসাৱ থেকে ফিৱাৰ পথে ঘূমন্ত চোখে ফুলন্ত গাছে গাছে
শুনতে পায়—

“ওগো নদী আপন বেগে
পাগল পাৱা,
আমি স্তৰ ঠাপাৱ তৰু
গন্ধভৱে তন্ত্রাহাৱা ।

আমি সদা অচল ধাকি,
গভৌৱ চলা গোপন রাখি,
আমাৱ চলা নবীন পাতায়,
আমাৱ চলা ফুলেৱ ধাৱা ।”

ওই গানেৱ সঙ্গে যথন মানুষও গান গাইতে শেখে তথন ত সে
মৃতুকেই বড় বলে মানতে চায় না। কিন্তু যাক সে কথা !

এক মাস পৱে রাজা বন থেকে বসন্তোৎসব শেষ কৱে’ রাজ-
ধানীতে কিৱে এলেন। রাজপুরীতে এসেই মন্দীকে বিজেস কৱলেন
—“মন্দী সন্ন্যাসী কোথায় ? তাঁৰ কাছে আমায় নিয়ে চলুন।” মন্দী
রাজাকে সন্ন্যাসীৰ কাছে নিয়ে গেলেন।

রাজা সন্ন্যাসীকে দেখে একেবাৱে চমকে উঠলেন ! এই সেই
সন্ন্যাসী যাকে তিনি মাত্ৰ এক মাস আগে দেখেছিলেন। কোথায় সে

নধন তমু—উন্নত শির তেজভৱা চোখ, স্বাস্থ্যভৱা দেহ, কাঞ্চনের
মত বর্ণ। সে মুখে যেন কে কালি মেখে দিয়েছে—সে চোখে যেন
কে কুক্ষুটিকা ভরে' দিয়েছে—প্রশস্ত ললাটে চামড়া কুঞ্চিত হয়ে
গিয়েছে—সারা শরীরটা একেবারে ঝুনো নারকেলের মত চিমসে
হ'য়ে উঠেছে। রাজা বিশ্বয় প্রকাশ করে' সন্ন্যাসীকে জিজেন
করলেন—“মহাত্মন, আপনার একি পরিবর্তন”?

সন্ন্যাসী তাঁর অত্যন্ত শুক ঠোটে একটু হাসি এনে ঘৃতকঠো উত্তর
দিলেন—“মহারাজ, গত একমাস আমি অনাহারে আছি”।

ক্রোধে রাজাৰ চোখ ছুটো জলে উঠল—শরীর ধৰ্ ধৰ্ করে'
কেঁপে উঠল—বুকেৰ উপৰ রত্নরাঙ্গি ঝক্ঝক করে' জেগে উঠল—
কোষেৰ অসি ঝন্ঝন্ধ করে' বেজে উঠল—রাজা মন্ত্রীৰ দিকে চোখ
ফিরিয়ে তৌক্ষু দৃষ্টিতে কঠোৱ কঠো বললেন—“এ কি ব্যাপার মন্ত্রী?
আমিৰ যে রাজ্ঞে কোনদিন সামান্য একটি পিংপড়ে পর্যান্ত অভুক্ত
থাকে না, মেই রাজ্ঞে রাজাৰ অতিথি হয়ে রাজপুরীতে অবস্থান
করে' একমাস কাল অনাহারে!—মন্ত্রী এৰ অৰ্থ কি”? ক্রোধে
রাজাৰ বাক রুক্ষ হয়ে এল, মুখে আৱ কথা সৱল না।

মন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে প্রশস্ত কঠো উত্তর কৰলেন—“মহারাজ এ
দাসেৰ অপরাধ মার্জনা কৰবেন। কিন্তু মহারাজ, বনোৎসবে যাবাৰ
সময় এ দাস সন্ন্যাসীৰ নিজ মুখ থেকেই শুনেছিল যে তাঁৰ কিছুৱই
প্ৰয়োজন নেই—তাই এ দাস তাঁৰ আহাৰেৰ কোন আয়োজন কৰে
নি। সন্ন্যাসীও কোন অচুক্ষা কৰেন নি”।

রাজা সন্ন্যাসীৰ দিকে ফিরে বললেন—“মহাত্মন, আপনার
আহাৰ্য কি”?

সন্মাসী উত্তর দিলেন—“মহারাজ, আমি যখন কুক্ষবর্ষের রাজপ্রাসাদে অবস্থান করছিলেম, তখন প্রতিদিন রাজভাণ্ডারী দশসের করে’ দুধ আমার আশ্রমে রেখে যেত”।

রাজা মন্ত্রীকে সম্মেধন করে’ বললেন—“মন্ত্রী, রাজগোশালায় শ্রেষ্ঠ যে গাড়ী তিনটি রয়েছে সেই গাড়ী তিনটি সন্মাসীর সেবায় নিযুক্ত হোক”।

—“যে আজ্ঞা মহারাজ”।

রাজা সন্তুষ্ট ও ব্যথিত অস্তঃকরণে অস্তঃপূরে চলে গেলেন।

(২)

প্রশস্ত রাজসভা। রাজা সভা করে’ বসে’ আছেন। ঝুপোর ঝালুর লাগান চুনি পান্নার চুম্বকি বসান চন্দ্রাতপ—তারই নীচে সোনার ঝালুর লাগান প্রশস্ত রাজছত্র—তারই নীচে সুবর্ণনির্মিত রত্নথচিত রাজসিংহাসন। রাজসিংহাসনে রাজা—মাথায় তাঁর রাজমুকুট, হাতে তাঁর রাজদণ্ড। রাজমুকুটে কত কত মণি মরকত প্রবাল—তাদের বুকে বুকে আলো প্রবেশ করে’ আবার ছুঁচের মত সৃষ্টি আর বিদ্যুতের মত ভীক্ষ্ণ হ’য়ে বেরিয়ে এসে চারদিকে ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। রাজাকে অর্জুনুভাকারে ঘিরে কত কত পাত্র মিত্র অমাত্য সভাসদ, কত কত বৈদেশিক রাজ-প্রতিনিধি। সভাসদদের উষ্ণৌষের রত্নরাজিতে আলো প্রতিফলিত হ’য়ে সভামণ্ডপ চক চক ঝক ঝক করছে, দ্বারে দ্বারে সঢ়ফোটা ফুলের মালা খোলানো, তারই মাঝে মাঝে আবার চোখ-জুড়োন আম্ব-পল্লবের মঙ্গল ইঙ্গিত। রাজসভা স্তুক নৌরব—একটুকু কোনখানে নড়াচড়া নেই। এ যেন

সত্ত্বিকার রাজসভা নয়—এরা যেন সত্ত্বিকারের মানুষ নয়। এ-যেন একখানা নিপুণ তুলিতে পটে-ঝাঁকা ছবি।

ধীরে ধীরে সভামণ্ডপের বাইরে মন্দিরার ঠিনি ঠিনি মিষ্টি শব্দ উঠল—তারপর তারই সঙ্গে সঙ্গে বৈতালিক-কর্ণে রাজাৰ মঙ্গলাচৱণ গীত উঠল। একবার, দু'বার তিনবার ফিরে ফিরে বৈতালিকেৱা রাজাৰ গুণগান কৰে’ রাজাৰ জয়ধ্বনি কৰে’ উঠল, এমন সময়ে সভামণ্ডপের বৃহৎ দ্বাৰ দিয়ে ধীৱ পাদবিক্ষেপে উন্নত-শিরে সন্মানী রাজসভায় প্ৰবেশ কৱলেন।

চকিতে রাজসভা চকল হ'য়ে উঠল। চক্ষেৱ পলকে রাজা সিংহাসন ত্যাগ কৰে’ উঠে দাঢ়ালেন। রাজাৰ পাশে রাজমন্ত্ৰী উঠে দাঢ়ালেন, অমাত্যৱা উঠে দাঢ়াল, পাত্ৰ মিত্ৰৱা উঠে দাঢ়াল, সভাসদেৱা উঠে দাঢ়াল, বৈদেশিক রাজ-প্ৰতিনিধিৱা উঠে দাঢ়াল। সন্মানী তাঁৰ আজামুল্লিখ অনাৰুত বাহু উন্তেলিন কৰে’ সবাৱ উদ্দেশে আশীৰ্বাদ বাণী উচ্চারণ কৱলেন। রাজা সিংহাসন থেকে নেমে এগিয়ে এসে সন্মানীকে অভ্যৰ্থনা কৱলেন, তাঁকে নিয়ে গিয়ে আপনাৰ সিংহাসনেৱ দক্ষিণপার্শ্বেৱ আসনে বসায়ে রাজা সিংহাসনে বসলেন, পাত্ৰমিত্ৰ আমাত্য সবাই তথন নিজ নিজ আসন গ্ৰহণ কৱল।

তারপৰ রাজা মন্ত্ৰীকে সন্মোধন কৰে’ জিজ্ঞাসা কৱলেন—“মন্ত্ৰী রাজ্যৱ কুশল ত”?

—“মহাৱাজ—” মন্ত্ৰীৰ মুখেৱ কথা মুখেই থেকে গেল। মন্ত্ৰীৰ কথা কেড়ে নিয়ে সন্মানী উত্তৱ কৱলেন—“মহাৱাজ কুশল কোথায়? যেখানে রাতদিন ধৰে’ মিথ্যাৱ পূজো চলছে—আগা থেকে গোড় পৰ্যন্ত অনৃতেৱ লৌলা চলছে—সেইখানে কুশল? মৰুভূমিৰ তপ্ত

বালি নিউড়িয়ে সলিল-বিন্দু মিলবে ? বাসনাৰ বহিৱ মাঝে স্বিক্ষিতাৰ আশা ? বিষবৃক্ষ কি চন্দন তৰু হয় ? পকে ডুবে কি রত্ন আহৰণ কৱা যায় ? মহারাজ কুশল নেই—অনৃতেৰ ধৰংস না কৱতে পাইলে কুশল নেই”।

রাজসভা বিস্থিত হ'য়ে প্ৰায় কৃষ্ণ-শাসে সম্মানীৰ কথা শুনতে লাগল। কাৰো চোখে পলক পড়ল না। কে ইনি ? মানুষ,—না স্বয়ং ভগবান মনুষ্যদেহ ধাৰণ কৱে’ মৰ্ত্ত্যে এসেছেন !

শুধু মন্ত্ৰী তাঁৰ মাথা-ভৱা পাকা চুল হেলিয়ে স-সন্তুষ্টে সম্মানীকে সম্মোধন কৱে’ বললেন—“মহাভুন ! আমি দার্শনিক নহি, সুতৰাং যা আমি দৰ্শন কৱি তাকে অদৃশ্য বলে মানতে পাৰি নে। রাজকাৰ্যে আমাৰ চুল পেকে গেল, মানুষেৰ শুখ দুঃখেৰ সঙ্গে আমাৰ পৱিচয় আছে। মহাভুন ! সেই সাহসেই আজ আমি বলতে দিধা কৱৱ না যে রাজ্যেৰ কুশল”—তাৰপৰ রাজাৰ দিকে ফিৱে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—“মহারাজ রাজ্যেৰ সৰ্ববত্ত কুশল। রাজ্যে অপৰ্যাপ্ত শস্ত্ৰ উৎপন্ন হয়েছে, প্ৰজাদেৱ ঘৰে ঘৰে প্ৰচুৰ অম্ব, রাজা জীৱনগুপ্তেৰ নামাঙ্কিত পতাকা উড়িয়ে বানিজ্যাতৱণীৰ বহুৰ পৃথিবীৰ সপ্ত-সমুদ্ৰেৰ তৱজ্জমালাৰ পৱিচয় নিছে, শিল্পকলাৰ নব নব সৃষ্টিতে সমাজেৰ মনেৱ সৌন্দৰ্যেৰ ও প্ৰাণেৱ সজীবতাৰ চিহ্ন ফুটে উঠছে, সাহিত্য-দৰ্শন-বিজ্ঞানেৰ আলোচনায় সমাজ-জীৱন সম্পদশালী উদাৰ হ'য়ে উঠছে। মহারাজ ! দেশেৱ এক প্ৰাক্ত খেকে আৱ এক প্ৰাক্ত পৰ্যাপ্ত আনন্দময়। নৱনাৱীৰ প্ৰাণেৱ আনন্দে রাজ্যেৰ আকাশ বাতাস আকুলিত। সেই আনন্দই ত উন্নত সৌধ-ঘৰো নগৰীতে নগৰীতে, পাৰ্থী-ডাকা ছায়ায় ঢাকা পল্লীতে পল্লীতে পুলক ছড়িয়ে আনন্দ-আলম্ব গড়ে’

তুলেছে—সেই আনন্দের আলো লেগেই ত বৃক্ষবাটিকায় তরঞ্জেণী
সতেজ হ'য়ে আকাশের পানে আপনাদের মাথা নির্ভয়ে তুলে দেয়,
সেই আনন্দেই ত সহস্র কল্লালিনী সহজ গতি-ভঙ্গিমায় পৃথিবীর বুক
কেটে কেটে শামল ক্ষেত্রে আপনার স্নেহরস অপর্যাপ্ত করে’ বিলিয়ে
সাগরাভিসারিক। মহারাজ ! রাজ্যের সর্বত্র কুশল। রাজরাজেশ্বর
জীবনগুণের রাজ্যে সারা বর্ষ ধরে’ বসন্তোৎসব চলছে”।

সন্ধ্যাসী ব্যথিত কর্ণে বললেন—“মহারাজ, মহারাজ ! আমরা কেবলই
আল বুন্ধি—উর্ণনাডের মত আমাদের অন্তর থেকে আকাঙ্ক্ষার
সূক্ষ্ম সূত্রে বের করে’ কেবলই স্বপ্নের আল বুন্ধি। তারই উপরে
আবার অজ্ঞানের তুলি চালিয়ে হাওয়ার মত অদৃশ্য রঙ দিয়ে আকাশ-
কুশম আঁকছি—এর শেষ কোথায় মহারাজ ? কিসে এর সমাপ্তি
মহারাজ ? এর শেষ অব্যতে নয়—বিষে, আনন্দে নয়—হতাশায়,
হাসিতে নয়—অশ্রাগতে ; মহারাজ ! এর শেষ সংবাদ মৃত্যু। মহারাজ,
ইলেকট্রনের মাঝা ধৰ্ম করতে’ না পারলে অব্যতের সাক্ষাৎ
মিলবে না”।

মন্ত্রী বিনোদ কর্ণে বললেন—“মহাত্মন ! এর শেষ সংবাদ মৃত্যু
হোক, কিন্তু সেই মৃত্যুকেই বড় করে’ দেখব কেন ? আমার বয়েস
আশী পেরিয়ে গেছে, হয়ত’ কাল মৃত্যু হবে। মৃত্যুর পরপারে কি
আছে ?—হয় অনন্ত জীবন, নয় বিরাট শূন্য ; কিন্তু আমার ঐ আশী
বৎসরের জীবনকে ছোট করে’ এক মুহূর্তের মৃত্যুকেই বড় করে’ দেখব
কেন ? অনন্ত কালের কোলে আশী বছরও যে আমি ছিলেম এইটেই
যে আমার গোরব”।

সন্ধ্যাসী মন্ত্রীর কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠলেন—“কে

ছিল, কি ছিল মন্ত্রী?—ছিল শুধু স্বপ্নের বোনা সূক্ষ্ম জাল—ছিল শুধু আকাঙ্ক্ষার বোনা শুল জঞ্চাল—ছিল না, যা চরম ও পরম, যা অক্ষয় ও অব্যয়, যা অবিনশ্বর ও ঈশ্বর”—কথা বলতে বলতে সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ দু'টি উৎসাহে উদ্বীপিত হ'য়ে উঠল, তাঁর মুখমণ্ডল অনিষ্ট সুন্দর জ্যোতিতে মণ্ডিত হয়ে গেল। আজানুলস্থিত দুই বাহু তুলে সমস্ত রাজসভার দিকে তাঁর মহাবৃজ্জল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে’ উচ্চেস্থরে বলে উঠলেন—“বল একবার খ্রস্ত সত্য, জগত মিথ্যা”। তাঁর সে কণ্ঠস্থরে সভামণ্ডপের বিরাট কক্ষ শুম্ভ শুম্ভ করে’ উঠল, দ্বারে দ্বারে সদ্ব-ফোটা ফুলের মালা সব কেঁপে উঠল, রাজছত্রের সোনার ঝালর নড়ে উঠল, চন্দ্রাতপের চুনি পান্নার চুম্বকি সব ছল্ ছল্ করে’ উঠল, আর রাজমুকুটের মধ্যমণি মহামৱকতটা যেন নিঃশব্দে একটুকু হেসে উঠল, রাজসভার কেউ সন্ন্যাসীর জ্যোতির্মণ্ডিত মুখমণ্ডলের দিক থেকে আর চোখ ফিরাতে পারলে না—যেন মন্ত্রমুক্তের মত সমস্ত রাজসভা সমস্তে ধ্বনি করে’ উঠল—“খ্রস্ত সত্য, জগত মিথ্যা”।

সন্ন্যাসী রাজ-সিংহসনের দিকে ফিরে রাজাকে সম্মোধন করে’ বললেন—“মহারাজ! আমি আপনার রাজ্যে ধর্ম প্রচার করতে চাই, অপনার প্রজাবৃন্দকে সত্ত্বের পথে অমৃতের পথে অমরত্বের পথে নিয়ে বেতে চাই—অনুমতি দিন”।

রাজা মন্ত্রীকে সম্মোধন করে’ বললেন—“মন্ত্রী, শিশ্রান্দীর তৌরে সন্ন্যাসীর অশ্ব বৃহৎ মঠ নির্মিত হোক। আর রাজকোষ থেকে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা সন্ন্যাসীকে দক্ষিণা দেওয়া হোক”।

পক্ষেশোবৃত মন্ত্রক অবনত করে’ মন্ত্রী বললেন—“ষে আজ্ঞা মহারাজ”।

(৩)

শিশ্রা অশ্রাস্ত গতিতে ছুটে চলেছে। সারা দিনমানে তার অস্ত্রিম
বুক রোদে চিকমিক—চান্দনীরাতে তার তরল হৃদয় জ্যোছনায়
ঝিকঝিক, দিন নেই, রাত নেই, শিশ্রা কলকল ছল ছল করে’
গান গেয়ে গেয়ে ব’য়ে চলেছে। স্তৰ্ক দুপুর বেলা যখন তমাল-
তালীর বনে বনে প্রাণ-উদাসকরা ঘুঘুর ডাক থেকে থেকে জেগে
ওঠে, তখন সেই নিষ্ঠকতার মাঝে শিশ্রার দু'তীরের ঘন দেবদান্ত
বনেরা তাদের মাথা হেলিয়ে শিশ্রাকে বুঝি জিজ্ঞেস করে— ওগো
শিশ্রা, তুমি গান গেয়ে গেয়ে কোথায় চলেছ?—আর শিশ্রা
তার উত্তর দেয়—

গান গাহিয়া চলছি আমি সেই দেশেতে যেথায় গো
আকাশ গায়ে সাগর শুয়ে উর্ধ্মালায় খেলায় গো,
অসীম নভে অগাধ জল
করছে সদাই ছল ছল
চলছি আমি সেই দেশেতে গান গেয়ে মোর বীণায় গো।

চলছি আমি সেই দেশেতে দুলতে দুনীল দোলাতে
চলছি আমি অস্তিমেতে পারব খেলায় ভুলাতে
আমার গীতি আমার গান,
স্বিন্দ করি হৃদয় প্রাণ
গগন তলে সিঙ্গুরুকে পারব কোথায় মিলাতে।

চলছি আমি সেই সুনৌলে যেথায় সবই পুলক গো
 গভীর জলের শান্তশীতল অসৌম নভের আলোক গো,
 আলোক যেথায় পুলক যেথায়
 শব্দ যত স্তুত যেথায়
 লক্ষ যেথায় পঞ্চ গীতে এই নিঃসের চালক গো ।

গান্টী আমায় শিখিয়েছে বিশ্পত্তির কল্পনা
 এই গানেতেই ধরিত্ব ও রাত্রি দিবস মগনা
 সুন্দর গানে সাঙ্গ গানে
 সূক্ষ্ম লীলার সঙ্গ গানে
 এই গানই গো সজ্জামহীর নইলে মহী নগনা ।

ওই গানেতে উঠ'বে জাগি আছিস্ যাবা ঘুমায়ে
 মুক্তি বিহীন মর্মহীনের ধর্মখানি জড়ায়ে,
 বক্ত হয়ে কুক্ত ঘরে
 মলিন মুখে আঁখির 'পরে
 অবিশ্বাসীর হাস্তুকু দিবস যামি ছড়ায়ে ।

উঠ'রে জাগি আলোর মাকে জীবন পথের আনন্দে,
 মর্মতলের দেবতা সেই মোহন মধু স্ব-ছন্দে,
 নৃত্যে তারি তালে তালে
 হাস্তে তারি ছল ছলে,
 উঠ'বে জাগি লাস্তে তারি বর্ণে গীতে গঙ্কে ।

উঠ'রে জাগি উষায় যথন রক্ত রবি কিরণে,
 পৃথী তলের দূর্বারাশি অড়ায় হিরণ বরণে,
 উঠ'রে জাগি ক্লান্ত সাঁবে
 দিনটী যথন রক্ত সাজে
 অঙ্ককারে ধরে যথন লুটায় মহীর চরণে ।

উঠ'রে জাগি জীবন পথে উঠ'রে জাগি মরণে,
 উঠ'রে জাগি মিলতে হবে বিশ্বপতির চরণে,
 উঠ'রে জাগি—চুটতে হবে
 উঠ'রে জাগি—লুটতে হবে
 শিপ্রা যেমন রঞ্জে নাচি' লুটায় সাগর-চরণে ।

এমনি করে' শিপ্রা ছুটে চলেছে—শক্ষ পল্লোকে বিরে ঘিরে, হাজাৰ
 নগৰ নগৰীকে বেড়ে বেড়ে নেচে নেচে দুলে দুলে ফুলে ফুলে ফেনা
 ছড়িয়ে ছড়িয়ে জঙ্গাল কুড়িয়ে কুড়িয়ে অক্লান্ত গতিতে ব'য়ে ব'য়ে
 চলেছে—আপন প্রাণের নিম্ফতা কোমলতা শীতলতা অপর্যাপ্ত স্নেহস
 ধরিত্বীর রক্ষে রক্ষে প্রবেশ কৱিয়ে দিয়ে এমনি করেই শিপ্রা সাগর-
 ভিসারিকা। সেই শিপ্রারই তৌরে এক বিৱাট মঠ নির্মিত হল—
 রাজ-আজ্ঞায়—সন্ধ্যাসীর জন্ম ।

বর্মা শেষ হ'য়ে গেল। শৱতেৱ সোনাৱ রঙ জগত ভৱে' ফুটে
 উঠল। সন্ধ্যাসী তাঁৰ মঠে যাবাৰ জন্মে রাজপুরী জ্যাগ করে' রাজ-
 পথে বেঝলেন। রাজপথে অগণ্য লোকেৱ সাৱি চলেছে—রাজপথেৱ
 পাশে পাশে অসংখ্য দোকানে বেচা কেনা চলছে। সন্ধ্যাসীকে যে
 দেখল সেই মুক্ত হ'য়ে চেয়ে রাইল। পথিক পথ ভুলে গেল—দোকানে

ক্রেতা বিক্রেতারা বেচা কেনা ভুলল—নাগরিকদের গৃহে গৃহে বক্ত-
জানালা সব খুলে গেল—তা দিয়ে অসংখ্য কুলাঙ্গনারা পলক হীন
চোখে সন্ন্যাসীকে দেখতে লাগল। কত কিশোরী তাঁকে মনে মনে
পতিষ্ঠে বরণ করল—কত প্রোঢ়া বৃক্ষ তাঁকে পুত্র বলে বাঞ্ছা
করল—সন্ন্যাসীর কোন দিকে অক্ষেপ নেই—তিনি সোজা চলেছেন
আপনার গন্তব্য স্থানে। সবাই জিজেস করে—কে ইনি ? মানুষের
মুখে মুখে কথার রঙ চড়ে। কেমন করে' রটে গেল যে কিছু
দিন আগে স্বয়ং মহাদেব রাজাকে স্বপ্নে দেখ দেন—দেখা দিয়ে
বলেন যে তিনি শীঘ্র মনুষ্য দেহ ধারণ করে' তার রাজ্য উপস্থিত
হবেন—এই সন্ন্যাসীই সেই মহাদেব। সন্ন্যাসী মঠে পৌঁছিতে না
পৌঁছিতে মঠের চারিদিক লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল—সেদিন
দিন ফুরুতে না ফুরুতেই সন্ন্যাসী লক্ষ শিষ্য করলেন—মঠের চূড়া
থেকে এক প্রকাণ্ড গৈরিক পতাকা উড়ল। বাতামে সেই গৈরিক
পতাকা সারা দিনমানে পত্ পত্ করে উড়ে উড়ে যেন বলতে লাগল—
“মি—ত্থ্যা”—“মি—তথ্যা”।

সন্ন্যাসীর লক্ষ শিষ্য পঞ্জপালের মত সমস্ত শাকস্বীপে ছড়িয়ে
পড়ল—ধর্ম প্রচারের জন্যে। ধনীর অট্টালিকায়, বণিকের বাণিজ্যালয়ে,
গৃহস্থের গৃহে, দরিদ্রের কুটিরে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—“ত্রুক্ষ সত্য
জগত মিথ্যা।” নগর নগরীর কোলাহলের মাঝে, শাস্তি পল্লীর
নীরবতার মাঝে, সবুজ বনের শ্বামলতার মাঝে কেবল ত্রি রব ধ্বনিত
হতে লাগল—“ত্রুক্ষ সত্য জগত মিথ্যা।” শাকস্বীপের এক প্রান্ত
থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যেন গৈরিক হ'য়ে উঠল—রোদের রঙ
যেন গৈরিক রেণুতে ভরে' উঠল—বাতাস যেন গৈরিক গঙ্কে পূর্ণ

হয়ে গেল—নীল আকাশ যেন গৈরিক রাগিণীতে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল—“ক্রক্ষ সত্য জগৎ মিথ্যা”। ওরে কি আছে?—কিছুই নেই, আমি নেই, তুমি নেই, জগত নেই—কিছুই নেই। ওরে এসব কিম্বের অন্তে—এই পরিশ্রম, এই কর্ম এই ভোগ? থামাও থামাও সব মুখের দল যদি মঙ্গল চাও। এমনি করেই দিন কাটতে লাগল। দিনে দিনে মাস কাটল—মাসে মাসে বছর কাটল—বছরে বছরে কত বছর কেটে গেল—ধৌরে ধৌরে নর নারীর প্রাণের অস্থি শিথিল হ'য়ে এল—ক্রমে ক্রমে জীবনের অযৃত স্বাদহীন হ'য়ে উঠল—এ স্থিতির শব্দ গুরু কল্প রস অর্থহীন বোৰা হ'য়ে পড়ল—ধনীর ভোগসামর্থ্য লয় পেয়ে গেল—মানুষের কর্মসামর্থ্য বাজ পড়ল—বণিকের বাণিজ্যালয় বিশৃঙ্খলায় ভৱে’ উঠল—কৃষকের লাজলের মুটো ঢিলে হ'য়ে পড়ল। সবার মুখেই ত্রি এক বাণী—জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। কত কত ধনীর অট্টালিকায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল—কত কত বণিকের বাণিজ্য তরণী বিনা ঝড়ে মারা পড়ল—কত কত গৃহস্থের বাসস্থান অমনি অমনি জলে’ উঠল—ক্ষেতে ক্ষেতে হালের বলদ অমনি অমনি মারা পড়ল। মানুষের অস্বীকারে সব অকৃতার্থ হ'য়ে উঠল। মন্ত্রী গিয়ে রাজসমৌপে নিবেদন করলেন—“মহারাজ রাজ্যের ভৌষণ অমঙ্গল উপস্থিতি। দুর্ভিক্ষ আসন্ন।”

“দুর্ভিক্ষ আসন্ন? সে কি মন্ত্রী! দুর্ভিক্ষ আসন্ন! আমার রাজ্য—যে রাজ্য প্রতি বৎসর তিন বৎসরের উপযুক্ত শস্তি উৎপন্ন হয়—সেই রাজ্যে দুর্ভিক্ষ! মন্ত্রী, আপনার ভুল হ'য়ে থাকবে—আপনার অবসর গ্রহণের কাল উপস্থিতি বুঝি।”

চুঁধের হাসি হেসে মন্ত্রী উত্তর দিলেন—“আমার ভুল হয় নি—

আমি সত্য সংবাদই রাজ সমীপে নিবেদন করছি। রাজ্যে প্রকৃতই দুর্ভিক্ষ আসম। দেশের নর নারীরা জীবনে আস্থা হারিয়েছে, জীবনের আনন্দকে তাড়িয়েছে। কৃষক আর তেমন উৎসাহে তেমন করে, লাঙল ধরে না—তার লাঙলের মুঠো শুখ হ'য়ে আসে, মাতা ধরিত্বাকে আর সে তেমন চোখে দেখে না, সে আজ তার কাছে প্রাণহীন অস্তিত্ব-হীন, এই অবস্থার বিনিময়ে সে আগে যে শস্ত পেত তার দশমাংশের এক অংশ পায়, বাণিজ্যের শিল্পের অবনতি ঘটেছে, বণিকের চোখে এ জগৎটা তার কারাগার, অস্ত্রখের জায়গা অঙ্গলের স্থান, তার বাণিজ্য-তরণী আজ কেবল কাঠের ভেলা, তার মধ্যে মানুষের প্রাণ নেই মন নেই আনন্দ নেই। বণিকের প্রাণের পুলকে আজ সপ্তসিদ্ধুর তরঙ্গমালা কল্ কল্ ছল্ ছল্ করে না, তাঁর জীবনের অবস্থায় তার বিশাল বুক আজ ফুলে ফুলে উঠেছে, তার কল্ কল্ ছল্ ছল্ অট্টহাসিতে পরিণত হয়েছে, তাই তার বাণিজ্য-তরণী বিনা ঝড়ে মারা পড়ে। দার্শনিকেরা সূর্যের আলোকে নাকচ করে দিয়ে অমাবস্যার অঙ্ককারীরে বুক চিরে স্বর্গের জ্যোতি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টায় ব্যস্ত। সাহিত্যে কেবল পরলোকে বাঁচবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মহারাজ—”

রাজা বিচলিত হলেন, মন্ত্রীর কথা শেষ না হতেই বললেন, “মন্ত্রী আমি পরিদর্শনে বের হব, প্রস্তুত হও।”

রাজা ও মন্ত্রী দু’জনে ছদ্মবেশে রাজপুরীর শুপ্তভাবে দিয়ে রাজপথে বেরিয়ে পড়লেন।

রাজা ও মন্ত্রী রাজপথ ধরে’ চলতে লাগলেন। রাজপথের দু’ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে, রাস্তায় নরনারী চলছে। সব ঘেন লক্ষ্মীহীন শ্রীহীন। রাস্তার দু’ধারের সৌধমালার ভিতর থেকে

যেন একটা নিঃশব্দ ক্রন্দনের রোল ঘুরে ঘুরে উঠে আকাশে মিশে যাচ্ছে, নর-নারীরা সব যেন অর্কম্ভুত, তাদের সে উৎসাহদীপ্ত আনন্দেই, তড়িতেজ্জ্বল চোখ নেই, যেন নিতান্ত অনিচ্ছাস্ত্রে আপনাদের নিরেট দেহটাকে বোঝার মত ব'য়ে নিয়ে চলেছে আর ভাবছে কবে এর হাত থেকে উক্তার পাবে। দোকানে দোকানে বেচা কেনা চলছে, যেন কলের দোকানে কলের মানুষেরা কলের সাহায্যে হাত পা নাড়ছে, চারিদিক ঘৃত্যর ছায়াতে সব কদর্য হ'য়ে উঠেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা—যেন তার মধ্যে বাস করছে সব “মন্ত্র” রা, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাণিজ্যালয়—যেন সেখানে বসে’ রয়েছে সব প্রেতাঞ্চারা, বাহির থেকে সেই সবই আছে, নেই কেবল সেই ভিতরের প্রাণের তড়িৎ—যে তড়িতের স্পর্শে সব সুন্দর হ'য়ে উঠবে সার্থক হ'য়ে উঠবে, অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। রাজা সব দেখলেন, তাঁর চোখ দুটো অক্রমিক্ত হ'য়ে এল। রাজা রাজধানী ছাড়িয়ে অনপদ ছাড়িয়ে পল্লীতে প্রবেশ করলেন।

রাজা দেখলেন পল্লীর সে চোখ-জুড়েন চেহারা আর নেই। পত্রবহুল বৃক্ষরাশি যেন সব কুপণ হ'য়ে উঠেছে, যা নেহায়ৎ না হলে নয় সেই কটা পাতা গায়ে অড়িয়ে তারা কঙ্কালের মত ডাল মেলে দিয়ে অড়ের মত দাঢ়িয়ে আছে, ক্ষেতে ক্ষেতে আর সে শ্রামল শোভা আপনার মাঝা বিস্তার করে হাসে না। দৌঘির জলে আর মরাল মরালীরা সে আনন্দে সাঁতার কাটে না, পল্লী-আকাশ আর তেমন শিশুদের হাত্ত কলরবে মুখরিত হয়ে ওঠে না, স্তুক দুপুরে ছায়ায় ঢাকা বটগাছের তলে আর রাখাল বালকের বাঁশীতে তেমন সুর ফোটে না—আর সে পল্লীদেৰালম্বে সাঙ্ক্ষ আৱতিৰ কাঁশৰ বেজে

ওঠে না। ভৱা-জ্যোছনায় আর সে ঠাকুরমায়ের মুখে রূপকথার
স্বপ্নের জাল বোনা নেই, সে সাধ আহ্লাদ শুখ সম্পদ যেন কোন্ এক
যাদুকরের মায়া প্রভাবে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। দুর্বিবিরল মাঠে
মাঠে হাড় বের-করা গাতৌর দল প্রাণপণে তাদের আহার্য আদায়
করবার চেষ্টায় ধুকছে, পল্লীপাশ দিয়ে শীর্ণ নদী দীনা ভিখারিণীর
মত থেমে থেমে জিরিয়ে জিরিয়ে আপনার প্রাণহীনতার পরিচয়
দিয়ে দিয়ে অস্ফুট ক্রন্দনে চলছে। রাজা যেখানেই যান সেখানেই
কেবল শোনেন—“ত্রঙ্গ সত্য জগৎ মিথ্যা। কি হবে রে তাই
মিথ্যার জঞ্জাল বাড়িয়ে কোনৱকমে ছুটে। দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই
ভাল”। রাজা সব দেখলেন, সব শুনলেন, তারপর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা
করলেন—“মন্ত্রী এ পরিবর্তনের কারণ কি”?

মন্ত্রী উত্তর দিলেন—“মহারাজ ! মানুষ ধরিত্বাকে অস্বীকার
করেছে, নিজেও তাই নিরর্থক হ'য়ে উঠেছে। মানুষের প্রাণহীনতায়
তার চতুর্পার্শের প্রকৃতি নিজীব আনন্দহীন হয়ে উঠেছে, মহারাজ !
আপনার জীবনের প্রতি মানুষ প্রেম হারিয়েছে তার বিনিময়ে সে
লাভ করেছে কেবল ঘৃত্য। এরা আজ মনে করতে শিখেছে যে
ইহলোকের দুঃখ পরলোকের শুখ হয়ে দেখা দেবে, ইহলোকের
অক্ষমতা পরলোকে সামর্থ্য হয়ে ফুটে উঠবে, এদের ধারণা মহারাজ,
ইহলোকে নরক ভোগ করাই পরলোকে স্বর্গ লাভের সহজ ও সত্য
উপায়”।

‘রাজা বিরাট দুঃখের ভার বুকে করে’ রাজপুরীতে ফিরে এলেন।

ধৌরে ধৌরে রাজা দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অন্ন বন্দু অগ্নিমূল্য হয়ে
উঠল। ষেখানে এক টাকায় আট মণ চাল মিলত সেখানে আট

ଟାକାୟ ଏକ ମଣ ଚାଲ ମେଲେ ନା । ସେଥାନେ ତାତିର ବାଡ଼ୀତେ ଚାର ଆନା ପଯସା ଫେଲେ ଦିଯେ ଏଲେ ଏକ ଜୋଡ଼ା କାପଡ଼ ମିଳିତ ସେଥାନେ ଚାର ଟାକାୟ ଏକଥାନା କାପଡ଼ ପାଓଯା ଯାଯା ନା । ଚାରିଦିକେ ହତାଶା ନିରାଶା, କେବଳ ହାହାକାର । ଦେଶେର କତ ଲୋକ ଏକବେଳା ଖେଯେ ଥାକଲ, କତ ଲୋକ ଆଧିପେଟା ଖେଯେ ଦିନ କାଟାତେ ଲାଗଲ । ଆର କତ ଲୋକ ମରେ ଗେଲ । କିନ୍ତୁ ଦେଶେର ଲୋକେର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଵିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଅନୁଭବ କରବାର ଓ ଶକ୍ତି ନେଇ—ଏମନି ତାରା ପ୍ରାଣହୌନ । ସବାଇ ମନେ କରତେ ଲାଗଲ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀର ବୁଝି ଏହି ରକମହି ଧାରା । ତଥନ ବିଶ୍ଵାସ ଜୋରେ ନରନାରୀ-କଠ ଥିକେ ଧ୍ୱନିତ ହତେ ଲାଗଲ “ବ୍ରଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଜଗଃ ମିଥ୍ୟା” । ଏହି ମିଥ୍ୟାର କାହିଁ ଥିକେ ଯତ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟା ନେଓଯା ଯାଯା ତତହି ତ ସ୍ଵବିଧା । ସରେ ସରେ ଆରା ପରିଧେଯ ବନ୍ଦୁ ଗେହ୍ୟା ରଞ୍ଜେ ରଞ୍ଜିନ ହୟେ ଉଠିଲ ।

(୪)

ଏହି ରକମ ଯଥନ ଶାକବୀପେର ଅବଶ୍ୟା ତଥନ ଏ ସଂବାଦ ଗୁପ୍ତଚର-ମୁଖେ ଜୟୁଦ୍ଧିପେର ରାଜା ହନେଶ୍ୱରେର କାହେ ଗିଯେ ପୋଛିଲ ।

ରାଜା ହନେଶ୍ୱର ସିଂହାସନେ ବସେ ଛିଲେନ, ସଂବାଦ ଶୁଣେ ଏକେବାରେ ସିଂହାସନ ଛେଡେ ଲାଫିଯେ ଉଠିଲେନ । “କି ବଲଲେ, କି ବଲଲେ ଗୁପ୍ତଚର ? ଏହି ରକମ ଅବଶ୍ୟା ? ଜୟୁଦ୍ଧିପେର ରାଜା ହନେଶ୍ୱର ତାର ପିତା ମୁଘଲେଶ୍ୱର, ତାର ପିତା ବାଣେଶ୍ୱର, ତାର ପିତା ଚଣ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଏମନି ସାତ ପୁରୁଷ ଧରେ ଶାକବୀପ ଅଯି କରବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ; ଆର ବାର ବାର ପରାଭୂତ ହୟେ ଫିରେ ଏସେହେ । ଆଜ ଶାକବୀପେର ଏହିରକମ ଅବଶ୍ୟା ! ସେନାପତି, ସାଜାଓ, ସାଜାଓ, ସୈନ୍ୟ ସାଜାଓ” । ରାଜା ହନେଶ୍ୱର ସେନାପତିକେ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତେ ସୈନ୍ୟ ସାଜାତେ ଆଦେଶ କରିଲେନ । ତୁମ୍ଭୀ ଭୋବି ବେଳେ ଉଠିଲ,

অসি ঝন্ডনা আগে উঠল, বর্ষাকলক চিকমিক করে উঠল। পঁয়তৌশ
হাজাৰ সৈন্ধ, দশ হাজাৰ হাতি, বিশ হাজাৰ ঘোড়। সঙ্গে নিয়ে রাজা
ছনেশৰ শাকষীপেৱ বিৱৰণ অভিযান কৰলেন।

রাজা জীবনগুপ্ত ধৰণ পেলেন, ছনেশৰ আসছে পঞ্চাশ হাজাৰ
সৈন্ধ দশ সহস্র হাতি বিশ সহস্র ঘোড়া নিয়ে শাকষীপ জয় কৰতে
মন্ত্রীকে ডেকে বললেন—“মন্ত্রী রাজ্ঞোৱ নগৱে নগৱে পল্লীতে পল্লীতে
পৱোয়ানা জাৰি কৱ যে স্বদেশৱক্ষাৰ্থে আবাৰ আজ অন্ত ধাৰণ
কৰতে হবে, শাকষীপেৱ চিৱকু জমুষীপেৱ রাজা আজ সৈন্ধে
আবাৰ সমাগত। দেশেৱ সমস্ত সমৰ্থ লোক সমবেত হোক, অস্তুৱাজ
ষেন আবাৰ পৱাজ্য-পুৱক্ষাৱ নিয়ে ফিৱে যায়”।

রাজ অনুচৱ ছুটল দিকে দিকে রাজাৰ পৱোয়ানা নিয়ে, দেশেৱ
স্বাধীনতা রক্ষাৰ্থে, দেশেৱ যুবক দলকে আহ্বান কৰতে। রাজ
অনুচৱেৱা সমস্ত নগৱ নগৱীতে প্ৰত্যেক পল্লীতে পল্লীতে রাজাৰ
পৱোয়ানা জাৰি কৱলে, রাজ-আহ্বান জানিয়ে দিলে, তাৰ পৱ
তাৱা এননি এমনি রাজপুৱীতে ফিৱে এল, তাদেৱ সঙ্গে কেউ
এলো না।

সেনাপতি নিজে বেঙ্গলেন—সমস্ত দেশবাসীকে ডেকে ডেকে
বললেন, “স্বাধীনতা হৱণেৱ অন্তে শক্ত আগত, ওঠো আগো, যাৰ
বাছতে কিছুমাত্ৰ বল আছে, ধমনীতে বিন্দুমাত্ৰ শোণিত আছে, দস্ত্যৱ
হাত থেকে দেশ রক্ষাৰ্থে, দাসবেৱ কবল থেকে স্বাধীনতা রক্ষাৰ্থে,
বেৱিয়ে এসো অগন্ত পল্লীৱ অসংখ্য কুটীৱ থেকে, সংখ্যাহীন নগৱীৱ
উচ্চ সৌধমালাৱ ভিতৰ থেকে, অগণিত মানুষেৱ দল, অদম্য অপৱাঙ্গেৱ
অৱিদ্যম। সেনাপতিৰ বাণী কাৰো আগে কোন চেউ তুললে না, সে

ଏଣୀ ଅକଃଶେ ଅମନି ମିଶିଯେ ଗେଲ । ସେନାପତି ଏକାକୀ ରାଜପୁରୀତେ ଫିରେ ଏଲେନ, ସଙ୍ଗେ କେଉ ଏଲୋ ନା ।

ରାଜୀ ନଜେ ବେଳେନ । ତାର ପ୍ରଜାଦେର ସମ୍ବୋଧନ କରେ ବଲତେ ଲାଗଲେନ, “ଏସୋ ଶାକଦୀପେର ବୌରେର ଦଳ, ଆମାଦେର ପିତୃପିତାମହରା ଯେମନ କରେ’ ଅନୁରାଜଗଣକେ, ତାଦେର ବାହିନୀକେ ବାର ବାର ପରାଜିତ କରେ ପୃଷ୍ଠ କରେ ନଷ୍ଟ କରେ ଶାକଦୀପେର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଥେବେଇ ବିଭାଡିତ କରେଛିଲେନ, ତେମନି କରେ ଆଜ ଆମରା ହନେଶ୍ଵର ଆର ତାର ବିଶାଳ ଚମ୍ବୁକେ ବିଭବନ୍ତ କରେ ତାଡ଼ିଯେ ଦେବ । ପରଧନମୋଲୁପ ହନେଶ୍ଵରେର ଛ'ଚୋଥ ଆଜ ଶାକଦୀପେ ନିର୍ଦ୍ଧିତ ବର୍ଣ୍ଣକଳକେର ତୌଳ୍ଣ୍ଣତା ପରୀକ୍ଷା କରୁକ, ତାର ସୈଞ୍ଚେରା ଆଜ ଶାକଦୀପେର ବୌରୁବୁଦ୍ଦେର ତରବାରୀର ଧାର ଅନୁଭବ କରୁକ, ଏସ ବୌରେର ଦଳ, ଆର ସମୟ ନେଇ, ଶକ୍ତ ଦ୍ୱାରେ ସମାଗତ” । ରାଜୀର କଥା ସବାର ଏକ କାନ ଦିଯେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆର ଏକ କାନ ଦିଯେ ବେରିଯେ ଗେଲ । ରାଜୀ ଫିରେ ଏଲେନ, କେଉ ଏଲ ନା ।

ରାଜୀ ହନେଶ୍ଵରେ ଅଯନ୍ତରନି ନିକଟ ଥେବେ ନିକଟର ହ'ତେ ଲାଗଲ । ଶାକଦୀପେର ଚାରିଦିକେ କୋଥାସ୍ତବ୍ରତ ଯୁଦ୍ଧକଟ୍ଟେ କୋଥାସ୍ତବ୍ରତ କଟ୍ଟେ, କେବଳ ରବ ଉଠିତେ ଲାଗଲ—“ବ୍ରଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ଅଗ୍ର ମିଥ୍ୟା” ।

ରାଜୀ ହନେଶ୍ଵର ଦ୍ରତିବେଗେ ଶାକଦୀପେର ରାଜଧାନୀର ଦିକେ ଅଗ୍ରସର ହଲେନ, ସ୍ଵର୍ଗମ ଗତିତେ, କୋନଥାନେ କୋନ ବାଧା ନେଇ, କୋଥାଓ ଏକଥାନି ତରବାରୀ ତାର ପଥ ଆଗମେ ବସେ ନେଇ, କୋନଥାନ ଥେବେ ଏକଥାନି ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ସୈଞ୍ଚେର ଆରେ ଏସେ ପଡ଼ିଲ ନା । ରାଜୀ ଔବନଗୁପ୍ତ ମାର୍ଦାସ କରାଦାତ କରେ’ ସିଂହାସନେ ବସେ’ ପଡ଼ିଲେନ । “କି ହବେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କି ହବେ ! ଆପନ ଶ୍ଵାଧୀନତା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଏକଟି ଲୋକ ଅଗ୍ରସର ହୋଲ ନା । ଦେଶରକ୍ଷା କେ କରବେ ? ଲୋକ ନେଇ । ରାଜକୋବେ କୁବେରେର ଧନ ସକିତ,

কি হবে ? লোক নেই। অস্ত্রাগারে অপর্যাপ্ত অস্ত্র মজুত, কি হবে ?
লোক নেই—লক্ষ সৈন্যের বর্ষব্যাপী রসদ মজুত, কি হবে ? লোক
নেই”। নিরাশায় রাজাৰ চোখ ফেটে জল পড়তে লাগল।

রাজা ছনেশ্বৰ সন্ধ্যাৰ প্রাকালে রাজধানীতে প্ৰবেশ কৰলেন।
গৃহে গৃহে সমস্ত দৱজা আনালা কুকু, রাজপথে পথে আৱ সেদিন
বাতি জলল না, একটি লোক চলল না, চারদিক স্তুক ঘৃত্যাৰ মত
নৌৱ, যেন কোন এক প্ৰেতপূৰ্বী। ধীৱে ধীৱে সন্ধ্যাৰ আধাৰ গভীৱ
কালো হ'য়ে উঠল, ছনেশ্বৰ তাঁৱ পঞ্চাশ হাজাৰ সৈন্য দশ হাজাৰ
হাতি বিশ হাজাৰ ঘোড়া নিয়ে এসে রাজপূৰ্বীৰ উত্তৰ দ্বাৱে হানা
দিলেন, সেই সময় সেই আধাৰে রাজা জীবনগুপ্ত তাঁৱ সাত রাণীৰ
হাত ধৰে’ চোখেৰ জল মুছতে মুছতে দক্ষিণ দ্বাৱে দিয়ে রাজপূৰ্বী
ত্যাগ কৰে গেলেন।

(৫)

রাজা জীবনগুপ্তৰ সিংহাসনে রাজা ছনেশ্বৰ বসে’। রাজা গুপ্ত-
চৱকে আহ্বান কৰে’ জিজেস কৰলেন—“গুপ্তচৱ, প্ৰবল প্ৰচাপান্বিত
এই শকজাতি, যাদেৱ কত শতাব্দী ধৰে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষেৱা জয় কৰতে
পাৱে নি, সেই শকজাতিৰ আজ এ দশা কেন ?”

গুপ্তচৱ বললে—“মহারাজ ! এই রাজ্য দশ বৎসৱ পূৰ্বে এক
সন্ধ্যাসী আসেন, তিনি প্ৰচাৱ কৱেন যে, তিনি অতি শুক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই
আবিকাৰ কৱেছেন বে এই জগতেৱ কোন অস্তিত্ব নেই। সেই
শিকাকে অবলম্বন কৱে শকজাতি এ জগতটাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে

দিয়ে আপনাদের আনন্দহীন প্রাণহীন করে তুলাছল, তারই প্রতিশোধ এই দুর্দশা”।

রাজা হনেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—“সে সন্ন্যাসী এখন কোথায়”?

গুপ্তচর উত্তর দিলে—“তিনি এখন শিশ্রাতীরে তাঁর মঠে অবস্থান করছেন”।

রাজা বললেন—“তাঁকে আমার সমীপে নিয়ে এস”।

সন্ন্যাসী রাজা হনেশ্বরের সমীপে নীত হ'ল। রাজা হনেশ্বর, আপনার গলা থেকে বহুমূল্য মণিহার খুলে নিজ হাতে সন্ন্যাসীর গলায় পরিয়ে দিলেন। বললেন—“মহাজ্ঞন, আমার পিতৃপিতামহরা সাত পুরুষ ধরে’ অস্ত্র দিয়ে যা করতে পারেন নি, আপনি এক পুরুষে শাস্ত্র দিয়ে তাই করেছেন, সন্তাট হনেশ্বরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ও এই যৎকিঞ্চিং উপহার গ্রহণ করে তাঁকে কৃতার্থ করুন”।

তরংপর সন্তাট তাঁর সেনাপতির দিকে চেয়ে বললেন--“সেনাপতি, সন্ন্যাসীকে আমার সান্ত্বাঙ্গের সীমানার বাইরে রেখে আসবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হোক, তাঁর জন্মে এক মাস সময় দিলেম, সন্ন্যাসীকে জানিয়ে দেওয়া হোক, ঐ এক মাস পর থেকে তাঁকে কোন দিন আমার সান্ত্বাঙ্গের সীমানায় দেখতে পেলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে”।

সেনাপতি তরবারি কোষমুক্ত করে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বললেন—“যে আজ্ঞা মহারাজ”।

শ্রীশ্রেণচন্দ্র চক্রবর্তী।

দৃষ্টি ।

—*—

শরতের একমুঠা রৌদ্রে জমায়ে
যে পদ্ম উঠেছে বেড়ে, তাই দিয়ে গড়া
হ'খানি মধুর আখি,—হ'টি পক্ষমছায়ে
সুগভীর স্বচ্ছলতা কূলে কূলে ভরা ।
তারি মাঝে দৃষ্টিখানি করণ-কাতর,
বাহুপুটে আলিঙ্গন মেলিয়াছে তার
বেপমান দৃষ্টি-বাহু—আত্মার অধর
পাঠায়েছে চুম্বনের চারু পুষ্পাধার !
ব্যাকুল বক্ষের দোরে আসন্ন উঠত,
অসমাপ্ত চিরস্তন দৃষ্টির চুম্বন—
বিদ্যুৎপ্রবাহে চিত্ত মুঝ মন্ত্রহত ;
এত বল কোথা পেল ও ভীরু নয়ন !
হ'টি আখি—একখানি দৃষ্টি—তারি মাঝে
নিখিল বিশ্বের লীলা নিঃশেষে বিরাজে ,

আইহেমেন্দ্রলাল রায় ।

ঘিলে জঙলে শীকার ।

—*—

(৩)

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

তোমাদের একটা কথা বলা ভাল, যে পায়ের চিহ্ন দেখে বাষ কি
বাষিনী বুঝে নেওয়া যায় ; চিতাদের সম্বন্ধেও একটা খাটে । বাষের
দাগ অনেকটা চৌকাগড়ণের, বাষিনীর তা নয় । পোল বাষে কখন
জান ?—বাচ্চাদের বেলায় । তাদের পায়ের দাগ দেখে বাষ কি
বাষিনী বুঝে নেওয়া দায় । কিন্তু একটি সহজ উপায়ে এ সমস্তার
মীমাংসা করা যেতে পারে, পায়ের একটা দাগ হতে অন্ত দাগের
ব্যবধান কতখানি, দেখলে সেটা সহজে বোকা যায় । পায়ের দাগের
আকার ছয়েরি সমান, খোকা-বাষের পায়ের ফাঁদ খাট, আর খুকির
লম্বা । এটা নজর করে দেখা ভাল, কোনও আবেরই শিশুহত্যা করা
ভাল নয় । এদের বেঁচে বর্ণে বড় হতে দেওয়া উচিত, এতে যদি
তোমার হাতের শীকার কসূকে অঙ্গের হাতে পিয়ে পড়ে তবুও এ
স্বার্থ ত্যাগ করা কর্তব্য ।

বাষ কিন্তু চিতা কি করে গুরু মোষ মারে, এ খবরটা আবার সবারই
কোতৃহল হয় । এ ব্যাপার স্বচক্ষে সেখবার সৌভাগ্য যদিও আমার
ঘটে নি, তবে হত্যাকাণ্ড সমাধি হবার অব্যবহিত পরেই আমি উপশ্রিত

হয়েছি। হত অন্তর্টির পিঠে কিন্তু ঘাড়ের পাশেই আক্রমণকারীর দাতের দাগ দেখা যায়, আর যে ভাবে ঘাড়টি ভেঙে ঝুঁকে পড়ে, তা দেখলে বোধ যায় শক্রপক্ষ নিরীহ অন্তর্টির উপর ব্যাস্ত-ব্যস্তনে এসে, সম্মুখের পায়ের থাবা দিয়ে ধরে' তার ঘাড় মটকে ভেঙে দেয়। মারবার পরেই তাকে মুখে করে, কিছু দূর টেনে নিয়ে কোন খোপের অড়ালে কিন্তু তলায় রাখে, শকুন হাড়গিলে কিন্তু মাংসাশী অন্তদের মুখ হতে তাকে রক্ষা করবার জন্মেই এই কাজ করে। অনায়াসে এ ভার সে বহন করে। আমি একবার মন্ত্র একটা মোষকে এন্নি করে টেনে তিন ফুট চওড়া একটা নালার অন্ত পাড়ে রাখতে দেখেছিলাম। এন্নি অবলীলাক্রমে এই বিপুল ভার বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলে যে, সে দিকে যে মাটীর ঢিবি ছিল তাহ'তে এক আঁজল ধূলোও থসে পড়ল না। পায়ের দাগ দেখে বোধ গেল বাষটি প্রকাণ, আর সে অতবড় মোষটিকে বেড়াল যেমন তার ছানা-মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেন্নি মহঞ্জেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, এতে তার গায়ে কি পরিমাণ সামর্থ্য ছিল, তা অনায়াসেই অনুমান করতে পারে।

এসম্বন্ধে আমাদের দেশে সাধারণত অভিভা এতদূর যে, অনেকেই গন্তৌর ভাবে বলেন, “কাপড়া চাই মেঘ সাহেব” বলে যে ফেরি-ওয়ালারা সহরের অলি গলিতে ফেরে, ব্যাস্তবীরও তাদেরই মত তার শীকারের বোধা পিঠে করে বয়ে” নিয়ে যায়। আর একটি হাস্তকর ধারণা এই যে, বাষ গিয়ে মোষ কিন্তু গন্ধর ল্যাঙ্গে কামড় দিয়ে ধরে, হটোতে খুব ধানিকটে টানা হিঁচড়া চলে, তারপর স্বষ্ঠেগ ঝুকে চতুর বাষ মোষের ল্যাঙ্গের টানটা আলগা করে দেয়, আর সে যেন্নি মুখ খুবড়ে পড়ে আর অন্নি ইনি পিয়ে তার ঘাড়ের উপর চেপে বসেন।

এই হচ্ছে মাঘুলি বিশ্বাস, আৱ ভূমি যদি এৱ বিপৰীত কিছু বল,
তা হলে সেটা তোমারই অস্ততা বলে' প্রতিপন্থ হবে। এখানে আৱ
একটা গল্ল না বলে' এগিয়ে চলাটা ঠিক হয় না। একবাৰ সুন্দৱনে
বাঘে একজন নাপিতকে দিনে দুপৰে আক্ৰমণ কৱেছিল, ধূতি
নাপিত ভয় পাবাৰ পাত্ৰ নয়, সে কৱলে কি জ্ঞান ?— তাৱ পুঁটুলি হতে
নকৃণটি না বাৱ কৱে বাঘেৰ গলায় বসিয়ে দিলে, আৱ যাৰে কোথা ?
বাঘ আৱ পালাৰ পথ পায় না, কিন্তু পালাৰ যো কি ? চতুৰ
নৱসুন্দৱ ততক্ষণ তাৱ লেজ ধৰে আটক কৱেছে ; ফলে কি দাড়াল
জ্ঞান ?— ধলেৱ মুখ ফাঁক পেলে ঈদুৱ যেমন পালায়, বাঘটি তেমনি
কৱে দে চম্পট, কিন্তু আলাঙ্গুল ডোৱাৰাকাটা বাঘছাল খানি, বিজয়ী
নাপিত ভায়াৱ হাতেই রঘে গেল ! দুঃখেৰ বিষয় এমন অপূৰ্ব
ঘটনা অতঃপৰ আৱ ঘটবাৰ সন্তাবনা নেই। সেৱপ নাপিত একটি
মাত্ৰ ভূভাৱতে জমেছিল, মৱণ কালে এমন অসন্তুষ্টি বৌৱহৰ মে সঙ্গে
কৱেই নিয়ে চলে গেছে। যে ভদ্ৰলোক এ গল্লটি আমায় বলে ছিলেন,
তিনি পৱে অশ্বান দেশে অস্ত্ৰচিকিৎসা শিক্ষা কৱতে যেয়ে মাৱা
গিয়েছেন, কিন্তু গল্লটি অমৱ হয়েই আছে।

চিতাৰ শীকাৰ পদ্ধতি কিন্তু ভিন্ন, সে ঘাড়ে গিয়ে পড়ে না, গলায়
কামড় দিয়ে ধৰে থাকে, অস্তুটি মৱে পড়ে গেলে, তবে তাকে ছাড়ে।
লোকে বলে রক্ত শুষে থাৰাৰ অশ্বে মে এমনি কৱে, কিন্তু এটাকে
মেনে নেওয়া চলেনা, কেননা এসবক্ষে প্ৰমাণ কিছু পাওয়া যায় নি।

আমি যতদূৰ আনি, তাতে বলতে পাৱি, চিতা আহাৰ্য্য সম্বন্ধে
অনেকটা সাহিক, বাঘেৰ মত অমন তামসিক নয়। সে উচ্ছিষ্ট কিন্তু
পযুঁজিত আহাৱ কৱে না, আৱ তা ছাড়া চিতা পৱেৱ শিকাৰ-কৱা।

অস্ত্র আহার করে না। বাঘের অত বাট-বিচার নেই, যা পাই তাই
খায়, তবে ক্ষুধার তাড়নায় স্ববোধ স্বত্বাবের অঙ্গে নয়! আমি
দেখেছি একটি ছোট অথচ পূর্ণবয়স্ক বাঘ একবার বাঘিনীর শিকার-
করা। একটি মোষ অধিকার করে বসে ছিল, তারপর যার সম্পত্তি, সে
আসবামাত্র “অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ” এই নৌতিবাক্য শিরোধার্য
করে অবিলম্বে পলায়ন করলে। এ ব্যাপার যেখানে ঘটেছিল শুনেছি
সেইখানেই এক বাঘিনী পরের শীকার চুরি করে খেয়ে বেড়াত, কিন্তু
যখন বন্দুকের গুলিতে মাঝা পড়ল, তখন দেখা গেল তার দেহখানি
একেবারে অস্থি চর্মসার। কারণ অনুসন্ধান করে আবিষ্কার হল যে,
তার টাকরায় অনেকগুলো সজানুর কাঁটা আটকে রয়েছে, আর
কতকগুলো বিঁধে তার চোয়াল ফুটো হোৱে গিয়েছে, মুখের চারিদিকে
মোচাকের মত ঘায়ের সমষ্টি, এ অবস্থায় চুরি করে থাওয়া ত দূরের
কথা, মুখের গোড়ায় থাবার এগিয়ে এলেও, থাওয়া তার পক্ষে অসাধ্য
হয়ে দাঢ়িয়েছিল। তাই বছদিনের উপবাসে দেহখানি হাড়ের
মালায় পরিণত। একজন মস্ত শীকারী আমায় বলেছেন, তিনি
একবার একটা বাঘ মাঝাৰ পৱ দেখেছিলেন তার সম্মুখের হাতে মস্ত
একটা সজানুর কাঁটা বিঁধে আটকে ছিল।

বাঘ আৱ চিতা দৈর্ঘ্যে এবং প্রশ্নে কত বড় হতে পাৱে, সে কথা
অনেক শীকারের বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়—কিন্তু নানা শীকারীৰ
নানা মত, তাই মাপ কৱাৱ নিয়ম সবাৱ সমান নয় বলে’ এ সম্বন্ধে
মতভৈধ দেখা যায়! বাঘ বন্দুকের গুলি খেয়ে মৱবাৱ অব্যাহত
পৱেই, তার লম্বাই চওড়াই কতখানি সেটা মাপা উচিত; কেননা
দেৱি হলো দেখা যায় তার শৰীৰ সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। আমি

একবার দশফুট লম্বা একটা বাঘ শাকার করি, জঙ্গল হতে তাঁরুতে বয়ে নিষে আসা, এই সময় টুকুর মধো পাঁচ ছয় ইঞ্চি কমে গিয়েছিল। এতে আমাৰ বক্সুদেৱ ভাৰী আমোদ বোধ হয়েছিল, ব'লে রাখা ভাল যে সে দিন তাঁদেৱ ভাগো কোন শীকাৰই জোটে নি ! মৃত্যুৰ পৱ সব জন্মুৰ শৱীৱই শক্ত হয়ে ওঠে, তবে বাঘদেৱ দেহে এই কাঠিণ্য যত শীঘ্ৰ দেখা দেয়, অস্ত পশ্চুৰ শৱীৱে তা হয় না। চামড়া ছাড়িয়ে নিলে বাঘটা যে কত বড় ছিল তাৰ কোন খবৱই পাওয়া যায় না। প্ৰকৃতি-মাতা এ জাতীয় জন্মুদেৱ যে পোষাকটি পৰিয়ে দেন, তা' তাঁদেৱ দেহে এঁটে বসে না, আলগা থাকে। এৱ উদ্দেশ্য এদেৱ দেহে যে ক্ষত হয়, সেটা চামড়াতেই আটক থাকে, মাংসে গিয়ে না পৌছয়, তা হলৈ প্ৰাণ হানিৰ সন্তোষনা অধিক। এদেৱ গায়ে আৰাত-ক্ষত সৰ্ববদ্ধাই হচ্ছে—সেটা ঘাতে চামড়াৰ উপৱ দিয়েই যায়, বেশি সংঘাতিক না হয়, এই নিয়ত বিপদ নিবাৰণেৰ জন্মেই প্ৰকৃতি তাঁদেৱ দেহেৰ আচ্ছাদনটি ঢিলে রেখেছেন। বাঘেৰ চামড়া ছাড়িয়ে নেবাৰ পৱ দু'ফিট আন্দাজ বেড়ে যায়, চিতাৰাঘেৰ এৱ অৰ্কেক বাড়ে। একটা দৈৰ্ঘ্য এবং আয়তনেৰ বাঘ ও চিতা কিন্তু ওজনে সমান হয় না। একটা বড় বাঘেৰ ভাৱে একখানি বড় শক্ত চাৰিপাই মড় মড় কৱে ভেড়ে পড়তে আমি দেখেছি। চিতা ওজনে একমণি ৩৫ সেৱেৰ বেশি হতে প্ৰায় দেখা যায় না, একটি বড় বাঘ কিন্তু সাড়ে সাত মণি পৰ্যান্ত হতেও পাৱে, এমনটা যদি ও সচৱাচৱ বড় একটা দেখা যায় না। কয়েক বৎসৱ পুৰ্বে একটা অন্তুত ঘটনা ঘটে ছিল। সেই কথা মনে পড়ে গেল, একটা বাঘেৰ গায়ে গুলি লাগে নি, পালাৰাৰ সময় যেখানটিতে শীকাৰীৰা ঘোণ কৱে-ছিল, সে সেই দিকে ছুটে যেতেই আৱ সবাই পালিয়ে গাছে উঠে

পড়ল, এক বেচারী তাড়াতাড়ি উঠতে না পেরে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল, তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, সে সেই খানটিতে পড়ে মরে আছে, ঘাড়টি মটকান, নখের কিছু দ্বাতের কোন চিহ্ন শরীরের কোথাও ছিলনা। পলায়নতৎপর ব্যব্রাজ হয়ত একবার সন্তুষ্টিপূর্ণে তার ঘাড়ে হাত রেখেছিলেন (প্রণয়ীর সলজ্জ প্রথম সন্তানের মত !) তাতেই তার এই দশা, একেবারে “পপাত চমমার চ”। এ হ'তেই জন্মটির ওজন যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

সামর্থ্য আর নিষ্ঠুরতায় আর কেউ বাধের সমান না হ'লেও, এরা কিন্তু বুনো কুকুরকে ভারী ডরায়। বনচর জন্মদের মধ্যে এই কুকুরদের মত স্থান্য স্বভাবের আর কোন পশ্চ নেই। এরা একবার যে বনে এসে দেখা দেয়, আর সবাই আতঙ্কে সেখান হ'তে স্থানে পলায়ন করে। ব্যব্রাজও এই “যেনগতা পন্থার” অনুসরণ করেন। আর একটা কারণও থাকতে পারে, শীকারই যদি সব পালান, তবে শীকারী আর সেখানে বসে কি করবে বল ? ভালুক আর পাহাড়ি-চিতা বুনো কুকুরকে তেমন ডরায় না, তার কারণ এরা সহজে শুহা গহনের আশ্রয় নিতে পারে। আমার একবারকার শীকার এদের উপস্থিতে একেবারেই মাটী হয়ে গিয়েছিল।

বাব, সান্ধির, অঙ্গ মৃগপাল সব কোথায় অনুর্ধ্বান হয়ে গেল, আমি পথ চেয়ে চেয়ে বসে যখন ফিরে এলাম তখন শুনলাম, তার দু'দিন পরে বাঘ ভালুক হরিণ নৌলগাই সবাই বাসায় ফিরে এসেছিল। এই বুনো কুকুরের দল ভারী চালাক ; এক জায়গায় জড় হয়ে না থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, একই জন গিয়ে, এক একটা পাহাড়ের চূড়ায়

ওঠে, আর অশ্রু শীকার তাড়িরে তাদের দিকে নিয়ে বাঁচ। সাম্বর-হরিণ প্রায়ই এদের ফাঁদে পড়ে, কারণ প্রকাণ্ড ডালপালা ও মালা শিং নিয়ে এরা বনের মধ্যে দিয়ে শীগুগির দোড়ে পালাতে পারে না। এই কুকুরের দলের এক আধটিকে মেরে ফেললেও আর গুলোকে ভয় খাওয়ান যায় না, কিন্তু ঘায়েল করে যদি চলচ্ছকি রহিত করতে পারা যায়, তাহলে কাজ করকটা হয় বটে। এরা কিন্তু মানুষের কোন হানি করে না। এই শয়তানদের কথা শেষ করবার আগে এক জন স্কচ (Scotch) শীকারী তাদের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা সর্ব সাধারণে জ্ঞাত করান কর্তব্য। তিনি বলেন—“অস্ত্রদের মধ্যে এদের মত থেকী, বেয়াদব, পাজী জানোয়ার আর ছুটি নেই” (The most snarling, ill-mannered and detestable of beasts). এমন সকল শব্দের উপযোগীতা ততক্ষণই আছে, যতক্ষণ না তার অপব্যবহার হয়। এম্বি একটি দুর্দিশাগ্রস্ত শব্দ (d-d) নিশ্চয়ই আদিম মানব-প্রবর “আদমের” মুখ হতে রাগের মাথায় প্রথম অশ্রুতি করেছিল,—আর এ রাগটার উৎপত্তি যে ইবা-র (Eve) ব্যবহারে হয় নি এ কথা কে সাহস করে বলতে পারে ? আইন যাঁদের পেশা, তাঁরা বলবেন এম্বি আর একটি বহু প্রাচীন প্রথা তাঁদের ব্যবসায়ে প্রচলিত আছে—সেটা হচ্ছে alibi, এটাও নিশ্চয়ই আদিম-পাপের মতই পুরাতন। আদম যিহোবার বিচার কালে এই alibi গরহাজিরের অছিলা করেছিলেন—কিন্তু বিফলে।—আমাদের অজ সাহেবরাও যদি এ কথাটা জানতেন, তাহলে তাঁদের হাতে কি জবর নজিরই থাকত !

একবার একটা চিতা, হঠাৎ কোন দিক দিয়ে কোথায় যে অস্তর্কান হ'ল তা আর কারো বোধগম্য হল না বলে, (এর কথা পরে আরো

শুনতে পাবে) আমরা সবাই শীকারী, লাঠিয়াল বৱকম্বাজ তাৰ
অনুসন্ধানে বেৱ হ'লাম। জায়গাটিৰ পাশে এক টুকুৱা জজল ছিল,
সেটা কাৰো নজৰে পড়ে নি, কেননা সেখানে গাছপালা, কি ঘন ঘাস,
এমন কিছুই ছিল না য'ব আঢ়ালৈ আবড়ালৈ কে'ন জন্ম, এমন কি
একটা বেড়ালও, লুকিয়ে থাকা সন্তুষ ! আমরা একবাৰ নয়, দু'বাৰ
নয়, তিন তিনবাৰ এৱ চাৱিদিক উটকে পাটকে দেখে যখন কোনই
কিনাৱা কৱতে পাৱলাম না, তখন এৱই পাশে যে আথৈৱ ক্ষেত্ৰে ছিল,
সেই দিকে খুঁজতে যাৰ মনস্ত কৱলাম। লাঠিয়ালৱা সবে মাত্ৰ দু'পা
এগিয়েছে, কাৰ কি কৰ্তব্য সে বিষয়, আমাৰ তাৰেৱ সব কথা বলা
তখনও শেষ হয় নি, এমন সময় আমি দেখতে পেলাম সেই জঙ্গলটাৱ
মধ্যে কি যেন নড়ছে, তাৱপৱ দেখি কিনা, চিতাটি বুকে হেঁটে মস্ত
একটা টিক্টিকিৱ মত এগিয়ে চলেছে। ভাগিয়া আমাৰ বন্দুকটা
আমাৰ কাঁধেৱ উপৱ তৈৱি ছিল। আচমকা শব্দ শুনে সবাই চমকে উঠল,
আৱ মনে কৱলে সেটা হঠাৎ ফস্কে আওয়াজ হয়েছে, কিন্তু যখন
বাঘটাকে ভূমিসাং হয়ে পড়তে দেখলে, তখন আৱ তাৰেৱ বিশ্বায়েৱ
পাৱাপাৱ রইল না। আমৱা যখন তাৱ খোঞ্জে চাৱিদিক তোলপাড়
কৱে বেড়াচ্ছিলাম, তখন সে কেমন কৱে নিঃশব্দে লুকিয়ে ছিল, আৱ
অতবাৰ আনাগোণা কৱা সহেও যে আমাৰে চোখে পড়ে নি, এটা
ভাৱী আশচৰ্য মনে হয়।

বাঘ শীকাৱেৱ একটা বিশেষ স্মৱণীয় দিনেৱ কথা তোমাৰেৱ
এখানে বলা ভাল, তাৱ মধ্যে একটু মজাৱ কথা আছে। গেল-
বৎসৱ ঘটনাটা ঘটেছিল। গল্লটা আমাৰ আৱ K. G. B-ৱ কাছে
তোমৱা অনেকবাৰ শুনেছে। একটি বাঘিনী আমাৰ নিৰ্ঘাত গুলিৱ

ঘায়ে মরে পড়েছে, আমরা সবাই মিলে, চারিদিক ঘিরে তার ডোরা-
কাট; সুন্দর চামড়া খানির, আর নধর দেহের প্রশংসাৰণ কৱচি,
অনবিশেক লাঠিয়াল কাছাকাছি, আর বেশিৰ ভাগ পাহাড়ের মাথাৰ
উপৱ রয়েছে, আমাদেৱ কাছে পৌঁছতে হলে, তাদেৱ অনেক খানি
পথ নেমে আসতে হবে, বাঘিনৌ-নিধন বাঞ্চা, লাঠিয়ালৰা চৌৎকাৰ কৱে
তাদেৱ বলছে, তাৰা মহানন্দে পাহাড় হতে দৌড়ে নেমে আসছে,
কাছাকাছি যাবা ছিল তাৰাও ভিড় কৱে ঘিরে এগেছে, আমি আমাৰ
বন্দুকটি বাঞ্চবন্দী কৱেছি, এমন সময় প্ৰকাণ্ড এক ভলুক দম্পতিৰ
হৃপ হৃপ শব্দ আমাৰ কাণে এসে পৌঁছল। K. G. B. বন্দুক হাতে
এগিয়ে গিয়ে তাদেৱ অভ্যৰ্থনা কৱলেন, স্বাগত সন্তোষণেৰ মাহাজ্ঞো
একটি ত তৎক্ষণাৎ ধৰাশায়ী হল, ইহজীবনেৰ মত আৱ তাৰ বাক;
নিঃসৱণ হয় নি। অন্তি চারিদিকে লাঠিয়াল শীকাৰীৰ গোলযোগে,
বাঘ ভালুক মাৰা পড়বাৰ বিভাটেৰ সুষোগে পলায়ন দিলে, সুখেৰ
বিষয় কাৰো কোন হানি কৱে যায় নি। আমি বাঞ্চ হতে বন্দুকটি
বাৱ কৱে নেবাৰ দু'এক মিনিটেৰ মধ্যেই এত খানি কাণ্ড হয়ে গেল।

আৱ বেশি দূৰ না এগিয়ে, এলোমেলো ভাবে ঘুৱে না বেড়িয়ে
এখন কাজেৰ কথায় মন দেওয়া ভাল। বাঘ আৱ চিতা শীকাৰেৰ
গল্ল আমি প্ৰকৃত ঘন্টা হতেই বলব। এ ব্যাপাৱে যেখানে সন্তুষ,
পায়ে হেঁটে শীকাৰ কৱাই সব চেয়ে নিৱাপদ উপায়, এ কথা জোৱ
কৱে বলতে আমি একটুও বিধি বোধ কৱছি নে—এ বিষয়ে প্ৰথম
স্থান দিতে হবে Still Hunting-কে, অৰ্থাৎ এক স্থানে স্থিৱ হয়ে
বসে শীকাৰ কৱাকে। এ কাজে প্ৰচুৱ অভ্যাস আৱ অলোকিক
ধৈৰ্যেৰ আবশ্যক। এ ব্যাপাৱে অনেক সময় দেখা যায়, সেটা বিৱৰণ-

জনক লুকোচুরি খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। শীকারী শুধু খুঁজেই মরে, কিন্তু অভিষ্ট লাভ হয়ত ভাগো সহজে ঘটে না। লম্বা ঘাসে ভরা জঙ্গলে এমন ভাবে শীকার করা সন্তুষ্ণ নয়—পাহাড়ে যায়গায় এ সুযোগ থোঙা দরকার আর সুবিধাও পাওয়া সহজ। বৃহদাকার জন্ম বিশেষকে তার আপন জমিদারীর এলেকায়, এ ভাবে হাত করতে পারাই শীকারীর মৃগয়া-কৌশলের পরাকাষ্ঠা। যদি মৃগয়ার নির্দর্শন, অ্যাস্ত্রবাজের ডোরাকাটা আঙ্গরাখা, ভাঙ্কের লোমশ কোমল কম্বল খানি, হরিণের শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট প্রকাণ শৃঙ্গ যুগল, মহিষাশুরের অর্কচন্দ্রাঙ্গতি শৃঙ্গ-ফলক, বরাহ অবতারের খড়েগর মত যুগ্মদন্ত, সংগ্রহ করে গৃহের শোভা, আর আপনার বীর্য গৌরব স্মরণীয় করতে চাও তাহলে পরিশ্রম করতে হবে, যে মানুষ গ্রন্থি অর্জন করতে চায়, বিনিময়ে তাকে আপন জীবনের অনেক খানি অংশ, আর প্রেষ্ঠ অংশই দান করতে হবে।

মধ্য-প্রদেশে অনেক পাহাড়তলী আছে, কিন্তু শীকারী সেখানে কমই যায়। কেননা সেখানে সহজ গতিবিধি, সৌখ্যেন চালচলন চলে না। শীকার প্রত্যাশায় মৃত জন্মুর পাশে পাহারা দিয়ে বসে থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা হয় না। টোপ গেথে মাছ ধরবার জন্যে চুপ করে বসে থাকতে হয়, বাঘকে ভুলিয়ে আনবার জন্যে পাঁঠা কি ভেড়া বনে বেঁধে রাখতে হয়, তাকে আকর্ষণ করে আনবার জন্যে এইটি সব চেয়ে ভাল উপায়। আর যদি তার কাছাকাছি কোন জন্ম বাঘের আক্রমণে মারা গিয়ে পড়ে থাকে, আর সেখানে জনসমাগম বিরল হয়, তাহলে বাঘটিকে তার মৃত-শীকারের কাছাকাছি নাগাল পাবার খুবই সন্তান। এই সব মৃত-শীকারের কাছে পৌছবার

জন্মে শীকারীর বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। কান-কথার চেয়ে জোরে কোন কথা বলা চলে না, আর শীকারীও তাঁর অমুচরদের নিঃশব্দ পদ সঞ্চার পাওয়া আবশ্যিক। প্রায়ই দেখা যায় এর কাছাকাছি কাক চিল গাছের ডালে বসে গলা বাড়িয়ে সতৃষ্ণ

ই দিকে চেয়ে আছে। তোমার আসতে দেখে শেয়াল-গুলো মনভারী করে নিতান্ত অনিছায় অস্ত্র সরে পড়ছে। ময়ূরের কেকা ধৰনি, যতক্ষণ বাঘ সেখান হতে অদৃশ্য না হচ্ছে, ততক্ষণ আর কিছুতেই নীরব হচ্ছে না, এই সব লক্ষণ হতেই বাঘটি যে কোথায় আস্তানা নিয়েছে, তা বোঝা যায়। এখন তাঁর কাছাকাছি পেঁচতে হলে, গাছের আড়ালে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, আস্তে আস্তে এগোন ভাল, সম্ভব হলে মাঝে মাঝে দু'এক চক্র ঘুরে ঘুরে যাওয়া মন্দ নয়, কিন্তু কখনই নালা কিন্তু নদীর শুকন ধাল কিন্তু ঘন ঘাসে ঢাকা মাঠ দিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

ময়ূর জাতের কেন কে জানে বাঘ সম্বন্ধে ভারী একটা মোহ আছে—কি যে মায়ামন্ত্র ব্যাখ্যারীরের জানা আছে কিনা জানিনে, কিন্তু ময়ূর এদের কাছাকাছি থাকতে পারলে দূরে যেতে চায় না। জঙ্গলবাসী শীকারীরা দেখে শুনে এই গুণ-জ্ঞানের ঠিক খবর জেনে নিয়েছে, আর শীকার করবার সময় এই দুর্বিলতার বিশেষ সুবিধা নিয়ে থাকে। আমি একবার শীকার করতে গিয়ে, বনের মধ্যে তাঁবুতে বসে ছিলাম, এক ঝাঁক ময়ূর কাছাকাছি চরছিল, দেখলাম একজন শীকারী বাঘের মত ডোরা-কাটা একটা হলদেটে রঞ্জের পর্দা নিজের সম্মুখে আড়াল করে ধরে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। ময়ূর স্বভাবত ভারী ভৌরু আর লাভুক, কিন্তু বাঘের মত এই ডোরা-টানা পর্দা দেখে

তারা ভারী উত্তেজিত হয়ে উঠল, পর্দা যতই এগোয় ময়ুরগুলি ততই
স্ফূর্তি করে, বিচিত্র কলাপ আৱ পাথা মেলে আনন্দে নেচে নেচে
ঘুৰে বেড়ায়। গ্রাম্য শীকারীটি পঁচিশ গজের মধ্যে গুলি করে একটিকে
হাত করলে, কিন্তু তবুও অন্যেরা তখনও নিরাপদ হবার জন্যে পালিয়ে
গেল না। পাগলের মত কলরব করে সেই পর্দারই আশে পাশে ঘুৰে
বেড়াতে লাগল, ইত্যবসরে শীকারী আরো একটিকে গুলি করে মেরে
সামনের পর্দা ফেলে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলে। এই পর্দাকে
তারা বলে ‘বাঘিনী’—মোহিনী শক্তির আধিক্যবশত বোধ হয়
স্ত্রীলঙ্ঘের ব্যবহার চলেছে। সে যাই হোক, অনেকবার এ কথা
শুনেছিলাম কিন্তু চোখে না দেখা অবধি বিশ্বাস করি নি। অমন
সুন্দর পাথী মেরে ফেলা ভারী নিষ্ঠুরতা, তবে অমন নিষ্ঠুরতা যে
আমার চোখের সমুখে ঘটতে দিয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ,
শোনা-কথার সত্য পরীক্ষা। আমি মনে করেছিলাম যে তার বড়াই
নিতান্তই গাল-গল্প, কিন্তু দাঙ্ডিয়ে গেল অন্য রকম। সে বলে ময়ুর
শীকার করা যে শীকারীদের ব্যবসা, তাদেরি কাছে এই বাঘিনীর
চাতুরিটা সে শিখে নিয়েছে। এই শীকারীরা তৌর ধনুকে ময়ুর
শীকার করে থাকে। কোন কোন বন্দ প্রদেশে যেখানে চারিদিক
গুল্ম কিন্তু ঘন তৃণ-সমাচ্ছম, মাঝে মাঝে বালুকার স্তুপ আৱ জলহীন
নালার প্রাদুর্ভাব, সেখানে শীকারী হাতী পাঠিয়ে, বাঘকে তাঙ্ডিয়ে
তার হত-শীকারের কাছে নিয়ে আওয়া হয়। বলা বাহ্য, যে হাতী
এ বিষয় বিশেষ রূপে শিক্ষা পেয়েছে সেই কাজে লাগে, আৱ এমন
একটি হাতী সহজে বড় একটা পাওয়া যায় না।

হাতীর উপর হাতুলা দেওয়া হয় না, জিন-সওয়ারীর মত বসতে

হয়, পা রাখিবার জগ্নে দু'টি জ্ঞায়গা থাকে, এটা বীরামন সন্দেহ নাই
কিন্তু নিরাপদ নয়, বিশেষত পথে এগিবার সময় বার বার ডাল পালাব
বাধা অতিক্রম করতে হয়। এর উপর যদি দ্বীপেন্দ্রিটি বীরেন্দ্র না
হয় তাহলে সমুহ বিপদ ঘটিবার সন্তাবনা। এমন একটি বিপুল
বপু অনাহৃত আগস্তুককে অক্ষমাং আসতে দেখে বাস কিম্বা চিতা,
এম্বি স্তন্ত্রিত হয়ে যায় যে প্রথম গুলি মারিবার বিষয়ে কোন বাধা
দেয় না। সম্ভব হরিণও ঘন ঘাস-বনের মধ্যে ঠিক একই ব্যবহার
করে। আর অযোধ্যায় যেখানে বহু চিত্রিক হরিণের বসতি, স্বচ্ছন্দ
আহার বিহারে প্রকাণ আয়তনের হয়ে ওঠে, তাদেরও আমি অনেক
বার অনেক গুলিতে এই উপায়ে শীকার করেছি।

এই রুকম হাতৌর উপরে বসে শীকার করতে পেলে, একটি বিষয়ে
তোমাদের বিশেষ করে সাবধান হতে হবে। যে মুহূর্তে বনের মধ্যে
প্রবেশ করবে আর যতক্ষণ না বনের বাহিরে আসবে ততক্ষণ
কিছুতেই নিজের বন্দুকটি হাত ছাড়া করবে না, তা সে যতই ভারী
হোক না কেন? হঠাৎ যে পথে কখন কার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য
ঘটিবে বলা কঠিন, বিপদ যে এসে দেখা দিয়ে যাবে না এ কথা কে
বলতে পারে? না যদি আসে, সে ত ভাল কথা কিন্তু বনের মধ্যে
হাতৌর পিঠে চড়ে, শীকারের খৌজে বেরতে হলে, আগে হতে
সাবধান হওয়াই ভাল, জান ত কথায় বলে “সাবধানে বিনাশ নাই”।
আর তা ছাড়া নিজের বন্দুকটির সঙ্গে পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হয় ততই
ভাল, তাকে যখন তখন কাঁধে পিঠে করে নিয়ে বেড়ালে তার সঙ্গে
এমনি বঙ্গুর জন্মায় যে বিপদের মুখে সে সহায় হয়ে নিশ্চয়ই দাঢ়ায়,
আর অনায়াসে তার সাহায্যে শক্র বিনাশ হয়ই হয়। যারা ক্রিকেট,

হকি, টেনিস খেলে তারা জানে, ব্যাটের সঙ্গে ভাব রাখলে সময়ে
কাজ দেখে !

P.—একবার জঙ্গলে মাচান বাঁধা ঠিকমত হচ্ছে কিনা দেখতে
গিয়েছিলেন, আমি বার বার বলা সহেও বন্দুকটি নিলেন না, রেখে
গেলেন। একটা সরু নালা পার হয়ে যাচ্ছিলেন, তার দু'ধারে
থাড়াই পাড়, ঝোপ ঝাড়ে একেবারে ঢাকা, বেশি দূর যেতে না
যেতেই একটা মস্ত বাঘ একেবারে কানের কাছ দিয়ে লাফিয়ে পড়ে
গজেন্দ্র-গমনে চলে গেল। P.—যে হেঁটে যাচ্ছিলেন তাঁর পায়ের
শব্দ কিন্তু পাথর গড়িয়ে পড়বার শব্দে সে চমকে উঠে থমকে,—
পালিয়ে গেল। উভয় পক্ষেই কি স্বয়েগ হারালে বল দেখি !
P.—কে তোমাদের মনে আছে ত ? Bisley আর অন্যত্র কত
প্রাইজ আর মেডাল সে পেয়েছিল, শেষ কালে একটা জলন্ত বাড়ী
হতে বসন্ত রোগী ছোট একটি মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে, সেই
রোগে বেচারী দু'চার দিনের মধ্যে নিজেই মারা গেল।

সেই জঙ্গলেই আমি একদিন চিঞ্চলের খেঁজে খেঁজে বহুদূর
বিস্তৃত ঘন বাঁশবনের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম। থেকে থেকে ময়ুরের
কর্কশ কেকা ধ্বনি কিন্তু কপোতের মৃদুগান ছাড়া আর কিছুতে
চারিদিকের পরিপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তা ভঙ্গ হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে অরণ্য-
স্থলত দু'একটি অপরিচিত অঙ্গুত পূর্ব শব্দ কানে আসছিল, তার,
কোথা কিন্তু কেন কিছুই বোকা ধায় না। এই বিরল শব্দগুলি ই
য়েমন মৃত্যুকার স্তুপ ডিঙিয়ে, শুকনো গাছের গুঁড়ি এড়িয়ে কেবলি
এগিয়ে চলেছি, একবার অনেও হয় বি, বে কোন কিছু হঠাতে আমার

সম্মুখে এসে পড়বে কিন্তু তবুও চোখ যদিও কিছু দেখতে কিন্তু কান
কিছু শুনতে পায় নি, হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, কি যেন একটা
আসছে, তারপর চোখ তুলেই দেখলাম—প্রায় চলিশ হাত দূরে
একটা প্রকাণ হাতী, কুলোর মত কান ছুটে থাড়া করে, শুঁড় শুটিয়ে
তুলে সোজা আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিচার বিবেচনার
সময় ত আর তখন ছিল না, আমি তাড়াতাড়ি একটা ঘন বাঁশ বাড়ের
মধ্যেই লুকিয়ে পড়লাম, যদিও আমার পিছু পিছু আসবার কোন পায়ের
শব্দ আমি শুনতে পাই নি, তবুও সেদিকে কি ঘটছে দেখবার জন্যে
আস্তে আস্তে মুখ ফেরালাম—দেখলাম পর্বত-প্রমাণ একটি হস্তিনী
শুঁড় তুলে হৃকার করতে করতে দ্রুত অস্তর্ধান হল—গজেন্দ্র গমনে
নয়। যদি আমি আর দু'চার হাত এগিয়ে যেতাম, বাঁশ বাড়ের
আড়ালে না আশ্রয় নিতাম, তাহলে কি যে ঘটত সে সম্বন্ধে অধিক
না-ভাবা আর না-বলাই ভাল। আমার হাতে শুধু 12 bore Nitro
Paradox ছিল, আর তোমরা ত জান হাতী মন্ত বড় জানোয়ার
হলেও কেমন অনায়াসে অতি অল্প পরিসর স্থানে সহর পার্শ্ব পরিবর্তন
করতে পারে। তাই Paradox আর আমার পদবুগলের সম্মিলিত
চেষ্টাতেও প্রাণ রক্ষা হত না, সেটা স্বনিশ্চিত !

ক্রমশ—

বিসর্জন।

—::—

তার নামটি ছিল টুলু; সে ছিল আমার বাল্য-সহচরী। তার সম্পর্ক, পৃথিবীর আকাশ এবং পৃথিবীর বাতাস সম্পূর্ণরূপ পরিহার করে' আমারই প্রাণে—আমার মর্মের গভীর বেদনাতেই নিমগ্ন হয়ে রয়েছে।

সে থাকত আমাদের পাড়ার রায়দের বাড়ীতে। কিন্তু রায়দের দেহের যে শোণিত-প্রবাহ, তার সঙ্গে তার রক্তের যোগ ছিল না; আবার প্রীতি বা স্নেহের কোন ঘোগসূত্রে তাদের হৃদয়ের সঙ্গে তার যে কোন বন্ধন পড়েছিল, এমনও নয়। ঐ ক্ষুদ্র একটি বালিকা যেন ছিল রায়-পরিবারের মন্ত্র একটা দায়।

টুলুর এক মামি-মা ছিল রায়দের ঘরের ঝিয়ারী, সে ধখন বিধবা হয়ে তার বাপের বাড়ী এল, তখন অনাথা ভাগিনৈয়ীটিকেও সে তার সঙ্গে আনল। বিধবা-মেয়ের অস্তিত্বের শুরুতার আর রায়দের বেশি দিন বইতে হল না, কিন্তু মৃত্যুকালে একটি অনাথা বালিকাকে লালন পালন করবার দায় সে তার মা বাপের ঘাড়েই চাপিয়ে গেল।

জীবনটাকে আঁকড়ে ধরবার একটা স্বযোগ টুলু পেয়েছে, কিন্তু রায়দের বাড়ীতে যে অবস্থায় তার দিন কেটেছে,—পশ্চ-প্রদর্শনীর পশ্চ যে দশা, তার তুলনায় তা ছিল আরো দুর্বল। বাড়ীর লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে এবং তাদের মনের ঘোগ ছিন্ন করে বালিকাকে

କୁନ୍ଦ ପ୍ରାଣ-ପାତ୍ରାଟି ମୁହଁର ଅବାଧ ଆକାଶେ ଆନନ୍ଦେ ସେ ଡାନା ମେଲବେ,
ଅମନ ଅବକାଶ ତାର ଥୁବ ଅଛଇ ଛିଲ ; ନିରସ୍ତର ତାକେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରେ'
ଆତିପାତି କରେ' ତାର ଦୋଷଗୁଲୋ ବେର କରବାର ଏବଂ ନାନାଭାବେ ତାକେ
ଗଞ୍ଜନା ଦେବାର ଉତ୍ସମ ଓ ଉତ୍ସାହ ବାଡ଼ିମୁକ୍ତ ଲୋକେର ଏକାନ୍ତରଜାପେଇ ଛିଲ ।
ଟୁଲୁ ସେ ତାଦେର ଆପନାର କେଉ ନୟ, ଅର୍ଥଚ ତାକେ ପାଲନ କରବାର ଦାୟ
ତାଦେରଇ, ଏ କଥା ଏକ ମୁହଁରେ ଜନ୍ମିତ ବିଶ୍ୱରଣ ହତେ ନା ପେରେ ତାକେ
ନିଯେ ତାଦେର କାରୁର ଆର ସ୍ଵସ୍ତିବୋଧ ଛିଲ ନା । ଅନାଥ ବାଲିକାଟିର
ମୁଖେର ଅଳ୍ପ ତୁଳେ ଧରେ ତାରା ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରେଛେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ତାର
ପ୍ରତି ତାଦେର ଅନ୍ତରେର ସେ ଅବଜ୍ଞା ଓ ବିଦେଶ ଭାବ, ତାର ବନ୍ଦ ହାଓୟାତେ
ଶିଶୁର କୁନ୍ଦ ପ୍ରାଣଟି ନିରସ୍ତର ଗୁମ୍ରେ ମରେଛେ ।

ଆମାର ବିଧବା-ମାୟେର ଆମିହି ଛିଲୁମ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ । ତୀର ହଦୟେର
ଅଜଣ୍ମ ସ୍ନେହରାଶି ଆମାର କୁନ୍ଦ ପ୍ରାଣ-ପାତ୍ରାଟି କାଣାଯ କାଣାଯ ଭରେ' ତୁଳେ'
ଆରୋ ସେଇ ଉପରେ ପଡ଼େଛେ, ଆର ତାର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାର ଏକଟି ଧାରା ଏ
ଅନାଥ ବାଲିକାକେ ଆଶ୍ରଯ କରେଇ ବେଗେ ପ୍ରବାହିତ ହେଯେଛେ । ଟୁଲୁର
କଟି ହଦୟଥାନି କଷାଘାତେ ନିରସ୍ତର ଜର୍ଜରିତ ହେଯେଛେ, ଥେକେ ଥେକେ
ଛ'ଏକ ମୁହଁରେ ଫାଁକେ ବାଲିକାର ଅନ୍ତରେର ଏ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନେ ଆମାର ମା-ଇ
ତୀର ସ୍ନେହେର ହାତଥାନି ବୁଲିଯେଛେ । କିନ୍ତୁ ଆମାଦେର ବାଡ଼ୀ ଟୁଲୁ ସେ
ଏସେହେ, ତାର ଦରଣ ତାକେ ଢେର କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ହେଯେଛେ । ରାଯଦେର
ବାଡ଼ୀର ଦୃଷ୍ଟି ଗୁପ୍ତଚରେର ମତ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକେ ଅନୁଗମନ କରେ' ସଦାସର୍ବଦା
ତାର ଗତି ବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରେଛେ । ଭାଲମନ୍ଦ ସାମଗ୍ରୀ ସଥନ ଯା-କିଛୁ
ଆମାଦେର ବାଡ଼ୀତେ ହେଯେଛେ, ମା ହୟ ତ ହେସେଲ ସରେର ଏକ କୋଣେ
ବସିଯେ ତାକେ ଥାଇୟେ ଦିଯେଛେ, କିନ୍ତୁ ରାଯଦେର ଦୃଷ୍ଟି ସେଥାନେ
ଗିଯେଓ ପୌଛେଛେ । ଟୁଲୁକେ ତାରା କତ ଗାଲିଗାଲାଜ କରେଛେ,—ଏକ .

রতি মেয়ে, কিন্তু তার উদরখানি যেন কুস্তকর্ণের মত, বাড়ীতে এত বেঁচায় তবু কি তৃপ্তি আছে, আবার এবাড়ী ওবাড়ী গিয়ে পাত না পাতলে মেয়ের দিন আর যায় না। কিন্তু, অত যে বিড়ম্বনা, তবু টুলুর আমাদের বাড়ী আসা ক্ষান্ত হয়নি ; দু'বেলা অন্তত দু'টিবার সে আমাদের বাড়ীতে প্রতিদিনই এসেছে।

আমি তখন গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলে নৌচের এক ক্লাশে পড়তুম ; ইস্কুলে যারা ছিল আমার সহপাঠী, ইস্কুলের বাইরে আমি তাদের সম্পর্ক বড় একটা রাখতুম না। আমি ছিলুম বিধবা-মায়ের একমাত্র সন্তান ; মায়ের অঞ্চলখানি আমাকে সদাসর্বদা আকস্মিক বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছে। ইস্কুলের ক'টি ষণ্টা ব্যতীত বাড়ীর বার হবার, এবং অন্যান্য ছেলেপিলেদের সঙ্গে দোড় ধাপ ও ছুটোছুটি করবার অবকাশ আমি খুব অল্পই পেয়েছি ; অধিক সময় আমার কেটেছে অন্তঃপুরেই। এই সময় টুলু যখন একটু ফাঁক পেয়েছে আমাদের বাড়ীতে এসেছে, একটি নিঃসঙ্গ বালকের হৃদয়ের কারবার দিনে দিনে তাকে নিয়েই জমেছে।

ইস্কুল থেকে আমি বাড়ী ফিরেছি ; তার অল্পক্ষণ পরেই টুলু আমাদের বাড়ীতে এল ; সেদিন বালিকার কচি প্রাণের পল্লব আরো যেন নেভিয়ে পড়েছিল। আমার স্বমুখে চুপটি করে এসে সে দাঁড়ালে, যেন নৌরব মনোবেদনার জ্যান্ত একটি সাকার রূপ। বালিকার তাপ-দৃশ্য চিত্তে যে মুহূর্তে একটি বালক-হৃদয়ের স্মিশ ও সুশীতল স্পর্শখানি লাগল, তার অন্তরের যে একটা নিবিড় বেদনা, তার পারিপার্শ্বিক হাঙ্গয়ার উভাপে এখনও অঙ্গ হয়ে বালবার অবকাশ পায় নি ; সেই নিমেষে তার দুটি ডাগর আধির পাতায় বিন্দু বিন্দু হয়ে

ଦେଖା ଦିଲ । ବାଲିକାର ପ୍ରାଣେ ସେମିନେର ଏକଟି ବିଶେଷ ଘଟନା ଅତି ନିଦାରୁଣଭାବେ ଆଘାତ କରେଛି ।

ଟୁଲୁକେ ତ ବାଡ଼ୀଶ୍ଵର ଲୋକ ତାଡ଼ନାଇ କରେଛେ, ତାଦେର କାହେ ତାର ଚିନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଚ୍ଛିତ ହେଯେଇ ରହେଛେ, ସେଥାନେ ଯାର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ବାଲିକାର ହଦୟଥାନି ଈସଂ ମେଲେଛେ, ସେ ହଚେ ତାର ପ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟି ବିଡାଳ । ଅବଭା ଓ ଅନାଦରେର ପାଂଚିଲ ଅଳଞ୍ଚ୍ୟ ହେଯେ ଯେଥାନେ ଉଠେଛେ, ବାଲିକାର ଅନ୍ତରାଳୀ ଥିକେ ଥିକେ ଯେନ ଏ ଏକଟି ଶୁଦ୍ଧ ଜାନଲାର ଅଳ୍ପ ଏକଟୁ ଫାଁକେ ମୁଖଥାନି ବାଡ଼ିଯେ ଆଲୋ-ଆକାଶେର ଆନନ୍ଦ-ମୁଣ୍ଡିର ଈସଂ ପରିଚୟ ପେଯେଛେ ।

ଟୁଲୁ ବିଡାଳଟିକେ ବଡ଼ ଭାଲ ବେମେଛେ ; ବାଡ଼ୀର ଲୋକଦେର ବିଷ-ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରାଳେ କୋନ ଏକଟି ନିରାପଦ ସ୍ଥାନେ କଥନୋ ସେ ଯଦି ତାର ସାଙ୍ଗାଂ ପେଯେଛେ, ତାକେ କୋଲେ କରେ ଗାୟେ ତାର କତ ହାତ ବୁଲିଯେଛେ, ତାକେ କତ ସୋହାଗ କତ ଆଦର କରେଛେ ; ତାର ବ୍ୟଥାୟ କତ ସମବେଦନା ଜାନିଯେଛେ । ଆବାର ବିଡାଳଟିଓ ଛିଲ ଏମନିତର ଯେ ବାଡ଼ୀର ଆର ଆର ଛେଲେପିଲେ ଯଦି ତାର ଗାୟେ ହାତ ଦିଯେଛେ, ଅମନି ସେ ହୟ ତ ଦୌଡ଼େ ପାଲିଯେଛେ, ଅଥବା ହିଂସ ଏକଟି ଜୀବେର ମତଇ ଧାରାଲୋ ନଥେର ସାହାୟ ନିଯେଛେ ; ଆର ଟୁଲୁ ଯଥନ ଗିଯେଛେ, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁଟିର ମତ ତାର କୋଲେ ଏସେଛେ । ବିଡାଳଟାର ସଙ୍ଗେ ଟୁଲୁର ଯେ ଅତ୍ତା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଭାବ, ଓଟା ଯାତେ ବ୍ୟକ୍ତ ନା ହୟ, ସେମିକେ ଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାଲିକାର ଯଦିଓ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଛିଲ, ତବୁ ବେଶି ଦିନ ଆର ତା ଗୋପନ ରହିଲ ନା । ଆର ଯଥନ ପ୍ରକାଶ ପେଲ ଯେ, ବିଡାଳଟା ଟୁଲୁରଇ ଏକାନ୍ତ ଅନୁରକ୍ଷ, ତଥନ ଏ ବିଡାଳେର ସମସ୍ତକେ ବାଡ଼ୀର ଲୋକଦେର ମନୋଭାବ ବିବ ହେଯେଇ ଉଠିଲ । ସେମିନ ଟୁଲୁର ବଡ଼ଇ ଆଦରେର ଏ ଯେ ବିଡାଳଟି, ତାର ବିଷାଦସନ ଚିତ୍ରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ-ଲୋକେର ଏକଟି

ক্ষীণ আলোক-রশ্মি বহন করে এনেছিল, তাকেই—ঐ বালিকার যারা
নিষ্ঠুর বিধাতা, তার প্রাণের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটি নদীর
পারে ‘অস্তরীণ’ করেছিল ; আর বালিকা, তার অস্তরে নির্দারণ একটা
আঘাত পেয়ে, আমারই কাছে এসেছিল তার সে বেদনা জানাতে ।

অশ্রুভরা দুটি চোখের দৃষ্টি আমার মুখের দিকে তুলে ধরে টুলু
আর্দ্ধকণ্ঠে যখন জানালে, “তারা আমার বিড়ালটাকে নদীপার করে
দিয়েছে”। বালকের মন তখন যেন একেবারে উদ্ধত হয়ে উঠল,—
বালিকার প্রাণে তারা অস্থায়কৃপে যে নিষ্ঠুর ব্যথা দিয়েছে, তার
একটা প্রতিবিধান করবার উদ্দেশে। আমি সাক্ষনা দিয়ে তাকে
বললুম, “আমাদের বিশুকে কালই ওপারে পাঠাব, এবার তোমার
বিড়ালটিকে আনিয়ে আমাদের বাড়ীতেই রেখে পূষ্ব, দেখব কে
আবার তাকে নদীপার করে”।

বিশু আমাদের বাড়ীর একটি চাকর, আমার সকল আবদার ঐ
বিশুই শুনত। সেদিন বিশু বাড়ীতে উপস্থিত ছিলনা, নতুনা আমি
তাকে সেই মুহূর্তেই পাঠানুম ; সময়ের অপেক্ষা আমারই সইছিল না।
বালিকার দুঃখ সেই দণ্ডে ঘুচিয়ে তার প্রীতিসাধন করবার জন্য একটি
বালকের অস্তর বড়ই উদ্বেল হয়ে উঠল। নদীটি আমাদের বাড়ী
থেকে প্রায় একপোয়া মাইল দূরে ছিল ; টুলুকে সঙ্গে করে’ আমিই
গেলুম, যদি বিড়ালটার কোন সঙ্কান করতে পারি। যখন পাড়ের
উপর এসে আমরা দাঢ়ালুম, শুনলুম, ওপারের একটা ঝোপের
আড়ালে বসে বিড়ালটা মিউ-মিউ করে কাদছে। বিড়ালের কান্না
শুনতে পেয়ে, টুলু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল ; “আয় আয় পুষি
আয়, আয় আয় পুষি আয়”।

বিড়ালটা খোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে, জলের একেবারে কিনারাতে এসে দাঢ়াল, কিন্তু নদীতে সাঁতার দিতে সে আর সাহস করল না ; আবার পাড়ের উপরে উঠে গিয়ে এবার আরো বেশি কাত্রাতে লাগল। টুলু হতাশ হয়ে আমার মুখের দিকে চাইল,— তার ঐ চোখের চাহনি অন্তরের দারুণ কাতরতাই জ্ঞাপন করছিল। বালিকার প্রতি আমার অন্তরের সহানুভূতি আমাকে জানিয়ে দিল, যে বিড়ালটিকে যদি এখানে ঐ অবস্থাতে রেখেই আজ বাড়ীতে ফিরি, সারা রাত তার বেদনা-বিক্ষ হৃদয় অঙ্গ হয়েই ঝরবে। বালিকার ঐ অঙ্গ নিবারণ করবার আগ্রহ বালকের স্বাভাবিক ভৌরুতাৰ অন্তরে একট দুঃসাহস জাগিয়ে তুললে।

নদীৰ এক ঘাটে ছোট একপানি ডিঙি-নৌকো বাঁধা ছিল, আমৱা দু'জনেই গিয়ে ঐ নৌকোতে উঠলুম। নদীৰ গভীৰতা তেমন ছিল না, কষ্টে শ্রেষ্ঠে নৌকা আমি পাড়ে নিলুম ; কিন্তু নৌকাখানি সিধে ভাবে না গিয়ে এদিক ওদিক কৱতে কৱতে, শ্রোতোৱ টানে অনেকটা দূৰে গিয়ে পড়ল। সেখানে একটি জায়গায় নৌকো ভিড়িয়ে রেখে, দুজনেই পাড়েৰ উপর এসে দাঢ়ালুম ; টুলু আবার ডাকল, আয় আয় পুষি আয়, আয় আয় পুষি আয়’। পুষি এবার বালিকার গলার আওয়াজ পেয়েই, দৌড়ে তার সামনে এসে উপস্থিত হল।

যখন ওপারে আমার নৌকাখানি ভিড়েছিল তখনই সন্ধ্যা ; এবার ফিরবার কালে যখন আমৱা নদীৰ বুকে, তখন সাদা মেঘেৱ টুকুৱোৱ মতই দিবাভাগেৱ নিষ্প্রত চাঁদ, অগ্ৰ-মায়েৱ কপালে একটি বুজতেৱ টিপ হয়ে জলে উঠেছিল। প্ৰকৃতি তার অঙ্গেৱ ধূম-ধূসৱ বসনখানি উম্মোচন কৱেছিল, তার দেহ থেকে আলোৱ উৎস ছুটে.

ছিল। আৱ নদীটিৰ যেদিক পানে গতি তাৱ বিপৰীত দিকে, দিগন্তেৱ তরুণ্শ্ৰেণীৰ মাথাৱ উপৱে,—নিবিড় একখানি মেঘ, একটি বিৱাট বিহগেৱ মতই পক্ষ বিস্তাৱ কৱেছিল। আকাশ যেন উতলা হয়ে এদিক ওদিকে ছুটেছিল; তাৱ ত্ৰস্ত-পদক্ষেপে নদীৰ বুক থেকে থেকে বিষম চাঞ্চল্য জেগে উঠেছিল। টুলু,—নৌকোৱ আগ-গোলুয়েৱ দিকে একটি জায়গায় বিড়ালটিকে কোলে কৱে বসে, নদীৰ দিকে একবাৱ বুঁকে পড়ে দেখছিল যে যাদুকৱেৱ হাতেৱ একটি রজত-মুদ্ৰাৰ মত নদীৰ গৰ্ভে আকাশেৱ একটি চাঁদ থেকে থেকে দশটি হচ্ছে, কথন বা একটি মশালেৱ মত জলে উঠছে, আবাৱ এক একবাৱ নদীৰ বক্ষে—চন্দ্ৰমা যেন সোনাৱ একখানি মাদুৱ হয়ে বিছিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ীৰ পুকুৱঘাটে মা আমাকে অল্প বয়সেই সাঁতাৱ শিখিয়ে-ছিলেন, কিন্তু আমাৱ বড় বেশি ভয়-ভাবনা হতে লাগল টুলুৰ জন্মে। টুলুকে আমি বাৱ বাৱ সাবধান কৱলুম; কিন্তু বালিকাৱ অন্তৱেৱ সাবধানতা সেদিন কি ছিল? হারিয়ে-ষাওয়া যে অমূল্য নিধি, তাৱ স্নেহানুৱন্ত একটি বালকেৱ প্ৰয়াস তাকে মিলিয়ে দিয়েছিল, বালিকা তাৱ ঐ ফিৱে-পাওয়া ধন বুকে ধৱে, রাঙ্গস-পুৱীৱ যে রাজ-কন্যা রাঙ্গসদেৱ সহবাসে অতি দুঃখে যাৱ দিন অতিবাহিত কৱেছে, তাৱই মত প্ৰণয়-পাশে বন্ধ একটি রাজপুত্ৰই যেন অমু-সঙ্গিনী হয়ে, স্নোতে তাৱ ডিঙা ভাসিয়েছিল। রূপকথাৰ কৌটো-টিৰ মতই যেন একটি কৌটো—ঐ একটি অনাথা বালিকাৱ অন্তৱে, এতকাল তাৱ দুঃখ বিড়ম্বনাৱ পাথৱ-চাপা হয়ে পড়েছিল, সে দিন ক্ষণকালেৱ অবকাশে তাৱ ঐ কৌটোৱ ডালাখানি যেন সৱেছিল।

বালিকার প্রাণে আনন্দের হাট বসেছিল। নৃত্য-শীলা পরীদের শুন্ধি-সম্মতি উল্লাস-সঙ্গীতে তার হৃদয়ের দিক-দিগন্ত যেন মুখরিত হয়ে উঠেছিল। নদীর এ-পারে ও-পারে যে আলো, প্রিয়জনের সহস্র চূম্বন-বর্ষণের মত অজস্র ধারায় এসে গাছের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় পড়েছিল, এ আলোকের মদে সেদিন টুলু তার অন্তরের শৃঙ্গ পেয়ালাটি ভর্তি করেছিল। যে বাতাস দশাগ্রস্ত ভক্তের মত, নদীর তৌরে, ধানের ক্ষেত্রের সোণার প্রাঙ্গনে আনন্দে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, সেই হাওয়াতে বালিকার চিত্ত যেন উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটেছিল। তাকে কত আমি সতর্ক করলুম, তবু তার অস্থিরতা কিছুতে গেল না ; এক একবার জলের দিকে আরো ঝুঁকে পড়ে, বালিকা উল্লিখিত চিত্তে নদীর বুকে চাঁদের খেলা দেখতে লাগল। একটা হাওয়ার বেগ একবার উদ্বাম হয়ে এসে, আমার নৌকোখানিকে জোরে ধাক্কা দিয়ে জলেদের একটা বাঁশের সঙ্গে লাগিয়ে দিলে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লগি ঠেলছিলুম, সে ধাক্কাটা সামলে উঠতে না পেরে জলের ভিতর ডিগবাজি খেয়ে পড়লুম। তারপর আবার যখন আমি জেগে উঠলুম ; দেখি যে হাওয়ার প্রবল বেগ আমার নৌকোখানিকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, আর অন্য একখানি নৌকো বেয়ে কারা যেন আমার দিকেই আসছে। আমার সর্বাঙ্গ আতঙ্ক ও ত্রাসে আড়ম্বর হয়ে আসছিল ; জলেদের বাঁশটি নিকটে পেয়ে, সেইটে ধরে আমি নেয়েদের ডাকাডাকি করতে লাগলুম।

‘টুলুর বিড়ালটাকে পার করে’ নেবার উদ্দেশ্যে ছোট একখানি ডিঙিতে উঠে, আমি টুলুকে সঙ্গে করে ও-পারে গিয়েছি, মায়ের কানে কি করে যেন এ-সংবাদ পেঁচেছে। মা বড়ই ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে

দু'জন লোক আমার খোঁজে পাঠিয়েছেন। তারাই একখানি নৌকো-
বেয়ে আমার দিকে আসছিল। যখন কাছে এসে তারা আমাকে
তাদের নৌকোতে তুললে, তখন দেখলুম আমার ডিঙ্গিখানি খানিকটা
দূরে গিয়ে, পাড়ের উপ্ডে-পড়া একটা গাছের সঙ্গে বেধে রায়েছে।
টুলু সে নৌকোতে নেই। বালিকার কোলে তার আদরের যে
বিড়ালটি ছিল, সাঁতার দিয়ে সেটি তৌরে উঠেছে ও সেখানে এক
জায়গায় বসে মিউ মিউ করে' ডাকছে। অবোধ জন্ম জানেনা যে,
সে যার প্রতীক্ষায় আছে সে আর কখনো আসবে না, তার ভালবাসার
ধনকে বঁচাতে গিয়ে সে আজ নিজে প্রাণ হারিয়েছে!

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।



সভ্যতার কঠিপাথৱ।

—*—

বনে যেমন অনেক ঋকম ফুল থাকে, যাদের চেহারা দেখলেই তাদের শুঁকতে ইচ্ছে যায়, কিন্তু পরিমল লোভৌকে তাদের নিকট হতে শেষে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরতে হয়, সেইরূপ সাহিত্য-কাননেও অনেক ফুল আছে যাদের বাহিক চাকচিক্যই তাদের একমাত্র সম্বল। সে দিন জনেক বঙ্গুর হাতে ডাঙ্গার কারেল লিখিত “Modern man & his Forerunners” বলে একখানি বই সেখলুম। বইটির নাম, মলাট, ছবি প্রভৃতি আমার মনকে গ্রেপ্তার করে বসল। ধার নিয়ে সেটিকে আঢ়োপান্ত পড়লুম। পড়ে কিন্তু লেখকের উপর রাগ ও হল আর মায়াও অশ্বাল। রাগ হল তার অনুত্ত materialistic মতগুলো দেখে, আর মায়া হল তার ঐতিহাসিক অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে। লেখক পুস্তকের উপক্রমণিকায় বলেছেন যে তিনি ১৫।১৬ বৎসরের গবেষণার পরে বইটি লিখেছেন। যদি তাই হয় তাহলে আমি এ কথা বলতে বাধা যে তিনি যদি ইতিহাস চর্চা ছেড়ে ডাঙ্গারিতে মনোনিবেশ করেন তাহলে তার পক্ষে ও অগতের পক্ষে মঙ্গলকর হবে।

(২)

লেখক সভাতা মাঝক ভিনিসটির ধর্ম নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারের নামই হচ্ছে

সভ্যতা। যে জাত এ বিষয় ঘতবেশি ক্রতিত্ব লাভ করেছে সেই আতিই ঘতবেশি সভ্য। প্রকৃতির উপর আধিপত্যই হচ্ছে সভ্যতার কষ্টি-পাথর। কোনো আতির সভ্যতার পরিচয় নিতে হলে তার এই ক্ষমতার ধৰণ নিতে হবে। ডাক্তার ফারেল আরও বলেন যে দাসহই হচ্ছে সভ্যতার বনেদ। দাসহের উপর ভর করেই সভ্যতার চারুহর্ষ্য সর্বস্থানে পঠিত হয়ে উঠেছে। দাসহ কোন না কোন আকারে সব সভাদেশেই বর্তমান আছে। যে দিন এই মঙ্গলময় দাসহ প্রথা উঠে যাবে, সে দিন সভ্যতা ও জিতিহীন অট্টালিকার শ্যায় অচিরাং ধূলিসাং হবে। এইরূপ খেয়ালের চশমা দিয়ে বর্তমান যুগকে নিরৌক্ষণ করে যে ডাক্তার সাহেবের মনে কতকটা ভীতির সংকাৰ হয়েছে তাতে আশৰ্ধ্য হবার কিছু নাই। অনসাধারণ চারিদিকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার পাবার অস্ত চীৎকাৰ কৱচে, মারামারি কাটাকাটি কৱচে, বিপুল অন্দোলন কৱচে। ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত একচেটে ক্ষমতা ক্রমেই লোপ পেৱে বাঁচে। এই সব মেখেন্দুনে লেখক বৈরাণ্যে অভিভূত হয়ে পড়েছেন। ফলে সভ্যতার, বিশেষত ইউরোপীয় সভ্যতার, স্থায়ীহ সম্বন্ধে তাঁৰ মনে বিলম্বণ সন্দেহ অঞ্চেছে।

(৩)

লেখক সভ্যতার যে সংজ্ঞা নির্দেশ কৰে দিয়েছেন এবং যে-সামাজিক প্রথাকে সভ্যতার সর্বপ্রধান উপকৰণ কৃপে নির্কারিত কৰেছেন, প্রকৃত ঘটনা যদি তাই হয়, তাহলে সভ্যতার বিলোপের উপর চোখের জল কেলোৱাৰ বিশেৰ কোন কাৰণ দেখতে পাওয়া বাবু না। রুশো (Rousseau) বলেছেন “আমি যদি কোন বৰ্বৰ দেশেৰ জাতা হই

তা হলে যে ব্যক্তি সে মেশে সভ্যতার আমদানী করবে কৃণমাত্র ইতস্তত
না করে তাকে ফাঁসি কাটে ঝুলিয়ে দেবো”। লেখক সভ্যতার
যে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা পড়ে ঝশ্চোর সঙ্গে সায় দেবার একটা
প্রবল প্রবৃত্তি মনে জেগে ওঠে। অগতের উন্নতি যদি কষাঘাতে
রক্ষাকৃ কলেবর মাসের শ্রমাঞ্জিত সম্পদের নাম হয়, তাহলে সে
উন্নতির শেষ যুবনিকার যত শীঘ্র পতন হয় ততই মঙ্গল। সভ্যতার
যদি কোন আধ্যাত্মিক অর্থ না থাকে, তাহলে সে সভ্যতার দ্বারা মানবের
অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গল হতে পারে না। যাইবলের সঙ্গে যদি নৈতিক
বলের বিকাশ না হয়, তাহলে সেটা একটা মহা ভয়াবহ বস্তু হয়ে
ঁাড়ায়।

(৪)

লেখক যে সামাজিক অবস্থাকে সভ্যতার পরিচায়ক বলে বর্ণনা
করেছেন তাৱ দৃষ্টান্তের অন্ত পুরাকালের ইতিহাসের ঔর্ণ
নথি ধোলবাৰ দৱকাৰি নেই, একবাৰ বৰ্তমান অগতের উপৱ
দৃষ্টি নিক্ষেপ কৱলেই তাৱ প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি দেখতে পাওয়া
ঘাৰে। এই গত জুন মাসের Edinburgh Review-এ Mr. W.
C. Scully “The Colour Problem in South Africa”
শীৰ্ষক একটি প্ৰকল্প লিখেছেন। সেটি পড়ে বোৰা যায় যে ডাক্তার
ফাৰেল নিৰূপিত সভ্যতার গুণনিয়ম দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পূৰ্ণমাত্রায়
বিৱাজ কৱচে। সেখানে মানুষ প্ৰকৃতিৰ উপৱ দৃঢ়কৃপে আধিপত্য
স্থাপন কৱেছে, সেখানে শ্ৰেণীবিভাগ পূৰ্ণমাত্রায় বিৱাজ কৱচে এবং
দাসৰ তাৱ ক্রূৰ অটোহাসিতে দিগন্ত মুখৰিত কৱেছে। Mr. Soullly

বলেন “within the union limits there is a population of six million souls, only a million and a quarter of whom are Europeans and throughout the greater area comprised by the four provinces—Cape, Transval, Free State and Natal—such a stringent and illiberal colour line is drawn that not alone have the non-European inhabitants, no voice in the management of the country but their social and economic conditions are such as to practically debar them from advancement. Moreover they are subjected to vexations, discriminating laws and are the victims of a deep and growing race-prejudice on the part of the Europeans.”

দেখতে পাওয়া যায় দক্ষিণ আফ্রিকায়, ডাক্ষিণ কারেল যা চান; তাই আছে। কিন্তু তাই বলেই কি, দক্ষিণ আফ্রিকা সভা জগতের শীর্ষস্থানীয় নলে গণ্য হবে? এই কি সেই সভাত্তা যান জন্তু কোনা মানুষের মত মানুষ অকাতরে আজ্ঞা বলিদান করতে পারে? এই কি সেই সভাত্তা ধা নিয়ে আমরা এত গোরুব হরে বেড়াই?

(୯)

এই গত ইউরোপীয় মহাসময়ে জার্মানীর প্রতিপক্ষ দলের লেখকগণ, জার্মানীকে নানা বিশেষণে বিভূষিত করেন। জার্মানদের বলা হয় সভ্যবর্ষীর (Civilized Barbarian)। কথাটি অর্থহীন নয়, কারণ এর অর্থ সকলেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ কথাটির ধারা কি এ সভ্যের

প্রকাশ হয় না যে, প্রকৃতির উপর আধিপত্য ছাড়া অন্য কোন গুণের অস্তিত্ব না থাকলে একটা আতিকে সভ্য বলে গণ্য করা যায় না। জার্মানদের মধ্যে বিদ্যা ছিল, বৃক্ষ ছিল, বিজ্ঞান ছিল, organization ছিল, কিন্তু তবুও তারা বর্ষৱ। কেন?—প্রেসিডেন্ট উইলসনকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলবেন যে তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নেই, অপরের অস্তিত্বের স্বত্ত্ব তারা স্বীকার করে না, রাজনীতিতে যে শায় অশ্যায় পথ বলে একটা কথা আছে সেটা তারা মানে না, আতীর চুরি যে ব্যক্তিগত চুরির শায় দোষনীয় একথা তারা বোঝে না, ইত্যাদি।

(৬)

কি কি গুণের ও ক্ষমতার সমাবেশ একটি আতির মধ্যে ঘটলে তাকে সভ্য নামে অভিহিত করা যেতে পারে সে বিষয়ে মত ভেদ আছে এবং ধার্কা ও স্বাভাবিক, তবে একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে সভ্যতা নামক বিশেষণটি কেবল বাহ্যবলের নামাঙ্কন মাত্র নয়। একজন আততায়ী যদি বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে তার পৈশাচিক উদ্দেশ্য চরিতাৰ্থ কৱাৰ জন্মে শুর্কোশলে ব্যবহাৰ কৰতে শেখে, আমৰা তাৰ অন্য তাকে, তাৰ সভ্যতাকে আশীর্বাদ কৰিব না। সভ্যতার সম্বন্ধ পাশবিক ক্ষমতার সঙ্গে নয়—নৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে। বাহ্যবলের সঙ্গে সভ্যতার সম্বন্ধ ধারকতে পারে কিন্তু সে সম্বন্ধ নিত্য নয়—নৈমিত্তিক। যিন্তু খুঁট একজন নিঃসহায় ব্যক্তি ছিলেন আৱ যে Pilate নাকি তাঁকে ক্রুশে টাঙিয়ে ছিল, সে ছিল একজন ক্ষমতাশালী রোম-প্রতিনিধি। রোমের

অতুলনীয় ক্ষমতা তাঁর ইঙ্গিতে চলত। কিন্তু তাই বলে কি Pilate-কে যিন্ত অপেক্ষা বেশি সভ্য বলতে হবে? ব্যক্তিগত কথা ছেড়ে, আত্মর কথাই নিন। নব্যবুগের গ্রৌসের বিজ্ঞানবল প্লেটোর যুগের এখেন্স অপেক্ষা অনেক বেশি। এখন গ্রৌসে রেল-গাড়ী আছে, মোটর ছুটছে, টিমার চলছে, তোপ, কামান, বন্দুক, কল-কারখানা সবই আছে, আর প্রাচীন এখেন্সে এসবের কোন চিহ্নই ছিল না। এ সব সহেও প্লেটোর এখেন্স কে আমরা নবীন গ্রৌস অপেক্ষা বেশি সভ্য বলে মনে করি। এর কারণ কি?—এর কারণ হচ্ছে এই যে, প্রাচীন এখেন্সে মানবাঞ্চার যে বিকাশ হয়েছিল আজকালকার গ্রৌসে তাঁর কোনও লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। জীবনের মূল উদ্দেশ্যের অনুসন্ধানে এখেন্স যে ব্যগ্রতা দেখিয়েছিল এখনকার গ্রৌসে তাঁ দেখতে পাওয়া যায় না। ব্যক্তিহের বিকাশের চেষ্টা এখেন্সই করেছিল এখনকার গ্রৌস সে চেষ্টা নেই। এবং উভ মহান् উদ্দেশ্যবয়ের অনুশীলনে এখেন্সের যে কৃতিহ লাভ হয়েছিল এখনকার গ্রৌসের তা স্বপ্নেও অগোচর। এইজন্তই আমাদের নিকট প্রাচীন এখেন্সের এত কদর। এই একই কারণে আমরা প্রাচীন ভারতকে নব্য ভারত অপেক্ষা এবং গেটের জার্মানীকে নব্য আর্মাণী অপেক্ষা বেশি মহামূল্য বলে মনে করি।

(৭)

সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্ত ষেমন আমাদের অন্তরে বিচার-বুকি নামক একটা ক্ষমতা আছে, ভালমন্দ প্রশংসনীয় নিম্ননীয় নিম্নপংগের জন্তও আমাদের সেইরূপ একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিটির

বাঙলা নাম হচ্ছে ধর্মজ্ঞান, আর ইংরাজিতে তাকে বলে “The sense of right and wrong.” ক্যান্ট সেটাকে Practical Reason বলেছেন। এই কর্তব্য বুকির দ্বারা যে জিনিসটি অঙ্গুমোদিত হয় সেটি হচ্ছে বাহ্যনৌয়—good. এই বুকির প্রাচুর্য যে আতির মধ্যে ঘটেছে সেই আতিই সভ্য আর যে আতির অবস্থা ইহার বিপরীত, সে জাতিই বর্ণন। এই শায়াশ্যায় জ্ঞানই হচ্ছে সভ্যতার বিচারক। এর দ্বারা যাচাই করেই আমরা জ্ঞানতে পারি যে কোন্ জাতি সভ্য আর কোন্ জাতি অসভ্য।

(৮)

কোন্ কোন্ ব্যক্তিগত এবং জাতীয় গুণ প্রশংসনীয়, কোন্ কোন্ গুণ নিষ্পন্নীয়, সে বিষয়ে অবশ্য বিস্তৃত মতভেদ আছে। এই মতভেদ-বশত কোন কোন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, morality ও এক রূক্ষ রূচি বিশেষ। একই কাজ এক অনের নিকট প্রশংসনীয় এবং অন্য অনের নিকট নিষ্পন্নীয় বিবেচিত হয়। বৈত্তিক কর্মের মধ্যে এমন কোন সাধারণ গুণ (common element) নেই যাকে সকলেই শিরোধার্য করে নিতে পারে। যদি থাকত তাহলে এ বিষয়ে একপ ব্যক্তিগত ও আতিগত মতবৈষম্য দেখা যেত ব। তাল মন্দের বিচারও অ্যামিতির সিদ্ধান্তের মত অকাট্য হত। তাঁরা বলেন আমাদের তাল মন্দের বিচার কতকটা ধাত্তজ্ঞব্যের উপাদেয়তার বিচারের স্থায়। হুই ব্যক্তির মধ্যে যেমন কাঁটাল এক অনের নিকট অমৃততুল্য অঙ্গুভূত হয় এবং সেই একই ফল প্রতীয় ব্যক্তির ব্যবনেচ্ছা আনয়ন করে, সেইরূপ মাতৃ-হত্যাও কারও নিকট এক বিষম পাপ

কলে অনুভূত হয় এবং কেউ তাকে একটা প্রশংসনীয় কাজ বলে মনে করে। কাটাল সম্বন্ধে রুচির বিভিন্নতা যেমন একটা ব্যক্তিগত জিনিস, মাতৃহত্যা সম্বন্ধে মতভেদও ঠিক সেইরূপ একটা ব্যক্তিগত রুচি-ভেদ মাত্র। সার্ববর্তোমিক নীতি (Universal moral Law) বলে কোন জিনিস নেই, ওটা একটা অলিক স্বপ্ন মাত্র।

(৯)

এই আতীয় দার্শনিক এ কথা ভুলে যান যে, যদি কোন কুক্ষ মেজাজের লোক তার এই অনুভূত মত শুনে ধৈর্য হারিয়ে লাঠি মেরে তাকে ঘায়েল করে বসে, তাহলে তিনিই তারস্বত্রে বলে উঠবেন—লোকটির সাজা হওয়া উচিত। জজ-সাহেব যদি রায়েতে লেখেন যে রুচির বিভিন্নতা দোষণীয় নয়, অতএব আসামীকে ছেড়ে দেওয়া হোক, তাহলে দার্শনিক ম'শায় ক্ষণমাত্র ইতস্তত না করে বলে উঠবেন, “বড় অস্থায় হয়েছে, সমাজ আর টিকবে না, শীগ্রগির অরাজকতা আরম্ভ হবে। সভ্যতা এবাবে লোপ পাবে,” ইত্যাদি। কেউ যদি উন্তরে বলে, “কেন, অরাজকতা এলই বা—ক্ষতি কি ?” দার্শনিক অমনই উন্তর দেবেন, “তাহলে বর্দনরতা ফিরে আসবে”। তার্কিক যদি বলে, “বর্বরতা এলই বা ক্ষতি কি ?” দার্শনিক বলবেন, “মানুষের স্বত্ত্ব চলে যাবে, দর্শন বিজ্ঞান লোপ পাবে, আরও নানা রুক্ম অনিষ্ট হবে”। বোধ গেল দার্শনিক মশায় এই জিনিসগুলিকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। তার্কিক কিন্তু অত সহজে হার না মনে তার কথাতেই উন্তর দেবে, “যে সে জ্ঞান বিজ্ঞানকে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে না। এ সব জিনিস তার নিকট অরুচিকর, এর প্রতিকার কি

কি কর্বেন” ? দার্শনিককে তখন বলতেই হবে, “ও-ব্যাটার মাধ্যাম দোষ আছে, ওকে পাগলা গালদে পোরা দুরকার, না হলে ও বিষম প্রমাদ ঘটাবে ইত্যাদি”। নৌভিটাকে আম কাটালের সঙ্গে তুলনা করলে তার ফল এই রকমই হাস্তাস্পদ হয়ে দাঢ়ায়। সমাজের শক্ত হওয়া দোষণীয়, তা না হলে শক্তকে জেলে পূরবার আমাদের কি অধিকার আছে ? দার্শনিক যদি বলেন, “আত্মরক্ষার জন্য আমরা ও-কাজ করতে বাধ্য”। তার্কিক তখনই বলে উঠবে “আত্মরক্ষার প্রয়োজন কি ? আমরা সকলে মরমুমই বা” ? তখন দার্শনিককে বাধ্য হয়ে বলতে হবে “জীবনটা বাস্তুনীয়, এটা একটা অমূল্য জিনিস। এ থেকে যা পার আদায় করে নেও”।

(১০)

দর্শন বিজ্ঞানের সব কচকচি ছেড়ে দিলে আমরা দেখতে পাই যে, আসল কথা এই যে ভালমন্দ বিচারের একটা ক্ষমতা আমাদের সকলেরই আছে এবং আমরা যেটাকে ভাল মনে করি সেটা হওয়া উচিতও মনে করি। ভাল মন্দের জ্ঞানটাকে আমরা ঝুঁচিবিশেষ বলে মনে করি নে। যা পাপ তা যেকেউ করুক আমরা সেটাকে দোষণীয় মনে করি। আমাদের কর্তব্য-জ্ঞান (Practical Reason) বলে, ভাল কাজ সকলেরই করা উচিত আর মন্দ কাজ থেকে সকলেরই দূরে থাকা উচিত। জ্ঞানী যে-কোরণে তার বিচার বুদ্ধিকে মানেন, ঠিক সেই কারণেই তার বিবেক বুদ্ধিকেও মানেন। দুটিই মানুষের ঈশ্বর দশ অমূল্য ধন, দুটিই সমান শিরোধার্য। অবশ্য কোন্ বিশেষ কাজটি ভাল আর কোন্টি মন্দ

সেই নিয়ে মত তেম আছে। কিন্তু কোন্টি সত্য আৱ কোন্টি মিথ্যা এ নিয়ে কি মতভেদ নাই? বৈজ্ঞানিকেৱা এক সময় পৃথিবীকে চতুর্ভূক্ষণ বলতেন আৱ এখন বলেন সেটা গোলাকাৰ। কিন্তু এ ক্লপ বিভিন্নতা ঘটেছে বলেই কি আমৱা বলতে পাৱিযে পৃথিবী গোলও বটে আৱ চতুর্ভূক্ষণ বটে? এখন একজন যদি বলে যে রাম তাৱ মাকে খুন কৱে মহাপাপ কৱেছে এবং আৱ একজন যদি বলে বৈ, না সে অক্ষয় পুণ্য অর্জন কৱেছে, তাহলে এই দুইটি মত কখনো সত্য হতে পাৱে না। এৱ মধ্যে একটি সত্য আৱ একটি মিথ্যা। সত্যাসত্য নিয়ে মতভেদ ঘটলেই যেন আমৱা বলে উঠিবা বৈ, সত্যাসত্য বলে কোন জিনিস নাই। সেইক্লপ ভাল মন্দেৱ বিষয় মতভেদ ঘটলেও এ কথা মুক্তিযুক্ত নয় যে, ভাল মন্দ বলে কোন জিনিস নেই। এ সব কথা হচ্ছে ইংৰাজিতে যাকে বলে *platitude* কিন্তু মৰ্মন বিজ্ঞানেৱ প্ৰকোপ যখন বড় অসন্তুষ্ট রূক্ষ বেড়ে বায় তখন *platitude* হয় আমাদেৱ প্ৰধান আশ্রয়স্থল।

(১১)

ভাল মাৰে, হওয়া উচিত। সত্যতাকে যে আমৱা ভাল বলি তাৱ মানে সেটা হওয়া উচিত। আমাদেৱ প্ৰথম স্থিৱ কৱতে হবে যে কি কি জিনিস হওয়া উচিত। ভাৱপৰ দেখতে হবে যে সে জিনিসগুলি কোন সমাজবিশ্বে আছে কি না। যদি ধাকে তবে সে সমাজ সত্য আৱ যদি না ধাকে তাহলে সে সমাজ বৰ্কৱ। অবশ্য নিখুঁত সত্যতা perfect civilization কোথাৱ পাওয়া যাব না। কখনও আমৱা perfect state-এ পৌছুব কিনা, সে কথা আমি এখানে আলোচনা

কর্মচি নে। আমি এখানে এই বলতে চাই যে perfection-এর একটা নজ্বা পরিস্ফুট ভাবেই হোক আৱ অপরিস্ফুট ভাবেই হোক, আমাদের মনের মধ্যে অস্তৱনিহিত আছে এবং সে নজ্বাৱ সঙ্গে বে-সমাজের যত বেশি সৌসামৃগ্র আছে সেই সমাজ তত বেশি সভ্য।

আমি পুর্বেই দেখিয়েছি যে প্রকৃতিৰ উপৱ আধিপত্য বিস্তার কৰলেই সভ্যতা লাভ হয় না। বিজ্ঞানের উন্নতিৰ সাথে মনুষ্যহৰে বিকাশ ঘৰোপযুক্তকৰণে হয় নি বলেই বেঞ্চামিন কিড আক্ষেপ কৰে বলেছেন—“Civilization has not yet arrived, for that of the West is as yet scarcely more than glorified savagery.” সভ্যতার সম্বন্ধও বাহিক সম্পদেৰ প্রতাপেৰ সঙ্গে নয়, মানসিক নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষেৰ সঙ্গে; দাসহৰে সঙ্গে নয়, সাম্যেৰ সঙ্গে; বিজ্ঞানেৰ সঙ্গে নয়, জ্ঞানেৰ সঙ্গে। যেখানে মানুষেৰ মন ফুলেৰ যত কুটে উঠেছে, যেখানে তাৱ আজ্ঞা পত্তন থেকে দেবহৰে দিকে উঠে যাচ্ছে, যেখানে দয়া ধৰ্ম স্নেহ যত্নতা সম্মানকে তাৰেৰ স্বৰ্গ খৃঞ্জলে জৰমেই দৃঢ় হতে দৃঢ়তৱ ভাবে বাঁধছে, সেখানেই প্ৰকৃত সভ্যতার বিকাশ হচ্ছে। এ সব কথা মামুলি হলেও সভ্য।

(১২)

দাসত্ব—সভ্যতার ভিত্তি নয়, ভিত্তি অসভ্যতাৰ। মানুষ আৱ কে কোন কালেৰ অন্ত স্থৰ্ট হোক, গোলাম হৰাৱ অন্ত স্থৰ্ট হয় নি। সুজ্ঞৱাং বে-সমাজে দাসত্ব আছে, তাৱ সভ্যতায় বৰ্কৰৱতাৰ বীজ আছে। দাসহৰে আৱা প্ৰকৃত সভ্যতা কোনও সমাজে গঠিত হয় নি,

দাসত্ব সঙ্গেও গঠিত হয়েছে। কলিকাতা, লঙ্ঘন প্রভৃতি বড় বড় নগরে অসংখ্য বাস্তুবনিতার সমাগম দেখতে পাওয়া যায়। এমন বড় সহর নাই বেধানে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা তাদের জাল বিছিয়ে না বসে আছে। সমাজের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ চিরস্থন। কিন্তু তাই বলে কি আমরা বলতে পারি যে, উক্ত নগরগুলিতে যা কিছু সভ্যতা দেখতে পাওয়া যায়, তা বেশ্টা-প্রধার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। ডাক্তার ফারেল দাসত্ব সম্বন্ধে যা বলেছেন তাও কতকটা এই শ্রেণীরই যুক্তি।

(১৩)

সভ্যতা সমাজেই সন্তুষ্পন্ন। সামাজিক-জীবন রক্ষার অঙ্গ যে সব অঙ্গুষ্ঠান আবশ্যিক সে সবের সংস্থান যে-সমাজে নেই তার সভ্যতাকে lopsided (একরোধা) বলতে হবে। যে সব জিনিসকে সমাজ মূল্যবান মনে করে তাদের রক্ষার ক্ষমতা যদি সমাজের না থাকে, তাহলে আমরা সে সমাজের সভ্যতাকে পূর্ণবয়ব বলতে পারি নে। এই সমাজিক আঙ্গুষ্ঠার জন্ম বিজ্ঞান একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। বিজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃতির শক্তিসমূহকে আমরা নিজের বুশে আনতে পারি এবং তাদের সাহায্যে সমাজের মঙ্গল সাধন এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারি। এই হিসেবে প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তার, জাতীয় জীবনের একটি প্রধান কর্তৃব্যের মধ্যে গণনীয়। আমার মনে হয় এই সামাজিক সভ্যতা ডাঃ ফারেলপ্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের মনে একপ প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তাঁরা জীবনের অঙ্গ সব সত্ত্বের প্রতি অঙ্গ হয়ে পড়েছেন। জীবনের মঙ্গল দর্শনে তাঁরা এমন মেতে গেছেন যে

এ ছাড়া যে জীবনের আর কিছু আছে, তা তাঁরা একেবারে বিশ্মৃত হয়ে গেছেন। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, জীবন কেবল একটা মল্ল-মুক্ত নয়, এটা আত্মার একটা অনন্তকালব্যাপী উন্নতির চেষ্টাও বটে। তাঁরা আত্মার এই মর্মান্তিক মন্ত্র ভুলে গেছেন—“আজ বাহায়েম বাহুরা দারম, আজ মালায়েক হাম, আজ বাহায়েম বোগজুর তা আজ মালায়েক বুগজুরি”। অর্থাৎ—আমাদের মধ্যে পশ্চও আছে আর ফেরিস্তাও (angel) আছে। পশ্চও ছেড়ে উঠ, তাহলে ফেরিস্তাদেরও ছেড়ে উঠবে।

ওয়াজিম আলি।

ঝিলে জঙ্গলে শীকান্ন ।

—*—

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

স্নেহের অন্তর্কা কল্যাণ,

সে যে কত বৎসর আগে, আমি আমার তা মনে নেই, মনে আমি করতেও চাই নে । এক সুন্দর ঝোঁকারাতে, ব্যাত্রবাজের সঙ্গে বনপথে আমার প্রথম শুভদৃষ্টি হয় । তখন মাঘ মাস, আমি আমাদের দেশের বাড়ীতে ছিলাম । সেদিন ভোরে গায়ের একজন লোক এসে আমায় খবর দিলে, গায়ের সীমানায় আগের রাতে, তার একটা মন্ত্র মোষ বাঘে মেরে রেখে পিয়েছে । স্থানটি পরীক্ষা করে আনা গেল উভয় পক্ষের যুক্তের কোন চিহ্ন নেই । বাঘটি খুব সন্তুষ্ট লুকিয়ে কাছাকাছি প্রতীক্ষা করে ছিল, ঘাড়ে এসে পড়ে বেচাবীকে প্রাণে মেরেছে । মহিষ-সাংস অল্পই সে আহার করেছিল এবং পাশের চৰা-ক্ষেত্রে যে পদচিহ্ন রেখে গিয়েছিল, তাহতে স্পষ্টই আনা গেল—তিনি একটি অসুরবিশেষ । তখন আমার বয়স একেবারেই কাঁচা, তা ছাড়া শীকারীদের উপর, উপরওয়ালাদের কড়া হকুম যে, আমাকে বাঘ ভালুক শীকারের কোন উৎসাহ না দেয় কিন্তু সাহায্য না করে । সেই অস্ত্রে শীকারীদের সঙ্গে নিয়ে বন পিটিয়ে বাঘটিকে যে ষেরোও করব, তার কোন আশাই ছিল না । কাছেই একটা গাছে মাচান বাঁধা হল—

আসনটি নিরাপদ হলেও নিঃশব্দ ছিল না, একটু নড়া চড়াতেই ক্যাক
ক্যাক শব্দ করে উঠত। সূর্যাস্তের বহুপূর্ব হতেই আমি গিয়ে
আসন নিলাম, সঙ্গে এক বঙ্গু ছিলেন, তিনি না ছিলেন শীকারী, না
আনতেন তার কায়দা কানুন। অল্প কালের মধ্যেই সন্ধ্যার অন্তর্কারে
চারিদিক ছেঘে গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে স্বাইপ আর হাঁস আমাদের মাথার
উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল, ক্রমে বন-প্রান্তের সম্পূর্ণ নিষ্ঠুর হয়ে এল,
শুধু রাত্রিচর পাথীর ডাকে মাঝে মাঝে সেই গভীর নিষ্ঠুরতা
কণিকের অন্তে ভজ হচ্ছিল মাত্র। আকাশে প্রায় পূর্ণ-চন্দ্র, রাত্রিখানি
যেন মাঝা ফটক। দুটি একটি বেজি টুকুটুক করে আসতে লাগল,
ভয়ে ভয়ে, থেমে থেমে, ঝুঁত মহিষের কাছে অগ্রসর হবার আগে,
গমা বাড়িয়ে চারিদিক বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে নিলে, কিন্তু সেখানে
অধিকক্ষণ রইল না। এর পরে হ'একটি শিয়াল দেখা দিলে, আর
দলের মধ্যে যার কুধা কিস্বা সোড একটু বেশি তিনি আহার কুকু
করে দিলেন। আমরা উপর হতে ছোট একটি শুকনো ডাল ছুঁড়ে
দিতেই, চমকে উঠে দেরোড়। অনেকক্ষণ ধরে বলবার মত কোন
ষটনাই ঘটল না। রাত নটার পর নদীর ধারে কুকুর ডাকতে
আরম্ভ করল, ক্রমে বন্তির কুকুরেরাও তার সঙ্গে যোগ দিলে। এ
ডাকাডাকি ও অল্পক্ষণের মধ্যেই থেমে গেল, আর কোন নড়াচড়াও
কোর দিকে রইল না, কেবল কাছাকাছি একটা শিমূল গাছ হতে কতক-
গুলো শকুন থেকে থেকে টেচিয়ে উঠতে লাগল, হাত বিশেক তফাতে
বাঁ দিকে অঙ্গলের মধ্যে একটি বড় আবোয়ারের বিশাসের গভীর শব্দ
শপ্ট শোনা যেতে লাগল। বঙ্গু আমার ঘাড়ের উপর হাত রেখে,
বাঁয়ে থে দিকে দেখালেন বহু চেষ্টাতেও সে দিকে আমার চোখে কিছু-

পড়ল না। একটি প্রকাণ্ড বাষ্টির আমাদের মাচানের নৌচে এলে বাড়িয়েছিল, বঙ্গুর ধ্যাননিশ্চল দেহ আর তস্ময় দৃষ্টি হতেই বোৰা পেল তার সমস্ত মন বাষ্টি আকর্ষণ করে নিয়েছে। ত্বএক নিমেষ সময় মাত্র, বাষ্টি মাচানের নৌচে হতে খোলা অমিতে বেরিয়ে ধৌরে ধৌরে শৃঙ্খল মহিষের দিকে অগ্রসর হতে লাগল কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছিল সে এক অনস্ত যুগ।

সে এক চমৎকার দৃষ্টি, সে যখন ধীরগস্তীর পাদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছিল তখন উজ্জ্বল চন্দ্রামোকে তার হলদের উপর কালো ডোরা-কাটা পৱীর, এমন কি গলার কাছের দাঢ়ীগুলি পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। নিঃশব্দে আমার বন্দুকটি আমি বাড়িয়ে ধরলাম (তখন আমার সেকেলে ধরণের ভারী বন্দুক ছিল), ঘাড়ের কাছটিতে নিশানা করে আওয়াজ করব আর কি, এমন সময় বঙ্গ আমার কাপড় ধরে আর একটান দিলেন। সেই লক্ষ্যীছাড়া টানে, আমি তাঁর দিকে ফিরে চাইলাম, প্রবীন ব্যক্তি গন্তীর ভাবে, তঙ্কণ শীকারিতিকে ‘উপদেশ’ দিলেন, “আরে সবুর কর, যখন আহাৰ সূক্ষ্ম কৱবে তখন মেরো”। হায় হায় আমার অদৃষ্ট ! সবুরে মেওয়া ফল্লনা ! যখন আবাৰ ফিরলাম তখন আমার কামনাৰ ধন অদৃষ্টপ্রায়। প্রতিযুক্তেই প্রতীক্ষা কৰে বলিলাম, এই বুঝি ফিরবে কিন্তু “সে গেল ধৌরে”—নাহি এল ফিরে ! না আসবাৰ কাৰণ হয়ত কিছু ঘটেছিল, মাচানটাতে কোন শব্দ হয়ত বা হয়েছিল, কিন্তু বঙ্গুর চুপি চুপি কথা শোৱে হয়ে গিয়েছিল (চুপি চুপি কথা ও আমার কপালে শোৱে হল !) যে অনিশ্চিত কাৰণই হোক, নিশ্চিত এই যে তাঁৰ দেখা আৰ পাওয়া পেল না। “মধুনিশি পূর্ণিমাৰ, ফিরে আসে

বাবু বাবু, সে বাধ এল না আর যে গেল কিরে”। এক শিক্ষা আমার
হল, স্বয়েগ ছেড়ে, আরো ভালো স্বয়েগের অন্ত আর কখনো মুহূর্ত-
মাত্র অপেক্ষা করা নয়। আমার দুঃখের বাড়া দুঃখ এই যে, বা করতে
পারতাম তা করি নি, আর সেই কথা ভুলতেও পারি নি।

এখন আমি তোমাদের আমার প্রথম বাস্তি লাভের গল্পটি
বলব। এ লাভ এক অপূর্ব আনন্দ, সে আনন্দের সহানুভূতি শুধু
শুনে হয়না, নিজের অভিজ্ঞতা ধাকলে তবে ঠিক বোঝা ষাট।
এই ব্যাপারের রঞ্জনী ছিল মধ্য-প্রদেশে—ঝেলওয়ে ষ্টেশন হতে
বছদুরে আমাকে যেতে হয়েছিল। কতকটা পথ গাড়িতে, তার পুর
টাটু ঘোড়ায়, সব শেষ হাতীতে চড়ে গিয়েছিলাম। এই ভাবে একটি
সন্ধ্যা আর সাবাটি রাত কঢ়িল। পথে কোথাও ধামতে না পারায়,
এ ধাতা বড়ই আন্তিজনক হয়েছিল, যে রমনীয় দৃশ্যের মধ্য দিয়ে
আমি ষাটিলাম, জ্যোৎস্নালোকে সে পথ আরো সুন্দর হয়েছিল।
আমার হাতীকে দেখে একটি রাত্রিচর পাথী ডাকতে শুন্ন করল, তার
তীক্ষ্ণ সমন্ত বনভূমি প্রতিখনিত করে তুলেছিল, বক্ষণ আমার
হাতী ঘন তক্ষসমাচ্ছম উপত্যকার গভীর অঙ্কুরে মিলিয়ে না পেল,
বক্ষণ আর সে শুন্ন ধামল না। যখন আমি আমার তাবুতে গিয়ে
পৌছিলাম—তখন পূর্বের আকাশ ব্রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। আমি আর
বিলম্ব না করে, শ্রান্ত শরীর কুণ্ডলী পাকিয়ে তৃণশয়ার শৈলে
পড়লাম। কতকণ এভাবে কেটেছিল বলতে পারি নে কিন্তু মনে
হল যেন, আমি যাই অতিবি হয়ে গিয়েছিলাম, তিনি আমার বড় বেশি
শীগুপ্তির এসে আগিয়ে দিলেন। শীকারীরা শুভ-সংবাদ নিয়ে এসেছে,
বাদি যাঘটিকে হস্তগত করতে চাই, তাহলে অবিলম্বে ধাজা করা

ଆବଶ୍ୱକ । ସେଲା ଦଶଟାର ସମୟ ଆବାର ଆମରା ଗୋ-ଧାନେ ସାଜା କରିଲାମ—ଚତ୍ର ମାସେର ରୌଦ୍ର ମାଥାର ଉପର କରେ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭେତେ, ନଦୀ ନାଲା ପାର ହେଁ, ଅଗସର ହତେ ଲାଗିଲାମ । ଶ୍ରାନ୍ତ ବଲଦଗୁଲି ବଦଳ କରତେ ସେ ଟୁକୁ ଥାମା ଆବଶ୍ୱକ, ତାର ବେଶ ଆର କୋଥାଓ ବିଶ୍ରାମ କରା ହସ୍ତ ନା । ଶ୍ରାନ୍ତିକର ଦୌର୍ବତମ ଦିନେରେ ଶେଷ ହୟ, ରାତଟି ଭାଲଇ କେଟେଛିଲ । ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ, ୧୦୧୨ଟି ବଲଦ ଛିଲ, ତାର ଅଧିକାଂଶଇ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ବାଘକେ ଲୋଭ ଦେଖିଯେ ଆନବାର ଉଦ୍ଦେଶେ ଏଗୁଲିକେ ଆନା ହୟେଛିଲ । ସଙ୍ଗଲୀ ଦେଶର ହିନ୍ଦୁର ମତ, ମାରହାଟ୍ଟାରୀ ବାଷେର ଉଦୟ ପୂରଣେର ଅଶ୍ୱେ ଗରୁ ବେଂଧେ ଦିତେ ଆପଣି କରେ ନା । ସେ ସାଇ ହୋକ ଏ ଗଡ଼ଲିକା ପ୍ରବାହ ଅଗସର ହୟେଇ ଚଲି, ଆବାର ଯଥନ କୋନ ପାଥରେରେ ଉପର ଉଠେ କିମ୍ବା ଗର୍ତ୍ତର ମଧ୍ୟେ ନେମେ, ଆବାର ଉଠେ ଚଲିଲେ ତଥବ ଆମାଦେର ଏମନି ଝାଁକାନି ଆର ଧାକ୍ତା ଥାଓୟାଲେ ସେ, ତାର ଶୃତିଚିହ୍ନ ବହୁକାଳ ସାବନ୍ ଆମାଦେର ବୁକେର ପାଞ୍ଜରେ ଦେହେର ହାଡ଼େହାଡ଼େ ସଜାଗ ବୁଯେ ଛିଲ । ରାତ ଦୁଇ ପ୍ରହରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଏକ ଧାକ୍ତା ଖେରେ ଆମାର ଘୁମ ଭେବେ ଗେଲ, ଜେଗେ ଦେଖି ଗାଡ଼ୀ ନାଲାଯି ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ସାଜେ ଆର ଆମି ଖଦେ ଗଡ଼ିଯେ ଚଲେଛି !

ଗାଡ଼ୀର ବଲଦଗୁଲୋ ପ୍ରାପଭୟେ ପ୍ରାଣପଣେ ଦୌଡ଼ ଦିଯେଛିଲ, କାରଣ ଗାଡ଼ୀର ପିଛନେ ସେ ସବ ବୁଡ଼ୋ ବଲଦ ବାଁଧା ଛିଲ, ତାରି ଏକଟାର ଉପରେ ବାସ ଏସେ ଝାଁପ ଦିଯେ ପଡ଼େଛିଲ—ଅନେକକ୍ଷଣ ହତେଇ ଖୁବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏ ପିଛୁ ନିଯେ ଶୁଣେଗେର ଅପେକ୍ଷାଯ ଛିଲ । ଜେଗେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମାର ଚୋରେ ପଡ଼ିଲ, ସମପୂର୍ଣ୍ଣ ରୌରବ ତାର କାଛେ କୋଥାଯ ଲାଗେ ! ଚୀଏକାର, ବିଲାପ, କ୍ରମନ, ହାତ ହାତ୍ୟ, ଆକ୍ରୋଶ, ଆକ୍ଷେପ, ଏବଂ କପାଳେ କର୍ମାଧାତ । ଆମାର ନାକ ଦିଯେ କିଞ୍ଚିତ ରସ୍ତପାତ ଛାଡ଼ା ଆର ବଡ଼ ବେଶ କିଛୁ କଣି

হয় নি। আবার সকলের যাত্রা করবার যত সুস্থ অবস্থায় বিরে
আসতে কিছুক্ষণ সময় গেল, সূর্যোদয়ের অল্প পরেই আমরা তাঁরুতে
পৌঁছিলাম। পথে আর কোন বাধা বিপ্র হয় নি। কিছুক্ষণ পরেই
সুসংবাদ কর্ণ-গোচর হল,—“গারা হোগিয়া”—অর্থাৎ বাষ্পে শীকার
ঘায়েল করে গিয়েছে, আমাদের তাঁর হতে বেশি দূরে নয়—
কাছেই। প্রাতরাশের পূর্বে কিন্তু পরে, মৃগযাযাত্রা হবে সেই
বিষয়ে তর্ক উঠল। মীমাংসা হল যে, পূর্বে যাত্রাই সমীচীন। মহারাজীয়
খাত্ত সম্বন্ধে যাদের রসনাৰ অশিক্ষিত পটুত নেই—তাদের প্রতি
আমার উপদেশ, “তফাং যাও, তফাং যাও”।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শীকারের সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল, আমরা মৃগয়া
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলাম। বন্দুকধারী শীকারী সবেমাত্র দুজন, আমি
আর আমার বন্ধু। এছাড়া বন্ধুর অনুচরবর্গ, নানা যুগের নানা
আকারের বন্দুক ঘাড়ে করে চারিদিকে ধিরে দাঙিয়ে গিয়েছিল। এর
মধ্যে কয়েকজন গাছে উঠে বসেছিল—বাঘ যদি পালাবার চেষ্টা করে
তাহলে যে কোন উপায়ে তাকে পথে আনাই তাদের কাজ। এগিয়ে
যে, আয়গাটি বেছে নিয়েছিলাম, তার একটু বিশেষত্ব ছিল। সেখানে
দাঙিয়েই চারিদিকে দৃষ্টি চলে। যাচানে উঠব না হির করেই,
এই স্থান আমি মনোনীত করে ছিলাম। আমার গায়ের কাছে, উত্তর
দক্ষিণ, শুল্ক-সমাচ্ছল ভূণ-বিরল সকীর্ণ পথ। শীকার বেদিক হতে
আসবে, সেদিকে ১০০ হাত পর্যন্ত আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে
পাচ্ছিলাম। যদি বাদটি আমার দিকে আসত, তাহলে সেই পথে যে
খন সবুজ চারা গাছের সারি ছিল, সেখানে গাঁঢ়কা দিয়ে সহজেই
আসতে পারিত। অল্পক্ষণের মধ্যেই শীকারীদের সোঁরগোল বেশ

শোনা গেল। একটা দাঁড়কাক, পাশের একটা পলাশ গাছের উপর উড়ে এসে জ্বড়ে বসে, মুখ কিরিয়ে গাছের নৌচে কি দেখে কে আনে, কেবলি গাল পাড়তে লাগল। দেখতে পেলাম, একটা গাছের পাশ-হতে মুয়ে-পড়া ডালের ছায়ার আড়ালে শুকিয়ে সাপের মত একে বেংকে নিঃশব্দে একটি বাথ আসছে। তখনও সে অনেক দূরে, দেখে বুঝলাম বাথ নয় বাধিনৌ, থাড় নৌচু করে এগিয়ে আসছিল বলে সহজেই আমি তার ঘাড় লক্ষ্য করে আওয়াজ করলাম। সে মুখ খুবড়ে পড়ে গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠে মাড়ালের মত টলতে টলতে চলতে লাগল। আমি দুটো গাছের ফাঁকের মধ্য দিয়ে আবার আমার দোনলা বন্দুকের বাঁ নলের গুলিটা ছুড়লাম। যত দূর সন্তুষ্ট সে সবুজ গাছের সারিয়ে ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে এসেছিল, আমার বাঁয়ে পৌছবামাত্র আমি গুলি করি। আবার সে পড়ে গেল, আর একবার উঠবার চেষ্টা করে পারল না। তখন মাটীতে শয়ে পড়ে গর্জাতে লাগলে। আমি গাছের আড়ালে চুপি চুপি যতখানি পর্যন্ত এগোন নিরাপদ মনে হল, ততখানি পর্যন্ত গিয়ে, দুটো ডালের ফাঁক দিয়ে শেষ সংঘাতিক গুলিটি মারলাম। সামান্য কি এক আওয়াজে সে আমার উপস্থিতি আনতে পেরে, চোখ দুটো আগুনের গোলার মত করে, আবার হকার দিয়ে আমার উপর ঝাপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল, কিন্তু শরীরে আর শক্তি ছিল না বলে পারলে না, পরমুহুর্তেই আমি তাকে আস্ত্রবশে আনলাম। সেই বিঅয়-গোয়বে আমার সর্বাঙ্গে যে পুলক সঞ্চাৰ হয়েছিল, আজও তার প্রভাব অস্তিত্ব হয় নি। যখনি সেদিনের কথা মনে করি, আমার শরীর-মনে সেই তীব্র অনিন্দ্যতেমনি করে আবার জেগে ওঠে।

একটা কথা বলে আজকার চিঠি শেষ করব। আমি যে হানটি
মনোনৌতি করে, বাধের আগমন প্রতীক্ষায় দাঢ়িয়েছিলাম, সেই পথে
আসা ছাড়া তার আর অন্ত উপায় ছিল না—কেন না “নান্ত পদ্ধা
বিগতে অযনায়”।

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭।

স্বেহের অলকা কল্যান,

বাধের কথা আমার এখনও শেষ হয় নি, আর যতদিনে জরা-
অন্ত হয়ে, অকর্ষণ্য হয়ে না পড়ি, ততদিনে শেষ হবার কোনো সন্তানবা
নেই। কাজের অবসরে সেই সব শীকারের ব্যাপার আমি মনের মধ্যে,
আবার অভিনয় করবার স্বয়োগ পাই, আর তখনি তোমাদের অঙ্গে
সেগুলি লিখে সঞ্চিত করে রাখি। যাই হোক দেখি, এসব পুরানো
কথা, তোমাদের কাছে কখনই পুরানো হয় না। আমি তোমাদের
কাছে শীকার-সামন্ত সমীর ধার কথা বলেছি। এক সময় পুলিশ
পাহারা ওয়ালাৰ কাজ তাকে করতে হত। সৌভাগ্যবশত, একদিন
সে একজন মন্ত্র কর্ষ্ণচাঁৰীৰ স্থনজৰে পড়ে যায়—তিনি তাকে
একখানি ছোট খাট আয়গীৰ দান কৰেন। এই সংস্থান হবার পর সে
শীকার ব্যবসায়ে তার শৱীৰ-মনের সব অধ্যবসায় নিম্নোগ করে’

ব্যবসায়টি বিশেষ লাভজনক করে তুলে ছিল। তার মত আর কাউকে অমন ব্যাপ্তি মহিষের খবর আনতে ও তাদের খুঁজে বার করতে দেখি নি। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯০২ সালে, তখন সে দাঁত-পড়া বুড়ো, তবে শরীরে তখনও শক্তি ছিল, এতখানি বয়সেও শীকারের আগ্রহ তার যায় নি, রাত ৪টের সময় প্রতিদিন সে আমার ঠাবুতে আসত, দুয়ারে দাঁড়িয়ে একটুখানি আস্তে কাশলেই আমার সজাগ ঘূঢ় ভেজে যেত। তারপর আমি, সমীর আর সমৌরের চিরসঙ্গী একজন গোড়, এই তিনি জনে বন্দুক ঘাড়ে বেরিয়ে পড়তাম। বনের ভিত্তি ভিত্তি আস্তায় বাঘ ভুলিয়ে আনবার অশ্রে যে সব গন্ধ বেঁধে রাখা হত, রাতের মধ্যে তাদের কার কি অবস্থা হল তাই আবিষ্কার করাই এ যাত্রার উদ্দেশ্ট। রাত আর দিনের এই সন্ধিক্ষণেই বাঘ ভালুক সম্বর প্রভৃতি জন্ম রাত্রি ভূমণ শেষ করে' আপন আপন শুহা গবরের উদ্দেশে যাত্রা করে। সমীর র্থা'র মত চতুর পথ প্রদর্শক সঙ্গে না থাকলে, একেবারে তাদের মুখে গিয়ে পড়া, কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়।

যাসবনে হরিণের স্বচ্ছন্দ পদধ্বনি, ভালুকের ধীর মন্ত্র পদক্ষেপের প্রভেদ অন্যান্যাসেই বোঝা যায়, আর বাঘের পদশব্দের সঙ্গে এদের ভূল হবার কোন সন্তাননাই নেই! এক বিড়াল ছাড়া আর কোন জন্ম বাঘের মত অমন মৃদু ধীর নিঃশব্দ পা ফেলে আসতেই পারে না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা যখন ক্রমেই পাহাড়ের উপরে উঠে থাচ্ছিলাম, সমীর র্থা তখন চুপি চুপি দুর্বল কথা কিছু সঙ্কেতে আমায় সতর্ক করে দিচ্ছিল। কিন্তু যখন বন-রাজ্যের সামাজ্য প্রজা, যথা মার্জার, অস্তুক, সে পথে দেখা দিচ্ছিল তখন আর সমীর

ঁ কিছুমাত্র সন্তুষ্টি দেখায় নি, আর তাদের সম্বন্ধে এমন সব ভাবা-
প্রয়োগ করছিল যা তোমাদের না শোনাই ভাল। যে পথে বাঘ
ভাঙ্গুক সচরাচর আসা ষাওয়া করে, সে পথ এড়িয়ে, বেশি দূর নিরাপদ
স্থান হতেই, আমাদের বাঁধা গরুগুলির সন্ধান নিয়েছিলাম। তোরের
অস্পষ্ট আলোকে অনেক সময়ই কিছু দেখা যেত না, বিশেষ ঘনে
গরুগুলি শুয়ে থাকত কিন্তু যদি বাঘ তাদের মেঝে ফেলে রেখে যেত।
বিশেষ কাছে যাবার আগে খোপ খাড়ের আড়াল হতে, গাছের ডালে
চড়ে লুকিয়ে বসে, কিন্তু কোন প্রকাণ পাথরের পিছনে গা ঢাকা
দিয়ে, পাখী কিন্তু অস্ত কোথায় কে কি শব্দ করছে, তাও ভাল করে
লক্ষ্য করে, তবে কাছে এগোন হত। আগের দিন কতকগুলি
স্ত্রীলোক অঙ্গলে মহম্মাকুড়োতে এসে, পাহাড়ে নদীর ধারে একটি বাঘ
দেখতে পেয়ে, তাঁবুতে আমাদের কাছে এসে থবর দিয়ে গিয়ে ছিল।
তখন বেলা পড়ে এসেছে, চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হয়ে
আসছিল। তাড়াতাড়ি আমরা বনের চারিদিকে বাস্তুরাজের নজর
স্বরূপে গুটিকত গরু বেঁধে দিয়েছিলাম, তার মধ্যে একটি যে তিনি
গ্রহণ করেছেন তার প্রমাণও অবিলম্বে পাওয়া গেল। পাশেই
একটি নালা ছিল, আর সেখানে নামবার পথটি একেবারে থাড়া।
কিন্তু এ অস্তুবিধা এড়াবার অঙ্গে গরুটিকে টেনে সে নালার কতক দূর
নামিয়ে দিয়েছিল। নালার ধারে ধারে নেমে গিয়ে বাঘটিকে
তখনই শীকার করে ফেলবার পরামর্শ সমীর থাঁ আমায় দিয়েছিল,
আমারো যে সে প্রলোভন হয় নি তা বলতে পারি নে, তবে সেটা
আমি সম্ভবণ করেছিলাম। আমি থাঁর অতিথি, তাঁর অজানিতে এ
কাজ করা ঠিক হত না। নালার ধারে ধারে লুকিয়ে বসবার যত,

গুটিকত “আয়গা ছিল, কোন কোন শীকারী তখনি সেই সেই খানে উকি দিয়ে বাঘ কোথায় আছে তার সন্ধান নিতে চেয়েছিল কিন্তু দরকার হল না। পাশেই গজ পঞ্চাশ” দূরে, মহঘা গাছে বসে একটা ময়ুর সে সংবাদ আমাদের আবিয়ে দিলে—পতিভ্রতা ময়ুরীরাও চারিদিক হতে তার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল ‘ঠিক ঠিক’। আমরা আর কিছু গোলযোগ না করে, মহানন্দে বাঘের শুভাগমনের সংবাদ নিয়ে তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলাম। প্রথম বারে বাঘ আমাদের ফাঁদে পড়ে নি, পাহাড়াওয়ালাদের মাঝ দিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে পালিয়ে ছিল। হঠাৎ চারিদিকে তাদের আনাগোণার শব্দ যে কেন থেমে গেল, আমরা সে কথা বুঝতে পারি নি, সমীর র্থা কিন্তু এসে তাড়াতাড়ি আমাদের ঠাই বদল করিয়ে দিলে। কাছেই অঙ্গলের ঘাস পোড়ান ছাই-এর উপর বাঘের পায়ের দাগ দেখা গিয়েছিল। আমাকে নালার ওপারে গাছের নীচে আয়গা দিলে। বাঘ যে-পথে আসবে সে-পথের ঘাস উচুতে ছিল প্রায় তিনি ফুট,—একটি গমিপথ নালার ধার পর্যন্ত এসে হঠাৎ প্রায় বিশ হাত সোজা নালার মধ্যে নেমে তার পাশের পাহাড় মুখে উঠে গিয়েছিল। আমাদের শীকার-কর্তা মাচানের উপর আসন করেছিলেন, তাঁর আপনার শীকারীর মতে সেইটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্থান। এই শীকারিটিকে দেখলে, নিতান্ত হতচ্ছাড়া বদমায়েস ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। কিন্তু সমীর থা শীকারত্ব আনত ভাল। এবারে বাঘটিকে নিঃশব্দে ঘেরাও করা হবে তারি বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, দামাদা কাড়া বাজবে না, শীকারীরা চুপচাপ আসবে, কেবল ‘এগিয়ে আসছে’ এই খবরটা আনাবাবু অঙ্গে মাঝে শুধু গাছ কিন্তু পাথরের গায়ে কুড়লের

ঘা দেবে। আমি আমাৰ দু'জন শীকাৰীৰ সঙ্গে আগে হতে ঠিক কৰে ছিলাম, তাৰা গাছ হতে ইসাৱা কৰে বাষেৱ গতিবিধি আমাৰ জানাৰে। একজন শীকাৰী পাগড়ী নাড়াল দেখে বুবতে পাৱলাম, বাষ শোজা আমাৰ দিকেই আসছে। দুএক মুহূৰ্ত পৱে প্ৰকাণ জন্মটিকে ঘাসেৱ মধ্যে দিয়ে গজ স্তৰৰ দূৰে আমাৰ দিকে আসতে দেখতে পেলাম। ঘাসেৱ সেই সামান্য আড়ালেৱ সমান হয়েই সে পৰ্ট নৌচু কৰে এগিয়ে আসছিল। সমুখে পিছনে পাশে ১৫ গজ পৱিমাণ অমিতে ঘাস দুলে দুলে, বনৌতে নৌকা চলে যাবাৰ পৱ, টেউ-ধেলান যেমন একটি পথেৱ চিঙ পড়ে, ঠিক তেন্তি দেখাতে লাগল। মাথা নৌচু কৰে আসছিল তাই মাথাৰ আড়ালে বুক ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। মাথাৰ গুলি মাৱবাৰ পক্ষপাতী আমি নই। বাষেৱ মন্তিকাংশ থাকে মাথাৰ পিছন দিকে, তাই গুলি অনেক সময় তত দূৰ অবধি, সহজে পেঁচায় না। কৰ্মেই এগিয়ে আসছে, ত্ৰিশ হতে কুড়ি, কুড়ি হতে দশ গজ' কাছে এল, তবুও যে ভাবে আসছিল তাৰ কোন বদল হল না। আমৱা দু'জনেই শীকাৰ এবং শীকাৰী সমান উচুতে ছিলাম, মাৰেৱ ব্যবধান শুধু সেই সকৌৰ নালা। যতক্ষণ পৰ্যন্ত সে ঘাসেৱ মধ্য হতে সম্পূৰ্ণ বেলিয়ে এসে নালায় নামতে আৱস্থা কৰলে, ততক্ষণ পৰ্যন্ত আমি আমাৰ নিঃশ্বাস আৱ গুলি দুই রোধ কৰে রেখেছিলাম। তাৰ স্বক আৱ মন্তকেৱ সকি হলে একটি গুলি খেয়ে সে চমকে লাফিয়ে উঠে নালাৰ মধ্যে পড়ে গেল। কুকুৰ যেমন পিছনেৱ পায়ে ভৱ কৰে, সমুখেৱ পা বিছৰে, তাৰি উপৱ মুখ রেখে বসে, সেও ঠিক তেমনি ভাবে পড়ে মাথাটা একবাৰ এৰিক, একবাৰ ওদিক নাড়াচ্ছিল, অস্তাৰ্ক অজপ্রত্যজ পক্ষাঘাত- অহ রোগীৰ মত একেৰাবে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। ঘাসেৱ পিছনে আৱ

ଏକ ଶୁଣି ଥାବାର ପରି ମାଥା ନାଡ଼ାଓ ସଙ୍କ' ହୟେ ଗେଲ, ମନେ ହଲ ସଞ୍ଚୂଧେର ଡାନଦିକେର ଥାବାର ଉପର ମାଥା ରେଖେ ସେ ଅଘୋରେ ସୁମଞ୍ଜେ । ଗୁହସାମୀର ଶୀକାରୀ, ତାର ପ୍ରଭୁ ବାଘ ପେଲେନ ନା ଦେଖେ ଭାରୀ ଚଟେ ଗେଲ । ସେ ଆର ସମୀର ଥା ପରମ୍ପରେର ପ୍ରତି ନାନା ରୂପ ସାଧୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତେ ଲାଗଲ, ଏଇ ମଧ୍ୟେ ତାର ମନିବ ଆବାର ଏକଟା ଅବିବେଚନାର କଥା ବଲେ ଫେଲାତେ ବ୍ୟାପାରଟୀ କ୍ରମେ ଶୁରୁତର ହୟେ ଦୀଡ଼ାଳ । ରାଜାର ଶୀକାରୀ ବିଜ୍ଞପ କରେ ବଲଲେ, ସମୀର ଥା ଆମାୟ ସବ ଚେଯେ ଭାଲ ଜାଯଗାଟି ଦିଯେଛିଲ । ସମୀର ତାକେ ବଲଲେ, “ତୁଇ ଏକଟା କୁଳି, ତା ନା ହଲେ ବୁଝନ୍ତେ ପାରିଦିନ ସେ, ବାଘକେ ବଲଦେଇ ମତ ଲ୍ୟାଙ୍କେ ମୋଡ଼ା ଦିଯେ ଚାଲାନ ଯାଯା ନା” । ପରେର ଦିନ ସମୀର ଥା ତାମେର ଉପର ଶୋଧ ତୁଳଲେ, ଆମାର କପାଳେ ଆର ଏକଟି ବାଘ ଜୁଟେ ଗେଲ । ଯେ ନାଲାତେ ଆଗେର ଦିନ ବାଢ଼ି ତାର ଶୀକାର-କରା ଗନ୍ଧ ଟେନେ ନିଯେ ଗିଯେ ଛିଲ, ଠିକ ତାରି ପାଶାପାଶି ମୋଜା ଲାଇନେ ନଦୀର ଏକଟି ଶୁରୁନା ଥାଲ ଛିଲ, ମେହି ପଥ ଛାଡ଼ା ବାଘେର ଆର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାତ୍ରି ଛିଲ ନା । ଆଗେର ଦିନ ଆମାର ଅଦୃଷ୍ଟେ ବ୍ୟାୟ ଜୁଟେଛିଲ ବଲେ ରାଜା ଏଥେ ନାଲାର ମୁଖେ, ସେ ଦିକ ଛାଡ଼ା ବାଘେର ଆମବାର ଭିନ୍ନ ପଥ ଛିଲ ନା, ମେହି ହାନଟି ଆଗେଭାଗେ ଦର୍ଖନ କରେ ବସିଲେନ, ଏତେ ଅନ୍ତାୟ କିଛି ଛିଲ ନା, ଠିକଇ କରେ ଛିଲେନ, ତବେ କରବାର ଧରଣଟି ଭଜ୍ରୋଚିତ ହୟ ନି । ତୁମେ ଏହି ବେ-ଶୀକାରୀ ବ୍ୟବହାର ସମୀର ଥାର ଆଦିପେଇ ପଛମ ହୟ ନି । ସମ୍ମିଓ ବାକ୍ୟ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତଥନ କିମ୍ବା ପରେ, ମେ ତାର ମନୋଭାବେର କୌଣସି ଆଭାସ କଥିବେ ଦେଯ ନି । ଏକଟା ଆୟଗାୟ ମେହି ନାଲା ହତେ ଆର ଏକଟି ବାଲା ବେରିସେ ପିଯେଛିଲ । ମେହି ସନ୍ଧାର୍ଣ୍ଣ ପଥ ସମୀର ଥାର ଶାନ୍ତିଶିଖାତେ ପାରେ ନି । ଠିକ ମେହି ଖାନଟିତେ ମେ ଏକଅନ୍ତର ଶୀକାରୀକେ ନାଡି କରିଯେ ଦିଯେ ଛିଲ, ଏହି ଯକ୍ଷି ବାଘେର ପଥରୋଧ କରେ, ତାଡ଼ା ଦିଯେ ତାକେ

আমাৰ দিকে ফিরিয়ে দিতে পাৰিবে, এই ছিল তাৰ মতলব, ঘাসেৱ মধ্য দিয়ে বাাত্রটী অগ্ৰসৱ হচ্ছিল, তাৰ বৃঢ়োৱক ঘাসেৱ জঙ্গল ছাড়িয়ে ঘাসেৱ উপৱে উঠেছিল। খোলা মাঠেৱ সৌমানায় এসে একবাৰ সে শিল হয়ে দাঁড়াল, ঠিক আমাৰ সম্মুখটিতে, পিছনে তাৰ বনভূমিৰ বিচিৰ শ্যাম ঘবনিকা, চিৰপটে আকা, মুস্তিমান মহিমাৰ মত সে ছবি গন্তৌৱ ও স্থৰ। মুহূৰ্ত কাল এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, নিশ্চল নিবিষ্ট, মনে হ'ল যেন অনাৰুত প্ৰাণৰে পদাৰ্পণ কৱিবাৰ আগে, শক্ত অনুসৰণ কৱে আপন গন্তব্য পথ, স্থৰ কৱে নিচ্ছে। তাৰ বিস্তৃত শুভ কৰাট বক্ষ, আমাৰ সম্মুখেই প্ৰসাৱিত, লক্ষ্য ভৈষ্ণব হ'বাৰ কোনো সন্তাবনা ছিল না। বন্দুকেৱ আওয়াজ হ'বামাত্ৰ সে হাঁটু গেড়ে পড়ে গিয়ে, পৱেৱ মুহূৰ্তেই আবাৰ পিছনেৱ পায়ে ভৱ কৱে দাঁড়াল, সম্মুখেৱ পা দিয়ে আচড়ে যেন আকাশ চিৱে ফেলিবে! রাগে অধীৱ হয়ে আপন বুকে কামড় দিতে লাগল, এইবাৰ তাকে আগেৱ চেয়ে আৱো ভয়ানক অধিকতৰ বিশ্বয়জনক মনে হয়েছিল। ডাইনে আৱ বাঁয়ে অনবৱত স্বাইপ মাৰতে হলে ষত শীগুগিৰ গুলি চালাতে হয়, ততটুকু সময়েৱ মধ্যেই বিতৌয় গুলি খেঘো সে হত্যাশয্যায় ধৱাশায়ী হ'ল। সন্ধ্যাৰ সময় আমি বধন তাবুৰ বাহিৱে বসে ছিলাম সমীৱ থঁ

“Whispered there in the cool night air
What he dared not day by day light.”

কথাটি হচ্ছে—তাৰি কোশলে বাথ আমাৰ পথে এসেছিল, রংজাৱ শীকাৰীকে “যেমন কৰ্ম তেমনি ফল, মশা মাৰতে পালে চড়” শেখাৰ অন্ত সে এ কাজ কৱে ছিল।

৮ই সেপ্টেম্বৰ ১৯১৯

হাওদা-শীকার।

“হাতৌপৰ হাওদা”—আবাৰ তাৱ উপৰ নিজে রাজাৰ মত বলে
 শীকার কৱতে খুব আৱাম। হিমালয়েৰ তৱাই, আসাম আৱ শ্ৰীহট্টেৱ
 অঙ্গলে বাঘ, গণ্ডাৰ, মহিষ, সাংৰ, ছুলিৰ প্ৰভৃতি বড় বড় শীকার, এমন
 কি তিতিৰ প্ৰভৃতি ছোট শীকার কৱবাৰও এই একমাত্ৰ উপায়।
 এই সব জায়গায় ঘন জঙ্গল যেন লম্বা ঘাস আৱ শ্ৰেৱ গভীৰ সমুদ্ৰ;
 এ ঘাস এতই লম্বা যে মাঝে মাঝে হাওদা ছাড়িয়ে ওঠে, আৱ এম্বি
 ঘন যে, সমুখে যে সব প্ৰকাণ হাতি, শীকার সন্ধানে আৱোহীকে নিয়ে
 অগ্ৰসৱ হয়, তাদেৱ একেবাৱে চোখেৰ আড়াল কৱে ফেলে। প্ৰতি
 পদেই গতিৱোধ হয়, আৱ হাতৌৰ পায়েৰ চাপে যে সব ঘাস ভেঙে
 পড়ে, সে এম্বি মজবুত যে ভাঙবাৰ আওয়াজটা পিস্তলেৰ শব্দেৱ
 মত শোনায়। এই উপায়ে প্ৰথম যেদিন আমি শীকার সন্ধানে
 গিয়ে ছিলাম, সে কথা আমাৰ এখনও বেশ মনে আছে—এ যেন
 বিচালীৰ গাদায়—হাৱাণ-সৃচ খুঁজতে যাওয়া, তবে মন্ত এই প্ৰণেৰ
 যে একে যে খুঁজতে যায়, তাৱ নিৱাশ হতে হয় না—যাৱ আশায়
 “টুড়ত ফিৱি” তাকে ঠিক পাওয়া যায়। চলন্ত হাতিৰ উপৰ দোল
 খেতে খেতে তাক ঠিক রাখা অভ্যাস হতে একটু সময় লাগে, আৱ
 তা ছাড়া টেউ এৱ মত দোলায়মান ঘন ঘাসেৰ মধ্যে কোন জানোয়াৰ
 চলে বেড়াচ্ছে, সে কথা ভাল কৱে বুৰুতেও বিশেষ অভ্যাস আবশ্যিক।
 হাওদা-শীকার ব্যয় সাধ্য—খুব কম লোকেৱি এ বুকম হাতি রাখবাৰ
 সামৰ্থ্য হয়—আৱ যে দু চাৱ জন মাথেন তাঁৱাও এ সব হাতৌকে

রৌত্তিমত শিক্ষা দেবার কষ্ট স্বীকার করেন না, এ ব্যাপারে গুটিকত
রৌত্তিমত শিক্ষিত হাতি নিতান্তই দরকার, আর এ রকম একটি হাতি
পাওয়া সহজ নয়, যদি পাওয়াই যায় তাহলে তার নাম দিতে যে
সোনার থনি উজাড় করে ফেলতে হয়, তাই বা ক'জনে পারে ?
হাওদা শীকারে কৃতকার্য্য হতে হলে, এই রকম হাতি অন্তত ২৪, ২৫টি
নইলে চলে না—কাজেই বুঝেছ, আলাদিনের অপূর্ব প্রদীপ যার নাই,
তার ভাগ্যে এ শীকার ঘটা দুঃসাধ্য।

এক সময়ে আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ ভারতের অন্ত আর প্রদেশের
চেয়ে শীকার ব্যাপারে বেশি উন্নতি করেছিল। দেশের জমিদারদের
মধ্যে এ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যকর প্রতিপ্রস্তুতি ছিল। শীকার তাঁরা পৌরবের
কথা মনে করতেন, আর এই সূত্রে প্রস্তুত প্রীতির বক্তব্যে আবক্ষ
ছিলেন। এখন আর সেদিন নেই বলেই হয়। বর্তমান জমিদারবর্গ
অনেকেই পাশ্চাত্য আহার বিহারে, বিলাস ব্যবহারে অভ্যন্ত হয়েছেন।
কলপ-দেওয়া কড়া কামিজ ‘কলার’ ধারণ, তাঁরা মুনি ঝুঁটির কৃচ্ছ্ৰ সাধনের
মতই অপরিহার্য মনে করেন। ব্যায়িশ্র নিষিক্ত আহার্য, সনাতন
স্বাস্থ্যকর খাচ্চের অপেক্ষা লোভনীয় হয়ে পড়েছে। যে সকল উগ্র
পানীয়, এক সময়ে কেবল মাত্র ঔষধার্থে ব্যবহার করবার বিধি ছিল,
এখন সে সকল সেবন তাঁরা নিতা বৈমিতিক কর্তব্যের মধ্যে করে নিয়ে-
ছেন, আর তার অপরিমিত ব্যবহারই পৌরুষ বলে জ্ঞান করেন।
নিঃশব্দসঞ্চার মধ্যম মোড়া হাওয়া-গাড়ী ব্যতীত চলা-ফেরা করতে
তাদের মন ওঠে না। এই গুলি হচ্ছে আধুনিক জমিদারবর্গের আধ্যা-
ত্মিক পরিমাপ—দৈহিক মাপটি তাদের ইংরাজ দর্জিতে কাছে পাওয়া
সহজ। এইসের তরঙ্গায়িত ব্যবপু গুলি কোটি প্যাণ্টে সাম্য করে রাখা

ভাদেন্নই কর্তৃব্য। কোথায় কখন কি ভাবে এ সৌন্দর্য ফেটে পড়বে, তার জন্ম বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যিক। একবার, দৱ্রব্যারে একজন রাজকীয় কর্মচারী কোনো জমিদার রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—“ রাজা একটি সিগারেট খাবে কি ” ? আধুনিক আলোক-প্রাপ্ত এই হঠাৎ-নবাবটি বলে উঠলেন,—“আমি শুধু হাতানা ব্যবহার করে থাকি—(হাতানা সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বাপেক্ষা দামী চুক্ষট)। আজ কালকার দিনে ম্যানিলা (Manilla) আৱ মিুরিয়ার (Muria) প্রভেদ বুৰতে পাৱাই হচ্ছে সভ্যতাৱ ও শালীনতাৱ বিশিষ্ট পৱিচয় ; বিবিধ মণ্ডেৱ জাতি, গোত্ৰ, গাঁই কুলজি, জ্ঞান যদি থাকে, তাহলে সেত ইংৰাজী কিম্বা সংস্কৃত সাহিত্যেৱ অভিজ্ঞতাৱ চেয়ে অনেক অধিক গোৱবেৱ পৱিচয়। বাক্যালাপ অধিকাংশ সময়ই অতি অকথ্য বিষয় সম্বন্ধেই হয়ে থাকে। যদিও এঁৱা ছুৱি কাটায় থাৰাৱ কায়দাটা থুব ভালই শিখে নিয়েছেন, তবু পাশ্চাত্য সভ্যতাৱ যথাৰ্থ প্ৰভাৱেৱ বাহিৱে পড়ে থাকায় তাৱ শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাৰ্বশতঃ সৰ্বদা কেবল মাত্ৰ বাহাড়ুৰ ও আস্বাষ্যকৱ কৃত্ৰিম আৰহাওয়াৱ মধ্যে বাস কৱে এঁৱা দিন দিন অকৰ্ম্য ও হীন-চৱিত্ হয়ে পড়েছেন। মাৰু হতে রাজ-সুলত মৃগয়া ব্যবসায়েৱ সমাদৰচলে যাচ্ছে।

হাওদাৱ উপৱ কোন কোন শাকাখীৱ অভ্যাস আছে, অনেকগুলি কৱে গুলি-ভৱা বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যান, তাতে নানান দুৰ্ঘটনা ঘটিবাৱ সম্ভাবনা। আমাৱ মনে আছে যে, একজন অল্পবয়স্ক জমিদার এই অভ্যাস-বশত মাৰা যান। হাতি যথন উপৱেৱ দিকে উঠছিল, বন্দুক গড়িয়ে পড়ে আওয়াজ হয়ে যায়, তাতেই তাঁৱ মৃত্যু হয়। অভ্যাস কৱলে

একটি বন্দুক রেখে আর একটি তুলে নিতে যে পরিমাণ সমস্ত লাগে, তাতেই অনায়াসে সেটিতে গুলি ভরে নিতে পারা যায়। আর যে বন্দুকটি সর্বদা ব্যবহার করে করে একেবারে আপনার হয়ে গিয়েছে, তার কাছে যেমন কাজ পাওয়া যায়, নতুন অজ্ঞান বন্দুকের কাছ থেকে তা হ'বার যো নেই। আর একটি কাজ কখনো করো না ; সম্মুখে ঘাস শুধু নড়ে উঠেছে বলে, জন্মটিকে যতক্ষণ না স্বচক্ষে দেখতে পাও, ততক্ষণ বন্দুক ছুঁড়ো না। হাওদা শীকারের লাইন বাঁধবার দুটি নিয়ম আছে—তার মধ্যে একটা হচ্ছে সূর্তি খেলে, যার ঘেমন নাম উঠবে, সেই ভাবে সাজান, কিন্তু শীকারের দলপতি আর সকলে যাঁর নিমন্ত্রিত অভিধি, তিনি যে ভাবে দল ভাগ করে দেবেন, সেই মত সাজান। এই সারি-বাঁধাটা ধনুকের আকারে করা ভাল। পাশের জায়গা হচ্ছে শীকারের পক্ষে সকলের চেয়ে সুবিধাজনক। পতাকার সঙ্কেতে, এগোতে, পিছতে, সারিটা প্রশস্ত কিন্তু সঙ্কীর্ণ করে নিতে হয়। দ্রুত জন শীকারীকে সম্মুখে পাঠিয়ে তাদের দিয়ে শীকার জড় করিয়ে নিলে বেশি সুবিধা হবে। কোথায় কি ভাবে এ সব হাতি সারি বেঁধে দাঁড়াবে, সে বিষয় স্থির করতে বিশেষ অভিজ্ঞতার আবশ্যক। তার পরে বাঘ এসে পাশ কাটিয়ে না পালিয়ে যায়, কিন্তু এই সব হাতির উপর এসে না পড়ে সে সম্বন্ধে সতর্ক হবার জন্যে সাহস এবং চাতুরী দ্রুই কাজে লাগান দরকার। অনেক সময় এমনও হয় যে, বাঘ গুঁড়ি মেরে বসে থাকার দরুণ অন্তত সেই সময়ের জন্য চোখে পড়ে না। সব সময়েই যে নির্বিপৰ্য্য কার্য উক্তার হয় তা নয়, কেন না বাঘ যেন্নি এই হাওদাধারী হাতিটিকে দেখে, আর অন্নি চার পা তুলে লাফিয়ে ছুটে আসে।

ষাসের মধ্যে দিয়ে বাঘ যখন আক্রমণ করবার জন্যে
ছুটে আসে, সে বড় চমৎকার দৃশ্য, দেবতারা দেখলেও খুসি হয়ে
যাব। এছলে শুধু হাতিটি নির্বিকার হলে চলে না—শীকারীর
গুলিটিও অবিকল সোজা চলা চাই, তবেই বিপদ এড়ান যায়।
গুলি না ছাড়লে ত শীকার মরে না, আর সেই সঙ্গে মুহূর্তে সে সম্বন্ধে
কোনো বিধি করা চলে না, গুলি ছুঁড়তেই হয়, তা তোমার লক্ষ্য
যেমনই হোকনা কেন, গুলি ফস্কে গেলেও এ সময় কাজ হয়।
কেননা শব্দ শুনে অনেক সময় বাঘ পালিয়ে যায়, কারো ক্ষতি
করবার সুবিধা পায় না।

এ সব জায়গায় বাঘ কোথায় খুন খারাবী করেছে এ সংবাদ না
পাওয়া গেলে তাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন, হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলেও
এই ঘন ঘাস জঙ্গলে, সে খবর জানতে দুএকদিন চলে যাব। যখন
দেখা যায় মন্ত মন্ত শকুন, চক্র করে ঘুরে ঘুরে উড়ছে, অথচ ষাসের
মধ্যে নামছে না, কিন্তু ভয়ে নেমে লাফিয়ে পালাচ্ছে না, তখনি
বোৰা যায় খুনী ব্যাঞ্চিটি কাছাকাছি কোথাও আস্তানা নিয়েছে।
এই দস্তাটিকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে গরু তেড়া বেঁধে দিলে অনেক
সময় উদ্দেশ্য সাধন হতে দেখেছি—এই উপায়ে একবার চমৎকার
একটি বাধিনাকে হস্তগত করা গিয়েছিল।

এই হাওদা শীকারের প্রধান বিপদ জলাভূমিতে গিয়ে পড়া,
হাতির মত সাহসী অস্ত্রও কানায় পা বসে যাচ্ছে দেখলে, ভয়ে কাণ্ড-
জ্ঞান রহিত হয়ে যায়। একটা দৃশ্য ঠিক যেন কালকের ঘটনার মত
আমার স্পষ্ট মনে আছে। হাতির সমস্ত সারি, সংখ্যায় প্রায় পঁচিশটি
হবে, তখন গাঁৱো পাহাড়ের চোরাবালির মধ্যে পড়ে হাবুড়ুবু খেতে

লাগল, আমরা বন্ধ মহিষ আর জলাভূমির হরিণ-শীকারে বেরিয়ে ছিলাম, পথটা মাছতদের পরিচিত। সেটা ভূমিকম্পের পরের বৎসর, খুব সম্ভবত পাহাড়ের উপরকার আলগা মাটি, বৃক্ষের জলে ধূয়ে নীচে এসে পড়েছিল। যে আয়গা সবুজ ঘাসে ঢাকা স্বত্ত্ব রক্ষিত শাবলের মত মনে হয়েছিল, সেটি কয়েক হাত গভীর চোরবালি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা তখনি শরবনে ঢাকা একটা জলাভূমি হতে সবে মাত্র বেরিয়ে এই সঙ্কট স্থানে এসে পড়লাম—অন্তি দূরে হাতচলিশ তকাতে শুকনো ডাঙা ছিল। প্রত্যেকটি হাতি প্রাণপণ চেষ্টায় অগ্রসর হতে লাগল—সবাই ভয়ে ডরে ঢাঁকার করতে করতে চলেছিল, যাদের পিঠে হাওদা ছিল সবচেয়ে দুরবন্ধ হয়েছিল তাদেরি। এই সলের মধ্যে শ্রীহট্ট অরণ্যবাসিনী একটি হস্তিনী সব প্রথমে নিরাপদ স্থানে গিয়ে পেঁচালে। এই বুজ্জিমতী, বড় বড় ঘাসের বোৰা শুঁড়ের উপর নিয়ে পায়ের তলায় বিছিয়ে, পা, রাখবার ঠাঁই করে নিতে লাগল। সকলেই নির্বিপ্রে অপর পারে উঠোণ হল, কিন্তু এই জীবন-যতু সংগ্রামে জয়ী হবার জন্মে তাদের এতই কষ্ট আর পরিশ্রম করতে হয়েছিল যে, তার পর দুদিন আর তাদের চলৎশক্তি ছিল না। একটা ধাল পার হতে গিয়ে রাজা—একটি হাতি হারালেন। সে পার-ঘাটার একটু দূরে পার হবার চেষ্টা করেছিল, বৃথায়; আন্তে আন্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মাছত শুধু প্রাণ হাতে করে, সাঁতাৰ দিয়ে অপর পারে গিয়ে উঠল।

শীকার করতে গিয়ে প্রত্যেক শীকারীর প্রধান কর্তব্য একে অপরকে প্রীতমনে সাহায্য করা। যদিই বা শীকার নিয়ে দুর্ভাগ্য-বশত, কোন বিবাদ বিস্বাদ উপস্থিত হয়, তাহলে শীকার-কর্তা

এ সম্বন্ধে যে বিচার করেন, সেইটিই সন্তুষ্ট ছিলে মেনে নেওয়া উচিত। নিজের অ্যায় দাবী বরং ছেড়ে দেওয়া ভাল, তবু কলহ করে মৃগয়া-শিবিরের শান্তি ও সন্তোষ হানি করা কখনো উচিত নয়। একটুকুও মন ভাবী না করে নিজের নির্দিষ্ট জায়গাটি প্রাপ্ত করো। আর মনে করো সেইটিই তোমার পক্ষে সব চেয়ে বেশি সুবিধাজনক। স্বার্থপর অসন্তুষ্ট-চিন্ত লোকেরি “পরিণামে পরিত্বাপ অবশ্যই ঘটে”। নির্বোধ কিন্তু মন্দমতির প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হন না। গেল বৎসর আমারি চাকুষ এই রুকম একটি ব্যাপার ঘটেছিল। খবর এল একটি প্রকাণ্ড বাঘ, বাথানের সবচেয়ে ভাল গরুটিকে মেঝেছে, তার পর সেটিকে টেনে নদীর তীরে নিয়ে গিয়েছে, হেঁটে নদী পার হয়ে শীকার শুল্ক এক শিমুল তলায় উঠেছে। আমরা সেদিন একটি আহত বাঘের সন্ধানে ফিরছিলাম। আগের দিন আমাদের শীকার কর্তা সেটিকে গুলি করেছিলেন—মারা পড়ে নি। সেই জন্যে সেদিন আমরা নতুন আগস্তকেব খোঁজে আর গেলাম না, যদিও সহজেই এ কাজটি সেই দিনই উদ্ধার হতে পারত। আমাদের শাকার-কর্তা কিন্তু মৃগয়া-ব্যবসায়ীর সহজ সংস্কার বশতই হাতের কাজ শেষ করে, পরের দিনের অনুষ্ঠি স্থগিত রাখলেন। আহত বাঘটি তো পাওয়া গেলাই, উপরন্তু সেই জঙ্গলেই আর একটিও আমরা মারলাম। ভাস্তাৱ শেষেৱ বাঘটিৰ জন্যে প্ৰথম গুলিৰ ব্যবস্থা কৱেন, কিন্তু চৱম-শৈষধ, নিদানকালেৱ বিষবড়ি প্ৰয়োগ কৱিবাৰ ভাৱ অন্তৰ হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমরা আশাতীত ফললাভ কৱে আনন্দে ভাবুতে ফিৱে, পরেৱ দিনেৱ অভৌষ্ট লাভেৱ প্ৰত্যাশায় উৎসুক হয়ে প্ৰতীকা কৱে রাখলাম।

গুরুর হাড়ের খবর বাড়ীতে লিখিবার মত প্রসঙ্গ নয়, বিশেষত তা হ'তে কাক কি কোকিলের এক দানা মাংসেরও প্রত্যাশা ছিল না। আমরা এই গো-হত্যাকারীকে পাহাড়ে, মাঠে, খানা খন্দে, সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট সমস্ত জায়গায় খুঁজে যখন বেলা দুটো পর্যন্ত কোন কিনারা করতে পারলাম না, তখন অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যাহ্ন-ভোজনের চেষ্টায় তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এই কারণে আমাদের লাইন হতে তিনটি হাতি কম পড়ে গেল। তাঁদের ফিরে আসতেও অনেক সময় কেটে গেল, আমাদের শীকার-নেতা এই সময়টি বুধা অপব্যায় না করে, শীকারের সঙ্কানেই ফিরছিলেন, বেলাও পড়ে আসছিল, তাই আর একটিবার মাত্র থেঁজে বেরবার মত সময় তখন হাতে ছিল। নদীটি যেখানে অর্ধ চন্দ্রাকারে ঘূরে এসেছে, তারি ভৌরে, ঘাস আর শর দিয়ে ঢাকা একখণ্ড জমি ছিল। লম্বায় প্রায় তিন কি চারশ' আর প্রশঞ্চে ১০০ কি ১৩০ গজ হবে। দুকোণায় জঙ্গলটি ফাঁক হয়ে এসেছে, গাছ পালা বড় একটা ছিল না। বাষ ষে পথে আসছিল, সেটা ছেড়ে অন্য দিকে ফিরে ছিল, তাই আমাদেরও এগোবার লাইন নতুন করে, হাতির মুখ ঘূরিয়ে, বিপরীত পথে ধারা করতে হল। আমি একেবারে লাইনের শেষে ছিলাম, ডানের দিকে ধানিকটে খোলা ময়দান আর গো চারণের মঠ ছিল। আমার বাঁয়ে তিনটি হাওরায় তিন অন শীকারী ছিলেন, উভয় দিক হতেই তাঁদের অধিকৃত স্থানগুলিকে, উত্তম, উত্তমতর আর অত্যুত্তম বলা যেতে পারে। পঞ্চম হাওদা যাঁর অধিকারে ছিল, তিনি নদীর পারে বিরাজ করছিলেন। আমি যে জায়গাটি পেয়েছিলাম, তাতে দৈব সুপ্রসন্ন না হলে কিছুই ঘটবার আশা ছিল না। সম্মুখে প্রায় ৮০

গজ পর্যন্ত ফাঁকা জমির মাঝে দুএকটি গাছের গুচ্ছ দেখা যাচ্ছিল, সে ঘেন ঠিক গুড়ার মাথায় অর্ক ফলার মত, এদিকে ওদিকে খোচ খোচ শূঘ্রারের কুঁচির মত খাড়া খাড়া দুএকটি গাছ, সমস্ত মাঠটির অনুরূপ রূপ, আরো ঘেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল। নদীর বাঁক ধরে হাতির সারি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল, অল্প কালের মধ্যে বাঘের সামিধ্য বতই নিকটতর হতে লাগল, চারিদিকে উভেজনার আভাষ ততই দৃষ্টি ও শ্রতিগোচর হল। হাতীর ছক্কার, শুণ আস্ফালন, প্রহরী জমাদারের ভঙ্গী হতেই বোৰা গেল যে বাঘ নির্দিষ্ট পথে আসছে না, কিন্তু হাতির সারির মধ্যে যে স্থানটি সব চেয়ে নিরাপদ সেইখান দিয়ে পলায়নের সুযোগ থুঁজছে। হাতিগুলি যেমন দৃঢ় ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সহজে সেখান হতে পলায়নের সুযোগ পাওয়া কঠিন। আমার সম্মুখের ঘাসবন ঈষৎ নড়ে উঠতেই, আমার নমস্ত শরীর যেন সতর্ক হয়ে উঠল, আমি রুক্ষনিষ্ঠাসে একাগ্র দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করে রইলাম। ছুট মুহূর্তের মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড আশ্চর্য সুন্দর শার্দুল রাজের উভদ্বাঙ্গ আমার দৃষ্টিগোচর হল। তখন সে দূরে, অনেক দূরে, সম্মুখের খোলা মাঠ দিয়ে সে যে আরো কাছে এগিয়ে আসবে, তার কোনো সন্তাবনা ছিল না। কিন্তু আমার দৃষ্টি, মুষ্টি, মন্ত্রিক সবই ঠিক ছিল—
৪৬৫ নং গুলি ছুটে গেল, ব্যাস্ত রাজ কোথায় ? কোথায় অদৃশ্য হলেন ? না অদৃশ্য হন নি। বিরল তৃণরাজির মধ্যহতে দেখতে পেলাম, তিনি ধৰাশয়া গ্রহণ করেছেন, বিশাল শরীর নিষ্পন্দ, জীবনের চিহ্ন মাত্র নেই। মাহতকে হকুম দিলাম “বাঢ়াও” ডান চোখের উপর একটি সামান্য ক্ষত চিহ্ন, নাক দিয়ে মন্ত্রিক মিশ্রিত রক্তধারা বয়ে আসছে, শরীর পাথরের মত নিশ্চল, অসাক্ষ।

ক্রমশ—

‘আনন্দ মঠ’।

—::—

‘বন্দেমাতৰং’ গানটিই হচ্ছে “আনন্দ মঠ”-এর মূল কথা, এমন কি এ উপন্যাসের চেয়ে গানটির মূল্য অনেক বেশি। এই মত নাকি স্বয়ং বঙ্গিম প্রকাশ করেছেন, এমনি একটা গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটা সত্য কিনা জানিনে কিন্তু এর মধ্যে যে সমালোচনাটুকু প্রচল্লম্ব আছে, সেটা যে খুব সত্য সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। আনন্দমঠের বিজ্ঞাপনে বঙ্গিম লিখেছিলেন, “বাঙালীর স্তু অনেক অবস্থাতেই বাঙালীর প্রধান সহায়। অনেক সময় নয়। সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাঙালা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল কথা এই গ্রন্থে ‘বুকান গেল’। কিন্তু আসলে তা প্রকৃত নয়। স্তুলোক সকল সময়েই স্বামীর সহায় কিনা অথবা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজ্য তগবানের ইচ্ছাতেই স্থাপিত কিনা এ সব কথা বোঝাবার জন্য উপন্যাস লেখবার দরকার ছিল না। এ সব সত্য প্রমাণ করবার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ বিস্তুর অন্য উপায় ছিল। আশা করি এ কথা বলা বাহুল্য যে, বঙ্গিম “আমন্দমঠে” কিছুই বোঝাতে চেষ্টা করেন নি, তাঁর মনে যে গভীর দেশভক্তি ছিল তাই তিনি আর্টের মধ্য দিয়া প্রকাশ করবার চেষ্টা পেয়েছেন।

বঙ্গিমের সকল উপন্যাসের মধ্যে আনন্দমঠ যে অধিকাংশ পাঠকের

এত ভাল লাগে তার কারণ আনন্দমঠে মাতৃবন্দনার বে সুরাটি
বেজে উঠেছে, সকলের মনেই তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। বস্তুত
আনন্দমঠ আমাদের জাতীয় ইতিহাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে—
তাই বঙ্গিমের অন্য উপন্যাস আলোচনা করতে আমরা যদি বা সাহস
পাই—আনন্দমঠের সমালোচনা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।
অথচ এ কথা যেন ভুলে না যাই যে, দেশকে ভক্তি করে যদি দেশের
সাহিত্যের প্রকৃত সমালোচনা না করি তবে তাতে দেশেরই
ক্ষতি হবে।

(২)

আনন্দমঠ আমাদের মনকে আকর্ষণ করে এ কথা সত্য, কিন্তু
দেখতে হবে কোন্ গুণে আকর্ষণ করে। কেবল দেশের কথা
. আছে বলেই আমাদের ভাল লাগে, না দেশ-সেবার একটা মহৎ আদর্শ,
দেশভক্তের একটা সর্বত্যাগী বলিষ্ঠ স্বরূপ আর্টে ফুটে উঠেছে
বলেই ভাল লাগে। দেশের কথা থাকলেই যাদের কাব্য বা
উপন্যাস ভাল লাগে আমি তাদের দেশভক্তির প্রশংসা করি; কিন্তু
অতি বিনৌত ভাবে বলতে চাই যে, এই সব শ্রদ্ধেয় লোক যদি
সাহিত্য-আলোচনা ছেড়ে ব্যবসা বাণিজ্যে মন দিতেন তবে যে-দেশকে
তাঁরা এত ভালবাসেন সেই দেশের অনেক মঙ্গল হত। খুব সম্ভব
তাঁদের মতে কংগ্রেসের বক্তৃতার চেয়ে উচু সাহিত্য পৃথিবীতে দুর্লভ।
ইতিহাস গড়তে সাহায্য করলেই অথবা দেশভক্তি থাকলেই যে
উপন্যাস বা কাব্য আর্ট হিসাবে বড় হবে না এ কথা সকলেরই
জানা উচিত। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ইতিহাসে Uncle

Tom's Cabin-এর স্থান খুব উচ্চে; কিন্তু তাই বলে আর্ট হিসাবে ও-বই বড় নয়। “La Marseillaise” ইতিহাসে যে স্থান অধিকার করেছে, কোন দেশের ইতিহাসে কোন গান তা করে নি। কিন্তু তাই বলে “La Marseillaise” যে কবিতা বলে গণ্য হয় নি সে কথা সকলেই জানেন। আমাদের দেশেও এক্সপ্রেস্টার্সের অভাব নেই। “ভারত ভিক্ষা”তে ও “ভারত সঙ্গীতে” যতই দেশভক্তি থাক না কেন, আর্ট হিসাবে ও-দুই-ই অতি খেলো, একটি হচ্ছে বুড়ো স্ত্রীলোকের অনাবশ্যক নাকে চোখে অশ্রু বর্ষণ—অগৃটি যাত্রাদলের বীরপুরুষের হৃক্ষাৰ—উভয়ই হাস্তজনক। আর্টে ও সাহিত্যে শিল্পীর কেবল উদার ভাব বা মহৎ সংকল্প থাকলেই চলে না, তার উপরূপ প্রকাশ চাই। এই প্রকাশের সফলতার উপরই আর্টের সফলতা নির্ভর করে। সাহিত্যের সমালোচনা কালে এ কথা আমরা যেন ভুলে না বাই যে, ওজঃগুণ সাহিত্যের একমাত্র গুণ নয়, এমন কি সর্বব্রহ্মে গুণও নয়। রামায় যেমন বাল, সাহিত্যে তেমনই ওজঃগুণ অঙ্গমতা ঢাকবার উপায়। বিশেষত, বাঙ্গলা সাহিত্যে সাধারণত আমরা যে ওজঃগুণে মুক্ত হই সে হচ্ছে বক্তৃতার ওজঃগুণ—চরিত্রের নয়।

(৩)

উনবিংশ শতাব্দীর যে সময়ে বঙ্গিয় আনন্দমঠ লিখেছিলেন, সে সময়টা ছিল আমাদের পক্ষে আশা ও উদ্দীপনার ঘৃণ। তখন টাট্টকা Byron-এর কবিতা পড়ে ও Bulke-এর বক্তৃতা পড়ে বীরংক

ଆମାଦେର “ପଙ୍କେ କେବଳ ସହଜ ନୟ, ଅନିବାର୍ୟ ହୟେ ଉଠେଛିଲ । ଆମାଦେର ତଥନକାର ସାହିତ୍ୟ ଏହି ଅସଂୟତ ଭାବୋଚ୍ଛାସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅଥଚ ଏହି ସବ ଉଚ୍ଛାସେର ସଙ୍ଗେ ଜୀବନେର କୋନ ସମ୍ପର୍କ ଛିଲ ନା । ତଥନକାର କାବ୍ୟ-ଆଲୋଚନା କରଲେ ଏଟା ଦେଖା ଯାଯା ଯେ, ସକଳ ଉଚ୍ଛାସେର ଚେଯେ ବୀରହ୍ମର ଉଚ୍ଛାସଟାଇ ଆମାଦେର ସହଜେ ଆସନ୍ତ । ଆମାଦେର କବିରୀ ଡକ୍ଟାଲଇ ହଡନ ବା ହାବମହୁ ଥାବୁନ, ଯୁକ୍ତର ପ୍ରାତି ତାଦେର ମନେର ଏକଟୁ ସ୍ଵାଭାବିକ ଟାନ ଛିଲ । ମାଇକେଲ ଲିଥଶେନ “ମେଘନାଦ ବଧ”, ହେମବାବୁ “ବୃତ୍ତସଂହାର”, ନବୀନବାବୁ “ପଲାଶୀର ଯୁଦ୍ଧ” । ବିଦେଶୀ କବିତା ଓ ଉପନ୍ୟାସ ପଡ଼େ ଆମାଦେର ମନେ ଯେ ଭୌଷଣ ବୀରହ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୟେଛିଲ, କାବ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟ ସେଟୀ ପ୍ରକାଶ ନା କରେ ଥାକବାର ଉପାୟ ଛିଲ ନା । ଏହି Sentimentality-ର ଯୁଗେ ଆନନ୍ଦମଠେର ସ୍ଫିଟି । ବକ୍ଷିମେର ପ୍ରତିଭାଓ ଏହି Sentimentality-କେ ଛାଡ଼ିଯେ ଉଠିଲେ ପାରେ ନି । ଆନନ୍ଦ-ମଠେର ଯା କିଛୁ ଦୋଷ ତାର ମୂଳେ ଏହି ଯୁଗେର ଉପ୍ରିଥିତ ଭାବାତିଶ୍ୟ । ବିଷୟକେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରେ, କପାଳକୁଣ୍ଡଳାୟ, କୃଷ୍ଣକାନ୍ତେର ଉଇଲେ—ବକ୍ଷିମେର ଲୋକଚରିତ୍ରେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାର ଗଲ୍ଲ ବଳାର ଅସାଧାରଣ ଭଙ୍ଗୀ, ଏହି ଭାବାତିଶ୍ୟ ତେମନ କରେ ପ୍ରକାଶ ହ'ତେ ଦେଇ ନି । କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦମଠେର ଆଖ୍ୟାୟିକା ଆମାଦେର ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଇତିହାସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ନୃତମ । ବକ୍ଷିମେର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଗୁଣି ମାନୁଷେର ଚରିତ୍ର ଓ ତାର ସ୍ଵାଭାବିକ ପରିଣତିର ଇତିହାସ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦମଠେ ତିନି ଯେ ସକଳ ଚରିତ୍ରେ ଅବତାରଣା କରେଛେ ସେ ସକଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର କଲ୍ପନାପ୍ରସୂତ, ଏଥାନେ ଜୀବନେର କୋନ ଅଭିଜ୍ଞତାଇ ତାକେ ହେଠୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନି । ଆନନ୍ଦମଠ ଯେ ମହାଦନେର ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାପନ ହୟେଛିଲ ଏବଂ ସେଇ ମହାଦନେର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଯିବେ ଗଲ୍ଲ ଆରମ୍ଭ ହ'ଲ, ଆମାର ମନେ ହସ୍ତ ସେଟୀ ମୋଟେଇ ପ୍ରକିଞ୍ଚିତ

নয়, এর পিছনে এই সত্য আছে যে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে আনন্দমঠের কোনো সম্পর্ক ছিল না। আনন্দমঠ স্বপ্নের মত শুন্দর হতে পারে, কিন্তু স্বপ্নের মত অশরীরি, অতএব আর্ট হিসাবে সার্থক নয়।

(৪)

আনন্দমঠ বক্ষিমের হাতে কঠিন নির্মাম হওয়া উচিত ছিল—বক্ষিমের হাতে এই জন্ম বলছি যে, বক্ষিমের প্রতিভাতে যে কেবল আক্ষণ্যমূলক শুচিতা ছিল তা নয়, আক্ষণ্যমূলক Austerity-ও ছিল। কিন্তু আনন্দমঠ Austerere হয় নি। কুক্ষণে সত্যানন্দ প্রভু এত যত্ন করে “গীতগোবিন্দ” পড়েছিলেন। হয়ত যদি তেমনি যত্ন করে বেদ-আক্ষণ পড়তেন তাহ'লে আনন্দমঠ এতটা সৌধীন হ'ত না।

১১৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কথা দিয়ে আনন্দমঠ আরম্ভ হ'ল। পদচিহ্ন গ্রামের যে বর্ণনা আমরা পেলুম তা ভয়ঙ্কর। প্রথম রোদ, দোকানপাটি বক্ষ, রাস্তা নিষ্ক্রিয়, বড় বড় বাড়ীগুলোতে জনমানব নেই। এই জনহীন নিষ্ক্রিয় পরিস্থিতি গ্রামের মধ্যে প্রকাণ্ড শূন্ত বাড়ীতে মহেন্দ্র ও কল্যাণী। তারপর মহেন্দ্র ও কল্যাণীর পদচিহ্ন পরিত্যাগ—ডাকাতের হাতে পড়া—সেই ডাকাতের “চেহারা অতিশয় শুক, শীর্ণ, অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, উৎস” তাদের “অশ্চিচর্ম-বিশিষ্ট অতি দার্ঘ শুক হস্তের শুক অঙ্গুলি”। আসন্ন বিপ্লবের কুসুম শূর এই দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় বেশ বেজে উঠেছে। কিন্তু এ শূর শেষ পর্যন্ত রক্ষা হয় নি। আমরা ভেবেছিলুম দিগৃদিগন্ত অঙ্ককার করে, পৃথিবীকে ছির ভিল করে, বজ্রগার্জনে তন্ত্রা ভাসিয়ে—প্রশংসনের

ଦେବତା ଆସିବେନ । ତୀର ଅସିର ଆଭାୟ ବିହୁୟେ ଚମକାବେ, ତୀର ରଥେର ଚାକାୟ ଲଙ୍ଘ ଲଙ୍ଘ ନର-ମାରୀର ଜୀବନ-ପ୍ରାଣ ପିଷ୍ଟ ହେଁ ଯାବେ । କିନ୍ତୁ କଡ଼ ଏଳ ନା, ଏଳ ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଵା ରାତ୍ରି, ଏଳ ଗେରୁଯା ବସନ, ଗାନ, ହାସି, ରସିକତା ।

ଆନନ୍ଦମଠେର ଆରମ୍ଭ ଥେକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଟା ଦୁର୍ବଲତା, ଏକଟା ସହଜ ସଫଳତାର ଭାବ ଦେଖା ଯାଯ । ତାତେଇ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ହ'ତେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହୋ ମଧ୍ୟେ ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାର ପ୍ରଥର ତେଜ ଦେଖି ନେ, କୋଥାୟ ସେଇ ଦୀତେ ଦୀତେ ଚାପା ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା—କୋଥାୟ ବାର ବାର ପରାଜୟେଓ ଅଟଳ ଧୈର୍ୟ । ସନ୍ତାନେରା ସମ୍ବାସୀ ଛିଲେନ ବଟେ କିନ୍ତୁ ତପସ୍ତୀ ଛିଲେନ ନା । ବନ୍ଧୁତ କଠୋର ତପସ୍ୟାର କୋନ ପ୍ରୟୋଜନଇ ଛିଲ ନା । ରାଜ-ଶକ୍ତିର ବିରକ୍ତ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ତାହା କଠିନ—ତାର ଫଲେରେଓ କୋନ ନିଶ୍ଚଯତା ନେଇ, ତାଇ ସେ ବିଦ୍ରୋହର ସଙ୍ଗେ ଗାନ ରସିକତାର କୋନ ସଂପର୍କ ଥାକା ସ୍ଵତହେ ଅସମ୍ଭବ ବଲେ ମନେ ହୟ । ବନ୍ଧୁମ ସନ୍ତାନ-ବିଦ୍ରୋହର ବିପକ୍ଷ ମୁସଲମାନ-ରାଜଶକ୍ତି ବା ଇଂରେଜ କୋମ୍ପାନୀର ସୈନ୍ୟବଳ କାଉକେଓ ସଥେଷ୍ଟ ପରାକ୍ରମଶାଲୀ ନା କରାତେ, ସନ୍ତାନଦେର ପ୍ରୟାସେର ମଧ୍ୟେଓ ସଥାର୍ଥ ବିକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନି । ପ୍ରାୟ ସକଳ ଯୁଦ୍ଧ ଅତି ସହଜେଇ ମୁସଲମାନେରା ହେଇରେଛେ । ସନ୍ତାନେରା କୋନ ଗ୍ରାମେ ଉପର୍ହିତ ହେଁଯାମାତ୍ର ମୁସଲମାନେରା ହିନ୍ଦୁ ହେଇରେଛେ । ସନ୍ତାନଦେର ନେତାରା କୋନ ଦିନ ମୁସଲମାନେର ହାତେ ଡେମନ କରେ ପଡ଼େନ ନି, ପଡ଼ିଲେଓ ଏମନ କି ଜେମେ ବନ୍ଧ ଥାକିଲେଓ, ଅତି ସହଜେ ସନ୍ତାନେରା ତୀରେ ଉକ୍ତାର କରେଛେ । ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ସନ୍ତାନ-ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଏବଂ ସେ ଅରାଜକତାର ଉପର ସନ୍ତାନଭାବର ସାର୍ଥକତା ନିର୍ଭର କରେଛି ତାର ଛବି ଆମରା ପାଇ ନେ । ଅର୍ଥଚ ଏଟାଇ ହଜେ ଏ ସହିଯେର background. ସବ କାଲୋ background-ରେ ଉପର ରଙ୍ଗେର

মত লাল রং-এ অগ্নিকাণ্ডের ছবি ঝাঁকা উচিত ছিল ; কিন্তু আকাশের কালো রং ফিঁকে হওয়াতে আগ্নের রং লাল না হয়ে স্বর্বস্বপ্নের মত গোলাপী হয়েছে। বিপক্ষেরা দুর্বল হওয়াতে সন্তানেরাও দুর্বল হয়ে পড়েছে। সর্বাঙ্গে রাম নাম ছাপ দিয়ে, কপালে তিলক কেটে অতিকায়কে যে কবি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন, তিনি যে কেবল অতিকায়কে কাপুরুষ করলেন তা নয়, পাঠকদের মনে রামের বৌরহের প্রতিও অশ্রু জমিয়ে দিলেন।

(৫)

আনন্দমঠের দু'শ'পাতার মধ্যে প্রায় তিন চার বার যুদ্ধের কথা আছে। সন্তানেরা বেশির ভাগ সময়ে গান করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যার উক্তার সাধন করেছেন। এই সকল যুদ্ধের পিছনে যে কোন রাজ্য স্থাপনের বা রাজধানী অধিকারের লক্ষ্য ছিল, তা মনে হয় না, তবু আনন্দমঠে যদি কিছু action থাকে তবে এই যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠ করলে দেখা যায় যে এ action-ও অতি মুহূৰ। পূর্বেই বলেছি যুদ্ধের দিকে বাঙালী লেখকদের একটা স্বাভাবিক রোক আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত কোন বাঙালী লেখক যুদ্ধ-বর্ণনায় সফল হন নি। তবে মাইকেলের মেঘনাদ বধে কিন্তু হেমবাবুর বৃত্তসংহারে যে যুদ্ধ-বর্ণনা আছে সে হচ্ছে ধনুর্বাণের যুদ্ধ। সে যুদ্ধ দৌর্ঘ ছল্দে দৌর্ঘকাল ধরে পুজ্জনামুপুজ্জনকাপে বর্ণনা করলে বিশেষ দোষ ধরা যায় না। রাম কি বাণ ছাড়লেন তা রপর রাবণ কি করলেন— মহাকাব্যে সর্গের পর সর্গ একাপ বর্ণনা দেওয়ার বিধি আছে। কিন্তু কাথান গোলার যুদ্ধ যদি কেউ সেইরূপ গভীর

অচল ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে বর্ণনা করেন তবে সেটা সহ করা কঠিন হয়ে ওঠে। নবীনবাবুর পলাশী যুদ্ধের বর্ণনায় “আবার আবার সেই কামান গর্জন” অথবা নবাব সৈন্যের যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষান্তি দিয়ে মোহনলালের দীর্ঘ বক্তৃতা ‘May be magni-
cent but it is not war”—চমৎকার ইতে পরে কিন্তু যুদ্ধ নয়।
বঙ্গিমও যে যুদ্ধ-বর্ণনায় সফল হন নি, তার প্রধান কারণ, তিনি
যুক্তের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেকের বক্তৃতার উল্লেখ করেছেন। একটি
মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার বক্তৃব্যটা বোঝাতে চেষ্টা করব। এক যুক্ত
সমস্ত সৈন্য রক্ষার নিমিত্ত ভবানন্দকে কুড়িজন মাত্র সৈন্য নিয়ে পুল
রক্ষা করতে হয়েছিল। বঙ্গিম লিখেছেন, “একা ভবানন্দ কুড়িজন
সন্তানের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে
লাগিলেন; কিন্তু যবনসেনা জলোচ্ছাসোথিত তরঙ্গের স্থায়। তরঙ্গের
উপর তরঙ্গ—তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ভবানন্দকে সংবেষ্টি, উৎপীড়িত,
নিঘন্মের স্থায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজ্ঞয়, নির্ভীক, কামা-
নের শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, যবন বাত্যা-
পীড়িত তরঙ্গাভিষাতের স্থায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল
—কিন্তু কুড়িজন সন্তান তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল।
তাহারা মরিয়াও মরে না—যবন পুলে ঢুকিতে পায় না”। কুড়িজন
লোক নিয়ে এই যে rearguard action, এ যে কি স্ট্রেইন তা
কল্পনা করা কঠিন নয়। এই সামাল সামাল ভাব—সন্তান-সেনাপতি-
দের উদ্বেগ—বর্ণনায় একেবারেই প্রকাশ পায় নি, এমন কি বঙ্গিম এ
ব্যাপারটাকে যেন অত্যন্ত সহজ করে ফেলেছেন। ভবানন্দ তোপ
সমস্ত করে হাতভালি দিয়ে বলেছেন “ক্ষেত্রাত্মক,”—আবার বলতেন,

“জীবানন্দ এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি”। যুক্তিক্ষেত্রেও রসিকতা চলছে। যুক্তি ভবানন্দ প্রাণ দিলেন। মৃত্যু-কালে তিনি ধৌরানন্দের সঙ্গে বগা বলতে বলতে যুক্ত করছিলেন। আসল কথা সত্যানন্দ যে তাঁকে সর্ববাস্তুঃকরণে ক্ষমা করে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির আশীর্বাদ করেছিলেন সেটা মৃত্যুর পূর্বে ভবানন্দকে না জানালে তাঁর প্রতি যে নির্ষৃততা দেখান হত বক্ষিম তাতে প্রস্তুত ছিলেন না।

এই বিদ্রোহ অগবং যুক্ত যে বিশেষ ভয়ঙ্কর নয় তার প্রমাণ এই যে, বউঘের শেষে দেখা গেল যে সন্তানদের প্রায় সকল নেতাই জীবিত রইলেন এবং সত্যানন্দের তিরোধানের পর যখন সন্তান-দল ভেঙ্গে গেল তখন খুব সন্তুষ্ট সকলেই স্বৰোধ ছেলের আয় ঘরে ফিরে চাক-রীর চেষ্টা করলেন। মহেন্দ্রের সঙ্গে কল্যাণীর মিলন হল, তাঁরা পদচিহ্নে ফিরে গেলেন। জীবানন্দ মরে ছিলেন, তাঁকে বাঁচান হ'ল, না হ'ল শুভ মিলন হয় না,—তিনি ও শাস্তি হিমালয়ে গেলেন। ধৌরানন্দ জ্ঞানানন্দের মৃত্যুর কোন কথাই নেই, অতএব বোধ করি তাঁরা ও বেঁচে বইলেন। এক ভবানন্দের মৃত্যু হ'ল—তবে তাঁর স্তুপুজ্ঞ নেই স্বতরাং বিশেষ ক্ষতি হ'ল না।

(৬)

আনন্দ মঠের সঙ্গে যখনই আমাদের প্রথম পরিচয় হল—তখনই তা Complete. হাজার হাজার লোক সন্তানধর্ম গ্রহণ করেছে, অস্ত্রশস্ত্রও সংগ্রহ করা হয়েছে—কামান সম্বন্ধে যে টুকু ক্রটি ছিল, অতি সহজেই মহেন্দ্রকে দৌক্ষিত করে সে অস্ত্রবিধাও আর রইল না। এখন

যুক্ত আৱলম্বন কৰলেই জয়লাভ নিশ্চিত। এই সম্পূর্ণতাৱ পিছনে কত বছৱেৱ নিষ্ফলপ্ৰয়াস, কত অত্যাচাৰ, কত অবিচাৰ ছিল বহুমতৰ তাৱ আভাৰণ দেন নি, অথচ এই লক্ষাধিক সাধাৱণ সন্তান—যাৱা যুক্ত কৱেছে, লুট কৱেছে, বক্ষিম যাদেৱ পৱিচয়ও দেন নি, সে সব লোক বৰ্তমানেৱ কোন দুঃসহ অত্যাচাৰেৱ ফলে বা ভবিষ্যতেৱ কোন মহিমাপূৰ্বত আদৰ্শেৱ আকৰ্ষণে নিজেৱ চিৱ দিনকাৰ ঘৱকম্বা, পুৰুষামুগত সংস্কাৱ ত্যাগ কৱে প্ৰলয়েৱ আহ্বানে ছুটে এসেছিল—প্ৰাণ দিতে। কোথায় ছিল পশ্চিমেৱ টোলে জীবানন্দ আৱ শান্তি, কোথায় ছিল প্ৰাসাদে মহেন্দ্ৰ আৱ কল্যাণী, কোথায় ছিল ভবানন্দ, কত দ্বিধা কত চিন্তাৱ পৱ তাঁৱা সত্যানন্দেৱ পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—তা আমৱা আনি নি, কিন্তু একথা সত্য যে আনন্দ মঠেৱ ঈষৎ অঙ্ককাৱ মন্দিৱেৱ মধ্যে বিশুড় জগন্মাত্ৰী কালী ও দুর্গামূৰ্তিৱ সামনে সত্যানন্দেৱ রূপক বক্তৃতাৱ দ্বাৱা এ সকল সম্পাদিত হয় নি। এক মহেন্দ্ৰেৱ দীক্ষা খাওয়াৱ ইতিহাস আমৱা পাই, তাৱ অতি বিচিত্ৰ। আজন্ম ঐশৰ্ষে প্ৰতিপালিত অতি সাধাৱণ লোক মহেন্দ্ৰ, বেশি ইতস্তত না কৱে হঠাৎ দীক্ষা নিতে স্বীকাৰ কৰলে। বাধা ছিল কল্যাণী, অন্য কোন স্বাভাৱিক কাৱণেৱ অভাৱে এক স্বপ্ন দেখিয়ে কল্যাণীকে বিষ খাওয়ান হ'ল, মহেন্দ্ৰেৱ দীক্ষাৱ পথ নিষ্কৃতক হ'ল।

(৭)

সন্তানদেৱ মধ্যে আমৱা যাদেৱ পৱিচয় পাই সে হচ্ছে সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীৱানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও মহেন্দ্ৰ, সমস্ত বইতে এঁৱাই হচ্ছেন প্ৰধান পুৰুষচৱিত্ৰ এবং সন্তানদেৱ মধ্যে এৱাই হচ্ছেন

সেনাপতি। যুক্তের সময়ে সব চেয়ে বেশি তরঙ্গযান ঘোরান এবং যুদ্ধান্তে বক্তৃতা দেওয়া আর সারং বাজিয়ে গান গাওয়া ভিন্ন এঁরা এমন কোন কাজই করেন নি, যাতে করে তাঁরা সেনাপতি হতে পারেন। সেনাপতির অপেক্ষা নভেলের নায়কত্ব এঁদের ভাল মানাত। সত্যানন্দ ও জীবানন্দ চমৎকার গাইতে পারতেন, ভবানন্দ দেখতে অতি সুন্দর ছিলেন, বক্তি তাঁর “অমরকৃত গুণশাশ্বত শোভিত সুন্দর মুখমণ্ডলের” বর্ণনা দিয়েছেন, ভবানন্দও গাইতে পারতেন। মহেন্দ্র জমীদারের ছেলে, সেও বেশ গাইতে জানত, ধীরানন্দ বা জ্ঞানানন্দের এ সব গুণের কোন উল্লেখ নেই, তবে তাঁরা বড় দরের নেতা ছিলেন না। বক্তি এঁদের এত স্বরূপার করে স্থষ্টি করেছেন যে, মনে হয় যুক্তের মত দারুন নিষ্ঠুর ব্যাপারে এই সব সেনাপতিদের সুন্দর গেরুয়া বসনে কাদা লাগতে পারে। এঁরা যুক্ত করেছিলেন বটে কিন্তু “নৃতন বসন্তের নৃতন ফুলের গন্ধ শু'কিতে শু'কিতে” যুক্ত করেছিলেন—এঁদের সৈশৃদ্ধের অন্তর্ভুক্ত বাঞ্ছনাও “ললিত তালধৰনি সন্ধলিত” ছিল। এই সব কবি-যৌক্তারা যে যুক্ত জয় করতে পেরেছিলেন তার-কারণ টমাস, হে প্রভৃতি ইংরেজ-সেনাপতিরা এঁদের চেয়েও অকর্ষণ্য ছিল। অনেক সময়ে মনে হয় সন্তান-সেনাপতিরা এ ব্রত গ্রহণ না করে ‘‘চির কুমার সত্ত্বার’’ খাতায় নাম লেখালে—চের বেশি স্বাভা-বিক হত। নায়িকাদের মধ্যে দেখতে পাই শান্তি সুন্দরী, বিদুষী; সত্যানন্দ জীবানন্দের তুল্য বলিষ্ঠ ছিলেন—সঙ্গীতেও তাঁর বিশেষ অধি-কার, কারণ তিনি যে গান গাইতে পারতেন তা নয়, তবে ‘‘রাগ-তাল-লয় সম্পূর্ণ’’ করে গীতগোবিন্দ গাইতে পারতেন। কল্যাণীও সুন্দরী—তিনিও যে অল্প স্বল্প গাইতে না জানতেন তা নয়, কারণ বিষ খেয়ে

মৃত্যুর পূর্বেই “অপ্সরোনিন্দিত কর্ত্তৈ” মোহভরে ডাকিতে লাগলেন — হরেমুরারে মধুকেটভারে। তিনি শাস্তির মত সর্বশাস্ত্র পাঠ করেন নি, তবে নানা রকম গুরুতর কাজ সহ্যেও সন্তানদের নেতাদের কল্যাণীর বিষ্ণু শিক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁকে ব্যাকরণ, অভিধান এবং গীতা পড়ান হত। বঙ্গিয় সকল প্রকার প্রতিকূল অবস্থাতেও শ্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ উপলক্ষ করেছিলেন। বোধ করি তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, যুদ্ধই কর আর যাই কর না কেন “না জাগিলে সব ভারত লম্বনা, এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা”।

(৮)

সত্যানন্দকে দল থেকে একটু আলগা রেখে, একটু উচুঁতে দাঢ় করান বোধ হয় বঙ্গিমের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অনেক সময়ে সে উচ্চতা রক্ষা হয় নি। নবীনানন্দ বেশে শাস্তি যখন দীক্ষা গ্রহণ করল তখন সত্যানন্দ তার ছদ্ম বেশ ধরতে পারেন নি—যদিও পরে বলেছিলেন, “যদি এমন নির্বোধই হইতাম, তবে কি এ কাজে হাত দিতাম”। তার পর জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ যে ধনুকে গুণ চড়াতে পারতেন, শাস্তি যখন সে ধনুকে গুণ দিল, তখন সত্যানন্দ যে কেবল বিস্মিত হয়েছিলেন তা নয়, তৌতও হয়েছিলেন। দাঢ়ির প্রাচুর্যে শাস্তির প্রকৃত পরিচয় যখন প্রকাশ পেল তখন তার সঙ্গে তর্ক বিতর্কে সত্যানন্দ যেন খেলো হয়ে পড়লেন। আর একবার জীবানন্দের প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত তিনি শাস্তিকে বলেছিলেন, “মা দাঢ়ির জোর না বুঝিয়া আমি জ্যোদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না বে,

আমি সকল জানি। তোমার ‘প্রলোভনে’ তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন, এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্য্যাঙ্কার হইতে পারে”। হ'তে পারে কার্য্যাঙ্কারের উপায় এই, কিন্তু এ সব কৌশল সত্যানন্দের মুখে মানায় নি। সমস্ত সন্তান-সম্প্রদায় যাকে অবতারের মত ভক্তি করত, হিমালয়ের গুহায়, আনন্দ-কাননে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা যাকে সন্তানবৃত্তে অতী করেছিলেন, তাঁর সামান্য কথা আদেশ বলে মান্য হওয়া উচিত ছিল। শাস্তির সঙ্গে বাদামুবাদে এ সব অনুনয় বিনয় তাঁকে মোটেই শোভা পায় নি। এতে মনে হয় যে অস্তরে যে প্রেরণা, যে মহত্ত্ব থাকলে মুখের কথা দৈববাণী হয়ে ওঠে, সত্যানন্দের তা ছিল না। মাঝে মাঝে বক্ষিম সত্যানন্দকে অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পদ মহাপুরুষ বলে দাঢ় করিয়েছেন। আবার পাছে বইর বাস্তবতা নষ্ট হয় তাই অলৌকিকতা বাদ দিয়ে কৌশলে ঘটনাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করেছেন। ভবানন্দ যে কল্যাণীকে বিবাহের প্রস্তাব করেছিল, এ কথা সত্যানন্দ জানতে পারেন; কি করে জেনেছিলেন সেটা বক্ষিম প্রথমটা বলেন নি। অঙ্ককার রাত্রে বনমধ্যে ভবানন্দ যখন প্রার্থনা করেছিলেন যে, ধর্ম্মে যেন তাঁর মতি থাকে তখন অদৃশ্য সত্যানন্দ আশীর্বাদ করেছিলেন। সে সময়ে মনে হ'ল যেন সত্যানন্দ অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা ভবানন্দের মনের অবস্থা জানতে পেরেছিলেন। তার পর জানা গেল যে, যে সময়ে ভবানন্দ কল্যাণীকে ও-সকল কথা বলেছিলেন তখন সত্যানন্দ কল্যাণীকে গীতা পড়াচ্ছিলেন। সন্তবত ভবানন্দ যাওয়াতে পাশের ঘরে লুকিয়ে কথাটা শুনেছিলেন। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, যখন ভবানন্দের প্রার্থনার উত্তরে

অদৃশ্য সত্যানন্দ “অতি প্রভুর অথচ গন্তীর মর্মভেদী কর্ণে” তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তখন হঠাৎ বনমধ্যে সত্যানন্দের কথা শুনে ভবানন্দের রোমাঞ্চ হয়েছিল এবং সত্যানন্দকে অনেক ডেকেছিলেন কিন্তু সত্যানন্দ কোনো জবাব দেন নি। যদি সত্যানন্দের কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই থাকে তবে এ সকল sensationalism-এর দরকার ছিল না—লুকিয়ে কথা শোনাতে, অস্বাভাবিক যায়গায় অপ্রত্যাশিত ভাবে অদৃশ্য থেকে হঠাৎ কথার জবাব দেওয়াতে যেন মনে হয় সত্যানন্দ অলৌকিক ক্ষমতার ভাগ করছিলেন। এই সকল clap trap সত্যানন্দকে আরও হীন করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে হয়, সত্যানন্দ প্রভুর কি কাজ ছিল না—তীর্থপর্যটনের কথাটা না হয় মেনেই নিলাম, কারণ তাঁর অন্য উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল যখন অনিশ্চিত, বহু বাধা বিপদের মধ্য দিয়ে তবে হয়ত দেশে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করা যাবে, হয়ত চেষ্টা সকল হবে না, এমনি সময়ে বিদ্রোহীদের নেতাকে কল্যাণীর বিষ্ণু শিক্ষার প্রতি এত মনোযোগ না দিলেও ক্ষতি ছিল না। সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে, তীর্থপর্যটন থেকে ফিরে এসে প্রথমেই সত্যানন্দকে দেখা গেল গৌরী দেবীর বাড়ীতে কল্যাণীকে পড়াতে ব্যস্ত। সত্যানন্দ তখন আমন্দমঠেও ধান নি। কল্যাণীর ঘরে ভবানন্দের সাক্ষাৎ হত, তাও তিনি করলেন না—বোধ হয় ভবানন্দ কি করে তাই দেখবার জন্যে। তা ছাড়া কল্যাণীর গীতাপাঠ না থাকলেও মহেন্দ্র-কল্যাণীর দাস্পত্য জীবনে বিশেষ গোলযোগ হবার ত কোন সন্তাবনা ছিল না—হয়ত বা কল্যাণী বেশি শাস্ত্র পাঠ করলেই গোলযোগ হত, কারণ মহেন্দ্র বেচারাকে আমরা যতদূর জানি সে শাস্ত্র টাস্ত্র কিছুই জানত না। দীক্ষার পূর্বে মহেন্দ্রকে প্রকৃত বৈক্ষণ-ধর্মের মাহাত্ম্য বোঝাতে সত্যা-

নন্দ প্রভুর অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। যা হোক, কল্যাণী তখন স্বামী-কন্তার কোনো খোঁজ না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ। বক্ষিম আধ পাতা ভ'রে সে বিষণ্ণতার বর্ণনা দিয়েছেন। এমন অবস্থায় গীতার নির্লিপ্ততা শিক্ষা কল্যাণীর পক্ষে দরকার ছিল সম্ভেদ নেই, তবে গীতাপাঠের মত মনের অবস্থা তখন তার ছিল কিনা সম্ভেদ আছে। ঘটনা-বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে গল্লের ধারা ঝরণার মত চালিয়ে নিতে যে বক্ষিমের তুল্য লেখক বঙ্গসাহিত্যে নেই, সেই বক্ষিম আনন্দমঠে এমন সকল অসন্তুষ্ট ঘটনা ঘটিয়েও গল্লের ধারা রক্ষা করতে পারেন নি। খুব সন্তুষ্ট সত্যানন্দের নানাবিধ দুর্বলতা বক্ষিম বুঝেছিলেন এবং সেই কারণেই আবার এক চিকিৎসককে এনে এবং সন্তানত্বতের আরম্ভটাকে অর্লোকিক রহস্য আবৃত রেখে সমস্ত চেষ্টাকে গৌরব দিতে চেয়েছিলেন।

(৯)

সন্তানন্দের নায়কদের মধ্যে কারো character-ই বেশ স্বাভাবিক হয় নি। তবে মহেন্দ্রের চরিত্র অন্যের চেয়ে ফুটেছে। নানা রকম ভদ্রোচিত সংস্কারের মধ্যে আজম্ব পালিত মহেন্দ্র সন্তানন্দের হাতে পড়ে সন্তানধর্ম গ্রহণ করলেন, কিন্তু তার চরিত্রের বেশি বদল হল না। মহেন্দ্র সে রকম করে দলে মিশতে পারলেন না। জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি কাজেকর্মে এমন কি নামে যেমন আনন্দ মঠের সঙ্গে জড়িত, মহেন্দ্র তেমন জড়িত হন নি। নীরব ভাল মানুষ মহেন্দ্রের মুখে বক্ষিম কোন বীরসাম্মান বক্তৃতা দেন নি, এমন কি শেষ যুক্তে প্রথমে যখন সন্তানেরা পলায়ন করছিল এবং পরাজয় যখন অনিবার্য বলে মনে হয়েছিল, তখন জীবানন্দ মহেন্দ্রকে

বলেছিলেন “এস এইখানে মরি”। মহেন্দ্র বলেছিলেন “মরিলে যদি রণ-
অয় হইত তবে মরিতাম। বুথা হ্যুৎ বৌরের ধৰ্ষ নহে”। অথচ
অনাড়ুর ভাবে মহেন্দ্রই সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করে-
ছিলেন। মহেন্দ্রের মত লোকেরা হয়ত বোঝে কম, জীবানন্দ
ভবানন্দের মত প্রতিভাশালী নয়, কিন্তু একবার বুকলে এ শ্রেণীর
লোকদের মন থেকে সে শিক্ষা দূর হয় না। জীবানন্দ ভবানন্দ নিজ
নিজ প্রতিভা ভঙ্গ করেছিলেন কিন্তু মহেন্দ্র তা করেন নি। জীবানন্দ
ভবানন্দ যা করেন খুব চটপট করেই করেন, মহেন্দ্রের কিন্তু বিধার অন্ত
ছিল না এবং সে বিধার পেছনে ছিল তাঁর সংস্কার ও শিক্ষা। মহেন্দ্রের
সঙ্গে ভবানন্দের প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ে। ভবানন্দ সিপাহীদের
হাত হ'তে মহেন্দ্রকে উক্তার করেন, তাঁর পর যখন সিপাহীদের সঙ্গে
সন্তানদের যুদ্ধ বাধে, মহেন্দ্র সন্তানদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার
উদ্ঘোগ করছিলেন, এমন সময়ে তাঁর মনে হল যে সন্তানেরা দম্ভ্য।
মহেন্দ্র জানতেন যে ডাকাতি করা অন্যায়, অমনি তিনি সরে
দাঢ়ালেন। এতক্ষণ সিপাহীরা যে তাঁকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল অথবা
ভবানন্দই যে তাঁকে উক্তার করেছিলেন এ সব কথার চেয়ে নৌতি-
শিক্ষার “চুরি করা মহা পাপ” এই শিক্ষাই প্রবল হল। আর একবার
কল্যাণীর সঙ্গে মিলনের পর পদচিহ্নে নিজের অস্তপুরে কল্যাণীর
শয়নগৃহে নবীনানন্দ বেশে শাস্তিকে দেখে মহেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত ও
কুষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরপর যখন কল্যাণী নিজে নবীনানন্দের বাঘছাল
খুলে দিতে লাগলেন তখন মহেন্দ্রের পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা মুশ্কিল
হল। নবীনানন্দ জিজ্ঞাসা করল—“কি গোসাই, সন্তানে সন্তানে
অবিশাস”! মহেন্দ্র বললেন—“ভবানন্দ ঠাকুর কি অবিশাসী ছিলেন”?

অর্থাৎ বিশ্বাস টিখাসের কথা ছেড়ে দাও, আমি এসব পছন্দ করিনে। নবীনানন্দ জিজ্ঞাসা করল, “কল্যাণীকে অবিশ্বাস করেন কোন্ হিসাবে”? জীবানন্দ বা ভবানন্দ খুব সন্তুষ্ট এ অবস্থায় পড়লে, হয় সত্যই বিশ্বাস করতেন, না হয় নবীনানন্দের গলা ধরে বাড়ী থেকে বের করে দিতেন, কিন্তু মহেন্দ্র ফস করে মিথ্যা কথা বলে বসলেন, “কই কিসে অবিশ্বাস করিলাম, কল্যাণীর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল তাই আসিয়াছি”। আসলে মহেন্দ্র মহা বিশ্বদে পড়েছিলেন, তিনি বিরক্ত বোধ করেছিলেন কিন্তু ভাবলেন “যে কল্যাণী একদিন অনায়াসে বিষ তোজন করিয়াছিল, সে কি অপরাধিণী হইতে পারে”? আমার মনে হয় কল্যাণীর বিষ তোজনটা মহেন্দ্র নিছক দুঃখ হিসাবে গণ্য করেন নি, অবশ্য কল্যাণীর মৃত্যুতে তাঁর খুব আঘাত লেগেছিল সম্মেহ নেই, তবু মনে মনে এই জন্য একটু আত্মপ্রসাদও অনুভব করেছিলেন যে, আমার স্ত্রীর মত পতিপরায়ণ সতী স্ত্রী কার, যে আমার ব্রত-সেবার পথ নিষ্কটক করবার জন্য এক মুহূর্তে বিষ খেল, সে কি সোজা কথা। আর কারো স্ত্রী করক দেখি। মহেন্দ্রের দুরবস্থা দেখে শান্তি আত্মপরিচয় দিতে প্রস্তুত ছিল, অবশেষে “সাহসে ভর করিয়া নবীনানন্দের দাঢ়ি ধরিয়া মহেন্দ্র এক টান দিল”, শান্তির ছদ্মবেশ ধরা পড়ল। কিন্তু তবু নিষ্ঠার নেই, নিজের স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে অবশ্য নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কিন্তু জীবানন্দ ঠাকুর কেন শান্তির সঙ্গে সহবাস করেন, এই ভেবে মহেন্দ্র ভারি বিষয় হলেন। কল্যাণী শান্তির পরিচয় দিল, “মুহূর্ত জন্য মহেন্দ্রের মুখ প্রফুল্ল হইল। আবার সে মুখ অঙ্ককারে ঢাকিল। কল্যাণী বুঝিল, বলিল, “ইনি অক্ষচারিণী”। যাহোক বাঁচা গেল, মহেন্দ্র এই জেবে নিশ্চিন্ত

হলেন যে ভূলজ্ঞমেও সে কোন দিন দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে মেশেন নি। যে সব লোক দিব্য খেয়েদেয়ে দিনে শুমিয়ে পান চিবিয়ে জীবন কাটায় এবং নীতিপাঠের সকল নীতিগুলি অত্যন্ত ভক্তি সহকারে পালন করে' পরকালের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পারে, মহেন্দ্র সেই জাতের লোক। যে মহেন্দ্রের উচিত ছিল উকৌল কি অধ্যাপক হওয়া, সেই মহেন্দ্র হঠাৎ এক দিন সন্তানত্বত গ্রহণ করলেম অথচ বক্ষিম তার কোন জবাবদিহি করা দরকার বোধ করেন নি। মহেন্দ্রকে বক্ষিম অনেক বিষয়ে অবহেলা করেছেন। এই অবহেলাতেই মহেন্দ্র একটা রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছেন কিন্তু মনোযোগ দিলে মহেন্দ্র একটা ঘোরতর বীরপুরুষ বা মহাপুরুষ হয়ে উঠতেন এবং সেই পরিমাণে অস্বাভাবিক হতেন। আনন্দ মঠের মহাপুরুষদের গীতাপাঠ, হরিসংকীর্তন, শুন্দর চেহারা এবং মাঝে মাঝে যুক্তিক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব ও বক্তৃতা পড়ে পড়ে মহেন্দ্রকে ভালই লাগে এ কথা স্বীকার করতে আমাদের লজ্জা নেই।

পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারীচরিত্র স্থিতিতেই যে বক্ষিম সিদ্ধহস্ত ছিলেন এ কথা সকলেই জানেন। এই নারীচরিত্র স্থিতিতে বক্ষিম আশৰ্দ্য সাহস দেখিয়ে ছিলেন। পঞ্চাশ বছর পূর্বে যখন স্ত্রীলোক অর্থে আমরা অবলা, সরলা, পতিত্রতা, পাঁচ ছেলের মা'র কথা ভাবতুম সেই যুগে ভ্রম, শৈবলিনী, দেবীচৌধুরাণী, কুন্দ, রোহিণী—এদের ছবি আঁকা যে কঠিন ছিল এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। বক্ষিম মেয়েদের কেবল স্বাধীনা করেন নি, সবলাও করেছেন। শাস্তিকে ঘোড়ায় চড়িয়ে, দেবী চৌধুরাণীকে ডাকাতের সন্দিগ্ধি করিয়ে ক্ষান্ত হন নি, এমন কি দলনীকে দিয়ে তকিঁথাকে পদাঘাত

করিয়েছেন, মৃণালিনীকে দিয়ে হৃষীকেশকে পদাঘাত করিয়েছেন। কিন্তু নারীচরিত্রেও আনন্দমঠ অন্য সকল উপস্থাস অপেক্ষা হীন। ভৱমু, শৈবলিনীর সঙ্গে শান্তি ও কল্যাণীর তুলনাই হতে পারে না। কৃষ্ণকান্তের উইলে ভৱমু কিন্তু চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী, রাজসিংহে চঞ্চলকুমারী—সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রের মত। তাদের বাদ দিয়ে ও-সকল বই লেখাই হতে পারে না। আনন্দমঠে কল্যাণীর স্থান খুব সঙ্কীর্ণ—তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার প্রয়োজন নেই; কিন্তু শান্তি অনেকটা জায়গা অধিকার করেছে। জীবানন্দ, সত্যানন্দ সকলেই তার কাছে মাথা হেঁটে করেছেন অথচ এই বইতে তার প্রয়োজন ছিল না। তার সমস্ত লাকালাফি, ঘোড়ায় চড়া, সহধর্মীর কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা নিয়েও সে একেবারে অনাবশ্যক। শান্তিকে বাদ দিলে আনন্দমঠের কোন অঙ্গহানি হ'ত না। জীবানন্দের সঙ্গে মিলে সে এমন কোনো কাজই করে নি যা আর যে-কোন সন্তান করতে পারত না। আসলে সর্বশাস্ত্র পাঠ করা, কুস্তিগীর, নিলিপ্তার একটা অনুশৃঙ্খলা বক্ষিম স্থষ্টি করতে চেয়েছিলেন। শান্তিতে তার আরম্ভ—দেবীচৌধুরাণীতে তার পরিণতি। প্রথম যথন তিনি তৌকু বুক্ষিমতী, প্রগল্ভা স্ত্রীলোক গড়েছিলেন তখন সে বেশ হয়েছিল কিন্তু যাই তাকে গীতা পড়িয়ে, কুস্তি শিখিয়ে, ঘোড়ার উপর চড়ালেন তখনই সে কেবল অবাস্তব নয়, অস্বাভাবিকও হয়ে পড়ল।

আনন্দমঠের মূল কল্পনার মধ্যে যে, কেবল ভাবাতিশয় দেখা দিয়েছে তা নয়—অনেক সমস্ত ঘটনা ও বর্ণনার মধ্যে তা অতিরিক্ত প্রকাশ পেয়েছে। বক্ষিমের অনেক বইতেই একটু খিয়েটারি ঢং দেখা যায়—যেমন কৃষ্ণকান্তের উইলে ঝোহিণীকে গুলি করবার পূর্বে

গোবিন্দলালের বক্তৃতা। আনন্দমঠে কল্যাণীর বিষ পানের দৃশ্যটাও আয় বাঙলা থিয়েটারের দৃশ্য হয়ে পড়েছে। কল্যাণী বিষ পাণ করে মহেন্দ্রের সঙ্গে duet গাইতে আরস্ত করলেন, ইতিমধ্যে সত্যানন্দ এসে উপস্থিত হলেন, তিনিও ঘোগ দিলেন। আমি বেশ কল্পনা করতে পারি যে ক্ষেত্রের অন্তরালে ঝ্যারিওনেট এবং বাঁয়া তবলা বাজতে লাগল এবং গানটা শেষ হবার পূর্বেই টেরিকাটা, লালগেঞ্জীর উপর মিহি পাঞ্চাবী-পরা দর্শক বাবুরা “এনকোৱ” “এনকোৱ” বলে চীৎকার করতে লাগলেন। কিন্তু কিছু পরে যখন মহেন্দ্র গিয়ে হঠাতে সত্যানন্দের কোলে বসল তখনকার দৃশ্যটা বাঙলা থিয়েটারের দর্শক মহাশয়রাও সহ্য করবেন কিনা আমার সন্দেহ আছে।

আনন্দমঠের শেষ হ'ল ট্র্যাভেডিতে—দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সকল বাধা যখন দূর হয়ে গেল তখনই বিসর্জনের বাজনা বাজল। ইতিপূর্বে আর একদিন বিদায়ের আহ্বান এসেছিল। সত্যানন্দ বলেছিলেন—“হে প্রভু ! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘীপূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব”। সেই মাঘীপূর্ণিমায় আবার যখন আহ্বান এল তখন না মেনে উপায় ছিল না। যুক্ত জয়ের পর কাউকেও কিছু না বলে সত্যানন্দ আনন্দমঠে একা ফিরে এসে বিষ্ণুমন্দিরে ধ্যানে বসলেন, তার পরে সেই গন্তুর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তির সামনে ক্ষীণালোকে মহাপুরুষ সত্যানন্দকে নিয়ে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। সেই নিস্তক পার্বণ মন্দিরে স্তুমিতালোকে বিষ্ণুর অক্ষে মোহিনী মূর্তির চোখ থেকে অশ্রুকণা কড়ে পড়েছিল কিনা কে জানে। সেই অনহীন, শব্দহীন, মহারণ্যের মধ্যে পড়ে রইল নিরানন্দ আনন্দমঠে পূজাবিহীন দেবতা, আর পড়ে

রইল সেই যুক্তিক্ষেত্রে জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের নীচে হাজার
অধ্যাত অভ্যাত সন্তানের মৃত দেহ।

আনন্দমঠের দোষের কথাই আলোচনা করা গেল কিন্তু এ কথা
যেন কেউ মনে না করেন যে, আমরা বঙ্গিমের প্রতিভাকে ইন মনে
করেছি। সত্যানন্দের প্রয়াসের বিপুলতা অঙ্কুট থাকুক—বঙ্গিমের
প্রয়াসের বিপুলতা বাঙালীর কাছে অভ্যাত নয়। বঙ্গিমের প্রতিভা
ত কেবল আনন্দমঠ স্থাপ্ত করে নি—চন্দশ্চেখের, কপালকুণ্ডলা,
কৃষ্ণকাস্তের উইল, বিষবৃক্ষের সঙ্গে আনন্দমঠ পড়লে সে প্রতিভার
বিপুলতা বোঝা যায়। আনন্দ মঠের সমস্ত ক্রটি সর্বেও একথা
আমরা ভুলতে পারব নাত যে, “ভারতভিক্ষণ” ও “ভারত বিলাপের”
দিনে বঙ্গিম মাতাকেই বন্দনা করেছিলেন এবং সুবর্ণনির্মিত দশভূজা
জ্যোতির্শ্যায়ী দেখিয়ে বলেছিলেন—“এই মা, যা হইবেন। দশভূজ
দশমিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আযুধরূপে নানা শক্তি শোভিত,
পদতলে শক্রবিমৰ্দ্ধিত, পদাশ্রিত বৌরকেশরী শক্রনিপীড়নে নিযুক্ত—
দিগ্ভূজা নানা প্রহরণ ধারিণী শক্রবিমৰ্দ্ধণী—বৌরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী
এস আমরা মাকে প্রণাম করি”।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

উপকথা ।

—*—

মানুষ ছিল একদিন অতি নির্বোধ, তাই সে তার পাশের সজিনী-
টিকে রেখেছিল কৃতদাসী ক'রে । তার পায়ে সে বেঁধে দিয়েছিল
লোহার শিকল—এমনি একটু লম্বা যে ঘরের কাজে সে এমিক ওদিক
করতে পারে ; কিন্তু বাইরে দোড়ে ছুটে না পালায় ।

সজিনীটিও থাকত, ঠিক কৃতদাসীর মতই ।

তার মনের কথা কে জানে ? মানুষের কূটীর্ণানি সে মেজে ঘসে
ধূয়ে মুছে চকচকে ঝককে করে রাখত । উঠানে নিজ হাতে তুলসীগাছ
গোড়ায় প্রতি সঙ্ক্ষ্যায় ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে সকল অমঙ্গলকে দূরে
রাখবার প্রার্থনা জ্ঞানাত । মানুষের কৃধার আহার জুগিয়ে দিত, তৃক্ষার
জল এনে দিত, পূজোর ফুল সাজিয়ে দিত । মানুষ মনে মনে ভাবত, ও
যে আমার জন্যে এত করে, তা আমি না হ'লে ওর চলে না বলে' ।

মানুষের মনের কথা জেনে বিধাতা মনে মনে হাসলেন । তিনি
মজা করবার জন্যে একদিন সজিনীটিকে তার পাশ থেকে সরিয়ে
নিলেন ।

মানুষ সে দিন কুটিরে কি঱ে এসে দেখলে যে, কৃধার আহার
নেই, তৃক্ষার জল নেই, পূজোর ফুল নেই ।

দেখে মানুষ একেবারে অগ্রিমৃত্তি, চেঁচিয়ে ঘর মাথায় করলে ; কান
সঙ্গে কুকুক্ষেস্তর বাধাবে তা খুঁজতে লাগলে । এমন সময় বিধাতা এসে

উপস্থিত হলেন। নিতান্ত ভাল মানুষটির মত জিজ্ঞেস করলেন—
ব্যাপার কি ?

ব্যাপার কি ? মানুষ রেগে বলে উঠল,—ব্যাপার কি ? কোথায়
গেল আমার সে ? ক্ষুধার আহার নেই, তৃষ্ণার জল নেই, পূজোর
ফুল নেই, সেই যে সব করত ।

বিধাতা বললেন—কেবল এই ?

মানুষ বললেন—তা নয় ত কি !

বিধাতা বললেন—বেশ তুমি সবই ঠিক ঠিক পাবে। তোমার
ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর ফুল, সব, কিছুরই ক্রটি হবে না।

বিধাতার মন্ত্রগুণে মানুষ সব ঠিক ঠিক পেতে লাগল—তার ক্ষুধার
আহার তৃষ্ণার জল পূজোর ফুল সব ঠিক ঠিক আগেরই মত ।

কিন্তু সঙ্গীটি আর ফিরলে না ।

সেই ঠিক ঠিক সবই রাটল—ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার জল, পূজোর
ফুল, কিন্তু সেই শুরুটি ত তেমন করে বাজে না। সেই শুরুটি—যে
শুরুটি তার আহার ও পানের মাঝামাঝি বিচ্ছেদটুকুকে পূর্ণ ক'রে
রাখত, তার পান ও পূজোর মাঝামাঝি অবসরটুকুকে সন্তোষ আর
তত্ত্ব দিয়ে ভরিয়ে দিত। আজ এ যে আহারের পিছনে কেবল
আহারই আছে, জলের পিছনে কেবল জল, ফুলের পিছনে কেবলই
ফুল—মুক্তিমতী নিষ্ঠুরতার মত, ঘড়ির কাটায় কাটায়, হৃদয়হীন যন্ত্রের
মত আপন আপন কর্তব্য ক'রে যায় ।

বাইরের কাজ সেরে মানুষ সেদিন ক্লাস্তদেহে তার কুটীরে ফিরে
এলো, দেখলে সব ঠিক ঠিক সাজান,—তার ক্ষুধার আহার, তৃষ্ণার
জল, পূজোর ফুল ।

মানুষের সর্বাঙ্গ জলে উঠল। কে চায়, কে চায় তোমার এ সব ?
কে চাই, কে চায় তোমার এই হৃদয়হীন বিজ্ঞপ ? কে চায়, কে চায়
তোমার এই ষন্ত্রচালিত নির্দিষ্টা ?

লাখি মেরে সে তার সমস্ত খাবার ছড়িয়ে দিল—জলের পাত
উলটিয়ে দিল, ফুলের ঝাশি ছয়-নয় ক'রে দিল।

বিধাতা এসে উপস্থিত হলেন, বললেন—আবার ব্যাপার কি ?

ব্যাপার কি ? মানুষ ক্রুক্ষস্বরে বললে,—ব্যাপার কি ? কে চায়
তোমার এ সব ? নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমার ওই হৃদয়হীন
ভোগ-সামগ্রি। আমার তাকে ফিরিয়ে দাও।

বিধাতা হাসলেন। তার সঙ্গীটিকে আবার ফিরিয়ে দিলেন।

মানুষ সে দিন তার সঙ্গীটির পা থেকে লোহার শিকল খুলে
নিয়ে তার হাত দু'থানিতে সোনার কাঁকন পড়িয়ে দিল, তার গলায়
মুক্তাহার দুলিয়ে দিল, তাকে বক্ষে চেপে চুম্বন ক'রে বললে,—তুমি ত
কৃতদাসী নও, তুমি যে পূর্ণা, তুমি অসম্পূর্ণকে পূর্ণ কর, তুমি শৃণুকে
সম্পদশালী করে তোল, তুমি কৃতদাসী নও।

সে দিন মানুষ যে ফুল দিয়ে পূজো করতে বসল, সে ফুলের
গক্ষে দেবতা আগ্রহ হয়ে উঠলেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্ণী।

অদৃষ্ট ?

—ঃঃ—

(Henri Barbusse-এর ফরাসী হইতে)

শান্দা ফাঁকা দেওয়ালের গায়ে খোলা জানলাটি দিয়ে দেখা যাচ্ছিল
সন্ধ্যার দৃশ্য—যেন একটা ছবি, যার শেষ নেই। আর বুড়ো ছটি
বন্ধু ও সেখানে বসেছিল,—পাথরে-কাটা মুর্তির মতই ভাবার্থহীন।

তারা হ'জনে জীবনের শেষ ক'টা দিন পাশাপাশি কাটিয়ে
দিচ্ছিল ; একই কোণটুকুর ছায়া ও রৌদ্রে হ'টিতে গড়িমসি করত,
একই ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টার প্রতীক্ষা করত, ও কখনো কখনো
কথা কইত।

—“সকলি ভুল। অদৃষ্ট ছাড়া কিছু নেই,”—বুড়ো দমনক
এমন ভাবে এই কথাগুলি বলে, যেন সে ইতিপূর্বে যা বলেছে, বা
মনে করেছে যে বলেছে, তারই এই শেষ কথা।

বুড়ো কুলদা উত্তরে বলে—“না, তা নয়। আর সকলের যেমন,
অদৃষ্টেরও তেমনি ভুল হয়ে থাকে।”

প্রথম বন্ধু মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীকে নিরীক্ষণ করে দেখলে। সে
দৃষ্টির ভিতর ছিল একটুখানি মায়া এবং একটুখানি তাচ্ছিল্য—কিন্তু
আশ্চর্যের ভাব কিছুই ছিল না, কারণ, এ বয়সে তার পক্ষে একটু
এলোমেলো বকাটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

অপৰ ব্যক্তি ঘাড় নাড়লে,—সে ঘাড় এক ঝাঁটি কাঠের মত
চিম্সে ও থাঁজকাটা ; এবং শুকনো কাঠখানার মত হাত দিয়ে ঠক
ঠক করে ইঁটু চাপড়ে বল্লে—

—হঁ হয়। আৱ এমনও সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে, যাৱ আবাৱ
প্ৰতিকাৱ হয়।”

দমনক চাপা গলায় ছঁঁ : বলে তাৱ নিস্তেজ, লাল কোটিৱগত
চোখ দুটি আকাশেৰ দিকে তুল্লে। এই ভেবে তাৱ মনটা নৱম
হ'ল যে, কিছুদিন বাদেই সেও মুখ খুল্লে হয়ত এমনি বাজে কথাই
বলবে।

কুলদা বলতে লাগল—“আমি এককালে বীৱনল্লিনীকে বিয়ে
কৱেছিলুম। এখন আৱ আমি তাৱ কথা মনেও কৱি নে। কিষ্টি সেদিন
একটি মেয়েকে দেখলুম, অনেকটা তাৱ মত দেখতে ; তাই তাকে
আবাৱ চোখেৰ সামনে দেখতে পেলুম, তাৱ সব কথা মনে প'ড়ে গেল।
আমি তাকে বিয়ে কৱেছিলুম ; আৱ তাৱ দু'মাস আগে বন্দুকেৰ
এক গুলি মেৱে তাৱ বাপেৱ মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলুম।”

দমনকেৱ হঠাৎ ভয় হ'ল যে, তাৱ সঙ্গী বিকাৱেৱ ঘোৱে
প্ৰলাপ বকছে, এবং এ অবস্থায় সে নিজে বলতে গেলে একলাই
ঘৰে রায়েছে। থৱ্ থৱ্ ক'বে কাঁপুতে কাঁপুতে সে চেঁচিয়ে বলে
উঠল—

—“অ্যা, কুলদা ! তুমি যুমচ্ছ ?”

—“না। আমি না যুমিয়ে ভাবছি। আমি যথার্থই সে মেয়েকে
বিয়ে কৱেছিলুম এবং যথার্থই সে বুড়োৱ দুই রংগোলি মধ্য দিয়ে এক
গুলি চালিয়ে দিয়েছিলুম। প্ৰথমেই ব'লে রাখি যে, সে মেয়েটি

বাপকে দেবতার মত পূজো করত, আর বাপও তাকে তেমনি
ভালবাসত।”

ছোট ছেলে যেমন ক'রে গল্প শোনে, দমনক তেমনি আবার শান্ত
ও লক্ষ্মীটি হয়ে দলে—

—“সে অনেক দিনের কথা।”

—“ইঁ, এতদিন আগেকার যে, মনে হয় যেন অশ্চ কার কথা
বলছি, আর এ সব যেন আমি জন্মাবার পূর্বে ঘটেছিল।”

বুড়ো যেন এক যুগ পিছিয়ে গিয়ে, স্মৃতির মত তার পূর্বজীবনের
অনঙ্গল ভাষা ফিরে পেয়ে বলে’ যেতে লাগল—

—“বৌরবাহু কর্তা ছিল ধূর্ত ও খাঁটি লোক। তাই সে আমাকে তার
মেঘে দিতে নারাজ ছিল। কারণ, আমি ছিলুম এক অকর্মার ধাড়ি।
আমার দ্বারা বাস্তবিক কোন কাজই হ'ত না,—এক তার মেঘেকে
ভালবাসা ছাড়া ;—কিন্তু যারা একমাত্র কাজ নিয়ে থাকে, তারা
যেমন সেটা ভাল ক'রেই করে, আমারও এ বিষয়ে সেই কৃতিহৃচুকু
ছিল। আমাকে সে মেঘেটি যেরকম মুক্ষ করেছিল, সেরকম অপর
কারো পক্ষে হওয়া অসম্ভব। তার পরে ত সে বুড়ো হয়ে কতকাল
হ'ল মরে গেছে। দমনক, শুনছ ত ?”

—“ইঁ।” বলে দমনক একটু কাছে এগিয়ে এল।

—“তাই বলছিলুম, তার বাপ মোটে রাজি ছিল না। চারপাশের
সব লোকে তার মত বদ্লাবার অনেক চেষ্টা করলে; কিন্তু সে এমন
ভাব দেখত, যেন তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না, বা বুঝতে পারছে
না। বেশি দূর এগোতে কেউ সাহস করত না। কারণ, বৌরবাহুর
শরীরে যেমন রাগ তেমনি সামর্থ্য ছিল। তার বাহু ছিল কুণ্ঠিগীর

পালোয়ানের মত, আর হাত দুটো ছিল শক্ত যেন হাতিয়ার। একদিন আমি সাহস করে তার সাম্নাসাম্নি কথাটা পেড়েছিলুম,—
 অতি নীচু গলায়,—কিন্তু সে আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিলে।
 ততক্ষণ নন্দিনীসুন্দরী রান্নাঘরের এক কোণ আশ্রয় ক'রে দুই মুঠো
 দিয়ে দুই চোখ ঢেকে ফোস-ফোস করছিল। আমি অক্ষমতায় ও
 লজ্জায় পাগলের মত হয়ে গিয়ে মনে মনে ভাবলুম—এর চেয়ে
 মৃত্যু ভাল। এ প্রাণ রেখে আর কি লাভ, যখন জীবনের শ্রী ও
 আনন্দ যার হাতে, সে বেটা সংযতানের মত পাপিষ্ঠ ও ঘাঁড়ের মত
 বলিষ্ঠ ! আর যত কিছু চেষ্টা-চরিত্র করি না কেন, তার ফল হবে
 শুধু লোকের কাছে নিজেকে আরও বেশি অপদস্ত করা। তার চেয়ে
 জীবনের সঙ্গে শোধবোধ করাই চের সোজা কাজ ব'লে মনে হ'ল।
 আমার বন্দুকে এক গুলি ভরলুম,—আর প্রেমিক মানুষের মনের মত
 একটি স্বন্দর রাত্রি দেখে মাঠের উপর দিয়ে সোজা দৌড়তে লাগলুম।
 কাজ ইঁসিল করবার উদ্দেশ্যে বুড়ি-ক্ষেত্রের মোড়ের কাছে রাস্তার
 ধারে বসলুম। কিন্তু বন্দুকটা মুঠোর মধ্যে সবে ঠিক করে ধরেছি,
 এমন সময় প্রথমে তুনতে পেলুম, পরে দেখতে পেলুম যে, একটি
 গাড়ী সেদিকে আসছে। বুকটা ছাঁৎ করে উঠল—বৌরবাহু কর্তৃর
 গাড়ি !—আমারও ভাল কথা মনে পড়ে গেল যে, মাসের এই দিনেই
 শক্ষেবেলা সে তাম্বলি গিল্লীকে এক থলে টাকা দিতে যায়। ঘোড়াটা
 কদম কদম চলুচিল। গাড়ীটা আমার নাকের সামনে দিয়ে চলে
 গেল, আর আমি তাকে দেখলুম,—সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে;
 সেই লম্বা প্রকাও শরীর—যা আমার চকুংশূল—সেই পাখীর ঠোটের
 মত নাক, সেই মন্ত্র ছুঁচোলো দাড়ি, সেই কালো বর্বর মৃত্তি, যেন

কাঞ্জিদের রাজা। তখন যে পশ্চ আমাকে এমন ভাবে কোণচেসা
করে' হুর্দিশাৰ শেষ সীমায় উপস্থিত কৰেছে, তাকে একেবাবে হাতেৱ
কাছে বাগে পেয়ে আমাৰ মাথায় এৱকম খুন চ'ড়ে গেল যে, সে
বলবাৰ নয়। আমি এক লক্ষে উঠে পডে' বন্দুকটা ঠিক তাৰ রগে তাক
কৰলুম, ছুঁড়লুম। টুঁ শব্দটি না করে' সে যেন ঝাপিয়ে ঘোড়াৰ লেজেৱ
দিকে একটা বোৰাৰ মত মুখ খুবড়ে পড়ল। ঘোড়টা ভড়কে গিয়ে
চাৰ পা তুলে ছুট দিলে, ও মোড়েৱ কাছে রাস্তা ছেড়ে পঁচিশ ত্ৰিশ
হাত দূৱে লাভচাঁদদেৱ জোতজমাৰ মধ্যখানে গিয়ে পড়ল। আমি
পালালুম—লম্বা লম্বা পা ফেলে উৰ্ধশ্বাসে পালালুম,—চোখে অঙ্ককাৰ
দেখছি, মাথা বিম্ব। বিম্ব কৰছে, আমাতে আৱ আমি নেই! পাগলেৱ
মত বেগে ছুটতে ছুটতে অনেক দূৱ এসে পড়বাৰ পৱ তবে আমাৰ
হঁস হতে লাগল যে কি কৱেছি। তখন যেন খোচা খেয়ে আৱ ও
মৱিয়া হয়ে মাঠ ও বনেৱ ভিতৱ দিয়ে দৌড় দিলুম। এই যে আমি
সেকালেৱ সব কথাই প্ৰায় তুলে গেছি, কিন্তু আজও মনে আছে,—
যেন সেদিনকাৰ কথা—কোন্ কোন্ ভয়ঙ্কৰ বোপ সেদিন রাত্ৰিতে
ডিঙিয়ে গেছি, কোন্ কোন্ মাৱাহুক বাধা উণ্ট ফেলে দিয়ে পথ
কৱে' নিয়েছি। মনেৱ মধো যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তা'তে যৎকিঞ্চিত
শাস্তি ও শৃঙ্খলা এনেছিল শুধু এই বিশ্বাসে যে, বাড়ী গিয়ে আহত্যা
কৱব, এটা নিশ্চিত। কিন্তু অভিশপ্তেৱ মত ছুটতে ছুটতে দেখি যে
তাদেৱ বাড়ীতে এসে পড়েছি—যে বাড়ী একজন এইমাত্ৰ ছেড়ে
গেছে, কিন্তু যেখানে আৱ একজন আছে। যখন এ বিষয়ে চেতনা
হ'ল, তখন সে এত কাছে এসে পড়েছে যে তাকে আৱ একবাৰ
দেখবাৰ চেষ্টা মা কৱে থাকতে পাৱলুম না। একবাৰ তাকে দেখব—

জানলাৰ ভিতৱ্ব দিয়ে—কেমন অপেক্ষা কৰে' বসে আছে, আগুনেৰ লাল আভায় অঙ্ককাৰে আধ-ফুটন্ত ! দেওয়ালেৰ বৱাবৰ যত আন্তে পাৰি হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁপ্তে কাঁপ্তে গেলুম ; ফিৱলুম ।—আঃ ! এই যে, জানলা থোলা আছে, তাৰ ধাৰে সে কনুয়েৰ উপৱ ভৱ দিয়ে বসে আছে । সে বসে আছে যেন স্বর্গেৰ দেবীৰ মত শাদা, আৱ আমাৰ মনে হল তাৰ ভিতৱ্ব থেকে কি একটা আলো ফুটে বেৱচ্ছে । সত্যি, সে হাসছিল ! সে দেখতে পেলৈ আমি ক'হাত দূৰে তাৰ সামনে দাঁড়িয়ে আছি, দেখে একটু চেঁচিয়ে উঠে হাতে তালি দিলে—আলো যেন আৱও জলে উঠল, হাসি যেন আৱও ফুটে উঠল ! সে বল্লে—“ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন । বাবা রাজি হয়েছেন । তিনি দেখলেন আমি কি-ৱকম কষ্ট পাচ্ছি, তাই আমাৰ দুঃখ দূৰ কৱবাৰ জন্মে হঠাত হাঁ বল্লেন । এইমাত্ৰ বেৱিয়ে যাবাৰ আগে তিনি হাঁ বল্লেন ও হাসলেন ।”

আমি গলা দিয়ে একটা আওয়াজ পৰ্যন্ত বেৱ কৱতে পাইলুম না । কে যেন আমাৰ গলা টিপে ধৰেছিল, চোখ কানা কৰে দিয়েছিল । জানিনে কেমন কৰে পিছু হটলুম, কেমন কৰে দেওয়াল টপ্কে তাৰ দৃষ্টি এড়ালুম, কেমন ক'ৰে পালালুম । কেবল মনে আছে সেই মুহূৰ্ত, যে সময় নিজেৰ বাড়ী পেঁচলুম,—এক হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে, আৱ এক হাতে বন্দুক আঁকড়ে ধৰে’—পৃথিবীতে এখন এই হ'ল আমাৰ একমাত্ৰ সম্পত্তি ! রান্নাঘৰে চুকে, কোন আলো না জালিয়েই, চোখ না খুলিয়েই, আমাৰ সাধেৰ টোটা খুজলুম, পেলুম, ও বন্দুকে পূৱলুম । কিন্তু অদ্ম্যেৰ এই ভীষণ সৰ্বনেশে অত্যাচাৰ আমাকে এতদূৰ পিষে ফেলেছিল—আহা এমনি মাৱই মাৱলে যে, আমাকে যে বাঁচিয়েছে সে খবৱটা জানবাৰও অবসৱ

দিলে না,—যে আমারি আঘাত্যা করবার উৎসাহ পর্যন্ত নিতে গিয়েছিল। সেই জন্মই কি শুলিটা ফস্কে গেল?—সে যাই হোক, ঘটনা এই যে, শুধু শুলির তপ্ত শাসের আঁচটুকু আমার মুখে লাগল, আর সে শুধু আমার একগোছা চুল উড়িয়ে নিয়ে গেল। টলতে টলতে মাটীতে পড়ে গেলুম,—ভাবলুম মারা গেছি।

প্রদিন বেলা দুয়ুরে ভরা দিনের আলোয় ঘুম ভাঙল। সব কথা মনে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। কান ভোঁ ভোঁ করছিল, কিন্তু বাইরে একটা মহা সোরগোল হচ্ছিল; লোকজন পাড়া-পড়শীতে হৈ হৈ ধৈ ধৈ করছে। ঠিক সেই সময় জীবন জঙ্গ দুরজায় এক ধাক্কা মারলে। আমার চেয়ে তখন সে বছর কতকেবু বড় ছিল, পরে বুড়োরোগে মারা গেছে। আর এক ধাক্কা দিতেই দুরজা খুলে গেল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে তার ফোকলা মুখ গলিয়ে সে চেঁচিয়ে বল্লে—

—বৌরবাহু কর্তাকে কাল রাস্তায় খুন করেছে।

—ঝ্যা, অঝ্যা, বলতে বলতে আমি পাড়াস মেরে ঘরের শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলুম।

—সেই পাপ বেদের কাজ। তারা টাকার থলে নিয়ে গিয়েছিল, তাই ধরা পড়ে গেছে। তারা সব কথা খুলে বলেছে। তারা আম থেকে বেরবার মুখে গাড়ির উপর চড়াও হয়েছিল,—তার বাড়ী থেকে দু'পা বুড়ো পিঠে দশ ঘা ছুরি থেয়েছে, সে একেবারে মরে' কাঠ হয়ে গিয়েছিল,- একগঙ্গা রক্ত পড়েছিল। তারপর তারা তাকে গাড়ির গদির উপর ঠিক করে বসিয়ে দিয়ে, ঘোড়াকে আস্তে আস্তে যেতে দিলে।

অনেকক্ষণ পরে, বুড়ী-ক্ষেতের মোড়ে, ঘোড়াটা কংসপতির বাড়ীতে
গিয়ে পড়েছিল।”

আমি তা’হলে তাকে মেরে ফেলি নি। কারণ সে আগেই
মরে গিয়েছিল! মরাকে কেউ খুন করে না।—এখন দেখছ,—
এ স্থলে অদৃষ্টের হাত ছিল বটে, কিন্তু সে রাত্রিতে তার ভুল হয়ে
গিয়েছিল।

শ্রীমতী ইন্দিরা মেবী চৌধুরাণী।

ଅନୁଷ୍ଠାନ ।

—::—

ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦ୍ରିରୀ ଦେବୀ ଚୌଧୁରାଣୀ ଫରାସୀ ଭାଷା ଥିଲେ “ଅନୁଷ୍ଠାନ” ନାମଧେଯ ଯେ ଗଲ୍ପଟି ଅନୁଵାଦ କରେଛେନ, ତାର ମୋଦା କଥା ଏହି ଯେ, ମାନୁଷ ପୁରୁଷକାରେର ବଳେ ନିଜେର ମନ୍ଦ କରତେ ଚାଇଲେଓ ଦୈବେର କୃପାୟ ତାର ଫଳ ଭାଲ ହସ୍ତ ।

ଏ କିନ୍ତୁ ବିଲେତୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ।

ଏ ଦେଶେ ମାନୁଷ ପୁରୁଷକାରେର ବଳେ ନିଜେର ଭାଲ କରତେ ଚାଇଲେଓ ଦୈବେର ଶୁଣେ ତାର ଫଳ ହୟ ମନ୍ଦ । ଏଦେଶୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକଟି ନମୁନା ଦିଚ୍ଛି । ଏ ଗଲ୍ପଟି ସତ୍ୟ—ଅର୍ଥାତ୍ ଗଲ୍ପ ଯେ ପରିମାଣ ସତ୍ୟ ହୟେ ଥାକେ, ସେଇ ପରିମାଣ ସତ୍ୟ, ତାର ଚାଇତେ ଏକଟୁ ବେଶିଓ ନୟ, କମ ଓ ନୟ ।

(୧)

ଏ ସଟନା ସଟେଛିଲ ପାଲବାବୁଦେର ବାଡ଼ୀତେ । ଏହି କଲିକାତା ସହରେ ଖେଳାରୀମ ପାଲେର ଗଲିତେ ଖେଳାରୀମ ପାଲେର ଭାଙ୍ଗାନ କେ ନା ଜାନେ ? ଅତ ଲଞ୍ଚା-ଚୌଡ଼ା ଆର ଅତ ମାଥା ଉଂଚୁ-କରା ବାଡ଼ୀ, ଯିନି ଚୋଖେ କମ ଦେଖେନ, ତୀର ଚୋଖ ଓ ଏଡ଼ିଯେ ଯାଯି ନା । ଦୂର ଥିଲେ ଦେଖିଲେ ସେଟିକେ ସଂକ୍ଷିତ କଲେଜ ବଳେ ଭୁଲ ହୟ । ସେଇ ସାର ସାର ଦୋତାଳା ସମାନ ଉଂଚୁ କରିଛିଯାନ ଥାମ, ସେଇ ଗଡ଼ନ, ସେଇ ମାପ, ସେଇ ରଂ, ସେଇ ଟଂ । ତବେ କାହେ ଏମେ ଆର ସନ୍ଦେହ ଥାକେ ନା ଯେ, ଏଟି ସରନ୍ଧୀର ମନ୍ଦିର ନୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଲୟ । ଏଇ ଶୁମୁଖେ ଦୌଘି ନେଇ, ଆହେ ମାଠ, ତାଓ ଆବାର ବଡ଼

নয়, হোট ; গোল নয়, চৌকোণ। এ ধাঁচের বাড়ী অবশ্য কলিকাতা
সহরে বড় ব্রাহ্মণ ও গলিঘুঁচিতে আরো দশ বিশটা মেলে, তবে
খেলারামের বসতবাটীর শুমুখে যা আছে, তা কলিকাতা সহরের অপর
কোনো বনে'দী ঘরের ফটকের সামনে নেই। দুটি প্রকাণ্ড সিংহ—
তার সিংহদরজা'র দু'ধার আগলে বসে আছে। তার একটিকে যে
আর সিংহ বলে চেনা যায় না, আর পথচলতী লোকে বলে, বিলেতী-
শেয়াল, তার কারণ, বয়েসের গুণে তাঁর ইঁটের শরীর ভেঙে পড়েছে,
আর তার চুণবালির জটা থসে পড়েছে। কিন্তু যেটির পৃষ্ঠে সোয়ার
হয়ে, নাকে নথ-পরা একটি পানওয়ালী সকাল সঙ্ক্ষে, পয়সায় পাঁচটি
করে খিলি বেচে, সেটিকে আজও সিংহ বলে চেনা যায়।

(২)

এই সিংহ দুটির দুর্দিশা থেকেই অনুমান করা যায় যে, পাল
বাবুদেরও তয় দশা উপস্থিত হয়েছে। বাইরে থেকে যা অনুমান
করা যায়, বাড়ীর ভিতরে চুকলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাল বাবুদের নাচঘরের জুড়ি নাচঘর কোম্পানীর আমলে
কলিকাতায় আর একটিও ছিল না। মেজবাবু অর্থাৎ খেলারামের
মধ্যম পুত্র, কলিকাতার সব আঙ্গণ কায়স্থ বড় মানুষদের উপর টেক্কা
দিয়ে সে ঘর বিলেতী-দস্তুর সাজিয়ে ছিলেন। পাশে পাশে টাঙ্গানো
আর গায়ে গায়ে ঠেকানো ঝাড়ে ও দেওয়ালগিরিতে সে ঘর চিকমিক
করত, চকমক করত। আর এদের গায়ে যখন আলো পড়ত, তখন
সব বালখিল্য ইন্দ্রধনু তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঝর্মে ঘরময়
খেলা করে বেড়াত। সে এক বাহার ! তারপর সাটিনে ও মথমলে

মোড়া কত বে কোচ-কুর্সি সে ঘরে জমায়েত হয়েছিল, তার আর লেখাজোখা নেই। কিন্তু আসলে দেখবার মত জিনিষ ছিল সেই নাচঘরের শুমুখের বারান্দা। ইতালি থেকে আমদানী-করা তুষার-ধবল, নবনৌতশ্বকুমার মর্মর-প্রস্তরে গঠিত, প্রমাণ সাইজের স্তৌর্মুক্তি-সকল সেই বারান্দার দু'ধারে সার বেঁধে দিখাবাত্র ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত—তার প্রতিটি এক একটি বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাদের মধ্যে কেউ বা স্নান করতে যাচ্ছে, কেউ বা সঁজ নেয়ে উঠেছে, কেউ বা শুমুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে, কেউ বা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ বা দুহাত তুলে মাথার চুল কপালের উপর চূড়া করে বাঁধছে, কেউ বা বাঁ হাতখানি ধনুকাকৃতি করে সামনের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে, দেখতে মনে হত, স্বর্গের বেষ্টক অপ্সরা শাপত্রষ্টা হয়ে মেজবাবুর বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন। সামান্য লোকদের কথা ছেড়ে দিন, এ ভুল মহা মহা পশ্চিমদেরও হত। তার প্রমাণ—পাল-প্রাসাদের সভাপত্তি স্বয়ং বেদান্তবাগীশ মহাশয় এক দিন বলেছিলেন,—“মেজবাবুর দৌলতে মর্ত্যে থেকেই স্বর্গ চোখে মেঘলুম। এই পাষাণীরা ষনি কারো স্পর্শে সব বেঁচে ওঠে, তাহলে এ পুরী সত্যসত্যাই অমরাপুরী হয়ে ওঠে” —একথা শুনে মেজবাবুর জনৈক পেয়ারা মো-সাহেব বলে ওঠেন, “তাহলে বাবুকে এক দিনেই ফতুর হতে হত—শাড়ীর দাম দিতে”। এ উত্তরে চারদিক থেকে হাসির তুফান উঠল। এমন কি, মনে হল যে, ঐ সব পাষাণমুক্তিদেরও মুখে চোখে যেন ঈষৎ সর্কোতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলা বাহুল্য যে, এই কলিকাতা সহরেও উর্বশী, মেনকা, রস্তা, ঘৃতাচীদের নাচে গানে প্রতি সঙ্ক্ষে এ নাচৰ সরগন্ম হয়ে উঠত। আর আজকের দিনে তার কি অবস্থা?—বলছি।

(৩)

এই নাচঘরের এখন আসবাবের ভিতর আছে একটি জরাজীর্ণ কাঠের অতিকায় লেখবার টেবিল আর খানকতক ভাঙা চৌকি। মেজেতে পাতা রয়েছে একখানি বাহাতুর বৎসর বয়েসের একদম বঙ্গ-জলা এবং নানাস্থানে ইঁচুরে-কাটা কারপেট। এ ঘরে এখন ম্যানেজার সাহেব দিনে আফিস করেন, আর রাত্তিকে সেখানে নর্তন হয় ইঁচুরে—কীর্তন হয় ছুঁচোর।

এই অবস্থা-বিপর্যয়ের কারণ জানতে হলে পাল-বংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস শোনা চাই। সে ইতিহাস আমি আপনাদের সময়স্তরে শোনাব। কেননা, তা যেমন মনোহারী, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এ কথার ভিতর সে কথা ঢোকাতে চাই নে এই জন্য যে, আমি জানি যে, উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের ঝিঁঝড়ি পাকালে, ও দুয়ের বুসই সমান কষ হয়ে উঠে।

ফল কথা এই যে; পাল বাবুদের সম্পত্তি এখনও যথেষ্ট আছে; কিন্তু সরিকৌ-বিবাদে তা উচ্ছ্বল যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ভাঙা ঘর আবার গড়ে তোলবার ভার আপাতত একজন কমন-ম্যানেজারের হাতে পড়ছে। এই ভদ্রলোকের আসল নাম—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু লোক সমাজে তিনি চাটুয়ে-সাহেব বলেই পরিচিত। এর কারণ, যদিচ তিনি উকিল, ব্যারিষ্ঠার নন, তা'হলেও তিনি ইংরেজী পোষাক পরেন—তা'ও আবার সাহেবের দোকানে তৈরী। চাটুয়ে-সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের আগাগোড়া পরীক্ষা একটানা ফাঁষ্ট ডিভিসনেই পাশ ক'রে এসেছেন, কিন্তু

আদালতের পরীক্ষা তিনি থার্ড ডিভিসনেও পাশ করতে পারলেন না। এর কারণ, তাঁর Literature-এ taste ছিল, অস্তুত এই কথা ত তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী অবশ্য এ কথাটা মোটেই বুঝতে পারলেন না যে, পক্ষীরাজকে ছুকড়ে জুতলে কেন না সে তা টানতে পারবে। তবে তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন বলে' স্বামীর কথার কোনো প্রতিবাদ করেন নি, নিজের কপালের দোষ দিয়েই 'বসে' ছিলেন। যখন সাত বৎসর বিনে-রোজগাঁৱে কেটে গেল, আর সেই সঙ্গে বয়েসও ত্রিশ পেঙ্গলো, তখন তিনি হাইকোর্টের অজ্ঞ হবার আশা তাঁগ করে' মাসিক তিনশ' টাকা বেতনে পাল বাবুদের অমিদাবী সম্পত্তির ম্যানেজারের পদ আৰকড়ে ধৰতে বাধ্য হলেন। এও দেশী অদৃষ্টের একটা ছোটখাটো উদাহরণ। বাঙালী উকৌল না হয়ে সাহেব কোঁচুলি হলে তিনি যে Bar-এ ফেল করে bench-এ যে প্রমোশন পেতেন, সে কথা ত আপনাবী সবাই জানেন। যাৰ এক পয়সাৰ প্র্যাকটিস নেই, সে যে একদম তিনশ' টাকা মাইনেৱ কাজ পায়, এ দেশের পক্ষে এই ত একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাঁর কপাল ফিরল কি করে জানেন?—ছেরেপ মুৱিবিৰ জোৱে। তিনি ছিলেন একাধাৰে বনে'দী ঘৰেৱ ছেলে আৱ বড় মানুষেৱ জামাই—অৰ্থাৎ তাঁৰ যেমন সম্পত্তি ছিল না, তেমনি সহায় ছিল।

(৪)

বলা বাছলা, অমিদাবী সম্বন্ধে চাটুয়ে-সাহেবেৱ জ্ঞান আইনেৱ চাইতেও কম ছিল। তিনি প্রথম শ্ৰেণীতে B. L. পাশ কৱেন,

সুতরাং এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে, আইনের অন্তর্গত পুঁথিগত বিদ্যে তাঁর পেটে নিশ্চয়ই ছিল ; কিন্তু কি হাতে-কলমে কি কাগজে-কলমে তিনি জমিদারী বিষয়ে কোনো জ্ঞান কখনো অর্জন করেন নি। তাই তিনি তাঁর আজীব্য ও পরম হিতৈষী জনেক বড় জমিদারের কাছে এ ক্ষেত্রে কিংকর্তব্য সে সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে গেলেন। তিনি যে পরামর্শ দিলেন, তা অমূল্য। কেন না, তিনি ছিলেন একজন যেমনি হঁসিয়ার, তেমনি জবরদস্ত জমিদার। তারপর জমিদার মহাশয় ছিলেন অতি স্বল্পভাষা লোক। তাই তাঁর আছোপাস্ত উপদেশ এখানে উঙ্কৃত করে দিতে পারছি। জমিদারী শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত—আমার বিশ্বাস, অনেকেরই কাজে লাগবে। তিনি বললেন,—“মেধ বাবাজী, যে পৈতৃক সম্পত্তির আয় ছিল শালিয়ানা দু’লক্ষ টাকা, আমার হাতে তা এখন চার লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমি যে জমিদারীর উন্নতি করতে জানি এ কথা আমার শক্তির স্বীকার করে ;—আর দেশে আমার শক্তির অভাব নেই। জমিদারী করার অর্থ কি জানো ?—জমিদারীর কারবার জমি নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে। ও হচ্ছে এক রকম ঘোড়ায় চড়া। লোকে যদি বোবে যে পিঠে সোয়ার চড়েছে, তা হলে তাকে আর ফেলবার চেষ্টা করে না। প্রজা হচ্ছে জমিদারীর পিঠ আর আমলা-ফয়লা তার মুখ। তাই বলছি প্রজাকে সায়েস্তা রাখতে হবে খালি পায়ের চাপে ; কিন্তু চাবুক চালিয়ো না, তা হলেই সে পুস্তক ঝাড়বে আর অমনি তুমি ডিগ্বাজি থাবে। অপর পক্ষে আমলাদের বাগে রেখে রাশ-কড়া করে ধরো, কিন্তু সে রাশ প্রাণপণে টেনো না, তা হলেই তারা শির-পা করবে আর অমনি তুমি উল্টো ডিগ্বাজি থাবে। এক কথায়

তোমাকে একটু রাশ-ভারি হতে হবে আর একটু কড়া হতে হবে। বাবাজি এ ত ওকালতি নয় যে, হাকিমের স্বস্তি যত মুহূর্যে পড়বে নেতিয়ে পড়বে, আর যত তার মন যোগানো কথা কইবে, তত তোমার পসার বাড়বে। ওকালতি করার ও জমিদারী করার কায়দা ঠিক উল্টো উল্টো।”

এ কথা শুনে চাটুয়ে-সাহেব আশ্চর্ষ হলেন, মনে মনে ভাবলেন যে, যখন তিনি ওকালতিতে ফেল করেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই জমিদারীতে পাশ করবেন। কিন্তু তার মনের ভিতর একটু ধোকা ও রয়ে গেল। তিনি আনতেন যে, তার পক্ষে রাশ-ভারি হওয়া অসম্ভব। তার চেহারা ছিল তার প্রতিকূল। তিনি হলেন একে মাথায় ছোট, তার উপর পাতলা, তার উপর ফর্ণা, তার পর তার মুখটি ছিল স্ত্রীজাতির মুখমণ্ডলের ঘায় কেশহীন, অবশ্য হাল-ফেসান অনুযায়ী—হ'সঙ্গা স্বহস্তে ক্ষোর-কার্যের প্রসাদে। ফলে, হঠাৎ দেখতে তাকে আঠারো বৎসরের ছোকরা বলে ভুল হত। রাশ-ভারি হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব জেনে তিনি স্থির করলেন যে, তিনি গন্তব্য হবেন। মধুর অভিবে শুড়ে যেমন দেবোচ্ছন্নার কাজ চলে যায়, তিনি ভাবলেন রাশ-ভারি হতে না পেরে গন্তব্য হতে পারলেই জমিদারী-শাসনের কাজ তেমনি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

তারপর এও তিনি জানতেন যে, মানুষের উপর কড়া হওয়া তার ধাতে ছিল না। এমন কি, মেয়ে মানুষের উপরও তিনি কড়া হতে পারতেন না। তাই তিনি আপিসে নানারকম কড়া নিয়মের প্রচলন করলেন, এই বিশ্বাসে যে, নিয়ম কড়া হলেই কাজেরও কড়াকড় হবে। তিনি আফিসে চুকেই হকুম দিলেন যে, আমলাদের সব ঠিক এগারটায়

আপিসে উপস্থিত হতে হবে, নইলে তাদের মাইনে কাটা যাবে। এ নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথমে সেরেস্তায় একটু আমলা-তান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু চাটুয়ে-সাহেব তাতে এক চুলও টললেন না, আন্দোলন থেমে গেল।

(৫)

পাল-সেরেস্তার আমলাদের চিরকেলে অভ্যাস ছিল, বেলা বাঁরোটা-সাড়েবাঁরোটাৱৰ সময় পান চিবুতে চিবুতে আপিসে আসা, তাৰপৰ এক ছিলিম গুড়ুক টেনে কাজে বসা। মুনিব যেখানে বিধবা আৱ নাবালক—সেখানে কৰ্মচাৱীৱা স্বাধীন ভাবে কাজ কৱতে অভ্যন্ত হয়। কিন্তু তাৱা যখন দেখলে যে ঘড়িৰ কাঁটাৱ উপৰ হাজিৱ হলেই হজুৱ খুসি থাকেন, তখন তাৱা একটু কষ্টকৰ হলেও বেলা এগাৰটাতে হাজিৱা সই কৱতে স্বৰূপ কৱে দিলে। অভ্যাস বদলাতে আৱ ক'দিন লাগে ?

মুশ্কিল হল কিন্তু প্ৰাণবন্ধু দাসেৱ। এ ব্যক্তি ছিল এ কাছাকীৱিৰ সবচেয়ে পুৱোণো আমলা। পঁয়তালিশ বৎসৱ বয়েসেৱ মধ্যে বিশ বৎসৱকাল সে এই ষ্টেটে একই পোক্তে একই মাইনেতে—বৱাৰৱ কাজ কৱে’ এসেছে। এতদিন যে তাৱ চাকুৱী বজায় ছিল, তাৱ কাৰণ—সে ছিল অতি সংলোক, চুৱি-চামারিৰ দিক দিয়েও সে ঘেঁসত না। আৱ তাৱ মাইনে যে কথনো বাড়েনি, তাৱ কাৰণ, সে ছিল কাজে অতি চিলে।

প্ৰাণবন্ধু কাজ ভালবাসত না, পৃথিবীতে ভালবাসত শুধু ছুটি-জিনিস, এক তাৱ স্তৰী, আৱ এক তোমাক। এই ঐকান্তিক ভালবাসাৱ

প্রসাদে তাঁর শরীরে দুটি অসাধারণ গুণ জন্মেছিল। বহুদিনের সাধনার কলে তাঁর হাতের লেখা হয়েছিল যে 'রকম চমৎকার, তাঁর সাথে তামাকও হ'ত তেমনি চমৎকার।

আপিসে এসে তাঁর নিত্য নিয়মিত কাজ ছিল—সর্ব প্রথমে তাঁর স্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখে। গোড়ায় “প্রিয়ে, প্রিয়তরে প্রিয়তমে” এই সম্মোধন এবং শেষে “তোমারই প্রাণবন্ধু দাস” এই দ্ব্যর্থ-সূচক স্বাক্ষরের ভিতর, প্রতিদিন ধৌরে স্বশ্রিতে ধরে ধরে পুরো চারপৃষ্ঠা চিঠি লিখতে লিখতে তাঁর হাতের অঙ্কর ছাপার অঙ্করের মত হয়ে উঠেছিল। এইজন্য আপিসের যত দলিলপত্র তাকেই লিখতে দেওয়া হত। এই অঙ্করের প্রসাদেই তাঁর চাকরীর পরমায় অঙ্কয় হয়েছিল।

তাঁর পর প্রাণবন্ধু ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক ধেতেন—অবশ্য নিজ হাতে সেজে। পরের হাতে সাজা-তামাক থাওয়া তাঁর পক্ষে তেমনি অসন্তুষ্ট ছিল—পরের হাতের লেখা-চিঠি তাঁর স্ত্রীকে পাঠান তাঁর পক্ষে ষেমন অসন্তুষ্ট ছিল। তিনি কর্কেষণ প্রথমে বেশ করে ঠিকরে দিয়ে তাঁর উপর তামাক এলো করে' সেজে, তাঁর উপর আলগোছে মাটীর তাওয়া বসিয়ে, তাঁর উপর আড় করে স্তরে স্তরে টিকে সাজিয়ে, তাঁর পর সে টিকার মুখায়ি করে, হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করে ধৌরে ধৌরে তামাক ধরাতেন। আধ ঘণ্টা তবিরের কম যে আর ধোঁয়া গোল হয়ে, নিটোল হয়ে, মোলায়ের হয়ে' নলের মুখ দিয়ে অনর্গল বেরোয়া না, এ কথা যারা কখনো ঝঁকে টেনেছে, তাদের মধ্যে কে না আনে?

এই চিঠি লেখা আর তামাক সাজাই ফুরুসতে প্রাণবন্ধু আপিসের

କାଜ କରିଲେ ଏବଂ ସେ କାଜଓ ତିନି କରିଲେ ଅନୁମନକ୍ଷତ୍ରାବେ । ସବୀଳ ବାହଳ୍ୟ ଯେ, ସେ ଫୁରସଃ ତାଁର କତ କମ ଛିଲ । ଏଇ ଚିଠି ଓର ଥାମେ ପୁର ଦେଓୟା ତାଁର ଏକଟା ବୋଗେର ମଧ୍ୟେ ଦୀଢ଼ିଯେ ଗିଯେଛିଲ । ଏ ସତ୍ତ୍ଵେଷ ସମଗ୍ରେ ସେରେଣ୍ଟା ଯେ ତାଁକେ ଛାଡ଼ିଲେ ଚାଇତନା, ସତ୍ୟ କଥା ବଲିଲେ ଗେଲେ ତାଁର ଆସଲ କାରଣ ଏହି ଯେ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ସେରେଣ୍ଟାଙ୍କ ହକୋବରଦାରୀର କାଜ କରିଲ—ଆର ସବାଇ ଜାନିଲେ ଯେ, ଅମନ ହକୋବରଦାର ମୁଚିଖୋଲାର ନବାବ-ବାଡ଼ୀତେଓ ପାଓୟା ଦୁକର । ତାଁର କରିପରେ ଦା-କାଟାଓ ଭେଲସା ହେଁ, ଧରିବାନ ଓ ଅମ୍ବୁରି ହେଁ ଉଠିଲ ।

ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ସକଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଧାକଳେଓ ତିନି ସକଳେର ଉପର ସମାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛିଲେନ । ପ୍ରଥମତ ତାଁର ଧାରଣା ଛିଲ ଯେ, ତାଁର ମାଈନେ ସେ ବାଡ଼େ ନା, ସେ ତିନି ଚୋର ନନ ବଲେ । ଅର୍ଥାତ ତାଁର ବେତନ ବୁଦ୍ଧିର ବିଶେଷ ଦରକାର ଛିଲ । କେନ ନା, ତାଁର ଶ୍ରୀ କ୍ରମାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ଛେଲେର ମୁଖ ଦେଖିଲେ । ବଂଶବୁଦ୍ଧିର ସଜ୍ଜେ ବେତନ ବୁଦ୍ଧିର ଯେ କୋନଇ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଇ, ଏହି ମୋଟା କଥାଟା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁଙ୍କ ମନେ ଆର କିଛୁତେଇ ବସନ ନା । ଫଳେ ତାଁର ମନେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେଁ ଗେଲ ଯେ, ଆପିସେଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷେରା ଶୁଣେର ଆଦର ମୋଟେଇ କରିଲେ ନା । ଶୁତର୍ବାଂ ତାଁର ପକ୍ଷେ, କି କଥାଯା, କି କାହିଁ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଦେର ମନ ଜୁଗିଯେ ଚଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଧକ । ଶେଷଟା ଦୀଢ଼ାଳ ଏହି, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ଯା ଖୁସି ତାଇ କରିଲ, ଯା ଖୁସି ତାଇ ବଲିଲ,—କାହିଁ କୋନୋ ପରୋଦ୍ଧା ରାଖିଲ ନା । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷେରାଓ ତାଁର କଥାଯା କାନ ଦିଲେନ ନା; କେନ ନା, ତାଁମା ଧରେ ନିଯେଛିଲେ ଯେ, ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ ହଜେ ଟୈଟେର ଏକଅନ ପେନସାନଭୋଗୀ ।

(৯)

এই মৃতন ম্যানেজারের হাতে পড়ে' প্রাণবন্ধু পড়ল মুক্তিলে। সে ভদ্রলোক বেলা এগারটায় আপিসে আর কিছুতেই এসে জুটতে পারলে না। কলে তাকে নিয়ে হজুর পড়লেন আরও বেশি মুক্তিলে। নিজ তার মাইনে কাটা গেলে বেচারা যায় মারা—আর না কাটলেও তার নিম্নম যায় মারা। এই উভয় সম্ভটে তিনি তাকে কর্ম হতে' অবসর দেওয়াই হির করলেন। এই মনস্থ করে তিনি তার কৈফিয়ৎ চাইলেন, তার পর তার অবাবদিহি শুনে চাটুয়ে-সাহেব আরোক হয়ে গেলেন। প্রাণবন্ধু তার স্বরূপে দাঙিয়ে অল্লানবদনে বললে—হজুর ! সাড়ে আটটার আগে ঘুর্ছ ভাঙে না। তার পর চা আর তামাক খেতেই ষণ্টাখানেক কেটে যায়। তার পর নাওয়া-খাওয়া করে, এক ক্ষেত্র পথ পারে হেঁটে কি আর এগারটার মধ্যে আপিসে পৌছান যায়” ?

এ অবাব শুনে হজুর যে আরোক হয়ে রাইলেন, তার কারণ তার নিজেরও অভোস ছিল এ সাড়ে আটটায় ঘূর্ম থেকে ওঠা। তার পর চা-চুক্ট খেতে তারও সাড়ে নয়টা বেজে যেত। স্বতরাং পারে হেঁটে আপিসে আসতে হলে তিনি যে সেখানে এগারটার ভিতর পৌছুতে পারতেন না, এ কথা তিনি মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেন না। সেই অবধি প্রাণবন্ধুর দেরি করে' আপিসে আসাটা চাটুয়ে-সাহেব আর দেখেও দেখতেন না। ম্যানে-জারের উপর প্রাণবন্ধুর এই হলো প্রথম জিঃ।

চান্দিম না যেতেই, চাটুয়ে-সাহেব আবিষ্কার করলেন যে, প্রাণ-

ବଞ୍ଚିକେ ଡେକେ ବଖନ ଓ ତମ୍ଭୁର୍ଟେ ପାଓଯା ଯାଯା ନା । ସଥନରେ ଡାକେନ ତଥନରେ ଶୋନେନ ଯେ ପ୍ରାଣବଞ୍ଚୁ ତାମାକ ସାଜଛେ । ଶେଷଟା ବିରକ୍ତ ହୟେ ଏକ ଦିନ ତାକେ ଧରକ ଦେବମାତ୍ର ପ୍ରାଣବଞ୍ଚୁ କାତର ସ୍ଵରେ ବଲଲେ—“ହଜୁର, ଆମି ଗରୀବ ମାନୁଷ, ତାଇ ଆମାକେ ତାମାକ ଖେତେ ହୟ, ଆର ତା ନିଜେଇ ସେବେ ଖେତେ ହୟ । ପୟସା ଥାକଲେ ସିଗାରେଟ ଖେତୁମ, ତା ହଲେ ଆମାକେ କାଜ ଥେକେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନ୍ତ ଓ ଉଠିତେ ହତ ନା । ବଁ ହାତେ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରହର ସିଗାରେଟ ଥରେ ଡାନ ହାତେ କଲମ ଚାଲାତୁମ” ।

ଏବାର ଓ ହଜୁରକେ ଚୁପ କରେ’ ଥାକତେ ହ’ଲ ; କେନ ନା, ହଜୁର ନିଜେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ସିଗାରେଟ ଫୁଁକତେନ, ତାର ଆର ଏକ ଦୃଢ଼ ଓ କାମାଇ ଛିଲ ନା । ତିନି ମନେ ଭାବଲେନ, ପ୍ରାଣବଞ୍ଚୁ ଯା ଥୁସି ତାଇ କରନ୍ତି ଗେ, ତାକେ ଆର ତିନି ସଂଟୋବେନ ନା ।

କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣବଞ୍ଚୁକେ ଆବାର ତିନି ସଂଟୋବେ ବାଧ୍ୟ ହଲେନ । ଏକଥାନି ଅନ୍ଧରି ଦଲିଲ ଯା ଏକ ଦିନେଇ ଲିଖେ ଶେଷ କରା ଉଚିତ ଛିଲ, ମେଥାନା ପ୍ରାଣବଞ୍ଚୁ ସଥନ ଦୁଦିନେ ଓ ଶେଷ କରନ୍ତେ ପାଇଲେ ନା, ତଥନ ତିନି ଦେଓୟାନଙ୍ଗୀର ପ୍ରତି ଏହି ଦୋଷାରୋପ କରଲେନ ଯେ ତିନି ଆମ୍ଲାଦେର ଦିଯେ କାଜ ତୁଳେ ନିତେ ପାଇଲେ ନା । ଦେଓୟାନଙ୍ଗୀ ଉତ୍ତର କରଲେନ ଯେ, ତିନି ସଫଳେର କାହେ କାଜ ଆଦ୍ୟ କରନ୍ତେ ପାଇନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇନ୍ତି ନା ଏକ ପ୍ରାଣବଞ୍ଚୁର କାହିଁ ଥେକେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣବଞ୍ଚୁ ଆପିସେ ଏସେ ଆପିସେର କାଜ ନା କ'ରେ ନିଷ୍ଟ ସଂଟୋବନେକ ଥରେ ଆର କି ଇନିଯେ-ବିନିଯେ ଲିଖେ ।

ପ୍ରାଣବଞ୍ଚୁର ତଳବ ହଲ ଏବଂ କୈକିଯିଃ ଚାଓୟା ହ’ଲ । ହଜୁରର ଉପର ଦୁ-ଦୁ-ବାର ଜିତ ହୋଯାଯ ତାର ସାହସ ବେଜୋର ବେଡେ ଗିଯେଛି । ମେ ଜ୍ଯାମେର ସାହେବେର ମୁଖେର ଉପର ଏହି ଜବାବ କରଲେ,—“ହଜୁର

আমাৰ লেখাৰ একটু হাত আছে, তাই লিখে লিখে হাত পাকাৰাম
চেষ্টা কৰি”।

—“তোমাৰ হাতেৰ লেখা ঘৰেষ্ট পাকা, তা আৱ বেশি পাকাৰাম
দৱকাৰ নেই। আৱ ষদি আৱো পাকাতে হয় ত আপিসেৰ লেখা
লিখলৈ হয়—বাজে লেখা কেন”?

—“হজুৱ, হাতেৰ লেখাৰ কথা বলছি নে। আমাৰ প্ৰাণে একটু
কাৰ্যালয়স আছে, তাই প্ৰকাশ কৱাৰ অস্ত লিখি। আৱ সে লেখা
বাজে নয়। গৱীৰ মানুষেৰ না হলে সে লেখা সব পুস্তক আকাৰে
প্ৰকাশিত হত। আমাকে তাই ঘৰেৱ লোকেৰ পড়াৰ জন্মই লিখতে
হয়। ষদি আমাৰ পৱনসা ধাকত, তা হলে ত ছাইপাঁশ লিখেও
দেশেৰ মাসিকপত্ৰ ভৱিষ্যে দিতে পাৱতুম”।

এৱ উকৱে চাটুয়ো-সাহেবেৱ আতে বা লাগল। তিনি বে
আপিসে বসে মাসিক পত্ৰিকাৰ অস্ত ইনিয়ে-বিনিয়ে হৱেকৱকয়
বেনামী প্ৰবন্ধ লিখতেন আৱ সে লেখাকে সমালোচকেৱা যে
ছাইপাঁশ বলত, এ কথা আৱ ষাৱ কাছেই ধাক, তাঁৱ কাছে ত আৱ
অবিদিত ছিল না। তিনি আৱ ধৈৰ্য ধৱে ধাকতে পাৱলেন না, চক্ৰ
বৰ্কবৰ্ক কৱে বলে উঠলেন—“দেখো, তোমাৰ হওয়া উচিত ছিল—”
তাঁৱ কথা শ্ৰেষ্ঠ কৱতে বা দিয়েই প্ৰাণবন্ধু বলে ফেলল—“বড়
মানুষেৰ আমাই! কিন্তু অনুষ্ঠ ত আৱ সবাৱই সমান নয়”।

ৱোধে কোভে হজুৱেৱ বাকৱোধ হয়ে গেল। তিনি তাকে উজ্জ্বলী
দিয়ে দৱলজা দেখিয়ে দিলেন, প্ৰাণবন্ধু বিনা বাক্যবায়ে স্বহাবে প্ৰহাব
কৱল, আৱ এক ছিলিম ভাল কৱে তামাক সাজতে। প্ৰাণবন্ধুৰ কিন্তু
হজুৱকে অপমান কৱাৰ কোনই অভিপ্ৰায় ছিল না। সে গুৰু

নিষে সাকাই হবার অন্ত ও-সব কথা বলেছিল। হিসেব করে কথা
কওয়ার অভ্যাস তার কশ্চিন্কালেও ছিল না, আর পঁয়তালিশ বৎসর
বয়সে একটা নৃতন ভাষা শেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

(৭)

চাটুয়ো-সাহেব দেওয়ানজীকে ডেকে বললেন—“প্রাণবঙ্গুকে দিয়ে
আর কাজ চলবে না, তার জায়গায় নৃতন লোক বহাল করা হোক।
নৃতন লোক খুঁজে বার করবার জন্যে দেওয়ানজী সাত দিনের সময়
নিলেন। এর ভিতর ঠার একটু গৃঢ় মতলব ছিল। তিনি জানতেন
প্রাণবঙ্গুর ঘারা কশ্চিন্কালেও কাজ চলে নি, অতএব যে চাকরী তার
এতদিন বজায় ছিল আজ তা যাবার এমন কোনো নৃতন কারণ ঘটে নি।
তা ছাড়া তিনি জানতেন যে, হজুরের রাগ হস্তা না পেলেতেই চলে
বাবে আর প্রাণবঙ্গু সেরেস্তার যে কাজ চিরকাল করে এসেছে ভবি-
শ্বতেও তাই করবে—অর্থাৎ তামাক সাজা। ফলে প্রায় হয়েছিল ও
তাই। যেমন দিন যেতে লাগল, ঠার রাগও পড়ে আসতে লাগল, তার-
পর সপ্তম দিনের সকাল বেলা চাটুয়ো-সাহেব রাগের কণাটুকুও মনের
কোনো কোণে খুঁজে পেলেন না। তিনি তাই ঠিক করলেন যে
এবারকার অন্ত প্রাণবঙ্গুকে মাপ করবেন। তারপর তিনি যখন
ধড়া-চূড়া পরে আপিস যাবার অন্ত প্রস্তুত হয়েছেন, তখন ঠার স্তু
তার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন, “দেখ ত, এ চিঠির অর্থ আমি
কিছুই বুঝতে পারছি নে।” সে চিঠি এই—

“প্রিয়ে প্রিয়তরে প্রিয়তমে,

আজ তোমাকে বড় চিঠি লিখতে পারব না, কেননা আর একথামি

মন্ত্র চিঠি লিখতে হয়েছে। জানই ত আমাদের ছোকরা হজুর আগাকে
নেক নজরে দেখেন না, কেন ন। আমি চোর নই অতএব খোসামুদ্দেশ
নই। বরাবর দেখে আসছি যে পৃথিবীতে শুণের আদর কেউ করে
না, সবাই খোসামোদের বশ। কিন্তু আমাদের এই নৃত্ব ম্যানেজারের
তুলা খোসামোদ-প্রিয় লোক আমি ত আর কখনো দেখি নি। একমাত্র
খোসামোদের জোরে যত বেটো চোর তার প্রিয়পাত্র হয়েছে। যাদের
হাতে তিনি পাকাকলা হয়েছেন তাদের মুখে হজুরের স্বীকৃতি আর
ধরে না। অমন রূপ অমন বুদ্ধি অমন বিষ্ণে অমন মেজাজ একাধারে
আর কোথাও নাকি পাওয়া যায় না। এ সব শুনে তিনিও মহা খুসি।
প্রিয়পাত্রের কাগজ সুমুখে ধরলেই অমনি তাতে চোখ বুজে সই
মেরে বসেন। এঁর হাতে টেটো আর কিছু দিন থাকলে নির্ধারিত
গোল্লায় যাবে। অমিনারৌর ম্যানেজারি করার অর্থ ইনি বোঝেন,
গন্ধীর হয়ে কাঠের চোকিতে কাঠের পুতুলের মত থাড়া হয়ে এগারটা-
পাঁচটা ঠায় বসে থাকা। ইনি ভাবেন ওতে তাকে রাখভারি দেখাবু,
কিন্তু আসলে কি রুকম দেখায় জান ?—ঠিক একটি সাক্ষী-গোপালের
মত। ইনি আপিসে চুকেই একটি কড়া হকুম প্রচার করেছেন যে,
কর্মচারীদের সব এগারটায় হাজির হতে হবে আর পাঁচটায় ছুটি।
আমি অবশ্য এ হকুম মানি নে। কেন না, যারা কাজের হিসেব
জানে না তারাই ঘণ্টার হিসেব করে—সেই পুরুষদের মত যারা মন্ত্র
পড়তে জানে না, কিন্তু ঘণ্টা নাড়তে জানে। খোসামুদ্দেরা বলে,
'হজুরের কাজের কায়দা একদম সাহেবি'। ইনি এতেই খুসি, কেন
না এঁর মগজে সে বুদ্ধি নেই, যা থাকলে বুঝতেন যে লেপাফা-চুরস্ত
হলে যদি কাজের লোক হওয়া যেত তা'হলে পোষাক পরলেও সাহেব

[হওয়া ষেত। এঁর বিশ্বাস ইনি সাহেব, কিন্তু আসলে কি জান ?—মেম-
সাহেব। অস্তুত দূর থেকে দেখলে ত তাই মনে হয়। কেন জানো ?—
এঁর পুরুষের চেহারাই নয়। এঁর ঝঁটা ক্যাকালে—সাবান মেথে,
আর মুখে দাঢ়ি গোফের লেশমাত্র নেই কিন্তু আছে একমাত্র চুল,
তাও আবার ক'টা। সে যাই হোক, একটু বিপদে পড়ে এই মেম-
সাহেবের মেম-সাহেবকে একখানি চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি। আজ
দুদিন থেকে কানাঘুঁষোয় শুনছি যে ছজুর নাকি আমাকে বরখাস্ত
করবেন। তাতে অবশ্য কিছু আসে ষায় না, আমার মত গুণী-লোকের
চাকরীর ভাবনা নেই। তবে কিনা অনেক দিন অঁচি বলে
জায়গাটাৰ উপৱ মায়া পড়ে গেছে। মুনিবকে কিছু বলা
হৰ্থা, কেন না তিনি মুখ ধাকতেও বোবা, চোখ ধাকতে কাণ।
তাই তাকে কিছু না বলে যিনি এই মুনিবের মুনিব তাঁৰ অর্থাৎ তাঁৰ
স্ত্রীৰ কাছে একখানি দৰখাস্ত কৰেছি। শুনতে পাই আমাদেৱ
সাহেব মেম-সাহেবেৰ কথায় ওঠেন বসেন। এ কথায় বিশ্বাস হয়,
এঁর স্ত্রী শুনেছি তারি সুন্দৱা, প্রাপ্তি তোমার মত। তাৱপৱ এই
অপদাৰ্থটা তাৱ স্ত্রীৰ ভাগ্যেই থায়, শুধু ভাতি থায় না, মদও থায়,
চুক্টও থায়। ইনি বিশ্বেৰ মধ্যে শিখেছেন ঐ দুটি। সে বাই
হোক এৱ গৃহিনীকে ষে চিঠিখানি লিখেছি সে একটা পড়বাৰ মত
জিনিব। আমাৰ দুঃখ হইল এই যে সেখানি তোমাৰ কাছে পাঠাতে
পাৱলুম না। তাৱ ভিতৱ সমান অংশে বীৱৱস আৱ কৱণৱস পূৱে
দিয়েছি আৱ তাৱ ভাষা একদম সৌভাৱ বনবাসেৱ। শুনতে পাই
কৃষ্ণকুৱাণী খুব ভাল লেখা পড়া জানেন। আমাৰ এই চিঠি পড়েই
তিনি বুৰতে পাৱবেন ষে তাৱ স্বামী ও তোমাৰ স্বামী এ দুজনেৰ মধ্যে

কে বেশি গুণী। আশা করছি কাল তোমাকে মশ টাকা মাইনে বাড়াব
হৃথিবর দিতে পারব।

তোমারই প্রাণবন্ধু দাস।”

চাটুয়ো-সাহেব চিঠিখানি আঢ়োপাঞ্চ পড়ে ঈষৎ কাষ্টহাসি হেসে
দ্বারাকে বললেন—“এ চিঠি তোমার নয়, ভুল খামে পোড়া হয়েছে।”

বলাবাহল্য পর্যপাঠ, প্রাণবন্ধুর বরধাস্তের তরুম বেরল।
চাটুয়ো-সাহেব সব বরদাস্ত করতে পারেন এবং দ্বীর কাছে অপদস্ত
হওয়া চাড়। কেব না তিনিও ছিলেন প্রাণবন্ধুর জুড়ি পজ্জী-গতপ্রাণ।

এই চিঠিই হল প্রাণবন্ধু দাসের দ্বীর যথার্থ অনুষ্ঠি-লিপি, আর সে
লিপি সংশোধনের কোনোক্লিপ উপায় ছিল না, কেব না তা ছাপার
অক্ষরে লেখা।

শ্রীপ্রমো চৌধুরী।

—————

ନବୟୁଗେର କଥା ।*

—*—

ମାନୁଷେର ସମାଜ ଓ ସଭ୍ୟତାର ସଥନ ବେଶ ଦିନ ହିର ହୟେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଧାକବାର ଯେ ନେଇ, ଯେ ପଥେ ହୋକ ତାକେ ସଥନ ଚଲାଇଛି ହୟ, ତଥା ସେ-
ସଭ୍ୟତା କିଛୁଦିନ ଟିକେ ଧାକେ, ତାରଇ ଯୁଗେର, ପର ଯୁଗ ଆସେ । ଅର୍ଥାତ୍—
ଏହି ଅବିରାମ ଓ ଅବିଚ୍ଛମ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ଇତିହାସେର ଖାନିକଟାକେ ଛ'ଏକଟା
ଶୁଙ୍ଗପଣ୍ଡିତ ବା ଅଞ୍ଚଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବାପର ଥେକେ ସେଟିକେ ତଫାଂ କରେ
ତାର ଏକଟା ଯୁଗ ନାମ ଦିଯେ ପଣ୍ଡିତରୀ ତାଦେର କାରବାର ଚାଲାନ । ଏବଂ ଏ
ହିସାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ମାତ୍ରେଇ ପୂର୍ବେର ଯୁଗେର ତୁଳନାୟ ନୃତନ ଯୁଗ । କିନ୍ତୁ
'ନବୟୁଗ' କୋନ ନୃତନ ଯୁଗ ନାହିଁ, ସେ ହ'ଲ ନବୀନ ଯୁଗ । ଗାଛେର ଔବନେର
ବାର୍ଷିକ ଇତିହାସେ ଶୀତେ ସଥନ ପାତା ଝରେ' ଶାଢ଼ି ଡାଳ କ'ଖାନି ଟିକେ
ଧାକେ ସେଓ ଏକଟା ନୃତନ ଯୁଗ; କିନ୍ତୁ ସଥନ ବସନ୍ତେର ଶ୍ରୀପର୍ବତୀ ତାର ସାବ୍ରା
ଦେହ ବଜିନ କିଶଳଯେ ସାଡ଼ା ଦେଇ ସେଇଟି ହ'ଲ ତାର ନବୟୁଗ ।

କୋନେ ସଭ୍ୟତାରଇ ଏମନ ରୌଭାଗ୍ୟ ସଟେ ନା ଯେ ଆଗାଗୋଡ଼ା ତାର
ଔବନଟା ହୟ, ଏକଟା ଏକଟାନା ଉତ୍ସତିର ଇତିହାସ । କଥନ ଓ ଦୌଡ଼ିଯେ,
କଥନ ଓ ଖୁଁଡ଼ିଯେ ଏମନି କରେଇ ମାନୁଷେର ସଭ୍ୟତା ଚଲେ । କଥନ ଓ ତାର
ଔବନେ ଆସେ ପ୍ରାଣେର ଜୋଯାର, ଯା ତାକେ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ଓ ଅଭିନବ
ଶୁଣ୍ଠିର ପଥେ ନିଯୋ ଥାଯ । କଥନ ଓ ତାର ପ୍ରାଣେର ସ୍ପନ୍ଦନ ମୁହଁ ହୟେ

আসে, অবসাদ এসে সমস্ত শক্তিকে চেপে ধরে ; সে তখন প্রাণপথে
প্রাচীন স্থষ্টিকেই অঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, ভয়, পাছে নৃতন পথে পা
দিলেই যা-কিছু পুঁজি তাও বুঝি হারায় । সভ্যতার এই যে সম্প্-
সারণের যুগ, মুক্ত-প্রাণের বিচিত্র লৌলার যুগ, এর প্রারম্ভই হ'ল ‘নব-
যুগ’ ; যে-যুগ নবীন স্থষ্টির বেদনার পুলকে আকুল, যার অঙ্গণালোক
রাত্রিশেষে সভ্যতার নব সুর্যোদয় ঘোষণা করছে । যে প্রবন্ধ-পুস্তক
খানি আমরা আলোচনা করছি, তার কথা এই যে বাঙালী জাতির
সভ্যতায় আজ এই রূক্ম একটি নবযুগ এসেছে ।

নবযুগ যে এসেছে, ১০২ পৃষ্ঠার এই ছোট পুঁথিখানি তার একটা
প্রমাণ । বইখানিতে লেখকের নাম নেই । প্রকাশক মহাশয় “প্রবন্ধগুলি
পূর্বে ‘প্রবন্ধকে’ বাহির হইয়াছিল”—এ ছাড়া বিজ্ঞাপনে আর কিছুই
বলা আবশ্যক মনে করেন নি । স্বতরাং লেখকের সম্বন্ধে সমস্ত
কোভুহল দমন করে আমরা লেখার সঙ্গেই পরিচয় করব ।

বইখানিতে ‘মুখ্যপত্র’ ধরে মোট ন'টি প্রবন্ধ আছে । সবগুলি
একই স্বরে বাঁধা, এবং তাদের অন্তরের কথা মোটামুটি একই ।
লেখকের মর্মবাণীটি এই প্রবন্ধগুলির নানা বিভিন্ন মধ্য দিয়ে বিচিত্র
ভঙ্গীতে নিয়েকে প্রকাশ করেছে । প্রবন্ধগুলি, ই অন্তরের বাণীই
হচ্ছে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ।

পুঁথিখানিতে লেখক যা বলেছেন তার দু'টো ভাগ আছে ।
একটা হচ্ছে বিচার ও যুক্তির দিক—অর্থাৎ তত্ত্বাংশ, আর একটা
হচ্ছে অনুভূতি ও তার প্রকাশের দিক—অর্থাৎ সাহিত্যাংশ । প্রথমটা
তর্কের বিষয়, স্বতরাং তা নিয়ে তর্ক উঠবেই । দ্বিতীয়টি নিয়ে কোনও
তর্ক উঠবে না । সেটি নবীন বাঙালীর একেবারে অন্তরে গিয়ে

পৌছিবে। কেননা বিংশ শতাব্দীৰ বাঙ্গলাৰ মৰ্ম্মকথাটি এ প্ৰকল্পিতে সাহিত্যেৰ সুষমাময় মৃত্তি নিয়ে প্ৰকাশ পেয়েছে।

বিচাৰেৱ কথাই আগে বিচাৱ কৱা যাক। বিচাৰেৱ বিষয় হ'ল আমাদেৱ অৰ্থ—হিন্দু-সভ্যতাৰ বৰ্ণনান অধঃপতনেৱ কাৰণ। এ প্ৰশ্ন এবং তাৰ সমাধান প্ৰায় সব ক'টি প্ৰকল্পিতে আকাৰে ইঙিতে কুঠে উঠেছে। কিন্তু ‘মানুষেৱ কথা’ প্ৰকল্পিতে লেখক সোজানুজি একটি প্ৰশ্ন তুলেছেন এবং তাৰ উত্তৰও দিয়েছেন। “আমৱা ত চিৱকাল এক্ষণ ছিলাম না। এমন দিন ছিল যখন আমৱাও ধৰাপৃষ্ঠে পৌৱৰবোন্নত শিৱে বিচৰণ কৱিতাম। তখন এই বিশ্মানবেৱ মহামেলাম্ব আমাদেৱ চক্ষে কাতৰ দৃষ্টি ফুটিয়া অপৱেৱ কৱণ। ও অবস্থা উজ্জেক কৱিত না। তখন চিৱ ছিল কুণ্ঠাহীন, হৃদয় ছিল উদার, জীৱন ছিল খেলিবাৰ সামগ্ৰী। সে সব আৱ নাই। কেন? অধঃপতনেৱ কাৰণ কি? আমৱা কোন্ ধৰ্ম হইতে বিচুক্ত হইয়াছি বে আজ আমাদেৱ এ অবস্থা?”—এবং মীমাংসায় লেখক বলেছেন, “হ'হাৱ একই উত্তৰ, সে উত্তৰ হইতেছে এই যে, আমৱা মানুষ নায়ক জীৱটিকে অস্তীকাৱ কৱিয়াছি—তাৰকে অবস্থা কৱিয়াছি। আমৱা মনুষ্য-ধৰ্মকে জলাঞ্জলি দিয়াছি।” উভয়েৱ ব্যাখ্যায় লেখক বুবিয়েছেন যে মানুষ তাৰ দেহ, মন, চিত্ৰ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান; তাৰ বহিৱিজ্ঞান, অন্তৰিক্ষিয়, অতীক্ষিয়; তাৰ কৰ্ম, ভোগ, ত্যাগ এই সব নিয়েই তাৰে মানুষ। যদি এৱ মধ্যে কতকগুলিকে অস্তীকাৱ কৱে, অমজদ ভেবে পিষে কেলবাৰ চেষ্টা কৱা যায় তা হ'লো মনুষ্যত্বকেই পঙ্কু কৱা হয়। কলে আতিৰ মন থেকে জীৱনেৱ যে সহজ আনন্দ, সে আনন্দ থেকে মানুষেৱ সত্যতাৰ যা কিছু মহৎ ও বৃহত্তেৱ শক্তি, সেটি জলে বাব।

তখন জীবনটাই হয়ে ওঠে দুর্বিহ ভার। তাতে আর কোনও প্রাচুর্য, কোনও লীলার জায়গা থাকে না। তখন কর্ম হয় জীবনযাত্রা, ধর্ম হয় প্রাণহীন আঁচারের লোহার শিকল, ভোগ হয় প্রাণপণে প্রাণকে আকড়ে থাকা, তাগ হয় অপৌরষের অক্ষমতা। লেখক বলেন, “হিন্দুআতিটা কয়েক শতাব্দী ধরে” এই অস্মীকারের, এই পিষে-ফেলার কাজটা করে আসছে। আর তার অধঃপতনও হয়েছে তখন থেকেই, আর সেই কারণেই। জাতির শিক্ষকেরা সমস্ত জাতিটাকে শিক্ষা দিয়েছেন যে জীবন দুঃখময়, জগৎ মায়া, ভোগ অমঙ্গল। আর এই দুঃখ থেকে, মায়া থেকে, অমঙ্গল থেকে মুক্তির এক উপায় কর্ম-ত্যাগ, ভোগে বিরতি, জগৎকে অস্মীকার। জীবন ও জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি হ'ল পুরুষার্থ। কিন্তু সে পথে পা’ বাঢ়াতে হলেই চাই “ইহামুত্তফলভোগ বিরাগং,” কি একালে কি পরকালে কল ভোগে বিতৃষ্ণ। এই শিক্ষা যখন জাতির হাড়ে হাড়ে বসে গেল তখন তার জীবন হয়ে উঠল বিস্মাদ, প্রাণ হ'ল আনন্দহীন, কর্ম হয়ে উঠল বেগোর। মেহের রক্তপ্রবাহ মৃদু হয়ে গেল, তার হাত পা শিথিল হয়ে এল। তাতে জাতিটা যে আধ্যাত্মিক হয়ে উঠল তা নয়, কেন না “নায়মাঙ্গা বলহীনেন লভ্যঃ”। সে হয়ে উঠল আমরা বর্ণ-শানে শা, অর্থাৎ—‘অড়ুভৱত’। তার কর্মও থাকল, ভোগও গেল না ; কিন্তু মাঝখান থেকে জীবনটা হয়ে উঠল একটা ‘কর্মভোগ’। এই পেষণের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন, “জীবনে উচ্ছাস শক্তির অনুভব করিতেছি—মনে হইতেছে যে শক্তির বলে অশাস্ত্র সিদ্ধুকে তাড়িত ঘৰিত করিয়া আপনার আজ্ঞাবহ করিতে পারি।” কিন্তু খবরদার—সে শক্তিকে জার্থক হইতে দিও না। মনে অনন্ত কল্পনার খেজা

খেলিতেছি, প্রাণে বিরাট ভোগসামর্থ্যের আভাস পাইতেছি, বুদ্ধিতে আশ্চর্যরূপ নব নব উন্নাবনী শক্তির পরিচয় পাইতেছি, বিজ্ঞানে ধীর প্রতিভাব, জ্ঞানের, আলোকের সম্মান পাইতেছি, কিন্তু না, উহাদিগকে আপন আপন ধর্ষের আচরণ করিতে দিও না। উহাদিগকে চাপিয়া দাও, দমাইয়া দাও, পিঘিয়া দাও। উহারা যেন তোমাকে কর্ষশীল করিয়া তুলিতে না পারে—তোমাকে ভোগবান্ করিয়া ফেলিতে না পারে—এ স্থষ্টিরূপ পদ্ম হইতে আনন্দরূপ মধু যেন তুমি আহংক করিতে না পার।”

এ বিষয়ে যে তর্ক উঠিবে তা এই যে, সত্যই কি হিন্দু জাতিটা তার দৃঃখ্যবাদী দার্শনিকদের আর মায়াবাদী আচার্যাদের উপদেশ মনে অঁকড়ে ধরেই জীবনের আনন্দ হারিয়ে, স্থষ্টির ক্ষমতাকে পঙ্কু করে’ ক্ষমে ‘অড়ভৱত’ হয়ে উঠেছে ? এই দৃঃখ্যবাদ আর মায়াবাদ, এ কি জাতির জীবনের আনন্দহীনতার কারণ, না তার কল ? রোগের নিদান না রোগের লক্ষণ ? হয়ত এ মতবাদগুলির উন্তব হয়েছে তখন যখন হিন্দুজাতির মন সরস ও সচল ছিল, কেন না দার্শনিক চিন্তাও একটা স্থষ্টি, সচল মনেরই অভিব্যক্তি। কিন্তু জাতির জীবনের উপর লেখক এদের ষেমন প্রভাব কল্পনা করেছেন সে কি সম্ভব ? জাতি যখন ‘জীবনে উচ্ছ্বাসশক্তির অনুভব’ করছে, যখন তার মনে ‘কল্পনাৰ অনন্ত ধোলা খেলছে,’ ‘বুদ্ধিতে নব নব উন্নাবনী শক্তি’ ফুটে উঠছে, তখন সে কি বৈরাগ্যের বাণীতে কান দেয় ; না, কান দিলেও মন দেয় ? স্থষ্টিপন্দের আনন্দমধু যার জিহ্বাতে লেগে রয়েছে তার কানে ‘জগৎ মিথ্যা’ মন্ত্র জপে দিলেই কি সে মধু তিতিয়ে উঠিবে ? বরং এই কি সত্য হওয়া বেশি সম্ভব নয় যে, হিন্দুজাতির জীবনে

বধন ভাট্টা ধরেছে, সহজ আনন্দের উৎস যখন শুকিয়ে এসেছে তখনি সে ঈ মতবাদগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েছে ? এবং তাদের শিক্ষায় আরও বেশি করে নিরানন্দ, বেশি করে কর্ম-বিমুখ হয়ে উঠেছে ? জাতির জীবনে এই যে ওঠা নামা, উৎসাহ অবসাদের শুগ একটাৰ পৱ আৱ একটা আসে, লেখক তা মোটেই তোলেন নি। তার 'মুখপত্রে' এ কথা তিনি চমৎকার কৱেই বলেছেন। কেন যে মানুষের সভ্যতার এই নিদ্রা আগৱণ, বিকাশ সংকোচ, একেৱ পৱ আৱ আসে তাৰ রহস্য কে জানে ? এ ত জীবন মৃত্যুৱাই রহস্য ! এবং সে পুৱণ রহস্য চিৱদিনই গুহাছিত, এবং হয়ত চিৱদিনই তেমনি থাকবে। অবশ্য প্রত্যোক সভ্যতাৱাই উত্থান পতনেৰ একটা ইতিহাস আছে। হিন্দুৰ সভ্যতারও তা আছে। এবং সে ইতিহাস নিশ্চয়ই জটিল ; এক কথায়, একটা সূত্রে গেঁথে ফেলাৰ বিষয় নয়। কাৱণ মানুষেৰ সভ্যতা জিনিষটিই অতি জটিল, এবং হিন্দু-সভ্যতা আৱ সব সভ্যতাৱ চেয়ে কম জটিল ছিল মনে কৱাৰ কোনও কাৱণ নেই। তবে সে ইতিহাস কল্পনায় ছাড়া এখনও গড়ে তোলা চলে না। কেননা তাৱ পনৱ আনাই এখনও আমাদেৱ অস্তীত। এবং হয়ত তাকে ঠিক সত্যকৱে বিচাৱ কৱিবাৰ মত এখন আমাদেৱ মনেৱ অবস্থা নয়। বৰ্তমানেৱ দারিদ্ৰ্য না ঘুচলে পূৰ্বপুৰুষেৰ কি ঐশ্বৰ্য কি দারিদ্ৰ্য, কিছুই মন খুলে বিচাৱ কৱা সহজ নয়।

কিন্তু এ সব বিচাৱ বিতৰেৰ কথা এখানেই শেব কৱা বাক। এই সব যুক্তি-বিচাৱ এ প্ৰবন্ধগুলিৰ প্ৰধান কথা নয়। লেখকও তাদেৱ প্ৰধান কৱতে চান নি, লেখাতেও তাৱা প্ৰধান হয়ে ওঠে নি। এ প্ৰবন্ধ-পুঁথিধানিৰ প্ৰধান কথা ও প্ৰাণেৰ কথা হ'ল বাজালীৱ

আৰনে আজ দীৰ্ঘাতিশৈষে জাগৱণেৱ যুগ ফিৱে এসেছে। সেই
সহজে আনন্দ ভগবান আমাদেৱ কিৱিয়ে দিয়েছেন যাৱ প্ৰাচুৰ্য হল
সত্যতাৰ সমষ্ট স্থিতিধাৰাৰ মূল উৎস। লেখকেৱ প্ৰাণে এই আনন্দেৱ
বে স্বৰ বেজে উঠেছে প্ৰবন্ধগুলি প্ৰথম থকে শেষ পৰ্যন্ত তাৱই
ঝঙাঙোৱে মুখৰ। এবং আগেই বলেছি, এ স্বৰেৱ চেউ নবীন বাঙলাৰ
একেৰাৰে মৰ্মে গিয়ে আঘাত কৱবে। হিন্দু-সত্যতাৰ কেন পতন
হ'ল, এ নিয়ে তক কৱা চলে, কিন্তু লেখক যথন ডেকে বলেছেন—
“আমৱা যাৱা নবীন—যাদেৱ মনে উৎসাহ আছে, আশা আছে; অতীতেৱ
বোৱা যাদেৱ প্ৰাণ ই'তে নবীন নবীন স্পন্দনেৱ অনুভূতিকে দূৰ কৱে
ৱাঞ্ছতে সক্ষম হয় নি—তাদেৱ আজ লড়াই কৱতে হবে এই ত্যাগ
মন্ত্ৰেৱ বিকলকে। এ বিচাৰ যাৱা সাৱাদিন মাৰ্ত্তিষ্ঠ-জাপে কাটিয়ে অবসম
কৈছে শুক মুখে সক্ষ্যাৱ আড়ালে তাদেৱ ক্লান্তি দূৰ কৱবাৰ জন্মে
চলে পড়ছে তাৱা কৱবে না—উষাৱ স্নিক্ষ বাতাসেৱ সজে সজে
প্ৰাণেৱ বিপুল স্পন্দনেৱ সাথে সাথে হাসিমুখে যাৱা আজ জীৱন-
মন্দিৱে সাধকেৱ বেশে প্ৰবেশ কৱতে যাজ্জে তাৱা কৱবে, আমি
আহৰণ কৱছি আজ নবীনকে, পুৱাতন আজ বিদায় মি'ক।” তখন
জৰু আহৰণে, আজ বাঙলায় যাৱা নবীন তাৱা সাড়া দেজেই
হৈবে। কেৱলা আনন্দেৱ এ স্বৰ তাদেৱ প্ৰাণে এসেও পৌঁচেছে।
এ সোনাৱ কঠি যাকেই স্পৰ্শ কৱেছে সেই মনে জানে—বে-
ত্যাগেৱ মন্ত্ৰ বিশ্ব থকে মানুষকে বিমুখ কৱে সে যাৱই ধৰ্ম
হোক আজ বাঙলীৱ পক্ষে সেটা পৱধৰ্ম। শীতেৱ দীৰ্ঘ রাত্ৰিৱ
পক্ষে ‘অচলায়তনেৱ’ পাথৱেৱ থেৱ ও আচাৱেৱ কম্বল-চাপ কড়টা
উপৰোগী কি অনুপৰোগী, এ নিয়ে বিচাৰ চলে। কিন্তু আজ

বসন্তের উষায় রঞ্জীন উত্তরীয় গায়ে মুক্ত আকাশের তলে এসে
দাঢ়াতেই হবে।

এ বইখানি যিনিই পড়বেন দুটি প্রবন্ধ বিশেষ করে' তাঁরই চোখে
পড়বে। এর একটি হ'ল “দরকার,” আর একটি হ'ল “ইয়োরোপের
কথা।” বিভৌয় প্রবন্ধটির এক জায়গায় লেখক বলেছেন, “আসল,
সে বুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তা নয়—সে অস্তর দিয়ে কি অনুভব
করে তাই।” ও কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলা যায়।—সাহিত্য
মানুষ বুদ্ধি দিয়ে কি চিন্তা করে তার ব্যাখ্যা নয়, অস্তর দিয়ে
কি অনুভব করে তাই প্রকাশ। অবশ্য যে চিন্তা করে আর যে
করে না, এ দু'য়ের অস্তর এক রকম নয়, এবং তাদের স্মষ্ট-সাহিত্যও
এক দরের নয়। কিন্তু শেষ পর্যাস্ত অস্তরের ভিতর দিয়ে না এলে
জিনিষটি মোটে সাহিত্যই হয় না। এ দুটি প্রবন্ধে লেখক যে চিন্তার
পরিচয় দিয়েছেন বাঙ্গলা দেশে তা সুলভ নয়; কিন্তু সে চিন্তা
এসেছে লেখকের অস্তরের অনুভূতির মধ্য দিয়ে, আর প্রকাশ হয়েছে
সাহিত্যের সুন্দর মূর্তিতে। “দরকার” প্রবন্ধটির কথা এই :—“দর-
কারের তাগিদে মানুষ সভ্যতা গড়ে নাই, কেননা বেশির ভাগ দরকার
সভ্যতারই ফল। এই স্থিতি অদরকারা বলেই, এ পৃথিবীর হাজার
বস্তু, হাজার বিষয় মানুষের অপ্রয়োজনীয় বলেই তাতে মানুষের এত
আনন্দ। কাবণ যেখানে দরকার সেখানেই দাসত্ব।” “Ne-
cessity is the mother of invention—এ একটা প্রকাণ্ড মিথ্যে
কথা—necessity, invention- এর mother ত নয়ই, মাসী পিসৌরও
কেউ নয়—ওটা একটা নিতান্ত প্রাকৃত জনের কথা, ধরতাই বুলিবাই
একটা বুলি। Invention-ই বল, discovery-ই বল, আর যাই বল,

এর মূলে রয়েছে মানুষের আনন্দ—প্রকাশ করবার আনন্দ—স্থিতি করবার আনন্দ।” ‘ইয়োরোপের কথায়’ লেখক এই রকম আর একটি ‘ধরতাই’ বুলির’ টুঁটি চেপে ধরেছেন। সেটি হচ্ছে—আধুনিক ইয়োরোপ জড়সর্বস্ব আর আধুনিক বা প্রাচীন হিন্দু আধ্যাত্মিক “ইয়োরোপ তার অস্তরের, তার প্রাণের, তার জীবনের আনন্দ দিয়ে যে সত্যতা গড়ে” তুলুল—যে সত্যতা সকল পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল— যে সত্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের সনাতন জাতির পূরাতন দেহে নৃতন প্রাণ জেগে উঠল—সে সত্যতা একটা গভীর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে না পারে—তাতে হাজার রকম ভুল ভাস্তি থাকতে পারে—হয়ত তাতে মানুষের স্বন্দে সকল সমস্তার সমাধান হ'য়ে ওঠে নি—কিন্তু তাই বলে’ যে সে সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে’ আছে কতগুলো জড়বস্তুসমষ্টির উপরে এ কথা যে বলে তার মত জড়বাদী এ ভূ-ভারতে আর বিতৌয় নেই। জড়বস্তুর এমন শক্তি এক নাস্তিক ছাড়া আর কেউ মানবে না।” “বাহিরের বস্তুসমষ্টি ইউরোপকে গড়ে’ তোলে নি—ইউরোপই বস্তুসমষ্টির জন্ম দিয়েছে— আপনার অস্তরের শক্তিতে—জীবনের আনন্দের আতিশয়ে—প্রাণের পতির বেগে। আসল কথা হচ্ছে যে জড় জড়ই, যতক্ষণ না সেটা মানুষের অস্তরের শক্তিতে কার্যকরী হয়ে ওঠে। স্বতরাং ইউরোপ আজ যা, তার মূল কারণ হচ্ছে তার জীবনে অনুভূত—প্রাণে ওজস্রূপিনী চিংশতি—তার জীবনদেবতার, ভগবানের এ স্থিতে লীলা-বিলাস।” তারপর প্রাচীন হিন্দু-সত্যতার কথায় লেখক অতি সরস করে’ দেখিয়েছেন যে, কথায় কথায় আমরা যে আধ্যাত্মিকতার মাপকাটি বের করি তার মাপে হিন্দু-সত্যতার গৌরবের ঘুগ্নলিকে

জড়সর্বস্ব বলে' ঠেলে দিতে হয়।” যে যুগে আর্য্যেরা বেদ লিখেছে সে যুগে কি তারা অনার্য্যদের সঙ্গে যুক্ত করে নি? স্বয়ং রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদে ছিলেন তখন কি তিনি গাছের বন্ধল পরে’ সৌতাদেবীকে আলিঙ্গন করতেন—ন। সৌতাদেবী নিজ হাতে মোটা চালের ভাত আর তেঁতুল পাতার অস্তল রেঁধে রামচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতার গোড়ায় সার দিতেন? গীতা রচনা হ'ল, সে ত একটা ভৌষণ মারামারি কাটাকাটির মধ্যে। স্বতরাং দেখা যাচ্ছে যে যুক্তবিগ্রহ বা ভোগ-বিলাসটা কেবল জড়বাদীদেরই একচেটে ব্যবসা নয়। তা যদি হত তবে এমন আধ্যাত্মিক জাতি যে হিন্দু, তাদের মধ্যে যুক্ত ইত্যাদি করবার জন্যে একটা পৃথক বর্ণই গড়ে’ উঠত না।” লেখক এই কথা বলে’ তাঁর “ইউরোপের কথা” শেষ করেছেন,—“আমরা সবাই বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষ আবার জগতে আপনার পূর্ব গোরবের স্থান অধিকার করে’ বসবে। কিন্তু কেউ যদি মনে করে’ থাকেন যে সেদিন হিন্দু তাতিরা কেবল গেরুয়া কাপড় তাঁতে চড়াবে, আর হিন্দু চাষীরা কেবল অপক্ত কদলীর চাষ করবে, তবে তাঁরা নিরাশ হবেন নিশ্চয়।”

এ প্রবন্ধ দুটির অন্তদৃষ্টি যেমন গভীর, এদের ভাষাও তেমনি লঘু, প্রকাশের ভঙ্গীও তেমনি সরস ও বিচ্ছিন্ন।

তাঁর ন’টি প্রবন্ধ জুড়ে লেখক তাঁর স্বজাতি সম্পর্কে যে সব কথা বলেছেন তাঁর অনেকগুলিকে গালমন্দ বললে খুব ভুল হয় না। টুগেনিক তাঁর রুডিনের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, “জাতিকে গাল দেবার কেবল তাঁরই অধিকার আছে, জাতিকে যে ভালবাসে। “নবযুগের কথা” পড়ে’ কারও সন্দেহ থাকবে না যে, লেখকের সে অধিকার নেই।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

বাদল ধারা ।

—*—

আষাঢ় ।

ভোর বরষার জলে ভাসা আজ এ আমাৰ পল্লীপাৰে
বাজ্ল উতল একি রে শুৱ বাজ্ল আলোৱ বিভোৱ তাৰে,
বাজ্ল মোৰ এ বিভল হাৰ্যায়, বাজ্ল জলেৱ কলস্বৰে,
বাজ্ল সবুজ রেখায় রেখায়, বাজ্ল মেঘেৱ থৰে থৰে,
বাজ্ল সাৱা গগনেৱি অযুত সাঁধোৱ কাজল পৱা
ঞ্চাখিকোণেৱ অবাক ধাৰায় কোন নিবেদন—বাঁধন হৱা !

পাল টেনে ঐ বাতাসে কি ছুটল রে আজ ছুটল তৱী
পরিয়ে দিয়ে গানেৱ মালা ভোৱ সাগৱেৱ লহৱ ভৱি,
শুৱেৱ শাড়ী উড়িয়ে ধূধূ নৃতন জলেৱ তেপাস্তৱে
সবুজ বাঁশী বাজিয়ে নিখিল ছুটল রে আজ পাগল কৱে !
বন ভেঙ্গে দূৱ ছায়াবৌথিৱ লহৱ-নাচ। নিঙদেশে
গেয়ে গেয়ে ধৰলে পাড়ি অশ্রুপাগল আলোৱ দেশে !

ফুলে' ফুলে' মেঘেৱ কোলে কেঁপে কেঁপে ধানেৱ ক্ষেতে
অথা' জলেৱ পাপড়িফোট। মেতে নাচেৱ কুলবনেতে

দোল খেয়ে ঐ পাতায় পাতায় ছুটল রে আজ ছুটল তরী
 দুধারে তার ভাঙ্গা চেউয়ে নৃপুরে স্বর পড়ছে ঝরি,
 পড়ছে ঝরে' পাখীর মুখে—সিঁদুর-আঁকা যাত্রাপথে
 বুকে বুকে ভোরেরি ঈ ভুবন ভরে ছিটাল কে !
 কুলে কুলে বাজ্জল কাকণ—আধেক গাওয়া মনের কথা—
 বাদল রাতের পুঞ্জকরা ব্যাকুল কুলের আকুলতা
 বাজ্জল ছায়ার কমলমনে ভেজা-আলোর চরণতলে
 বাতাসেরি কানের পাশে বাজ্জল অলের ছলক ছলে,
 গুঞ্জরিল আকাশে গান আলোধারার মধ্যথানে
 তরী আমাৰ ছুটল ভরে অফুৱণ ঐ গানে গানে !

উড়িয়ে দিল পথের বাঁকে নিশানধানি বকের পাথা
 কবুতরের মনমাতান মোহনপুরের রৌদ্রমাথা,
 ষেড়ঘুঞ্জুরে বৈঠা আমাৰ হাসের বাঁকে পড়ল মরি !
 যত প্রাণের ফাঁকে ফাঁকে সকল গানের স্বর শিহরি !
 মেঘে মেঘে বনকাননে ডঙ্কা আমাৰ বাজ্জায় রে কে—
 পালাল যে আকাশ ছেয়ে 'বৌ কথা কও' লিখে রেখে !
 বাজ্জাল ঐ ডাহক দূৰে ছোট তাহার ডুগডুগিটি
 ওই পারে তার যে আছে আজ এই যে রে তার আসুল চিঠি !

কি সে জানে কখন হল পড়া লিখন ভৱ-সভাতে
 চখাচখীৰ চোক বুলিয়ে সকল মাঠের যতেক হাতে !
 ঠেকল কখন হঠাং পায়ে ছেলেৰ দলেৱ, গঙ্গোলে,
 রাটুল যে তা যত মাতাল দাঢ়িদেৱ মন্ত্ৰ রোলে !

ধূমকে-থাকা বুতন বৌঘের ষাটের পথ আজ এমন দিনে
একি বাতাস উথাল-পাথাল বাজায় এসে বুকের বৈগে ?
চোকের তারার সব সৌমানায় বিছান আজ আঙনখানি
করুল যে আজ করুল তারে করুল রে আজ মনের রাণী !

আকাশপারে টেলে কালি খলুখলিয়ে হাসুছে মুখে
আখরগুলি শেষ করে সব গালে গায়ে মেথে চুকে,
হৃষ্ট ছেলে কচি দাঁতে ফুটিয়ে চেয়ে হাসির রেখা
মুক্তামালার মত করে ছড়িয়ে দিল সকল লেখা !

শ্রাবণ ।

হৃ'ধার থেকে তা নিয়ে যে শরবনে কি মাতামাতি
পাকাধানের ক্ষেতে ক্ষেতে লাগ্ল বিষম হাতাহাতি,
অগাধ হল ফিস্ফিসানি খস্থসানি বাঁশবনে আজ
ঘোমটা টেনে কলার বনে কিসের কথা ? ঐ অত কাজ ?
হাসির বাঁশী, নিশাসরাশি, জম্ল কি গো নয়ন পুটে
কুঁড়ের পথে আচলপাতা কার'হল—কার পড়্ল জুটে ?
হারাদিনের অদূরকথা, বুকের কারো আশাৱ ভৱা,
তাই দিয়ে আজ খুল্লে কি গো প্রথম দিনেৱ অঝোৱ ঘৱা ?
ভাস্ল যে আজ সেই ধাৱাতে তালপাকান কুক্ষমজটা
সকল-সহা মুক্তমাঠেৱ যাদুৱ পাহাড় মানুষ কটা ;
কম্ল না দুৱস্তুপনা কম্ল কোথা কচুৱ বনে ?
কাঙ্গা হাসি সব টেলে যে নাচছে ওৱা ক্ষণে ক্ষণে ;

কোমর কেচে ধক্কেরা সব শ্রেতের মুখে জুট্টল এসে
 শিঙারি স্তুর লাগ্ল কানে কেয়াফুলের গন্ধে ভেসে,—
 বুক্বে কি গো আর ওরা আজ ? আর কি ওরা থাকতে পারে ?
 দাঢ়াল সব অয়পত্তাকা চরণ ঘিরে সারে সারে !
 মাছরাঙ্গারি পাথায় পাথায় ফড়িংগুলির পায়ে পায়ে
 সব কথা যে রঙিন হয়ে ছড়িয়ে গেল গায়ে গায়ে !
 ছড়িয়ে গেল সকল রাতের রক্তরেখার উপর দিয়ে
 হাজার দিনের হাসির পায়ের ধূলোরিদাগ ধূয়ে নিয়ে
 টেউয়ের নাচে নাচাপরাণ চপলশ্রেতের সাথে সাথে
 চোকের আগের পথেরি ঐ কোলাকুলির আভিনাতে !
 বুকচেরা পথ মাঠের বুকে সিঁথির মত রইল আঁকা
 বাড়ল টেউয়ের মাথায় মাথায় গানের ভুবন মেল্ল পাথা !
 মেল্ল পাথা হাজার তরী চল্ল যে সব পাথীর মত !
 সবুজ মেঘের কিনার দিয়ে বাঁশীর স্তুরে তন্দ্রাহত,
 রেখে রেখে গেল নিশাস্ উধাও জলের বুকের টেউয়ে
 খুল্বে ঢাকন কখন কি তার জান্বে কি তা জান্বে কেউ এ ?
 বুকের মাণিক চল্ল যে আজ রৌদ্রচালা অভিসারে
 নয়তো সে কোন্দূর অজানা ধারানিবিড় অঙ্ককারে,
 হয়তো আকুল ধরণীর এই আপনহারা পারাবারে
 নয় তো আতুর মিগ্যা প্রাণের হাজার ঘাটের পারাপারে ;
 নয় তো আপন বুকের ঠাকুর বুকে ঢেকে কর্ম করা,
 নয় তো হাওয়ার হাসির ভেলা, নয় আগুণের তৃষ্ণ-পশরা !
 —বাজিয়ে নিয়ে সকল বেদন জলধারার খণ্ডনীতে
 ভাট্টিয়ালের প্রভাত স্তুরের পরাণভরা গহনগীতে !

তাঁদ্র ।

কথা শুধু জান্ত দুজন—পানকোড়ি আৱ কলমিলতা
 ভিজে ভিজেও মিল্ল না তো আজো তাদেৱ মনেৱ কথা !
 বিষম কালো উড়ল যে কেউ নীল হয়ে কেউ ফুলায় যে গাল,
 ঝিনুকগুলিৱ বুকেই শুধু রইল গোপন একটুকু লাল
 শাপলা মেয়ে চুপি চুপি বলতে এসেই হলদে হয়ে
 এলিয়ে পড়ে বাড়মাসীদেৱ ডৱে ভয়ে একটু কয়ে ;
 পাড়ায় পাড়ায় হল না গো ইশারাৰ আৱ একটুঁ দেৱী
 জলে স্থলে একেবাৱে অম্নি তাহাৱ বাজ্ল ভেৱি !
 গগনৱাণী হাওয়াৱ গায়ে ফুলেৱ ডালা দিল চেলে
 শুপারীগাছ নেয়ে উঠে হেসে হেসে পড়ল হেলে,
 খোপায় কাঁটা কদমবধূ শুনতে এসেই কথাটি সে—
 অঁচলে টান পড়ল যেমন—মুদল অঁখি শিউৱে উঠে !
 —গভীৱ স্বৰে রেশটি তাহাৱ কাৱ দুয়াৱে দিল হানা
 স্বদূৱে ঘাৱ বাজ্ল মাদল ?—কোথায় রে তাৱ কোন্ঠিকানা ?
 ছুটল পাগল সব নিয়ে আজ আকাশপাতাল সব ভাসিয়ে
 জটায় জটায় ছুল্ল অঁধাৱ হাসিতে তাৱ দিক কাপিয়ে
 কোথায় ছিল গোপন মনে এত কথাৱ অঁখিৱ বারি ?
 বুকেৱ কোলে খুল্ল যে আজ গভীৱ নিশাৱ খুল্ল বারি !
 বিবশ করে' নিশীথস্বৰেৱ আলাপনে ভুবনখানি
 বাজিয়ে দিল মনতাৱাতে উদাসৱাতেৱ অসীম বাণী

বাজিয়ে দিল বিজীরবের আঁধারফাটা তৌত্র স্বরে
প্রাণসাগরের কোন্ গোপনে ভুবন যে আজ চল্ল পুড়ে,
চল্ল অপার আজ্ অবারণ প্রাণের পৃষ্ঠা পুষ্প ফলে
লক্ষ হাজার বর্ল কমল উচল অতল স্নোতের জলে !

বর্ছে তাহার পাপ্ডিগুলির পাথার কাপন প্রাণের পাতে
অজানা সুর বাজ্ছে তালে জীবনবনের মন্দিরাতে !

জল্ছে যেথায় মাটির প্রদীপ কুঁড়ের কোণে মিটমিটিয়ে
নদীর ভাঙ্গন ঘরের পিছে, দেখছে উঠে গিয়ে গিয়ে,—
পড়শীঘরের আসছে সারা চল্ছে সাড়া ডাকে ডাকে
কার চরণের শব্দটুকু পড়ছে নিশির থাকে থাকে ?

দেয় নি ওরা আঁধারে আজ দেয় নি ওরা সুর নিভিয়ে
ঘাট যে ওরাই বিশ্ববীণাৰ—গড়াগানের রক্ত দিয়ে,—

গড়া কোথায় স্বপ্নে ঢালা কোন্ সে বিশাল ইন্দ্রপুরী
ভুবনবাণীৰ জমাট ব্যথার কোথায় রে মঠ আঁধার জুড়ি ?

চম্কে উঠে কেকার ডাকে পেখমতলে লুটিয়ে পড়া
পিয়ে সুরা সুরসাগরের শব্দ কিরে ঘুমায় ওরা ? জাগ্বে কিরে ?
জাগ্বে কথন জাগ্বে কথন জাগ্বে ওরা ? জাগ্বে কিরে ?
দশদিকে যে বাজ্ম মাদল নাম্বল বাদল স্বরে ঘিরে !

তারায় তারায় বাজ্ম যে শাখ ছায়াপথের সাগরজলে
অন্তগিরিৰ কোন্ সে চূড়াৰ কোন্ সে শুহার বাসাৰ তলে ?
কাপছে যেথায় জলেৱ গায়ে সঙ্ক্ষ্যারতিৰ রেশ-অবশেষ—
চল্ছে বেজে তাৱেই ঘিরে—কোড়াৰ ডাকেৱ নাই যে রে শেষ,

বাজল তৃণের শিরায় শিরায় কাঁপিয়ে জলের অধীর ধারা
 বাজ্ছে বেল ঝুগ হতে ঝুগ—একি রে কোন্ খ্ৰবতাৱা !
 বাজ্ছে রেণুৱ পুলকপুৱে নীৱৰ চিৱ বধুৱ ভালে
 বাজ্ছে ঘৱেৱ জাগা বুকে বাজ্ছে ঘুমেৱ অস্তৱালে,
 ধৱছে না তাৱ স্তৱেৱ ধাৱা—ছাপিয়ে যে তাৱ উঠছে কানা—
 বাজ্ছে স্তৱে এপাৱ ওপাৱ দিগন্তেৱ আজ সব মোহানা !
 ফাঁক দিয়ে তাৱ দৌপৈৱ আলো পড়ল না আৱ ভুবন মাৰে
 অথিৱ আকাশ নদীৱ কানে শুধুই কেবল গান্টি বাজে !

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদাৱ।

বন্ধু ।

—::—

(১)

এক নতুন বন্ধু পেয়েছি । সে সকালে দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায় অষ্টপ্ৰহৱই আমাৰ ঘৰে এসে বসে থাকে ।

সকালে বলে—“আহা কি শুন্দৱ সকাল, কি শান্তি সময়টা, পাৰী
ও ছেলেদেৱ কলৱবে শুধু মুখৰিত দিক—এ সময়টা আমি তোমাৰ
বন্ধু এসেছি তোমাৰ কাছে, আমাৰ সৎকাৰ কৱ, কোথাও বেও না,
যুৱে বেড়িও না । বোসো দিকিন ভাই, ধাতাটি বাও দেখি, আসন
কৰে বসে মৰেৱ ভিতৰ ডোবোত এবাৰ ?”

ভাই যদি কৱি, তবে সকাল পেৱোলে দেখি বন্ধু আমাৰ খ্রিষ্ণ
হাত্তমুখ । নম্বৰ কোথা উধাও ।

দুপুরে বলে—“আহা কেমন উদাৰ ব্যাপক সময়টা । ঘুমুৰে
মাকি ? তবে আমি চলুম ।”—হেসে হেসে আকাশবিহারী আকাশে
মিলিয়ে ঘেতে চায় ।

যদি বলি—“না, ঘুমোব না, বল কি কৱি, কি কৱলে তোমাৰ
কাছে রাখতে পাৰব ।”

সে পাখে এসে হাতে হাতখানি রেখে বলে—“তবে এসো, এই
আনাদিৰ ধাৰটাতে এসে বোসো । দেখ লিকি কেমন শাঠ—ঞ্জ

মাঠের শেষে দিগন্তের পরপারে কত কি সন্তাননা, কত কি আশা, কত কি গান, কত কি সোভাগ্য ঝিক ঝিক করছে। এই মরীচিকাকে ধরে ফেলে বাঁধতে পার না? ছবিতে, লেখায়, গানে, তাবে অড়াও না?

সঙ্ক্ষে বেলায় বলে—“একটুখানি চুপ করে বসে থাক শুধু। আর কিছুই কোরোনা।”

(২)

স্বায়ত্ত্ব সকালও আছে, দুপুরও আছে। বন্ধু কিন্তু আর আসে না। মাঠ ছেড়ে সহরে এসেছি। কাঠকাঠরা, আলমারি টেবিল চৌকির রাশল, বিছানা পত্র, খাটের মাথায় গোটান মশারি, ছড়ান কাপড়, হোল্ড, টিফিন বাস্কেট, ট্রাঙ্ক, হ্যাণ্ডব্যাগ ও সাজগোজের নানা উপাদানে ঘর ভর, চিকফেল। জানলার গায়েরঁ ভিতরে একটুখানি আকাশের পট। বন্ধুর চরণ আর তাতে পড়ে না।

কে সে বন্ধু? আগে ভেবেছিলুম তার নাম বুঝি “সময়”; এখনে দেখছি “সময়” সেই আছে, কিন্তু বন্ধু নেই। তবে কি সে শুধু অবসর নয়, অবকাশ? মনের আর ঘরের, কালের স্থানের আর দুর্ঘেরই? যেমন শৃঙ্খল মনে ভিন্ন বন্ধুর সমাগম হয় না, তেমনি নিরব-চিহ্ন স্থূলের টেস্টেসিতেও বন্ধু স্ফুর্তি পায় না?

(৩)

অনেক দিন আর সেরকম করে আকাশ সাঁৎৰে বন্ধুকে আমার দিকে আসতে দেখি নে। কিন্তু আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়লেই তাতে

যে তাঁর আভাস মাথান রয়েছে তাঁর স্পর্শ পাই। যদি নীরবে বসে থাকি, যদি নিজের মাঝে ডুবি তবে বঙ্গ আস্তে আস্তে অলঙ্ক্ষে এসে আবার জড়িয়ে ধরে। কে সে বঙ্গ ? কে সে শুজন, জনতা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে আনলে যাকে পাওয়া যায় ? সে কি আমার ভিতরের সম্পূর্ণতা ?

(৪)

আমার কতক সময় আর আমার নেই। বাক্দস্ত করে ফেলেছি। পাছে তাঁর কিছু ফেলাছড়া হয়, পরের জিনিষ হৱণ করে ফেলি তাই ভয় হয়। তাই ভয়ে ভয়ে নাওয়া, ভয়ে খাওয়া। প্রতিশ্রুত সময়ে পদক্ষাস্তি না হয়। সময়ের বাক্যদান আত্মসাধনার জন্য কোন শরীরী বঙ্গকে। তা হতেই হঠাৎ চিন্মেষ অশরীরী বঙ্গ তোমার কবিং পুরাণঃ অনুশাসিতারঃ ! তুমি আমার অন্তর্দ্যামী !

(৫)

দহরাকাশে যে অন্তর্দ্যামী, বহিরাকাশে সেই বিশ্বাজ্ঞা। হৃদাকাশ যাঁর আসন, চিদাকাশ তাঁরই বসন। দিগন্বরের পরিধান সেই অস্তরের প্রতি, সেই শৃঙ্খল—আকাশের প্রতি, শৃঙ্খের প্রতি মানবাজ্ঞার তাই এত টান। মশুনা ভব, মন্ত্রে, মধ্যাজ্ঞা, মাঃ নমস্কুরু।

কিন্তু আজ্ঞা বা বিশ্বাজ্ঞাকে শৃঙ্খভাবে সর্বিদা মনন করা যায় না, ধরা ছোয়া যায় না, ধরে রাখা যায় না। তাকে সূক্ষ্ম হতে যতই সূক্ষ্মতর হোক না কেন রূপের বা রেখার নির্দিষ্টতার মধ্যে আনতে-

পাইলে মন যে আলসব পাই ভাতে চর্মিতার্থতা প্রতি পরিপাক লাভ করে। তাই শুক্র মাহাত্ম্য, অবতারের সার্থকতা।

“আজ্ঞেব হাজ্জনো বক্তু

বক্তুরাজ্ঞাজ্ঞনোস্তু যেনাজ্ঞেবাজ্ঞাজিতঃ।”

আজ্ঞাই আজ্ঞার বক্তু। যে আজ্ঞচেষ্টায় আজ্ঞাজয় করে তাই আজ্ঞা তার বক্তু।

সেই ক্রব নিত্য বক্তু কখন কখন অস্তুর ছেড়ে মর্ত্যবক্তু হয়ে বাহিরে দেখা দেয়। হে অশৱীরি! তোমার মর্মবাণী চর্ষের ভিত্তির দিয়ে ব্যক্ত হলে বুঝি শ্রেয় কর্ষে প্রযুক্তি সহজ হয়? তাই অকৃপ তুমি রূপধারী হও? যাকে অর্জুন বলেছিলেন—

“শিশুস্তেহং সাধি মাঃ হাং প্রপন্নং।”

জগতে দুটি ধারা প্রবাহিত। এক শাসনের বা প্রহরীগিরির, অস্তুটি গ্রহণের বা প্রীতির। কৃক্ষাবতারে এই বিধীবার সঙ্গম হয়েছিল। অনুশাসিতা বেসে কবি হওয়া চাই, রসিক হওয়া চাই, বক্তু হওয়া চাই—শুধু শুরু নহে। তার নিকট থেকে আবদ্ধার চাই—

“আমার সব সমর্পণ করু।”

আজ্ঞাই আজ্ঞার বক্তু, আজ্ঞচেষ্টাদ্বারাই আজ্ঞাজয় করতে হবে। কিন্তু আজ্ঞা যে ঘটে ঘটে বিরাজিত, তাই ঘটাস্তুরেও তাকে বক্তুমুর্তিতে মর্শনের আকাশমা ও আনন্দ প্রবল। মানবাজ্ঞা আপনাকে আপনার কাছে অমিয়ে রেখে তৃপ্ত নয়, সে আপনাকে দিতে চায়।

“আমারে কে নিবি তাই সঁপিতে চাই আপনারে!”

মানবের মর্শোধিত এ জন্মনের নিবৃত্তির অন্ত নেবার লোক চাই, দেবার পাত্র চাই যে কইতে পারে।

“যৎ কর্মাসি যদস্ত্রাসি যজ্ঞবহাসি সদাসি ষৎ ।”

যতপ্রস্তুসি কৌশলে উৎকৃষ্ট মদর্পণং ।

যাকে অর্পণ করবে, যার নিকট সব কিছু বাক্দত হবে সে যদি
সামনে এলে হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায় তবে তশ্বন্ত হয়ে, তন্তু হয়ে তাকেও
নমস্কার ।

শ্রীসুন্দরা দেবী ।

—

উড়ো চিঠি।

—*—

ফেব্রুয়ারী ২৪, ১৯১৯।

অমর !

তুমি আমাকে একেবারে অশ্রদ্য করে দিয়েছিলে। প্রায় সাড়ে চার মাস পর আজ সকাল দশ ঘটিকা এগার মিনিট বার সেকেন্ডের সময় তোমার শ্রীহস্তের একখানি পত্র আমার এ দীনের কুটীরে এসে পৌঁচল—“তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম”।

যাহোক তোমার চিঠি পড়ে এতদিনের নৌরবতার কারণ বুঝলুম। চিঠিখানায় আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত একটা অভিমানের শূরুটে উঠেচে।

“ইউরোপ নিজের চেহারা দেখতে পেয়েচে বলে যে, সে রাত পোহালে গরদের জোড় পরে টিকি রেখে ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু তদ্বিক্ষণঃ পরমংপদম্ বলতে বসে যাবে তা নয়,”—আমার এ কথায় তুমি রাগ করেচ। আমাদের আচার ব্যবহার, ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে অমন ironical মনের ভাব তুমি আমার কাছে থেকে আশা কৱ নি; লিখেচ, এতে তোমার অন্তরে একটা আঘাত লেগেচে। কিন্তু ও-কথা আমি ironically লিখি নি—অমন একটা apt allusion আমি আর কোথা ও খুঁজে পেলুম না, তাই ওটা লিখোচ। ওটাৱ মধ্যে একটা

সত্ত্বের চেহারা দেখতে পাই বলেই উটা অমন জায়গায় অমনি করে লিখেছিলুম। এতে তোমার বা আর কারো অভিমান করবার কি আছে আনি নে।

তুমি আমায় ঘোর materialist বলেছ,—আমার materialism নাকি আমার পত্রে ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে। আমার চিঠিতে যে microscope দিয়ে materialism-এর সূক্ষ্ম পরমাণু কোথা থেকে বের করলে, তা বোঝা আমার বুদ্ধির অঙ্গ। তোমার বিশ্বাস, আর শুধু তোমারই বা বলি কেন, আজকাল এ দেশের প্রায় সবারই বিশ্বাস, যে-কেউ এই জগৎকাকে ফাঁকি বলে উড়িয়ে না দেবে সেই অদার্শনিক, অধার্শ্বিক, অনাধ্যাত্মিক, আনুহারিক—সে দৃষ্টিহীন, জ্ঞানহীন, বন্ধ, রুক্ষ, আসক্ত। এই যে অবস্থাটা দাঙিয়েচে আজ যদি সংস্কৃত আমাদের মাতৃভাষা থাকত তবে এই অবস্থাটা দাঙাতে পারত না বলেই আমার বিশ্বাস। কেননা তখন সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের একটা অতি সহজ সম্বন্ধ থাকত, তখন সংস্কৃত ভাষা আমাদের মুখে মুখে থাকত বলে আর তখন সেটাকে দেবভাষা আখ্যা দিত্ব না ; স্বতরাং আমাদের আজ্ঞার চাইতে পদে পদে তার একটা বড় মূল্য দিয়ে বসতুম না। যে-লোকটা লিখতে পড়তে জানে না বা অতি কম জানে তার কাছে যে ছাপার হরফের মূল্য কি, আর কতটা, তা ত সেই Scotch peasant-ই প্রমাণ করেছিল, যখন সে তার শেষ যুক্তি দাখিল করে এই বলে যে, I saw it in print. আমরা যখন সংস্কৃত সাহিত্য-মন্দিরে প্রবেশ করি, বিশেষত তার দর্শনের কোঠামু—তখন আমাদের মাথা ভয়ে ভক্তিতে অমনি নত হয়ে আসে, তাম্বপর ঐ মাথা-নত অবস্থা এমনি অভ্যাস হয়ে যাব

যে যখন সে-মন্দির থেকে বেঁচিয়ে আসি তখনও আর ঘাড় সোজা
হতে চায় না। কেবল যে সোজা হতেই চাই না, তাই নয়—সোজা
হওয়াটাই তখন একটা মন্ত্র অ-ভক্ত হন্দয়ের পরিচয় হয়ে উঠে।
কেবল তাই আমরা লক্ষ করা নিরানবুই হাজার ন'শ নিরানবুই জন।
সংস্কৃত জানিনা বলে, জানলেও তা পড়বার ইচ্ছে বা অবসর হয় না
বলে, আর ইচ্ছে আর অবসর হলেও কঠোপনিষদের বদলে খতুসংহারই
খুলে বসি বলে, সে-কালের ধার্শনিক মতগুলো একালে আমাদের
কাছে বাজারে-শুভবের আকার ধারণ করে দেখা দিয়েচে। এই
যেমন ধর—মায়াবাদ, এই মায়াবাদ যে আসলে কি তা আমিও আনি
নে, তুমিও জান না—শঙ্করভাণ্য আমিও পড়ি নি, তুমিও পড় নি—
ও রাম শ্রাম যহু কেউ-ই পড়ে নি—শঙ্করের আসল মায়া কি ছিল,
তা কেউ জানে বা। অথচ সকলের মুখেই মায়াবাদ। এবং যে আজ
জন্মালে সেও বলচে জগৎটা মায়া, ও যে কাল যবে সেও বলচে
জগৎটা মায়া। গেরুবাধারী সন্ন্যাসী এসে বলচে জগৎটা মায়া,
ভিক্ষে পাই গো। গৃহস্থ এসে বলচে—জগৎটা মায়া, চৱণধূলি চাই
গো। ডিলককাটা বৈক্ষণে বলচে—জগৎটা মায়া, এস রাধাকৃষ্ণন
নাম করি। কুস্তাক-আটা তান্ত্রিক বলচে—জগৎটা মায়া, এস কারণ-
বারি পান করি। এই যে বাজারে সস্তা মায়াবাদের বুলি, এই বুলি
আওড়ানই যদি আধ্যাত্মিকতা হয়, এবং এই বুলি খেতে শেতে
না আওড়ানটাই যদি অড়বাদের লক্ষণ হয় তবে আমি যে অড়বাদী
তাৰ কোনো ভূল নেই। তবে spiritualism আৱ materialism-এৰ
সংজ্ঞা ঠিক কি কি না সে সম্বন্ধে এমন একটা সন্দেহ আছে যে সন্দেহটা
এই জগৎটা আছে কি নেই—এ সন্দেহেৰ চাইতে সন্দেহজনক।

(২)

কিন্তু সে যাহোক, আমি তোমায় হলফ করে বলতে পারি যে আমি অড়বাদী নই, কেননা অড়ও ষে চৈতগ্যেরই বিকাশ এই আমাৰও বিশ্বাস। আমাদেৱ এই গোড়ামীৰ দেশে যে এক ব্রহ্ম আধ্যাত্মিকতাৰ গোড়ামী আছে সেই গোড়া আধ্যাত্মিকবাদীও আমি নই। আমাৰ ঘাড়ে যদি নিতান্তই কোন বাদ চাপাতে চাও তবে যে-বোদ্ধটায় তোমাৰ সঙ্গে আমাৰ কোন বিবাদ বাধবে না সেটা হচ্ছে লীলাবাদ। আমি ভগবানেৰ লীলা মানি। আৱ এই লীলা মানি বলেই আমি অড়ও মানি চৈতন্যকেও মানি, অর্থাৎ—অন্নকেও মানি, আজ্ঞাকেও মানি, ভোগকেও মানি, যোগকেও মানি—আলাদা আলাদা করে নয়, এক সঙ্গে। আমি যে Kipling নই, সে সম্বৰ্কে তুমি হিৱনিশ্চিত, স্মৃতিৱাঃ—

“East is east and west is west
And never the twain shall meet.”

এত বড় একটা কথা বলবাৰ সাহস আমাৰ নেই। আসলে অন্ন ও আজ্ঞাৰ মধ্যে বিৱোধটাই আমাৰ কাছে স্পষ্ট নয়, তাৰ চাইতে তেৱে বেশি স্পষ্ট তাৰদেৱ মিলনেৱ দিক এবং সেই দিকটাই হচ্ছে মজলেৱ দিক, কল্যাণেৱ দিক। তুমি শুনে আশৰ্চৰ্য হবে কি না জানি নে, কিন্তু আমাৰ ওই কথা সমৰ্থন কৱিবাৰ অষ্টে আমি তোমায় উপবিষ্ট থেকে শ্লোক তুলে দেখিয়ে দিতে পাৰতুম। কিন্তু মা বাঙ্গলাৰ বল্লুম তা যদি না মান, তাহলে সংস্কৃত শ্লোক তুলৈই যে অমনি বুৰে যাবে—এ কথা মনে কৱা আসলে তোমাৰ বুদ্ধিৰ প্রতি কটাক কৱা।

হয় ; কিন্তু আর যাই হোক সে কটাক্ষ তোমার বুদ্ধির প্রতি আমি করতে পারি নে । কিন্তু উপনিষদ থেকে এই যে-শ্লোক তুল্লুম না, সেই শ্লোকই প্রমাণ যে সেকালে ঋষিদের মধ্যেও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা কাঁধে পাখা লাগিয়ে দিবারাত্রি আকাশে উড়ে বেড়াতেন না,—কেবল বায়ু সেবন করে' ।

(৩)

আমাদের অতীত সম্বন্ধে আমার একটা মন্ত্র বড় আপত্তি কি আন ?—সেটা হচ্ছে এই যে, তা এত ভৌগণ লম্বা যে আমরা মেপে তার হিসেব করে উঠতে পারি নে ।—আর যদি বা পারি তবু সে হিসেব মনে করে রাখতে পারি নে । ওর শেষ প্রান্ত পর্যান্ত আমাদের দৃষ্টিই চলে না— মাঝপথ পর্যান্ত এসে তারপর হয় দৃষ্টি থেমে যায়, নয় ত ঝাপসা হয়ে আসে । যেখান পর্যান্ত এসে আমাদের দৃষ্টি থেমে যায় এই সেইটেই হচ্ছে “অপ্রাচীন দার্শনিক যুগ”—যাকে ইতিহাসের ভাষায় বলা চলে আমাদের যুগ্যুগ । এ যুগে ভারতীয় চিন্তা-অগতে একটা বিশেষ ভাব ফুটে উঠেছিল এবং এই ভাবকে আশ্রয় করে একটা নতুন দর্শন গড়ে উঠল । এর van guard হচ্ছেন বুদ্ধ, আর rear guard হচ্ছেন শঙ্কর । আমরা আমাদের আতীয় অতীতের লম্বা রাস্তায় ঠিক এই খানটায় পর্যান্ত দেখতে পাই বলে আমাদের আজ সবাইই মনে মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট হয়ে বসে গেছে, সে ধারণাটা হচ্ছে এই যে, আবহমানকাল থেকে হিন্দুর ভারতে ছিল মাত্র দুটি জিনিষ—এক পর্ণকুটীর আর শীর্ণ ঋষি ।

সে কালের ঝুঁধিরা সবাই শীর্ণ ছিলেন কি না সে তর্ক না হয় না-ই তুলুম কিন্তু এই কারণেই আজ আমাদের চোখের স্মৃতি নৈমিত্তিগ্রন্থের বৃক্ষলতাগুল্য এমনি নিবিড় হয়ে উঠেছে যে তা ভেদ করে ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুর ব্রাজপ্রাসাদের উচু চূড়া একটুও দেখা যাচ্ছে না, সেৱিতি সনকাদি ঝুঁধির মুখে চাপ্দাড়ি এমনি কাল হয়ে উঠেছে যে পরীক্ষিঃ অনমেজয়ের মাধাৰ স্বৰ্গ মুকুট একটুও চোখে পড়চে না। তাই অষ্টাদশপক্ষৰ মহাভারতেৰ একটি অক্ষয়ও আজ আমাদেৱ মনে নেই, আৱ মনে থাকলেও তা অতি ষত্রু কৰে মুখে আনি নে। কেন না মুখে আনলেই তাৱ একটা যুক্তিপূৰ্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে দিতে আন হয়ৱান হয়ে যাবে। তাৱ বদলে আজ আমৱা আওড়াচি—“মায়াময়মিদমধিলং হিত্বা” অথচ যখন প্ৰশ্ন ওঠে আমাদেৱ জাতিৰ দুর্দিশা হল কেমন কৰে ? সোজা উত্তৰ—ধৰ্মৰ অধঃপতন হয়েছে বলে। এখন জিজ্ঞেস কৱ—ধৰ্মৰ অধঃপতনেৰ অৰ্থ কি ?—তখন দেখবে পাঁচ জনেৰ মধ্যে চাৱ জনেৰ সে সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধাৰণাই নেই, আৱ বাকি একজন এমনি উত্তৰ দেবে যাতে হাসিৰ চোটে পিলে ফাটে। সেদিন এক বৃক্ষ ব্ৰাঙ্কণকে জিজ্ঞেস কৰেছিলুম—“আচ্ছা বলুন ত আমাদেৱ ধৰ্মৰ অধঃপতনেৰ অৰ্থ কি ?” তিনি উত্তৰ দিলেন—“বাপুহে ধৰ্মৰ অধঃপতনেৰ আৱ বাকি কি, আজকাল ব্ৰাঙ্কণৰাও যখন রেলগাড়ী চাপচে।” ব্ৰাঙ্কণ এমনি ভাবে আমাৱ দিকে চাইতে লাগলেন যে, তাৱ ধৰ্মৰ ব্যাখ্যাটা উপনিষদে স্থান পাবাৰ যোগ্য। অথচ এটা কাৰো কাছেই শুনবে না যে, আমাদেৱ যে ধৰ্মৰ অধঃপতন হয়েচে এবং যাৱ জন্মে এমন দুর্দিশা হয়েচে সেটা হচ্ছে “মনুষ্যহু” ধৰ্মৰ অভাব। আমাদেৱ প্ৰথম

ধারণা যে মানুষ আসলে হচ্ছে কঠিখোকা, তাকে অন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শাসনে রাখতে হবে। আর আমাদের দ্বিতীয় ধারণা এই যে, মানুষ নামক ঔষিটি আসলেই কু, ভাষায় যাকে বলে হাড়পাণী। তাকে এতটুকু স্বাধীনতা দিয়েচ কি সে গিয়ে নরকের পথে নেমেচে, অর্থাৎ— মানুষের আসল সদিচ্ছাটাই হচ্ছে তার নিজের ধর্মস সাধন করা— এই আত্মহত্যা থেকে বাঁচাবার জন্মে আমাদের ঘরে বাইরে বন্দোবস্ত। বাইরে অন্ত্র আর ঘরে শান্তি। শুনতে শুনতে আমাদের স্পষ্ট ধারণা হয়ে গেছে যে মানুষের আত্মাতী না হয়ে বেঁচে থাকবার একই উপায় আছে—সেটা হচ্ছে পরবশ্যতা। এর পালায় পড়েই মানুষের ধর্মের বিকাশ হতে পারছে না, যে বিকাশ হচ্ছে মানুষের আনন্দের ও স্বাধীনতার বিকাশ। অথচ আমাদের সবারই ধারণা যে আমাদের ষা-কিছু দুঃখ, তা হচ্ছে অক্ষয়ত্তীয়ার দিন যে বার্তাকু ভঙ্গ নিষেধ সেটা মানি নে বলে। কিন্তু সবার চাইতে মজাৱ কথা হচ্ছে এই যে, আজ আমাদের নজর পরপুরুষের অঙ্গের উপরে পড়েচে, কিন্তু পূর্ব-পুরুষের শান্তের প্রতি আমাদের দৃষ্টি মোটেও পড়ে নি—ভিতরের বাঁধনই যে বড় বাঁধন—একথা আমরা চোখ মেলেও মানি নে। তারপর বিশেষত আমরা যখন আজ সবাই পলিটিক্যাল, তখন আমাদের পূর্ব-পুরুষের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা একেবারেই দেশজোহীতাৰ পরিচায়ক। আমরা আতিটা কি না আধ্যাত্মিক তাই বাইরে থেকে যা আমাদের চর্মের উপরে এসে পড়েছে তাই আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ভিতৱ্ব থেকে যা আমাদের মর্মের উপরে পাথৰ চাপয়ে রেখেচে তা আমাদের মোটেই চোখে পড়চে না। দিব্যদৃষ্টি আৱকাকে বলে—বল ?

(৪)

ধান ভানতে শিবের গীত এখনেই শেষ করা গেল। এখন শোন
লীলাবান আমি মানি বলে মানুষ ও জগৎ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি ?

তুমি হাজার সাত্ত্বিক হলেও আমার কোনো আপত্তি নেই।
কিন্তু তোমায় একটি কথা বলে রাখচি যে কেবল সাত্ত্বিকতাকে আশ্রয়
করে একটা মানুষ বসে থাকতে পারে ; কিন্তু একটা সমাজ বা জাতিকে
গড়িয়ে বেড়াতে হবে। ইউরোপে যে এত Balance of power-এর
কথা শোন, একটা কোনো সমাজের মঙ্গল চিরকাল ধরে রাখতে
চাইলে সেই সমাজের মানুষদের মধ্যেও তেমনি একটা Balance of
সুস্থি, রঞ্জ, তম চাই। এই কলিযুগের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম—
ত্রেতায় যখন ধর্ম ছিল এখনকার চাইতে তিনগুণ, তখনও কিন্তু
বিশ্বামিত্রকে আসতে হয়েছিল দশরথের কাছে, রামলক্ষ্মণকে নিয়ে
যেতে তাড়কান্তুর বধ করবার জন্মে। ত্রেতাতেই যখন এই তখন
কলিযুগের কথা অনুমান করেই নিতে পার। বাযুপিণ্ড কফের সামঞ্জ-
স্ত্রেই মানুষের দেহের স্বাস্থ্য—স্বত্ব রঞ্জ তম—এই তিনের সামঞ্জস্যে
সমাজদেহের মঙ্গল। খালি সাত্ত্বিকতায় দেহটা আজ্ঞা হয়ে সমস্ত
মানুষটা আকাশে মিলিয়ে যাবে, খালি তামসিকতায় আজ্ঞাটা জড়
হয়ে সমস্ত মানুষটা মাটিতে মিশিয়ে যাবে, এই দুর্ঘটনা থেকে
বাঁচতে হলে, চাই এ দুয়ের মাঝে রঞ্জ। রঞ্জ দু'হাত দিয়ে দু'
দিককার সুস্থি ও তমকে টেনে রাখবে। সুস্থিকেও উড়তে দেবে না,
তমকেও লুটতে দেবে না। তবেই মানুষ নামক জীবটির মঙ্গল—
ভগবানের এই লীলার মাঝে। কিন্তু রঞ্জও যদি অতিরিক্ত প্রবল।

হয়ে উঠে তা হলেও ঘটবে আবার দুর্ঘটনা। রঞ্জিট হচ্ছে আগুন—এই আগুন যদি টু-হানড্রেড ডিগ্রী ফারেম্হিটে উঠে যায় তবে তৎক্ষণাৎ একদিকে আজ্ঞাটা বাস্প হয়ে যাবে, আর একদিকে দেহটা ভস্থ হয়ে ধ্বসে পড়বে। তিনি শুণেন এই তিনি অমঙ্গল থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে তার জীবনে এ তিনির একটা Balance (সামঞ্জস্য) স্থাপন করতে হবে। মানুষ তার ত্রি-শুণকে অতি সহজেই ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে সেই দিন, যেদিন সে প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে সে তার প্রকৃতির দাস নয়—সে তার ঈশ্বর।

(৯)

তুমি এইখানে একটা কথা বলতে পার যে সব ও রঞ্জকে না হয় মানলুম—কিন্তু তমর দৱকারটা কি?—দৱকার আছে। জান ত আহাজের খোলে ballast পূরে দেয়—আহাজের তলা ভারি রাখবার জন্মে। নইলে বাতাসের একটু জোরে আর টেউয়ের একটু তোড়ে জাহাজ এমনি হেলবে দুলবে যে, তাতে আহাজের শ্রেষ্ঠ রক্ষা করা দায় হবে। তমটা ও হচ্ছে মানুষের প্রকৃতিতে এই ballast, এই তমের ভাবেই মানুষ কোনো রকমে মাটীর উপর দাঁড়িয়ে থাকে। এ তম-এ যদি মানুষের তলা ভারি না থাকত তবে সে কোনু দিন প্রস্পেরোর এরিয়েল বা এঞ্জেল গেত্রিয়েলের মত পাখা মেলে আকাশে উধাও হয়ে যেত। এ তম আছে বলে সব তাকে উড়িয়ে নিতে পারছে না, রঞ্জও তাকে পুড়িয়ে দিতে পারছে না।

অবশ্য যারা মায়াবাদী বা নির্বাণবাদী তাঁদের কাছে আমার এ মত উপস্থিত করাই ধূষ্টতা। কেন না তাঁদের পক্ষে সমস্ত দেহটা

আজ্ঞা হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেলেই বা কি আব সমস্ত আজ্ঞাটা দেহ
হয়ে মাটিতে মিশিয়ে গেলেই বা কি—ও-ছয়ের একই ফল, অর্থাৎ—
সমাধি। কিন্তু তুমি যদি লীলাবাদ মান তবে আমাৰ কথাগুলো
এক দৃষ্টিতেই পাগলেৱ প্ৰলাপ বলে উড়িয়ে না দিয়ে একটু বিচাৰ
কৰে দেখবে কি ?

(৬)

তোমাকে নিশ্চয়ই আজ আমাদেৱ এই নব জাগৱণেৱ যুগে, যখন
আমাৰ সবাই সময়ে অসময়ে কাজে অকাজে এমন কি বেকাজে পৰ্যন্ত
গীতাৰ শ্ৰোক আওড়াই তখন একথা নতুন কৰে জানিয়ে দিতে হবে
না যে আমাদেৱ দেহেৱ চাইতে মন বড়, মনেৱ চাইতে আজ্ঞা বড়,
অর্থাৎ—যা যত বেশি অদৃশ্য তা তত বেশি প্ৰধান। এ তিনেৱ মধ্যে
আজ্ঞা জিনিষটা এত অদৃশ্য যে বিছাপতিৰ ভাষায় “লাখে না মিলিল
এক”, কে তাৰ র্থেজ ধৰৱ পায় ? স্বতৰাং ঐ আজ্ঞাৰ কথাটা ছেড়েই
দেওয়া যাক। বাকি রইল দেহ ও মন, এ দুয়েৱ মধ্যে মন বড়।
এখন আমাদেৱ প্ৰত্যোক্তৱই, অর্থাৎ—যাঁৰাই হিন্দুসমাজে বসবাস
কৰছেন, তাদেৱ এই মন নামক জিনিষটি interned হয়ে আছে।
শান্তীয় বালুৱ চৱে এই internment-এৱ camp, চাৱদিক সঙ্গীন
কাঁধে শ্ৰোক-পুলিশ পাহাৰা দিচ্ছে। এই internment ভেঙ্গেছ কি,
একেবাৱে সমাজ থেকে নিৰ্বাসন। এখন মনকে যদি দেহেৱ চাইতে
বড় বলে মান তবে দেহেৱ internment-এৱ চাইতে মনেৱ intern-
ment অবস্থা যে সাংঘাতিক একথা তোমাকে লজিকেৱ ধাতিৱে
মাৰতেই হবে। কিন্তু আমাদেৱ মধ্যে হাজাৰে ন'শ নিৱানবুই

ଅମାର ଓଟା ଖେଳାଲେଇ ଆସେ ମା । ତାର କାରଣ ମନେର internment ଅବଶ୍ଵ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ ନୟ ଏବଂ ଠିକ ସେଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓଟା ବେଶି ମାରାଇଥିବା । କିନ୍ତୁ ଆର ଯାରଙ୍କ ସାହୋକ, ଆମାର ନିଜେର ସମସ୍ତେ ବଲାତେ 'ପାରି ଯେ ଜୀବନ ହେଉଥାଏ ଥେବେ ମନେର interned ଅବଶ୍ଵ ଆମି ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରେଛି ।

ଉପରେ ଆମି କେବଳ ତୋମାର କାହେ ଥିଓରିଇ ଦାଖିଲ କରେଛି ଶୁତ୍ରାଂ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିତେ ଆମି ଶ୍ରାୟତ ବାଧ୍ୟ ।

ଅମ୍ବ ଥେବେ ଆମାଦେର ପ୍ରତୋକେରଇ ଜୀବନ ଯେ କେମନ ଭାବେ ଚାଲିଲ ହୟ ତାର ରଙ୍ଗ-ରସହୀନ ଇତିହାସ ଏଥାନେ ତୋମାଯ ନା ହୟ ନାହିଁ ଦିଲୁମ । ଉପରେ ଯେ ଥିଓରି ଦାଖିଲ କରେଛି, କେବଳ ଆମାର ଜୀବନେର ଦୁଟି ସଟନା ଦିଯେ ତାର ଏକଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିତେ ଚେଷ୍ଟା କରବ । ସେଇ ଯେ ଦୁଟି ସଟନା ତା ସମାଜେର କାହେ ହସ୍ତ ଅତି ଅକିଞ୍ଚିକର, ଏମନ କି ନେହାଂ ବାଜେ, କିନ୍ତୁ ଆମାର କାହେ ତାର ଏକଟା ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଛିଲ । ଏ ଦୁଟି ସଟନା ସଟଲେ ସମାଜେର କୋନୋ କ୍ଷତି ହତ ନା ଅଧିଚ ଆମାର ପରମ ଲାଭ ହତ । ଏ ଦୁଟି ସଟନାର କ୍ଷାତ୍ରି ତୋମାର ଜୀବନ ଆହେ । ପ୍ରଥମ ଆମି ବିଲେତ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟେ ଛିଲୁମ ଆର ବିତୌୟଟି ହଜେ ଏହି ଯେ ଆମି ତୋମାର ଭଗିକେ ବିଷେ କରିତେ ଚେଷ୍ଟେଛିଲୁମ । କିନ୍ତୁ ଓର ପ୍ରଥମଟି ସଟଲନା, କାରଣ ପୁଅପାଦ ତୋତାରାମ ଶୃତିଶିରୋମଣି ମହାଶୟ—ସାଂକେ ଆମାର ଦାଦାମଣାଇ ଇଷ୍ଟଦେବତାର ମତ ଦେଖିଲେ—ତିନି ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଆମାର ଠାକୁରଦା'କେ ଶୁଣିଯେ ବଲେଛିଲେନ ଯେ ନୋନାଜଳେର ଗନ୍ଧ ଯାର ନାକେ ଚୋକେ ତାର ଏଦିକେ ଓଦିକେ ଅର୍ଧା—ଉର୍କୁତମ ଓ ନିଷ୍ଠତମ ଗୋଣା-ଗୋଧା ଏକଣ' ତିରାମି ପୁରୁଷେର ବୁଡ଼ୋ ବୁଡ଼ୀ ଛେଲେ ମେଷେ ଆଶାବାଚା ସବା-ରହ ନରକବାସ ନିଶ୍ଚଯ । ଆର ଓର ବିତୌୟଟି ସଟଲ ନା ତାର କାରଣ ଆମାର

নাম শ্রীমান् অশাস্ত্রকুমার “ভট্টাচার্য” আৱ তোমাৱ বোনেৱ নাম
শ্ৰীমতী শাস্ত্ৰিলতা “গুপ্তা”। এৱ মানে হচ্ছে এই যে, আমাৱ মধ্যে
মন বলে যে একটি জিনিষ আছে সেই মনেৱ ছুটি বিশেষ চিক্ষা, দুটি
heroic ইচ্ছা যাৱ অস্তে আমি নিখে দায়ী, সেই দুটি চিক্ষা কৰ্ত্তৃ
অনুদিত হল না বাইৱেৱ চাপে, সমাজেৱ চাপে। মন বিৱৰণ হয়ে
বললে—এই ত তোমাৱ সমাজ, এখানে কুস্তকৰ্ণেৱ মত নিদা
দেওয়াই প্ৰশংস্ত, এখানে চিক্ষা কৰতে যাওয়াই ঝকমাৱি, এখানে
মন যদি আগে, মন যদি সংকীৰ্ণ আয়গা থেকে একটুকু ফুটে ওঠে
অমনি চাৱদিক থেকে সমাজ তাকে চাপতে থাকে। এমন অবস্থায়
মন বেচাৱী কি কৰে, সে ঘূমিয়ে পড়ল, মন যখন ঘূমিয়ে পড়ল
তখন ঔৰন বললে—মন যখন ঘূমল তখন আমি আৱ জেপে থেকে
কি কৰব। তখন সে চোখ বুঁধে দিয়ি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।
চাৱদিকে বাইৱে কত না হৈ চৈ কত না হাসিকামা রাগ। চোখ-
বোঁজা ঔৰনেৱ কাছে সে সব স্বপ্নেৱ মত এসে পৌঁচতে লাগল।

কিন্তু সে যাহোক এইখানে বাঙালীজাতি আজ যে অবস্থায়
এসে পৌঁচেছে সে-অবস্থায় যে শ্রীমান् ভট্ট ও শ্ৰীমতী চট্টোৱ বিয়েৱ,
সঙ্গে শ্রীমান् “ভট্ট” ও শ্ৰীমতী “গুপ্তা”ৱ বিয়েৱ, কি মানসিক কি বৈ-
তিক কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক কি ব্যবহাৱিক কোনো দিক থেকে
একটুকুও প্ৰভেদ নেই বিশ্বা আমি বিলেত গেলেই যে সমস্ত ভাৱত
মহাদেশটা ভাৱত মহাসাগৱেৱ নীচে তলিয়ে যেত না—এসমৰক্ষে
আমি তোমাকে লম্বা বক্তৃতা উনিয়ে দিতে পাৰিবুম, যে বক্তৃতাতে
স্বপ্ন বিপক্ষ ছুয়েৱই ব্ৰহ্ম গৱম হয়ে উঠত ; কিন্তু আমাৱ এ কুদু
চিঠিৰ পৃষ্ঠা ত তোমাৱ গোলদীধি ও নয়, গড়েৱ মাঠও নয়। স্বতুৱাঃ

অসাধারণ শোর্ষে সে-লোভ সম্বৰণ কৱে এই যে দুটি ইচ্ছা আমাৰ
সম্পাদন হল না তাৰ ভিতৱৰে দিকটাৰ একটা কথা তোমায়
বলব।

এইখানে আমি তোমাৰ কাছে স্পষ্ট কৱে কুল চাঞ্চি যে, আমি
বিলেত গেলেই যে আমাৰ স্বীকৃত শক্ত দুটো শিৎ বা পিছনে লম্বা
একটা লেজ গজিয়ে যেত বা তোমাৰ বোনকে বিয়ে কৱলেই যে
হোমঙ্গল ফলটা—যা আজি ভীষণভাৱে ডানে বাঁয়ে দুলছে, তা টক কৱে
বোঁটা ছিঁড়ে আমাদেৱ একেবাৰে নাকেৱ ডগাৰ উপৱে এসে পড়ত,
তা নয়। কিন্তু এই যে দুটি মনেৱ ইচ্ছাৰ বিকলকে সমাজ দাঢ়ালে—
এই ঘটনাটাৰ পিছনে একটা principle আছে, যেটা সমাজেৱ পক্ষে
মাৰাত্মক। এই principle-টা হচ্ছে এই যে, সমাজ তাৰ প্ৰত্যেক
সভ্যদেৱ বলচে—দেখ তোমাদেৱ ভাৰতে হবে না, চিন্তা কৱতে
হবে না, কোন বিষয়ে ইচ্ছা কৱতে হবে না। আমি আছি, আমাৰ
বাঁধা নিয়মেৱ পাকা সড়ক দিয়ে চলে যাও, তাতেই তোমাৰ মোক্ষ।

এই বন্দোবস্তে প্ৰথমত মানুষ নামক জীবটি ব্যৰ্থ হয়ে উঠছে,
কেন না মানুষ ত কল নয়। তাৰ মন আছে, বুদ্ধি আছে, কল্পনা
আছে, ইচ্ছা আছে, Will আছে—কিন্তু সমাজ মানুষেৱ এই
সকলেৱ মুক্তি দিতে নাবাঞ্জ। সমাজ বলচে—মানুষ তোমাৰ
মন চাই নে, বুদ্ধি চাই নে, কল্পনা চাই নে, ইচ্ছা চাই নে, Will চাই
নে—চাই তোমাৰ স্মৰণশক্তি, চাই তোমাৰ মুখস্তু কৱবাৰ বিষ্টে।
এই রুকম কৱে সমাজ যখন তাৰ সভ্যদেৱ কেবল ছকুম তামিল
কৱবাৰ যন্ত্ৰ কৱেই তুলচে—এৱ শেষ কুফলটা আবাৰ গিয়ে সমাজেৱ
বুকেই বাঞ্চে।

সমাজ নামক জিনিষটিকে যদি বিশ্লেষণ কর তবে দেখবে যে, সমাজ প্রাণবন্ত, সমাজ শক্তিমান। আসলে সমাজ আৱ যাই হোক বহুবৃহি সমাস নয়। সমাজ প্রত্যেক সভ্যের কাছ থেকেই তাৱ শক্তি সামৰ্থ্য জ্ঞান ইত্যাদি আহৰণ কৱছে। সুতৰাং যথন সমাজেৱ সকল সত্যহৈ, কি মনেৱ দিক থেকে কি চিন্তাৱ দিক থেকে কি কল্পনাৱ দিক থেকে কি শক্তিৱ দিক থেকে, একেবাৰে শূন্য; তখন সমাজ তাদেৱ কাছ থেকে কেবল শূন্যই লাভ কৱতে পাৱে। আসলে জড়জগতে ও মনোজগতে একটা প্ৰভেদ আছে। দশখানা কফি একত্ৰ কৱলে তা বাঁশেৱ মত মোটা ও শক্ত হ'য়ে উঠতে পাৱে কিন্তু দশজন বোকাকে একত্ৰ কৱলে একজন স্যৱ অ্যাইজ্যাক নিউটন হ'য়ে উঠে না।

সুতৰাং চাই যান্ত্ৰিক মানুষেৱ মুক্তি—তাৱ চিন্তাৱ মুক্তি, কৰ্মেৱ মুক্তি—এই মুক্তিৱ ভিতৱ্যে প্রত্যেক মানুষেৱ স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতাৱ আনন্দে প্রত্যেক মানুষটি তাৱ সমাজকে আনন্দ-ময় কৱে তুলবে, তাৱ প্ৰাণেৱ গতিতে মনেৱ কল্পনায় বুদ্ধিৱ দৃষ্টিতে সমাজকে পূৰ্ণ কৱে তুলবে—তখনই আমৱা দেখতে পাৰ সমাজ-দেবতা একটা কাঠেৱ পুতুল নয় বা East End Co-ৱ দম দেওয়া ঘড়ি নয়—সে দৃষ্টিবান, জ্ঞানবান ও শক্তিমান। এই দৃষ্টিৱ ভিতৱ্য দিয়ে সমাজ সত্যকে পাৰে, জ্ঞানেৱ ভিতৱ্য দিয়ে প্ৰেমকে পাৰে ও শক্তিৱ ভিতৱ্য দিয়ে সম্পদ ও গৌৱকে লাভ কৱবে।

লিখতে লিখতে চিঠি প্ৰকাশ হ'য়ে গেল। সময়ও যায়। কাজেই এখানেই দাঁড়ি টানলুম। কেন না তোমাকে আমি একটা

৪২০

শনুব পর্য

শৌধ, ১৩২৬

example set করতে চাই। সে example-টা হচ্ছে এই যে, জ্ঞ-
লোকের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তার উত্তর সাড়ে চার মাস দেরী না
করে' সেই সিনই দেওয়া। ইতি—

তোমার চিরকেলে
অশাস্ত্র ।

শিল্পী ।

—::—

শিল্পী ছবি আকত ।

রাজাৰ সেগুলো পছন্দ হ'ত না ; সভাসদগণেৰ মুখে তাচ্ছিলোৱ
হাসি ফুটে উঠ্ত ; নাগৱিকেৱা মুখ ফিরিয়ে চলে ষেত ।

শিল্পীৰ তবুও ছবি আকাৰ বিৱাম ছিল না ।

* * * * *

কিন্তু এমন একদিন এল যখন শিল্পীৰ অনশন-ক্লিষ্ট হাত হ'তে
তুলিকা আপনিই থ'সে পঢ়ল ।

গৃহলক্ষ্মী ব'ললেন—রাজাৰ কাছে যাও ; তাঁৰ হৃপাকটাকে
তোমাৰ সকল অভাব দূৰ হ'য়ে যাবে ।

মানস-প্ৰিয়াৰ আধ-অঁকা ছবিথানি তুলে রেখে শিল্পী রাজসভায়
এসে দাঢ়াল ।

রাজা বল'লেন—উচ্চারবাটিকাৰ ভিত্তিগাত্ৰে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ-
গণেৰ কৌতুকাহিনী তোমাৰ তুলিৰ মুখে ফুটিয়ে তুলতে হবে ।

সভাসদেৱা আশ্বাস দিলে—আশাতৌত পুৱকাৰ পাবে ।

নাগৱিকদেৱা আশা হ'ল—দেয়ালজোড়া ছবি দেখে চক্ৰ সাৰ্থক
কৰবে ।

রাজপ্রসাদতুষ্টি হাতে শিল্পী আবার তুলিকা তুলে নিলে ।

* * * * *

শতেক রাজাৰ মুখছবি ভিত্তিগতে ফুটে উঠল ; অমাত্যদেৱ
ভাবহীন মুখেৱ ছায়া অলিঙ্গেৱ ফাঁকে ফাঁকে দেখা যেতে লাগল ;
নাগরিকদেৱ প্রাণহীন মুখেৱ রেখা শোভাযাত্রাৰ মধ্যে ছড়িয়ে
ৱাইল ।

শিল্পীৰ কাজ সঙ্গ হবাৰ পৱ—

রাজা তাকে শিরোপা দিলেন ; সভাসদেৱা দিলে—বাহবা ;
নাগরিকেৱা দিলে—অভিনন্দন ।

শিল্পীৰ মুখ গৰ্বে, আনন্দে উৎকূল হ'য়ে উঠল ।

* * * * *

শিল্পীৰ বাড়ী ফেৱাৰ সংজ্ঞে সজ্জেই তাৰ মানস-প্ৰিয়াৰ অঙ্গসমাপ্ত
মুখধানি রেখায় সমাপ্ত হ'য়ে উঠল ।

কিন্তু তাৰ প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল না—শিল্পীৰ শত চেষ্টা সত্ত্বেও ।

ৱংএৱ সংজ্ঞে ৱং মিশ্ল, ৱংএৱ 'পৱে ৱং পড়ল ; কিন্তু মুখেৱ সে
মৃত্যু-বিবৰ্ণ ভাব কিছুতেই ঘুচল না ।

শিল্পী আহাৰ নিৰ্দা ত্যাগ কৱলে, বিস্তু সম্পদ দূৱে কেললে,
সুখস্বাক্ষৰ্দ্য বিসৰ্জন দিলে ; কিন্তু সে মুখে প্ৰাণেৱ আভাৰ ফুটে
উঠল না ।

* - * * *

শিল্পী তখন কলাদেবীৰ ধাৰণ হ'ল ।

দেবী বললেন—শিল্পীর বুকের রক্ত দিয়েই আমি তার মানস-প্রিয়ার মুখে ঔবনের আভা ফুটিয়ে তুলি ; শিল্পীর মৃত্যুর ভিতৱ্ব দিয়েই তার মানস-প্রিয়ার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করি ।

শিল্পী বললে—আমার সেই শ্রেষ্ঠ বলি আজ গ্রহণ করুণ ।

দেবী উত্তর করলেন—তা' তো পারি না । স্বর্গমুক্তার রঙে যে দিন তুলি রাখিয়ে ছিলে, সে দিন হ'তে তুমি মৃত । তোমার আত্ম-বলিদানে অধিকার নাই, কলও নাই ।

শিল্পীর সংজ্ঞাহত হাত থেকে তুলিকা থসে পড়ল । আর মানস প্রিয়ার প্রাণহীন মুখ শূষ্টে চেমে রইল ।

শ্রীকাশ্মিচন্দ্র ঘোষ ।



ভারতের নারী ।

—*—

শ্রীযুক্ত “সবুজ পত্র” সম্পাদক মহাশয় সমীপেমু—

গত ভাস্তু-আধিনেৱ সবুজপত্ৰে “ভাৱতেৱ নাৱী” শীৰ্ষক প্ৰবন্ধ
পাঠ কৱিয়া এই সম্পর্কে আৱৰণ গুটীকতক কথা বলাৰ লোভ সংবৰণ
কৱিতে পাৱিলাম না । আমি স্থলেখক হইবাৰ যোগাতা রাখি না
অথবা সেৱন উচ্চাশা ও মনে পোৰণ কৱি না । স্বতৰাং আমাৰ বক্তব্য
আপনাদেৱ পত্ৰে স্থান পাইবে কি না জানি না । তথাপি সত্য অপ্রিয়
হইলেও প্ৰকাশনীয় ও মাননীয় এই বিশ্বাসে অগ্ৰসৱ হইলাম ।

আজকাল খবৱেৱ কাগজ পড়িলে ও “দেশসেবী”দিগেৱ বক্তৃতা
শুনিলে কুৰক্ষেত্ৰ যুক্তেৱ কথা মনে পড়ে । এখনকাৰ শঙ্খ ভেৱী,
তুৱী, দামামা প্ৰভৃতি বাছ্যস্তৰেৱ শক্তে কৰ্ণ বধিৰ হয় ; এবং ভৌম,
অঙ্গুল, ভৌঞ্চ, ঝোণ প্ৰভৃতিৰ বৰ্ণিত বিক্ৰম আধুনিক বৌৱদিগেৱ
শৌধ্য বীৰ্যেৱ কাছে অতি অকিঞ্চিতকৰ বলিয়াই মনে হয় । “ভাৱতেৱ
নাৱী” প্ৰবন্ধে যে মহাবৌদ্ধেৱ উল্লেখ কৱা হইয়াছে, তৎশ্ৰেণীভুক্ত
সকলেৱ চোখে যদি আগুন ধাকিত, তবে বোধ হয়, ইংৰেজেৱ সঙ্গে
সঙ্গে সত্যেন্দ্ৰ সিংহ প্ৰভৃতিকেও ভৰ্ম হইতে হইত । অন্ত আইন
আছে বলিয়া চোখেৱ আগুনেৱ কথা বলিলাম, ইহাতে বৌৱদেৱ
অবমাননা হইল, কিন্তু উপায় নাই । ভাৱতেৱ নাৱী সন্ধকে এই

“দেশসেবি”গণের মত ও বক্তৃতা আকাশের ও উর্কে উঠে। মাতৃহ্রের গোরবস্থল, ত্যাগের আদর্শ, সহিষ্ণুতার পরাকার্তা প্রভৃতি বহুবিধ মহান् আখ্যা দ্বারা স্ত্রীজাতির গোরববর্জন করিলেই যদি তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইত, তবে ভারতের নারী সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিবার প্রয়োজনই থাকিত না। অনেক সময় পঙ্গাবাজী করিয়া মামলা জেতা যায়, কিন্তু তাহাতে সত্যকে বিচলিত করা যায় না। বাস্তু তের বছরের বালিকার মাতৃহ লইয়া বাগাড়স্বর ও দেশের ও ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার এক ভারত ব্যতৌত ও হিন্দুসমাজ ব্যতৌত পৃথিবীর অন্ত কোন সত্য বা অসত্য সমাজে বা দেশে প্রচলিত আছে কি না সন্দেহ। পরের সঙ্গে কথা কাটাকাটির দক্ষতা ভগবান আমাদিগকে কি উদ্দেশ্টে দিয়াছেন আনি না, তবে এটা ঠিক কথা যে আমি চোখ বুঝিলেই আর কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না, ইহা পাগলছাড়া অপর কেহ মনে করে না। নারীকে আমরা কত বড় গোরবের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি তাহা দু একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজেই বুঝা যায়। এই সে দিন কলিকাতা সহরে পুলিস এক পথভূষ্ঠা, অপস্ততা দশ বৎসরের বালিকাকে উদ্ধার করার পর, তাহার খণ্ডন ও স্বামী স্বীয় পবিত্রতা অটুট রাখিবার জন্ম তাহাকে গ্রহণ করা উচিত মনে করিলেন না। হিন্দু আইন, ব্যবহার ও আচার, সকলই স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অনেক বীচে মার্খিয়াছে। দেশে আমে প্রত্যেক বাড়ীতেই ইহার প্রমাণ আছে। বাগবাজীদ্বারা এতবড় স্পষ্ট সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। সতীদাহ নিয়ারুণের সময় গেঁড়া হিন্দুসমাজ রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে বিরাট সত্য করিয়া যে বহু-স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবাদের দরখাস্ত বিলাতে পার্থাইয়া ছিলেন তাহা মনে কারলে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে এখন

লজ্জিত হইতে হয়। ইংরাজি শিক্ষিত সন্ত্রাসীয়ের কথা ছাড়িয়া দিলে পল্লীগ্রামে এখনও এমন সংসার আছে যেখানে আহার ও রোগের চিকিৎসা-বিষয়ে নারী পুরুষের সমান যত্নের পাত্র বিবেচিত হয় না। এই সব আনিয়াও ইংরাজদের চেয়ে আমরা যে কোন অংশে ছোট নই, এই প্রমাণ করিতে গিয়া কেহ কেহ গলার জোরে রাত কে দিন করিতে চান। অনেকস্থলে দেখা যায় পবিত্র স্বামী একটু খুঁত পাইলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিব বলিয়া ভয় দেখায়। তিনি তাহা করিলেও অসহায় নিরপরাধিনী সমাজের দয়ার দাবী করিতে পারে ন। কার্য্যত স্ত্রীজ্ঞাতিকে যে এ সমাজের কোন স্থানে বসাইয়াছি, এই গেল তাহার এক প্রমাণ।

নারীর পাপের কথা বিশ্বাস করিতে আমরা যত প্রস্তুত ও উৎসুক এত আর কেহ নয়। ভারতের নারী বিলাতের নারীর অপেক্ষা বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধা পায় একথা খুব জোর করিয়া যিনি বলিবেন তাঁর ধীরতার খুব অভাব আছে বলিতে হইবে। আমরা নারীর সত্য বা মিথ্যা, কোনক্লপ দোষ পাইলেই তাকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, এক্লপ আর কোন দেশে আছে কি? পুরুষের সাত খুন মাপ; তৃতীয় চতুর্থ পক্ষও অনায়াসে চলিতে পারে, কিন্তু বালবিধবা নির্তুর নির্ধ্যাতনের আগুনে পুড়িয়া মরিবে আর আমরা বড় গলায় ও হাততালি দিয়া বাহবা দিব, এ দৃশ্য ভারত ছাড়া কোথাও নাই। আজকাল স্বদেশকে ভালবাসি ন। একথা কেহ বলিতে চাহেন ন। এ বেশ কথা, কিন্তু সমাজের অঙ্গে যে গলিতকুঠি দেখা যায়, তাহাকে সংযতে ও সম্মানে ঢাকিয়া রাখিলে দেশের মজলের চেয়ে অমজলই অধিক হবে। স্বদেশপ্রেমের নামে

দেশের কঠিন রোগগুলিকেও যে কেহ কেহ ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহা মরণেরই লক্ষণ। ইংরাজের উপর চোখ রাঙাইলে অথবা দাঁত কড়িমড়ি করিয়া বাহাদুরী নিলে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের চেয়ে আমরা কোন অংশে ছোট নই, এই প্রমাণ করিতে গিয়া যদি নিজের দুর্বলতাকে পরামুক্ত, ব্যাধিকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ, ও কুবুক্কিকে বিজ্ঞতা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি, তবে ইংরাজের কোন লোকসানই নাই। তাহাতে আমাদের বিকারই প্রমাণিত হইবে।

এইত গেল নারীর কথা। ভারতের নরের কথাও এই প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ে। লঙ্ঘনে সংস্কার আইন (Reform bill) গঠিত করিবার জন্য যে সমিতি (Joint committee) বসিয়াছে তাহাতে সাক্ষ্য দিবার সময় কে একজন বলিয়াছিলেন যে ভারতের বর্তমান সমাজ উন্টান পিরামিডের (pyramid) মত মাধা-ভারী। কথাটা শুনিয়া আমাদের রাজনৈতিক পাণ্ডুরা—বর্ষাকালে ভেকুলের মত তৌরে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কথাটা কি একে-বারে মিথ্যা ? প্রাচীনকালে ভারতবাসীর সত্যই ছিল চরিত্রের যুলভিত্তি। এখন কিন্তু রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্য মিথ্যার প্রভেদ উঠিয়া গিয়াছে। সংস্কার আইন এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে খবরের কাগজে প্রবন্ধ পড়িলে বোধহয় যে নিজের কোটিকে বজায় রাখিবার জন্য সব পক্ষই মিথ্যাকেও সত্য বলিয়া মামলা ফতে করিবার চেষ্টা করিতেছে। আজজীদলিলে কোন খুঁত না থাকিলেই হইল, মোকদ্দমা যদি মিথ্যাও হয় তবু মিথ্যাসাক্ষী ঘোগাড় করিয়াও জিতিতে হইবে, এই চেষ্টাই সব রাজনৈতিক গুণগোলের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। ষেহেতু

আমরা সাহেবদের দেশের মত শাসনপ্রণালী চাই, অতএব আমরা
জোর করিয়া বলিব যে দেশের চাষাভূষা পর্যাপ্ত সংস্কারের অপেক্ষায়
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে; কারণ ইহা না বলিলে যদি
না পাই। অভিনেতা রঞ্জমকে রাজা সাজিবার সময় মুখমণ্ডলে নানা-
রূপ রং প্রলেপ দেয় এবং তাড়া-করা রাজপোষাক পরে। সেইরূপ
নেতা-নামধারী অনেকেই পাশ্চাত্য দর্শকের মন ভুলাইবার জন্য জীর্ণ,
ক্ষতযুক্ত সমাজদেহকে বহু পুটিং দিয়া সাজাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত।
ভেদবুদ্ধি ও অঙ্ক-কুসংস্কার এখনও দেশে পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে,
কেহ কেহ স্বজাতি-প্রেমের ভাগ করিয়া এই সকলের বৈজ্ঞানিক
ব্যাখ্যা দিতেছেন। প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে ছোট ছোট এমন গুণী আছে
যাহার সৌমা লভণ করা অসমসাহসের কার্য; কিন্তু এসকল দেশ-
উদ্ধারকারীদের বিবেচনার মধ্যে আসে না। অল্পসংখ্যক লোক ইংরাজী
শিখিয়া চীৎকারে গলা ফাটাইয়া বলিতেছে, “ইংরাজের সমাজে
যেমন সাম্য আছে, আমাদেরও তেমনি আছে, আমাদিগকে স্বায়ত্ত-
শাসন দাও।” এদিকে বাংলার গ্রামে গিয়া দেখ, সমাজ যাহাদিগকে
অতি নীচ ও অবজ্ঞার পাত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের কি দুঃখ
দৈন্য কি নিঝীব জীবন। হিন্দুসমাজ পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বহু কষ্ট
ও চেষ্টাদ্বারা নিজের পায়ে পক্ষাঘাত আনিয়াছে। রোগ যত কঠিন
হইতেছে বিকারগ্রস্ত রোগীর শ্যায় তাহার প্রলাপও তত বাড়িতেছে।
কিছুদিন পূর্বে লেপ্টেনেট উপেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু
সমাজকে খংসের মুখেধাবিত দেখিয়া দু’একটা অপ্রিয় স্তোর আলোচনা
করিতে গিয়া গোড়াদের এমন কি অনেক “দেশহিতৈষীর” তি঱ঙ্কার
ও বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক প্রকার উপাদ

রোগের র্ণনা আছে, কিন্তু একট উৎকৃষ্ট রোগ চিকিৎসকদের জ্ঞানেও আসে নাই। হিন্দুসমাজ জনাতক রোগীর স্থায় জলে পড়িয়া মরিতে চাব, বারণ করিলে তাড়িয়া আসে। কয়েকজন লোক লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং ইংরাজের সঙ্গে তর্ক করিতে পারে আর সমাজের সকল শ্রেণীর লোক অশিক্ষিত, অসার, নিজীব, এ সমাজের তুলনা উল্টান পিরামিডের সহিতই হয়। চক্র খুলিয়া দেখিসে সকলেই দেখিবেন হিন্দুসমাজে বাঙালী শ্রমজীবির সংখ্যা ক্রমেই কমিতেছে। নৌকার মাঝি, কলের মজুর, চাষা, কুলী প্রভৃতি বলিষ্ঠ শ্রমজীবী বাঙালী লোপ পাইতে বসিয়াছে। হিন্দুসমাজের মাথাটী মোটাই আছে, হাত পা নাই বলিলেও চলে। দেশের সমাজের ঘারা মেরুদণ্ড, তাহারা দুর্বল, ক্ষীণজীবি। তাহাদের শিক্ষার ও উন্নতির কোন চেষ্টাই নাই, তাহারা সমাজের লাভনা ও অবমাননা এখনও সহ করিতেছে, আর জন কয়েক লোক তাহাদেরই প্রতিনিধি সাজিয়া হৈ চৈ করিতেছে। সমাজ নিজের প্রতি কর্তব্যে উদাসীন নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার বিষয়ে অঙ্ক, অথচ মুষ্টিমেয় লোক নেতা সাজিয়া গোলমাল করাকেই কর্তব্য মনে করিতেছে, যেন ইংরাজকে গাল দেওয়াই স্বদেশপ্রেমের পরাকার্তা। যাহারা গলাবাজিতে পটু এবং বিলাত গিয়া বাহাদুরী লইতে চেষ্টিত তাহারা কি বাংলার পল্লীস্বাস্থ্য ও এক শ্রেণীব্যাবারা অপর শ্রেণীর উপর অত্যাচারের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন ? যাহারা নিজের দেশভাইকে সর্ববিষয়ে নিজের সমান জ্ঞান করিতে শিখে নাই, পরের কাছে নিজেকে জাহির ও স্বীয় দোষ গোপন করাই ঘাহাদের কার্য—বিধাতা তাহাদের শাসন হইতে দেশকে রক্ষা করুন। নারীর অসহায় অবস্থার সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর

অশিক্ষিত লোকেৱ অসহাৱ অবস্থাৰ অনেক সামৃদ্ধ্য আছে। দেশকে
ভালবাসিতে হইলেই যে দোষকেও ভালবাসিতে হইবে একথা কোন
শাস্ত্ৰে নাই। “আমি তোমাৱ চেয়ে খাটো না” একথা বলিবাৱ
পূৰ্বে নিজেকে একবাৱ মাপিয়া দেখা উচিত। আমি বড় কি ছোট
তাৰা আমাৱ চেয়ে পৱেই ভাল বলিতে পাৱে। মানুষ নিজেই যদি
নিজেৰ স্ববিচাৱ কৱিতে পাৱিত তবে অপৱ বিচাৱকেৱ দৱকাৱ
হইত বা।

শ্ৰীৱেশচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

নড়াল কলেজ

২৪ নভেম্বৰ ১৯১৯।



আলো ও ছায়া।

—::—

বীণাকে কথা দিয়েছিলাম বড়দিনের সময় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে
বাব। তাঁর সাধ হয়েছিল পোষকালী দেখে পুণ্যসঞ্চয় করবেন—
আমার স্থ চেপেছিল কংগ্রেস দেখব।

যথাসময় বীণা আমাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। জবাব
ঠিকই ছিল—আমি বললাম কথাটা আমারও মনে আছে, কিন্তু ইন্দ্র-
য়েশ্বর ভয়েই সেটি রাখতে পারছি নে।

—ও সব ছুতো শুনতে চাইনে আমি।

—এটা কি একটা ছুতো হল ? থবরের কাগজখানা পড়ে দেখ
দেখি একবার।

—ও সব বাবে পড়া রেখে এই চিঠিখানা আগে পড়—বলে' বীণা
আমার হাতে একথান চিঠি দিলেন।

—এ কি ? তোমার দাদার লেখা যে ! ওঃ তুমি একেবারে ডাক্তা-
রের স্টিফিকেট হাজির করেছ সঙ্গে সঙ্গে।

—করব না ? তুমি যা বলবে তাই মেনে নিতে হবে নাকি ?

—আচ্ছা দেখি সতীশ কি লিখেছে।

পড়ে' বুঝলাম চিঠিখানা বেনামীতে আমাকেই লেখা। সতীশ
লিখেছে যে কলকাতায় অস্ত্র হচ্ছে বলে' যদি কারো শয় হয়, সে

বাইরের লোকের—যাঁরা শুধু খবরের কাগজ পড়ছেন। সে আরও লিখেছে যদি কলকাতায় আসার মতলব থাকে, তবে অস্থখের জয়ে পিছিও না, কারণ বছরে এমন দিন এবং জগতে এমন স্থান পাওয়া যাবে না, যখন মানুষ মরবে না বা যেখানে তার অস্থ হবেনা।

অগত্যা আমাকে হার মানতে হল।

আমি কলকাতায় যাব শুনে বস্তুরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, এমন কি ভূষণ এসে স্পষ্টই বললে—তুমি ক্ষেপেছ না কি?

—কেন বল দেখি?

—কলকাতায় যাচ্ছ এই সময়ে—তাও আবার যাচ্ছ সপরিবারে!

—ইঁ, তা যাচ্ছি বটে, কিন্তু ক্ষেপি নি—

—তার বড় বাকীও নেই। যত লোক কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, আর তুমি যাচ্ছ সেখানে মজা দেখতে।

—পালাবে কোথা ভাই—পালিয়ে কি নিষ্কৃতি আছে? এখানেও কি লোক মরছে না? বরং খতিয়ে দেখলে বুঝবে লোক এখানেই বেশি মরছে।

—তা হয়ত সত্য, কিন্তু এ হ'ল দেশ, আর সে—

—কলকাতাও রাজধানী। বাঙ্গলা দেশের সেরা জায়গা।

অতঃপর হতাশভাবে ভূষণ বলল—অর্থাৎ তুমি যাবে।

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম ইঁ।

—তবে বাধা দেওয়া দৃঢ়। কিন্তু সাবধান ভাই, বেশি দিন থেকে না এবং সাবধানে থেকো।

—সাবধানে থাকতেই হবে কারণ প্রাণটা ঠিক পড়ে'ত পাওয়া
নয়। আর—

—কবে ফিরবে ?

—তার ঠিক নেই, তবে মিছামিছি দেরী করব না। যাচ্ছি
বেড়াতে, সখ মিটে গেলেই ফিরব।

কলকাতায় গিয়ে দেখলাম সতীশের কথাই ঠিক। বোধ হয় না
যে সহরে মারীভয় হয়েছে।

তিন চার দিন বেশ কাটল। ভয় ও ভাবনার কথা প্রায় ভুলেই
গেলাম। শুধু সকালবেলা খবরের কাগজ পড়বার সময় একটু
ভাবনা হ'ত। কিন্তু ভয়ের খবর তাতেও ছিল না। অস্থির দিন দিন
কয়ে আসছিল।

হঠাতে তারপর একদিন বিকেলের দিকে বীণার শরীরটা থারাপ
বোধ হল, পরদিন দেখেশুনে সতীশ গন্ধীর হয়ে বল্ল—তাইত—

আমি জিজ্ঞাস করলাম—কি দেখলে ?

—নিউমোনিয়া হয়েছে—সাবধানে থাকতে হবে।

শুব সাবধানেই থাকা হ'ল—ভাল ডাক্তার দেখল, দামী ওষুধ
পড়ল কিন্তু কোন ফল হল না।

বীণাকে ধরে রাখা গেল না।

. ছেলে মেয়ে ঢুটিকে সেখানেই রেখে পরদিন সকালের গাড়ীতেই
আমি কলকাতা ছাড়লাম।

গাড়ী ছাড়বার তখন একটু দেরী ছিল। কামরার ধারে সতীশ
চুপকরে দাঢ়িয়েছিল। ভিতরে আমিও তেমনি বসেছিলাম।

সামনে একটা উদ্ভিদের খবরের কাগজ পড়ছিলেন, তিনি বলে
উঠলেন—আঃ বাঁচা গেল, ইনক্লুয়েশ্বটা তাহলে গেল এতদিনে।

চকিতের মত তাঁর দিকে চাইতে তিনি কাগজখানা আমার সামনে
থেরে আবার বললেন—এই দেখুন মশাই, কাল মোটে একটা মরেছে।
এইবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

ধীরে ধীরে আমার হাতখানা নিয়ে সতীশ শুধু তাঁর হাতের মধ্যে
চেপে ধরল।

কাঁপ দিয়ে পরক্ষণেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

প্রবোধ ঘোষ।

ঝিলে জঙ্গলে শীকার ।

—*—

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ ।

স্মেহের অলকা কল্যাণ,

মধ্যপ্রদেশের সৌমাত্রে আমারি পরিচিত কোন স্থানে, পার্শ্ববর্তী প্রদেশ হতে একটি ব্যায় উপস্থিত হয়ে সপ্তাহ ভিত্তিকের মধ্যে অনেকগুলি নরনারী হত্যা করেছে, এই সংবাদ পেলাম । সোকজনে ভারী ভয় পেয়ে গেল, পাহাড়ে অঙ্গলে তামের কাঠভাঙ্গ, ফল কুড়িয়ে আনা, একরকম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই হয় । নিজে অলঙ্ক্য থেকে শীকার ধরবার পক্ষে সেই ব্যাক্রিটির বিশেষ সুবিধাজনক, অনেকগুলি জায়গা জুটেছিল । যে পথ বেয়ে গন্তব্য গাড়ীর সারি ঘুরে ঘুরে আসে সেইখানে লুকিয়ে বসে তিনি অনেক বলি সংগ্রহ করেছেন শুনলাম । তিনি বাধিনী হলেও শীকারী কম ছিলেন না, গাই বলদ ছাগল ভেড়া সবই উজ্জাড় করছিলেন । স্থানীয় শীকারী তাকে মারবার বেশ একটি সুযোগ পেয়েছিল, সঙ্কেয়বেলায় সে তখন মৃত গরুটি ভক্ষণের চেষ্টায় ফিরছিল, কিন্তু বেচারা শিকারীর কাছে যে কার্টুস (cartridge) ছিল তাতে আওয়াজ ছয় নি, বাধিনী সেই যে চম্কে পলায়ন দিলে, আমরণ সে আর প্রলোভনে ভোলে নি বা ফাঁদে পা বাড়ায় নি ! কাজের শিকলে আমরা যেমন বাঁধা, তাতে স্বাধীনভাবে আনন্দের স্ফুরনে যাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ

নয়, যদিও একথা বড় একটা কেউ বিশ্বাস কৱতে চাইবে না জানি, কেননা আইন ব্যবসায়ের নাম স্বাধীন-ব্যবসা। সে যাই হোক ব্যবসায়জীবীর জীবন স্বাধীন নয়, কেননা তিনি মক্কলের কাছে বাঁধা। যার পয়সা থান, তার কাজ না বাজিয়ে, তাঁর আর কোন দিকে মনোযোগ কৱবার সুযোগ হয় না। আমি মাঝে মাঝেই কাজের মধ্যেই খেলার সুযোগ কৱে নি, তাতে অনেক অসুবিধা ভোগ কৱতে হয়, গাঁটের কড়িও মন্দ থৱচ হয় না (আর একথা আগে হতেই বলে রাখা ভাল, এ বস্তুর প্রাচুর্য আমার বড় একটা নেই)। থলির অর্থ আর দেহের সামর্থ্য যথেষ্ট ব্যয় কৱে মফঃস্বলে মামলা কৱতে গিয়ে সপ্তাহান্তে ষে দুদিন কাছাকাছি বন্ধ থাকে আমি সেই অবসরে দু' একবার শিকারের ঘোড় কৱেছি। মনিব্যাগ থালি হয়েছে বটে কিন্তু শীকারের খোলায় বাষ ভৱেছি। একবার একজন জজ মজা কৱে আমায় বলেছিলেন মফঃস্বলে আমার দুই শীকারই জ্বোটে—এক মক্কল, দ্বিতীয় বাষ। তাঁর বোধ হয় মনে হয়েছিল, পূর্বাণ ব্যাধির মত এ দুটোই আমায় পেঁয়ে বসেছে। আমি যখন প্রথম ব্যারিষ্টারী ব্যবসা আস্ত কৱি তখন আমার দু'একজন হিতৈষী মক্কলদের বোঝাবার চেষ্টা কৱেছিলেন আইনের চেয়ে শীকারেই আমার বুক্তিটা খেলে ভাল। ষে সব মানুষের শীকার-বাতিক আছে, ইংরাজ তাদের প্রতি একটু পক্ষপাতী। ছুটির সম্বন্ধে মফঃস্বলের কাছাকাছির চেয়ে হাইকোর্টে আমাদের ভাগ্য ভাল, সেখানকাৰ মত চাঁদ দেখে এখানে মুসলমান পৱনের ছুটি হয় না আৱ তা ছাড়া সৎ খণ্টানের মত তাঁৰা একদিন ছেড়ে দুদিন কৰ্তব্য বোধে সম্পূর্ণ বিশ্রাম কৱে থাকেন। সেবারে দোলের সময় এই সূত্রে আৱো দিন কত বেশি ছুটি পাওয়া গিয়েছিল।

ভবে এই সব অন্নদিনের ছুটির মুক্তি এই যে, আপনাকে একেবারে
ছেড়ে দেওয়া চলে না, মনের মধ্যে কাজের ফাঁসটা টানাই থাকে,
বেশ হাত পা ছড়িয়ে কিছু করা ঘটে না।

শীকারের লোভে K. G. B. পথের ধারে একটা ছেশনে এসে,
আমার সজ ধরলেন। রাত্তুপুরে আমরা গিয়ে পৌছলাম, আর
বাদের উপরে তত্ত্বাবধানের ভার ছিল তারা পোটলা পুঁটলি সম্যেত
আমাদের থানায় নিয়ে তুললেন। এমন নিরাপদ স্থানে আমাদের
প্রথম আর সবেমাত্র রাত্রিবাস। লোহার গরাদে-দেওয়া বারান্দাটি
স্থান-মাহাত্ম্য প্রচার করছিল। আমরা সেখানে গিয়ে পৌছবার পর,
একজন হাসতে হাসতে কোথায় এসেছি, সে কথা আমাদের জানালেন।
শুনে আমার বক্সুর যে হাসির ফোয়ারা ছুটল তা আর বক্স হ'তেই
চায় না। তার যেন হাসির হিট্টিরিয়া হয়ে পড়ল, আমি তাকে
বোঝালাম —

Stone walls do not a prison make,
Nor iron bars a cage.

কারাগার হলেও নির্দোষী আমাদের কাছে সেটি শাস্তি আশ্রিতপদ
বলেই মনে হয়েছিল।

তোর হ'তে না হ'তে আমরা রাজকীয় সমারোহে যাত্রা করলাম।
প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর আধুনিক রুথ, কিছুক্ষণ পরে ব্রিটিশরাজের
একজন প্রহরী আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করলে। আমাদের
অভ্যর্থনার জন্যে ঘোড়ায় চড়ে সে দশ ক্রেশ পথ এসেছিল। এর
কিন্তু এরি মত লোকের হাত এড়িয়ে যাওয়া বড় সহজ কথা নয়।

তবু মনে করলাম আবার যদি এ পথে আসি, তবে যেন শীকারের স্থবর্দ্ধে বস্ত্রের জন্যে এম্বি কারো হস্তগত হ'বার সৌভাগ্য আমার ঘটে। অতঃপর ইন্তিপৃষ্ঠে কয়েক মাইল যাবার পরই আমরা শিবিরে গিয়ে পেঁচলাম। এর আগেই শীকার সন্ধানে লোক জড় করে চারিদিকে পাঠান হয়েছিল। শৈলমালাবেষ্টিত যে স্থানটিতে আমাদের শিবির সংস্থান হয়েছিল, সে যেন এক স্বপ্ন-রাজ্য। গোধূলির শ্যামচ্ছায়ায়, পাদপরাজি আচ্ছাদিত বনভূমি যখন স্লিপ অঙ্ককারে আবৃত হয়ে এল, তখন চারিদিক হতে সাম্বর মৃগের ঘণ্টাধ্বনির মত আহ্বান রূপ, বারম্বার আমরা শুনতে পেলাম। সে যেন বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরতির মঙ্গল বাঢ়।

বাধিনী সম্বন্ধে যে সংবাদ আমরা জানলাম, সে হচ্ছে পাঁচ ছয় দিনের বাসি থবর, আমার বক্তু সেটা স্বিধার কথা মনে করেন নি, আমার কিন্তু তার উল্টোটাই মনে এল। তবু উৎসাহের গায়ে এমন শীতল প্রলেপ বাঞ্ছনীয় নয়, তা স্বীকার করাই ভাল। যাই হোক প্রভাতেই ভাগ্যলক্ষ্মী স্বপ্নসন্ধি হলেন, তাঁর হাসিমুখ দেখে আমাদের মুখও হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সংবাদ এল, সূর্যোদয়ের শুভলগ্নে থানিক দূরে বাধিনী একটি স্ত্রীলোককে তোগে লাগাবার উদ্দেশ করছিল, পারেনি, সে কোন রকমে একটা পাথরের স্তূপের আড়ালে গাঁ ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেছে। নিরাশ হয়ে ব্যাস্তী একটি নালার মধ্য দিয়ে অন্ত পথে যাত্রা করেছে। নালার পাশের ভিজে বালিতে তাঁর পায়ের টাট্কা চিহ্ন খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, আর বনের মধ্যে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকবার জন্যে যে পথে চলে গিয়েছে, সেখানেও তাঁর পায়ে হতে ঝরে-পড়া বালি আর কাদার দাগ পরিষ্কার মেখা যাচ্ছে। নালার

পাড়ে লাফিয়ে উঠে যেখানে সে পাহাড়ে চড়েছে সেইখান হতেই তাকে অচুসরণ করে যাওয়া কঠিন হয়েছিল, কোথাও গড়িয়ে-পড়া একধণ্ড পাথর, কোথাও বা পায়ের চাপে মুচড়ে-পড়া স্বরূপার লতা গুল্ম, কোথাও বা বিছিন্ন বিক্ষিপ্ত তৃণগুচ্ছ, এই দেখেই পথ আবিক্ষার করে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সহর অগ্রসর হওয়া ঘটে ওঠে নি, কেননা স্থির নিশ্চয় না হয়ে, পা বাড়ান আমরা যুক্তি-সিদ্ধ মনে করি নি। দিনের আলোতে পাহাড়ের নিরাপদ আশ্রমটি ছেড়ে সে অধিক দূরে অগ্রসর হবে না জেনে নিঃশব্দ ধীর পদক্ষেপে আবার আমরা নালার কাছে ফিরে এলাম। নালার কাছে পলায়নের তিনটি ঘাট, তার দুটি ভিন্ন পথ ছিল। শেষের পথ দুটি নালা হতে পাহাড়ের দিকে গিয়েছিল। ঘাট তিনটি একজন লোকেই পাহারা দিতে পারে।

আধ মাইল দূর হতে বাঘকে তাড়া দিয়ে আনবার বন্দোবস্ত করা হল। আমি আট ফুট উঁচু একটি পাথরের উপর উঠে আমার বসবার মোড়াটি এমন জায়গায় রাখিলাম, যেখান হতে তিনটি ঘাটই আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার ডাইনে ও সম্মুখে আরো দুটি পাথরের টিবি, আর গুটিকত গাছও ছিল। ঘাটের পথ চেয়ে দু'চারিটি সরু গলি, এরি মাঝ দিয়ে চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। আমি পাথরের উপরে মোড়া পেতে বসেছিলাম। তার উপরে গুটিকত গাছ ছিল। গাছের ডালগুলি এম্বিভাবে নামিয়ে দিয়েছিলাম যাতে করে আমি আড়ালে থাকতে পারি, অথচ চারিদিক দেখবার কি বন্দুক চালাবার কোন অনুবিধা না ঘটে। কত সামান্য আড়াল হলেই যে লুকোবার স্ববিধা হয়, শীকার তোমার পাশ দিয়ে অসন্দিঙ্গ ভাবে চলে যায়, তোমায় দেখতে পায় না, সে কথা সহজে বিশ্বাস হয় না : মানুষের গন্ধ হয়ত

বা পায় কিন্তু বেলা বাড়তে আরম্ভ করলে সে গঙ্গাও কম হয়ে আসে। আর তুমি যদি চুপচাপ বসে থাক, তাহলে সেদিকে মনোযোগ আকৃষ্ণ হবার, ধৰা পড়বার সম্ভাবনা বড় একটা থাকে না। প্রকাণ্ড একটা হিংস্র জন্ম পাশ দিয়ে যখন চলে যায় তখন স্থির হয়ে থাক। কঠিন কাজ কিন্তু অভ্যাস ও সাধনার বলে, শীকারীর মজ্জাপেশী ক্রমে ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়ে উঠে তখন কোথাও আর এতটুকু কাপে না কি নড়ে না। আমি যে জায়গাটি পছন্দ করে নিয়েছিলাম সেখান হতে চারিদিকে গাছপালা আর গলি ঘুঁজির জন্মে হাত বিশেক তফাতে গুলি করাটা তেমন নিরাপদ ছিল না। সেখানে আমার ডানে হতে পাহাড়টা গড়িয়ে নালার দিকে নেমে গিয়েছিল। K. G. B.-কে ছিলেন একখানি ছোট খাটিয়া মাচান করে বেঁধে দেওয়া অন্য একটি পাহাড়ার জায়গা, সেইখানকার একজন গেঁটিয়া তাঁর সঙ্গে ছিল—চট করে গাছে চড়ে পড়বার ক্ষমতা তার অন্তর্ভুক্ত। আর তা ছাড়া স্থান যতই সঙ্কীর্ণ হোক না, সে তারি মধ্যে অবলৌলাক্রমে আপন ঘুরবার ফিরবার স্থিতি করে নিত, কোন ব্রহ্মে আড়ষ্ট হ'ত না। এই চতুর লোকটির তা ছাড়া বন্দুকের তাকও ছিল ভাল।

প্রায় ঘণ্টা ধানেক প্রতীক্ষার পর, তবে বনের মধ্যে হতে যে সব শীকারীরা বায় তাড়া করে আনছিল, তাদের সোরগোল শোনা গেল, আরো কিছুক্ষণ সময় যাবার পর আদের মধ্যে জনকয়েককে পাহাড়ের মাথার উপর দেখতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যেই দেখলাম পৃষ্ঠাজী একটি ব্যাঘ দ্বরিত গমনে নালার মধ্য-ঘাট পার হয়ে আসছে, নিমেষের জন্মে সে প্রস্তরস্তুপের ব্যবধানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল—পর মুহূর্তেই তার মন্ত্রক আর গীবাদেশ দৃষ্টিগোচর হবা মাত্রই আমি তার স্বক্ষদেশ

লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লাম। সে আমার বাঁয়ে দশ গজ দূরে ছিল। আমার বন্দুক তুলতে সামান্য কি একটু শব্দ হয়েছিল, তাতেই সে ঘাড় ফিরলে, গুলি তার কাণের মধ্যে দিয়ে ঘাড়ে গিয়ে লাগল তৎক্ষণাত্মে সে ধূলিলুক্ষিত হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় গুলি মারবার জন্যে আমি প্রস্তুত হচ্ছিলাম, কিন্তু যখন দেখলাম সে আর নড়চড় করল না, তখন বন্দুকের যে নল থালি হয়ে গিয়েছিল সেইটি আবার পুরে কি ঘটে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। শীকারীরা কয়জন পাহাড়ের মাঝা হতে একটু নেমে আমার ডাইনের দিকে আর বাকী কয়জন সম্মুখে কিছু দূরে সঁর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ মৃগয়াভিনয়ের যন্ত্রিকা পতন না হয়, ততক্ষণ এ সান্ধানতার বিশেষ আবশ্যিক। জয়গর্বের উৎসুক আমি আবশ্যিক হয়ে থাকতে পারলাম না, সক্ষেত্রসূচক বাঁশিটি বাজিয়ে দিলাম, তখনই চারিদিক হতে জয় জয় শব্দে মহাকোলাহলে সকলে সে সক্ষেত্রে অভ্যর্থনা করল। K. G. B. আর গোঁটিয়া দুজনেই আমার কাছাকাছি ছিলেন, সবাই এসে ঘিরে দাঁড়িয়ে ব্যাস্ত-রাজ-পত্নীর রাজ-যোগ্য অঙ্গছেদ আর বরাঙ্গের প্রশংসা করতে লাগলেন। পাহাড়ের মাঝার উপর যে সব শীকারীরা ছিল তাদেরি মধ্যে জন কয়েক সময় মত এসে পৌঁছতে পারে নি, সেই সঙ্গে স্থান হতে নেমে আসবার জন্যে তারা ব্যাকুল অর্থচ ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল। এই খানেই ২ৱা সেপ্টেম্বরের ভল্লুক-বিভাট ঘটেছিল, সে কথাতো তোমরা আগেই শুনেছ।

অবিলম্বে বাঘিনীকে এক পর্যাক্ষে, ভল্লুকটিকে অপর একটিতে শয়া রচনা করে দিয়ে বাহকেরা সমারোহে শোভাযাত্রা করল, আমি আর K. G. B. গজারোহণে আর সেই গোঁটিয়া গজ-রাজের পুঁজ দেশে

লম্বমান হয়ে, তাদের অনুসরণ করলাম। পথে গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গ নিলে, মহানন্দে তারা ঢাক ঢোল বাজিয়ে চল্ল। বাত্তের সঙ্গে নৃত্যও বাদ যায় নি, সংহারকপিণী শার্দুল-বধুর মৃত্যুতে তাদের আনন্দের আর ধরে না। কাছে দেখলাম বাঘিনীটি কুশোদরী তার চামড়াখানি বড়ই সুন্দর। আমার এবারের হোলির উৎসব বনের মধ্যে, নরথাদক ব্যাস্ত্রের তপ্ত রক্তের আবীর কুকুমে সুসম্পন্ন হল।

আমরা অবিলম্বে এ শুভসংবাদ দশ ক্রোশ দূরের তার আপিসের সাহায্যে বাড়ীতে, আমাদের নিমন্ত্রণ কর্তাকে আর আর মহামুভূব বঙ্কুদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। সন্দেশ-বাহকই আবার সেগুলির উক্তরও নিয়ে এল, তবে বাড়ী আর আমার কুতঙ্গ নিমন্ত্রণ কর্তার কাছ হতে যে আস্তরিক সহামুভূতি পূর্ণ অভিবাদন পেয়েছিলাম, এমন আর কেউ করে নি।

শীকার করে এমন সুন্দর বাঘছাল যদি লাভ হয়- তবে তাকে বুক্ষা করবার জন্মে বিশেষ যত্ন বিতে হয়। আমরা প্রসিক চৰ্ম শোধনকারী Messrs Rowland Word-এর বরাবর এ চামড়া লণ্ঠন সহরে পাঠিয়ে দিলাম। তখন জর্মানদের অনুগ্রহে আহীজ ডুবির অস্তুব ছিল না। এর আগে, আর পরে, যে সব পার্শ্বে পাঠিয়ে ছিলাম সবগুলিরই পৌছ সংবাদ যথাসময়ে আমার হস্তগত হ'ল, কিন্তু অনেকদিন কোন সংবাদ না। পাবার পর হৃদয় বিনারক সংবাদ এল শক্রপক্ষের বিরুদ্ধাচরণে পার্শ্বে হারিয়ে গিয়েছে। হায়, এমন বিজয় আনন্দের পরিণাম এই শোকাবহ ব্যাপার! এ ক্ষতিপূরণ হবার উপায় ছিল না—হৃণ পাশবত্তাই এই ক্ষতির মূল কারণ!

ক্ষমণ—

ডিমোক্রাসি।

—::—

আজকের দিনে লোকের সঙ্গে কথাই কও আৱ খবৱেৱ কাগজই
পড়ো, কানে আসবে ও চোখে পড়বে শুধু একই কথা—ডিমোক্রাসি।
এই কথাটা আমাদেৱ মনকে এমনি পেয়ে বসেছে যে সেখানে অস্ত
কোনও ভাবনা চিন্তাৰ আৱ স্থান নেই—অবশ্য এক পেটেৱ ভাবনা
চাড়। অথচ দেখতে পাই ও-কথাটাৰ অৰ্থ প্ৰায় কেউ বোৰেন না।
আমাদেৱ বৌৱ অনসাধাৱণ ও আমাদেৱ পলিটিকাল বাক্যবাচীশৰো
এ বিষয়ে সমান অজ্ঞ। এ অবস্থায় কথাটা যে-দেশ থেকে এসেছে
সে-দেশেৱ দু'চাৰথানা বই একটু নাড়। চাড়া কৱা গেল—কথাটাৰ যথাৰ্থ
মানে বোৰবাৱ জন্মে। এই রাজনৈতিক সাহিত্যালোচনাৰ ফল এই
প্ৰক্ৰিয়ে লিপিবদ্ধ কৰছি। বলা যাছিল্য যা লিখছি তাৱ ঠিক নাম
হচ্ছে “নোট”।

(২)

প্ৰথমত মৰ্লি সাহেবেৱ Compromise-খানা আৰাৱ পড়লুম।
আমাদেৱ দেশে একদল লোক আছেন যাঁৱা সাংসাৱিক অভিজ্ঞতাৱ
দোহাই দিয়ে বুকিৰ গোড়ায় কলম চালান। কৰ্মেৱ পথ সৱল নয়, অতএব
বুকি খুঁড়িয়ে চলুক—এই তাঁদেৱ উপদেশ। সন্তুষ্ণনীয়তাৱ রাশ মেনে
চলতেই হবে, তা না হলে অতিবুকি গলায় এবং পায়ে দড়ি জড়িয়ে

খানায় পড়বে—খানায়-পড়া অবস্থা যখন সর্বিবাদী নিষ্ঠনীয় তখন গোড়া থেকে বুদ্ধিকে ধীর কদমে চালানই শ্রেণ। কিন্তু তাড়ির মাদকতা ময়দার মতন নিজীব এবং নিরেট পদার্থের পক্ষে ঝটাতে পরিণত হবার জন্য যেমন দরকারী, তেমনই ভাবরাজ্য বুদ্ধির সাহসিকতা, উৎজেনা এবং সূক্ষ্মতা নিরেট ঘটনাবলীকে সজীব করবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন—অন্তত এই ত ইতিহাসের শিক্ষা। ভল্টেয়ার, রুশো, ডিডেরোকে বাদ দিয়ে ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস-চর্চা যা, হামলেটকে বাদ দিয়ে হামলেট অভিনয় করাও তাই। ভাব এবং কর্ষের ঘটকালীতে মর্লি সাহেবের বিধান নেওয়াই বিধেয়, কেননা তিনি নিজে একজন কর্মবীর। তাঁর মত এই যে, বুদ্ধির বন্ধুর পথে সাহসে ভর করে চলাই উচিত, কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক জড়ত্বার ফলে ভাবের দুর্দিমনীয়তা সহজেই মন্ত্রগতিতে দাঁড়াবে। ভাব যদি প্রথম থেকেই সন্তবের কাছে মাথা মৌচু করে তাহলে না-হয় বুদ্ধির বিকাশ, না-হয় ভাবের প্রকাশ।

এখন স্মার্টের কথা যদি সত্য হয় তাহলে মানতে হবে যে, বর্তমান ভাবতে প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের কাঁধে একটা বিশেষ রকমের দায়ীহ এসেছে—বিশেষত বাঙালীর, সে হচ্ছে বুদ্ধিরভিকে খাটোনোর দায়। তবে বাঙালীর নামে আগে থেকেই বদনাম রয়েছে যে, তারা কুচ্ছকাম্কা নেহি। আমি বলি এ নিন্দা অনর্থক, কেননা আমার বিশ্বাস যে পৃথিবীতে কাজের লোকের অভাব নেই, অভাব আছে শুধু মাথা ঘামাবার লোকেরই। আর সেই অভাব যখন বাংলাদেশ প্রায় সব ক্ষেত্রেই পূরণ করেছে তখন রাজনীতির ক্ষেত্রেও করবে। আমার দুঃখ এই যে আমরা পূর্বে ঐ অভাব পূরণ করেছি কোন দায়ীহ বোধে নয়। কি সাহিত্য,

কি ধর্মে,, কি বিজ্ঞানে দায়ীভুত্তান নয়, প্রত্তিম তাড়নাই আমাদের ভাবের গতি নিরূপণ করে দিয়ে থাকে। এক রাজনীতির ক্ষেত্রেই, আমরা মনের খেয়াল অপেক্ষা নিষেদের কর্ম ক্ষমতা, চরিত্রবল একাগ্রতা প্রত্তি গুণের উপর বেশি নির্ভর করি, কেননা কি সাহিত্য কি ধর্ম স্বীয় চেষ্টায় তত গড়ে তোলা যায় না, যত যায় রাজ-নৌতি ও সমাজ-নৌতি। এই হচ্ছে অগত্যের নিয়ম। কিন্তু সব বিষয়েই আমরা স্থিত-ছাড়া, তা না হলে একই গলায় একই ক্ষেত্রে ডিমোক্রাসি এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি-নির্বাচনের জন্য আবেদন করতুম না। Mill এবং Comte সমাজ-সংস্কারে সাধারণ মানুষের বুদ্ধির জড়তা দেখে ভগমনোরথ হয়েছিলেন, সেই জন্য লোকের জড়-বুদ্ধির মূলে তাঁরা কুঠারাঘাত করলেন—নব্যন্ত্যায় লিখে। আমাদের দেশে দেখছি যুক্তির সাহায্যে জ্ঞানের পথ মুক্ত রাখতে কেউ ব্যস্ত নন, তাই বৌরবলের কথা হচ্ছে ‘এখন ভিক্ষের ঝুলি টাঙ্গিয়ে রেখে বুদ্ধি চালনা করা যাক। আপে পথ-বিচার করা হোক, না-হলে উন্নৃত্ব হয়ে যাব’।

(৩)

ধরা যাক ডিমোক্রাসি কথাটা। আমাদের ধারণা ও-একটা ধর্ম, নৃনকলে একটা মহৎ-আদর্শ। কল্পনার যাদুতে যাই ভাবা যাক না কেন, ওটা আসলে অনেক রকম শাসন-প্রণালীর মধ্যে একটা বিশেষ প্রণালী মাত্র। আমাদের দেশ-নায়কেরা কিন্তু এ কথাটি না বুঝে ও-বস্তুকে ধর্ম হিসেবে ধরে নিয়েছেন, তাই তাঁদের প্রত্যেক বস্তুতায় ভিক্ষার চাল কাঢ়া কি আ-কাঢ়া, ঠিক করা হয় ঐ আদর্শের

চালুনৌ দিয়ে। আমরা যদি ডিমোক্রাসিকে শাসন-প্রণালী হিসেবেই ধরি তাহলে চুইটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে। প্রথমত ডিমোক্রাসি আমাদের সামাজিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় কি না? দ্বিতীয়ত আমাদের ভিক্ষা-পত্রের দফাগুলির সঙ্গে ডিমোক্রাসির বোল আমা মিল আছে কি না?

(৪)

স্বরাজের কোন জীবন্ত ধারা বর্তমান না থাকলেও স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের দেশে নতুন নয়। তারপর এই যুক্তের কৃপায়, ইংরাজ-শাসন এবং শিক্ষার ফলে, পৃথিবীর রাজকীয় সমস্তার সঙ্গে আমরা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি যে আমাদের চলতে গেলেই বিশ্বমানবের সাথে এক পথেই সমান পা-ফেলে হাঁটতে হবে, অতএব প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে “হাঁ, ডিমোক্রাসি আমাদের চাই”। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

সাধারণ-তন্ত্র যে জনসাধারণের এত প্রিয় হয়ে উঠেছে, তার কারণ এই যে পূর্ববর্তন শাসন-প্রণালীর ভিত্তি অপেক্ষা এর ভিত্তি চের বেশি পাকা। পুরাকালে রাজ্যের ভিত্তি ছিল রাজাৰ শুণ, এখনকার ভিত্তি লোকেৰ সংখ্যা। রাজ্যতন্ত্ৰের ইতিহাস আলোচনা কৱলে বোৰা যায় যে, এক Federation ছাড়া Aristotle এ বিষয়ে যে তৰ নিৰূপণ কৱে পেছেন তা সন্তুতন। তাঁৰ মতে প্রথমে থাকে একেৱ রাজ্য, সেই এক রাজা বৰ্ধন স্বার্থ-সঙ্কানে বাস্তু হয়ে প্ৰজাৰ হিত-সাধনে কুষ্টিত হন, তখন তাঁৰ সভাপ্ত সন্তোষ পাত্ৰমিত্ৰেৰ মল নিজেদেৱ হাতে রাজ্য-শাসনেৰ ভাৱে অহং কৱেন তখন হয় অনেকেৰ প্ৰভূত। সেই বহু আবাৰ বৰ্ধন এক

গোষ্ঠীতে আবক্ষ হয়ে গণ-হিত ভুলে গিয়ে নিজেদের প্রভুত্ব রক্ষণে তৎপর হয়ে ওঠেন তখন একজন শক্তিশালী পুরুষ জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে নিজে tyrant হয়ে বসেন। তাঁরও পরোপকার বৃক্ষি যখন বংশ পরম্পরার কাছে হার মানে তখন জন-সাধারণ তাদের লুপ্ত ক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে কৃষ্টা বোধ করে না। কিন্তু কিছুকাল পরেই যখন দেখা যায় যে সাধারণের বুদ্ধি কোন অ-সাধারণ সমস্তার স্থচারু-রূপে সমাধান করতে পারে না, তখন একজন মূল-গায়েন এই গোলে-হরিবোল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ান বীরগবে। আবার একের প্রভুত্ব স্থৱ হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে বীরের আসর নেই, মূল-গায়েন আর বংশ-পরম্পরায় অবতীর্ণ হতে পারেন না। তাই সভ্যজগৎ আজকাল বহুর উপর আস্থা স্থাপন করেই নিশ্চিন্ত হয়েছে। তবে রাজ্য-শাসনের জন্য বিশেষ দরকার বলে কাজের ভার একদল বিশেষজ্ঞের উপর স্থুত হয়েছে যারা সাধারণের কাছে নিজেদের কার্য্যাবলীর জন্য জবাব-দিহি করতে বাধ্য। এরি নাম গণ-তন্ত্র।

(৫)

অন্তঃপর দাঁড়াল এই যে ডিমোক্রাসি একটি শাসন প্রণালী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এ বাপার সংখ্যামূলক। জন-সাধারণের ভিতর অবশ্য ভাল মন্দ সব প্রকৃতিরই লোক আছে, তবুও সাধারণ লোকের বুদ্ধির সমষ্টি অনকয়েকের অসাধারণ বুদ্ধির অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে বেশি বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু যেকালে রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞের আবশ্যক আছে তখন আদের

পরিচয় অন্মের দলিলের বদলে কর্ষ্ণের দলিল হতেই নেওয়া শ্রেণি। এদের কার্য্যকারিতার বিচারক হবে অবশ্য জন-সাধারণ।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে, এই শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য কি অন্য শাসন-প্রণালীর উদ্দেশ্য হতে বিভিন্ন? সকলেরই উদ্দেশ্য ত প্রজার মঙ্গল। তবে মঙ্গল কথাটার মানে একেকে একটু স্বতন্ত্র। আগে ছিল যাঁদের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার তাঁরা যখন বেশি বোঝেন তখন তাঁদের মতে যা মঙ্গল তাই মঙ্গল। এখন এর মানে হচ্ছে প্রজার নিজের মতে যা মঙ্গল তাই মঙ্গল। যুরোপে যেদিন থেকে পোপ আর জার্মান-সম্রাটের ঝগড়া বাধল সেই দিন থেকেই লোক-বাস্তুকী মাথা নাড়া দিয়ে নিজের সজীবতার পরিচয় দিলে—কুলীন-তন্ত্রের আসন টল্ল। Humanism-এর শিক্ষা যখন Erasmus, Oolet, Abelard প্রভৃতি দেশময় ছড়িয়ে দিলেন, যখন renaissance-এর প্রসাদে মানুষের আত্মপূজার আরতি বেজে উঠল, যখন Martin Luther ধর্মক্ষেত্রে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করলেন, অবশেষে যখন বিজ্ঞানের শিক্ষা লোকায়ত হল তখন মানুষ নিজের পাস্তে দাঁড়াতে শিখলে। এই শুভ ঘূহুর্ণে ফরাসী-বিপ্লবের বৌজ অঙ্কুরিত হল—সেই বিপ্লবের তন্ত্রধারকেরা দেখিয়ে দিলেন যে এক গণ-তন্ত্রেই মানুষ ব্যক্তিগত হিসাবে নিজের আনন্দে নিজের প্রকৃতির সব কলিকুলো ফোটাতে পারে, যা পূর্ব-শাসনতন্ত্রে একেবারে অসম্ভব ছিল।

কিন্তু গোষ্ঠী-ধর্ম পুরাতন বলেই যে বাতিল হয়ে গেল তা নয়। তাই নতুন অবস্থায় পড়ে গোষ্ঠী-ভাব জাতীয়-ভাবে পরিণত হল। Idea of Democracy রাজ্যতন্ত্রে রূপান্তর ঘটালে। কিন্তু রূপান্তরিত জাতীয়-ভাবের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য হল একটি

তৃতীয় উপায়ে। চিরকালই রাজা তাঁর সভাসদ আমীর-ওমরাওয়ের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতেন—কিন্তু বেশির ভাগ সময়ে শুধু বিপদ্কালেহ্যপন্থিতে। সন্ত্রাস্তবন্দের পক্ষে রাজার প্রসাদ প্রজাহিতের চেয়ে বেশি ফলদায়ী, তাই তাঁদের দ্বারা জাতির যা অঙ্গ-সাধন হত তা কেবল পেটের দায়ে। ইউরোপের কোন কোন রাজ্যে একটি ব্যবস্থাপক সভা ছিল যেখানে রাজার আত্মীয় স্বজন পার্শ্বের অনুচরবর্গ ছাড়া একটি জমিদারের দল, একটি পুরোহিতের দল এবং রাজ-কর্মচারী দ্বারা নির্বাচিত সাধারণ-দলের প্রতিনিধিরা আহুত হতেন রাজাকে সৎ পরামর্শ দেবার অন্ত। ইংলণ্ডে প্রথম তিন দল একত্র হয়ে এক সভায় সেই দিন থেকে বসতে আরম্ভ করলেন যেদিন John-এর দুর্বুক্তিতার ফলে ইংলণ্ডের সঙ্গে Normandy-র ঘোপ-সূত্র ছিন্ন হল। আর সাধারণ দল বসলেন অন্তর্ভুক্ত কিন্তু দুই দলের মধ্যে একটা যোগাযোগ রয়েছে। ইংলণ্ডে এইরূপে এক জাতীয়তা এবং সেই জাতীয়তার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সামঞ্জস্য রক্ষা হল। ফরাসী দেশে তিন দল আলাদা represented হত। কিন্তু চতুর্দশ লুই এবং পঞ্চদশ লুই এই সভার উপরে উপেক্ষা করে নিজেরাই শাসন কার্য সমাধা করতেন। কিন্তু ষোড়শ লুই এর রাজকোষ শূন্য হলে তিনি আবার এই ব্যবস্থাপক সভা ডাকতে বাধ্য হলেন প্রজার কাছ থেকে পয়সা আদায় করবার অন্ত। প্রশ্ন উঠল এই যে, তিন দল আলাদা আলাদা না একত্রে ভোট দেবে। রাজার মৎস্য আলাদা, প্রজার মৎস্য একত্রে, ফলে ঘটল ফরাসী-বিপ্লব। সেই বিপ্লবে জমিদারের দল কেউ বা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, কেউ বা বাণিজ্যে মন দিলেন। সেই থেকে Separate representation of class-interests-এর পরমায় শেষ হল। বর্তমান কালে

ইটালীয় রাষ্ট্রীয় জীবনের ধারা ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের নকল বলে
অভ্যন্তি হয়ে না।

১৮৫০ সাল থেকে প্রসিয়া, সেক্সনি এবং অগ্রান্ত জার্স্যাণ Municipality-তে ভোটারগণ তাদের টেক্স দেবার ক্ষমতা অনুসারে তিন
ভাগে বিভক্ত হত। অঙ্গিয়াতে কিছুদিন আগে পর্যন্তও লোক সমাজকে
পাঁচ ভাগে ভাগ করা হত—জমিদার, সহরবাসী ব্যবসায়ী, গ্রাম-সভা
এবং অন-সাধারণ। হাঙ্গেরি দেশে Table of magnates-এ শুধু
বড় লোকেরাই বসতে পেতেন। কিন্তু গত যুক্তের ধাক্কায় এই
রাজ্যগুলো ধূলিসাং হয়েছে, নতুন শাসন-প্রণালী যা অবলম্বিত হল
তার বিশেষত এই যে সমগ্র জাতিই হচ্ছে একটি সম্প্রদায়। বীরবলের
মতে গত যুক্তে ব্যক্তি-তন্ত্রের অগ্রি পরীক্ষা হয়েছে এবং তিনি ১৯১৪
সালে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ফলেছে। ডিমোক্রাটিক
জাতিরাই অয়স্ক হয়েছে, আর পরামিত জাতিরা ডিমোক্রাসি
অবলম্বন করেছে। তাঁর কথা যেকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে
তখন তাঁরাই মতানুসারে যে সব জাতির জীবন ব্যক্তি-তন্ত্রের উপর
গঠিত তাদের ইতিহাস হতে রাজনীতির মূলতন্ত্রের সন্ধান নেওয়া উচিত
—বিশেষত যখন বাকী যুরোপের জীবন তাদেরাই ধারায় প্রবাহিত
হচ্ছে। তাহলে দেখা গেল যে, কি ইংলণ্ড কি ফ্রান্স কি ইটালী
এমন কি আর্মাণী, অঙ্গিয়াতেও (রুশিয়ার কথা ছেড়ে দিয়ে)
যেকালে এ রূপ ঘরের ভিতর থেকে করা খোকামৌর পরিচয়
এবং আতীয়তার সর্ববাণ-সাধক বলে পরিগণিত হয়েছে তখন
বর্তমান-ভাবতে স্বায়ত্তশাসনের সূত্রপাতেই আমরা যে নির্বিবাদে
Communal representation-এর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি এই

প্রমাণ যে আমাদের মনে আজও দেশাঞ্চলের ঘোরতর অভাব রয়েছে। আমাদের দেশ-নায়কেরা হ'লে একমত হয়ে আজ বে বিষয়ক রোপণ করলেন তাদের উত্তরাধিকারীদের তার মারাত্মক ফল ভোগ করতে অবশ্যই হবে।

(৬)

তাহলে আমাদের এখন কি কর্তব্য ? ভাগ্যক্রমে ভোটের ব্যবস্থা স্থির করে প্রাদেশিক লাট-সাহেবদের মত নিয়ে নতুন ধরণে সভা বসাতে এখনও এক বৎসর। ইতিমধ্যে দেশের দলপতিরা এই সভা প্রচার করুন যে, মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে যুরোপ যখন Separate Communal representation আতীয় ঐক্যের বিরোধী বলে ছেড়ে দিয়েছে তখন আমাদের দেশে যুরোপ এবং আমেরিকা যে-উপায়ে সাম্প্রদায়ীকতার বিকল্পে স্বদেশীয়তা রক্ষা করেছে সেই উপায়ই অবলম্বন করা সঙ্গত। যুরোপের সত্য আমাদের দেশে খাটবে বিশেষত যখন দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশতই হোক যুরোপের রাজনৈতিক শিক্ষান্তর ইংলণ্ডের শিশ্য হয়েই আমরাও রাজনীতির শিক্ষানবিশী করছি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আতির তিনটি বিভাগ আছে। প্রথমত যারা ভোট দেবে তারা এক মল। দ্বিতীয়ত যারা ব্যবস্থাপক সভার কার্য চালাবে তারা আর এক মল এবং যারা ভারী-দলের আনুকূল্যে সাধারণের মত লক্ষ্য করে রাজা-শাসন করবেন অর্থাৎ Executive, তারা হচ্ছেন তৃতীয় মল। কে কি রকম ভাবে ভোট দেবে, কি রকম ভাবে ব্যবস্থাপক সভা গড়া হচ্ছে এবং মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যপক্ষাপক

সভার সম্বন্ধে কি হবে এই তিনি বিষয়ের তথ্যের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ programme নিয়মিত এবং নিরূপিত হওয়া কর্তব্য।

প্রথমেই ভোটের কথা ধরা যাক। ভোট দেৱাৰ অধিকাৰ সম্পত্তি-মূলক কিছু মনুষ্যহ-মূলক, যে মূলকই হোক না ভোট দেৱাৰ বীতি সাধাৱণত দুই রকমেৰ। প্রথমত প্রত্যেক জেলায় প্রতিনিধি স্থানীয় ভোটেৱ ধাৰাই নিৰ্বাচিত হবে—একেই বলে Scrutin d' arron dissement, ভাষাস্তুৱে district system. দ্বিতীয়, প্রতিনিধি ঠিক কৰা হবে একটা সমগ্ৰ প্ৰদেশেৰ ভোট একত্ৰ নিয়ে, এই প্ৰদেশেৰ ভিতৰ অবশ্য অনেক জেলা আছে। যদি দশ অন প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচনেৱ কথা হয়, তাহলে প্রত্যেক ভোটাৱেৰ হাতে একটা লিষ্ট ধাকবে সেই লিষ্টে অন্তত দশ জনেৰ নাম ধাকবে, ভোটাৰ তখন বিচাৰ কৰে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ক্ৰমে গুণানুসাৱে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰে দেবে। যিনি সৰ্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যা ভোট পাবেন তিনিই প্ৰথমে নিৰ্বাচিত হবেন এই রকমে পৱ পৱ দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি। একে বলে Scrutin de liste, ভাষাস্তুৱে General ticket system. এই দু'পক্ষতিৱই দোষ-গুণ আছে এবং দুই পক্ষেই বড় বড় কৌন্সিলী দাঁড়িয়েছেন। ফ্ৰান্সী দেশে Montesquieu, Mirabeau থেকে আৱস্থা কৰে Duguit পৰ্যন্ত; ইংলণ্ডে Lord Brougham থেকে Sidgwick, Balfour; আৰ্মণীতে Bluntschli—এৱা সকলেই বলেন যে আতীয়-জীবনেৰ সমস্ত প্ৰবাহণুলিৱ অবাধ গতিৱ পক্ষে district system ভাল, আবাৰ Robespierre থেকে M. Goblet পৰ্যন্ত সকলেই Scrutin de liste-এৱা পক্ষপাতী। দু'নলেই যখন মহা মহানৱথী রয়েছেন তখন

নিজেরই আলোচনা করে দেখা যাক আমাদের পক্ষে কোনটি ভাল। District method-এর বিপক্ষে এই যুক্তি পেশ করা হয়েছে যে, প্রথমত নির্বাচনের গুণী ছোট হলে অনেক সময় অযোগ্য লোককে ভোট দিতে হয়। দেখা গেছে যে, যে-সব সহরে ward অনুসারে alderman বাছাই হয় সেখানে যুষের জোরে ঘোগ্য থাই পায় না।

তৃতীয়ত এই সব অযোগ্য লোকেরা নিজেদের ছোট গুণীর অভিন্নতা কোন জাতীয় ভাবের ধারণা মনে পোষণ করতে অপারণ। ফ্রান্স এবং ইটালীর ইতিহাসে এই সত্ত্বের ভূমি ভূমি প্রমাণ রয়েছে—ইটালী বুকে স্বরে district method ছেড়ে দিয়েছে। এই বীতিতে যে-সব Deputy পাঠান হয় তারা নিজেদের কেবলমাত্র জেলার প্রতিনিধি হিসেবেই দেখেন, সমগ্র দেশেরও যে তারা প্রতিনিধি এ কথা তারা মনে ভাবতেই পারেন না—সেইজন্য তারা নিজের ভোটারদের খুসী করতে এত ব্যক্ত ধাকেন যে দেশের রাজকার্তা চালাবার কথা তাঁদের মনে ধাকে না। Daudet তাঁর Numa Roumestan বইয়ে এঁদের দুর্দশা করা কথা স্পষ্টাকরে ব্যক্ত করেছেন—কোথায় একটা বাজার বসাতে হবে, কোথায় কার ছেলের চাকরী করে দিতে হবে এই সব কাজ করতে করতে তিনি ভোটারদের বাজার-সরকারে পরিণত হন। District system-এ যে পরিমাণে তোষামুদ্দী এবং যুষের প্রশংসন পায় তার তুলনা কুত্রাপি নেই।

তৃতীয়ত এই উপায়ে শাসকের দল ভোট অনুসারে যে স্থানের যত সংখ্যক প্রতিনিধি হওয়া উচিত তা অপেক্ষা নিজেদের মনোমত বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি হস্তগত করবার অন্য জেলাকে খেয়াল অনুসারে বিভাগ করেন।

এসব গেল বিপক্ষের কথা। স্বপক্ষের কথা হচ্ছে district system-য়ে প্রথমত ভোট দেওয়া সহজ হয়, প্রতিনিধি ভোটারদের পরিচিতেরমধ্যে একজন এবং সেই পরিচয়ের জোরেই তিনি জেলার অভাব দূরীকরণে বেশি উৎপর থাকেন। দ্বিতীয়ত এ উপায়ে যাদের দল সংখ্যায় কম তাঁদের মতেরও যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হয়। সাধারণতন্ত্রের দোষই এই যে মতের গুরুত্ব অনুসারে দলের ভাবীত্ব নির্দ্বারিত হয় না। General ticket system অনুসারে যে-কোনও দল চালাকী করে সব প্রতিনিধিগুলিকেই হস্তগত করতে পারেন—সেইজন্য আমেরিকা ১৮৪২ শ্রীষ্টাব্দ থেকে এই পদ্ধতি ত্যাগ করে district method গ্রহণ করেছেন। চতুর্থত Bradford সাহেবের মতে যে-কালে অশিক্ষিত ভোটারের পক্ষে সুস্থিতাবে ভোটপ্রার্থীদের গুণ বিচার করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা অসম্ভব, জনসাধারণকে সেকালে party-guide-এর হাতে পড়তেই হবে; অতএব স্বাবলম্বনই শ্রেয়।

মোটামুটি এইত গেল যুক্তির কথা, দৃষ্টান্তের কথা তাঁরপর। ফ্রান্স ১৭৯১ সালে Scrutin d' liste আনন্দ করেন, ফলে দেশের তিনি দল একমত হয়ে রাজাৰ অত্যাচারের বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দ্রুতাল, তাঁরপর নেপোলিয়নের যুগে সব ওলট-পালট হয়ে গেল, কিন্তু তা সহেও তৃতীয় নেপোলিয়ন আবার এই ভোটের ক্রপায় ফ্রান্সের সম্রাট হয়ে বসলেন কিন্তু তাঁর কার্য্যকলাপ দেখে ফ্রান্স মনস্থির করলে যে Dictator-এর যুগ চলে গেছে, তাই ১৮৭৬ সাল থেকে রাজবংশের পুনরাগমন বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে Scrutin d' arrondissement পুনঃপ্রতিষ্ঠ হল। কিন্তু শীঘ্ৰই দেখা গেল যে ফ্রান্সেৱ ব্যবস্থাপক সভায় কি দেশান্ত-

জ্ঞান, কি ধর্ম-জ্ঞান সবই লোপ পাচ্ছে, তাই ছোট দলগুলিকে এক করে একটি স্থায়ী Republican দল গড়বাব প্রয়াসে Scrutin d' liste-এর আশ্রয় পুনরায় গ্রহণ করা হল। কিন্তু Boulanger আবাব যথন মূতন নেপোলিয়ন হতে চাইলেন তখন ১৮৮৯ সালে district method ফিরে এল। ফলে ফরাসা দেশের ব্যবস্থাপক সভার দুর্দিশার কথা সকলেই অবগত, বিস্তুর ছোট দলের উপন্দবে বড় দলের স্থায়ীভ নেই, মন্ত্রীদলের পরমায়ু গড়পরতা ৮০০ মাস এবং কোন কার্যেই তাঁরা নিজেদের দলের উপর নির্ভর করতে পারেন না—ব্যবস্থাপক সভা সে দেশে হয়ে উঠেছে একটা Debating club. ফ্রান্স নিজের দুরবস্থার কথা বোঝে কিন্তু পাছে আবাব কেউ ভোটারদের ঠকিয়ে নেপোলিয়ন হয়ে বসে এই শম্ভু তার এখনও ঘোচে নি—শুধু তাই নয় ফ্রান্স বহুকাল থেকেই সুস্পষ্টভাবে জেলায় জেলায় বিভক্ত এবং জেলার শাসন-প্রণালী বাজে সাধারণ-তন্ত্র থাকা সত্ত্বেও অতিশয় centralised. তার উপর সে দেশে আছে—ল্যাটিন বুদ্ধির চিরন্তন symmetry-প্রিয়তা, এই সব কারণে এখনও ফ্রান্স district method-কে আকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য। বর্তমান কালে এক ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং আমেরিকা ছাড়া ইটালী, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, নরওয়ে, স্লাইডেন, পটুগাল, স্পেন, কোবে, জাপান, অনেক Swiss Cantons, আইসল্যান্ড, টেস্মেনিয়া, কুইন্সল্যান্ড ব্যতীত সমগ্র অর্টেলিয়া এই Scrutin d' liste মেনে নিয়েছে। সাধারণ-তন্ত্রের অনিবার্য দোষ এই যে যে-সম্প্রদায় সংখ্যায় কম সে-সম্প্রদায় নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন না। কিন্তু General ticket system অবলম্বন করাৰ অন্ত পূৰ্বোক্ত সব দেশেই তাদেৱ প্রতিনিধি নির্বাচন কৱাৰ স্বয়েগ দেওয়া হয়েছে।

এখন যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দুই-ই দেখান গেল। আমাৱ কথা এই
ষে district system-এৱ যে দোষগুলি যুৱোপে দেশাঞ্চলৰ অত
শুগভীৱ থাকা সম্ভৱ প্ৰকট হয়েছে—যথা ছোট ছোট দলেৱ মধ্যে
আতীয়তাৱ অভাৱ, গণৌৱ বাইৱে বাবাৱ অক্ষমতা—এগুলি ত
ভাৱতবৰ্ষেৱ সন্তোষ দোষ—তাৱ উপৱ যুৱোপ আমেৱিকা ষা পৱিত্যাগ
কৱেছে অৰ্থাৎ—communal representation, তাই আমাৱা যেচে
নিলুম। কাজেই আমাৱ মতে আমাৰদেৱ general ticket system
অবলম্বন কৱলৈ খানিকটা বাঁচাও, নচেৎ আমাৰদেৱ ব্যবস্থাপক সভা
একটা দলাদলীৱ আড়ডা হবে।

শ্ৰীধৃষ্টিপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায় ।

প্রাচ্যে শক্তিবাদ।*

—*—

জীবনযাত্রার সৌতির মত নৈতিক ধারণাও প্রাচ্যদেশে বহুবিধ ; তথাপি সাধারণত পাশ্চাত্য জগৎ মনে ভাবে যে, নৈতিক হিসাবে প্রাচ্যের সকল ভাবের ধারা পাশ্চাত্যের ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । তিনি ভিন্ন আতির মধ্যে কর্ষের আদর্শ লইয়া যখন আলোচনা চলিতে থাকে তখন পরম্পরারের পক্ষে পরম্পরাকে বুঝিতে পারা কঠিন ; কাব্য প্রত্যেক জাতির মধ্যেই তাহার চিরাগত সামাজিক প্রপা বক্তুল হইয়া জীবনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, স্বতরাং এক জাতি অন্য জাতির প্রথা একেবারে অস্থায় না হউক ঠিক শ্যায় বলিয়া মনে করিতে পারে না । তাই যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ে পরম্পরারের নৈতিক ও কর্ষের আদর্শ তুলনা করিয়া দেখে, তখন সহানুভূতিতে অস্তদৃষ্টির অভাব হইবারই কথা । তথাপি ভারতের সমাজ-নৈতিক চিন্তাপ্রণালী আলোচনা করিতে করিতে সরল, প্রাচীন আর্যজগতে গিয়া পেঁচাইলেই দেখিতে পাই, পাশ্চাত্যে আজ যে সকল গুণের আদর, প্রাচীন ভারতীয়গণও সেই সকল গুণকেই শ্রদ্ধা করিতেন । পাশ্চাত্যে প্রাচ্যসম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা আছে তাহা ঠিক নহে, পাশ্চাত্যের শ্যায় প্রাচ্যের নৈতিক সাহিত্য ও সর্বদা মুক্ত কর্তৃ প্রচার করে

* (Paul Rienkski-র Political and Intellectual Currents in the Far East হইতে ।

যে, সত্যানুরাগই মানবের প্রধান ধর্ম। ভারতের প্রাচীনশাস্ত্রে সাহস, শক্তি, ধৃতি প্রভৃতি বৌরোচিত সদ্গুণও অবহেলা করা হয় নাই।

কিন্তু ক্রমাগত বিদেশীর নিকট পরাজিত হইয়া নানাকূপ পরিবর্তনে এবং আতিভেদ প্রথার প্রচলনে ভারতীয় সভ্যতা ক্রমেই যত জটিল হইতে লাগিল, নীতিশাস্ত্রও ততই তাহার প্রাচীন সরলতা হারাইয়া ফেলিল। নীতিশাস্ত্রের নানাকূপ বিভাগ হইল, নানাকূপ অনাবশ্যক অংশ তাহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইল। অবশেষে ত্যাগধর্ম (doctrine of renunciation) আতির মনে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল। ভারতের প্রবর্তী যুগের চিন্তা—সংসারত্যাগ, কর্মবিরতি, জীবনের দুঃখকষ্ট ধীরভাবে সহকরা, এই সব প্রবৃত্তির অঙ্গুকুলে। তখন এই নৈকশ্চ্যবাদ শাস্ত্রভাবে সকল শক্তি নিরোধ করিয়া মানুষকে শুক্ষ ধ্যান-ধারণায় জীবন কাটাইতে উপদেশ দিল। বারবার বহিঃশক্তির ভারতজয়, দুর্দম্য অড় প্রকৃতির অত্যাচার, আতীয়তার অনুভূতির অভাব, এই সকল মিলিয়া চিন্তা জগতের এই সব ভাবকে আরও দৃঢ় করিতে সাহায্য করিল। শুধু হিন্দুধর্মে নয়, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি ভারতীয় সকল ধর্মেই এই জাতীয় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান যুগে ভারতবর্মে এক মহা সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত দেখিতেছি। নব নব জাতীয় শক্তির উদ্বোধন দেখিতে পাইতেছি। প্রাচীন শাস্ত্রের নৃতন ভাবে নৃতন বাধ্যা দেওয়া হইতেছে, দেখান হইতেছে যে, নৈকশ্চ্যবাদ ও ভগবানের বিধান মাথায় তুলিয়া লওয়া (Submission) হিন্দুধর্মের জটিল শাস্ত্রের একটি অংশমাত্র; দেখান হইতেছে যে পুরুষেচিত গুণ, যে-সব গুণে মানুষকে অধিক কর্ষেপযোগী করিয়া তুলে, সে-সব গুণেরও হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া

থাকে। এই সব বৌরোচিত গুণ এখন প্রাচ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। জাপানে জাতীয়ভাবের ফল দেখা যাইতেছে, অপান তাহার জাতীয়-জীবনে যে-শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা এশিয়ার অপরাপর দেশের আদর্শ স্বরূপ।

(২)

হিন্দুদের তুলনায় চীনাদের দার্শনিক আলোচনার প্রবৃত্তি অনেক কম। সহজ বুঝিতে যাহা নীতি-অনুমোদিত মনে হয় তাহাই তাহারা পালন করে। চীনারা চিরকাল শাস্তিপ্রবণ, অস্থায়েয় বিকলকে শাস্তি-ভাবে দাঁড়ান্ত তাহাদের চরিত্রের প্রধান বল ; বলের স্বারা বলের প্রতিরোধ করিতে না গিয়া তাহারা যেকুপ ভাবে নানা অঙ্গলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করে, তাহাতে তাহারা ঋষি টল্ট্যয়ের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি তাহার দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, “চীনাকে আদর্শ কর ; দেখ এই বিপুল জনসংঘ কেমন শাস্তি ও ধীরভাবে জীবনযাপন করে, বিদ্রোহাচরণ দ্বারা অস্থায়ের প্রতিরোধ করিতে না গিয়া শাস্তি ও সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া কেমন ভাবে তাহারা ‘অস্থায়ের প্রতিরোধ করিও না’ Resist not Evil—এই নীতি পালন করে”। চীনা দার্শনিক লাওট্জে (Lao-Tze) চীনাদের এই জাতীয়-আদর্শ অনেকটা পরিস্ফুট করিয়াছেন। লোকে ইঁহাকে চীনের এপিকটিটাস্ বলে। তিনি reason-কে যেকুপ ভাবে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন তাহাতে গ্রীকদার্শনিকের সঙ্গে তাহার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহার মতে, reason যেমন ভাবে জগতে ও মানব মনে অভিযোগ, তাহাতে মানবশক্তিকে আত্মপ্রত্যয়বিশিষ্ট

(Self conscious) করার কোনই প্রয়োজন নাই। পণ্ডিত তিনি, যিনি সহজে ভাবে অবলম্বন করিবেন এবং তাহার নিজের reason-এর প্রয়োগ ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া বিশ্বের reason-কে স্বীয় প্রকৃতির সঙ্গে মিলাইয়া লইবেন। যুক্তি করে সবাই, কিন্তু সবাই আত্মপ্রতিষ্ঠা চায় না। লাওট্জ়-এর এই আত্মপ্রতিষ্ঠা-বর্জনের অর্থ অবশ্য অকর্ম নয়, ইহার উপদেশ—সকল বস্তু স্বাভাবিক ভাবে বাঢ়িয়া উঠুক, কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে বাঢ়াইতে যাইও না। কিন্তু জন-সাধারণ তাহার উপদেশের মর্ম এ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে তাহার প্রচারিত নীতির অন্তরে যাহা ধর্ম ও শক্তির সহায় ছিল তাহা দুর্বলতায় পরিণত হইয়াছে; এবং বর্তমানে অনেক চীনার মতে আতীয় প্রতিষ্ঠানের যে-সব অসম্পূর্ণতার জন্য চীন অসংখ্য অনুবিধা ও অপমান সহ্য করিয়াছে তাহাদের জন্য এই লাওট্জ়-ই দায়ী।

আজ আমরা দেখিতেছি যে এই বিপুল জনসংখ্য জাগিয়া উঠিয়া নিজের অন্তরে নৃতন শক্তির পরিচয় লাভ করিতেছে, ইহাদের মন কর্ম্মযোগের প্রতি আরও অনুকূল হইয়া উঠিতেছে; চৌনে—আত্ম-প্রতিষ্ঠাবর্জনের দেশ চৌনে—সামরিকতা দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। শক্তি লাভই যে আতীয়-আদর্শ তাহা সকল দেশের সাহিত্যে আজ পরিষ্কৃট। যুক্তের আয়োজনের জন্য আজ অনেকে ক্ষতিস্বীকারে অগ্রসর, স্কুলের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশস্বরূপ সকলে সামরিক বেশ পরিধান করিয়া সৈন্যদের মত শিক্ষা পাইতে আগ্রহাস্তি। এতদিন দেশে লোকে যুক্তবৃত্তি ঘৃণার চক্ষে দেখিত, আজ সে ঘৃণা নৃতন শক্তির আবিষ্টাবে লোপ পাইতে বসিয়াছে। চীনা বৌর ওয়াং-ইয়াং-মিং এই নৃতন ভাবের বশ্য দেশের সাহিত্যে

আসিয়াছেন, তাঁহার রচনার মূল্য যে কত বেশি, তাহা আপানৌরা প্রথমে দেখাইয়া দেয়। আঞ্জিকার দিনে তিনি চীনে সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠাবান লেখক। কর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত এই— চিন্তা ও জ্ঞানের পরিণাম যদি কর্ম না হয়, তবে সে চিন্তা ও জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিত। নৈতিক ও দার্শনিক চিন্তা এই হিসাবে পরীক্ষা করিতে হইবে যে তাহা কর্মজীবনের পক্ষে সহায় কি না। নিজে তিনি সংসারী ছিলেন, এবং স্বীয় মত এমন ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিতে পারিতেন যে তাঁহার রচনার ছত্রে ছত্রে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, বীরোচিত কর্ষে পাঠকের উৎসাহ অঙ্গে। কর্ষের অঙ্গ এই উৎসাহ, বিপ্লববাদের ভাবে এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় অভিব্যক্ত হইতেছে; বৃক্ষ দার্শনিক বাঁচিয়া ধাকিলে হয় ত এসব পছন্দ করিতেন না। অস্ত্যায় যে সহ করিতে হইবে, এ ভাব চীন দেশ হইতে অনেকটা চলিয়া গিয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে আসিয়াছে এই বিশ্বাস যে, শুধু বীরভূতের স্বারাই জাতীয় জীবনের জটিল সমস্যা সকলের সমাধান করিতে হইবে। ওয়াং-ইয়াং-মিং-এর কথাগুলি চীনের কর্ণে যেন তৃষ্ণানিনাদ করিতেছে।

প্রাচ্যে কর্ম্মবজ্জ্বের প্রকৃত পুরোহিত জাপান। শুধু তাঁহার বর্তমান জীবন নয়, তাঁহার অতীতও এই কর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছে। প্রাচ্যে একমাত্র জাপানেই ইউরোপের মত সামরিক সামস্ত্রেণী (Military feudalism) গড়িয়া উঠিয়াছে। যখন তাঁহার অন্তরে জাতীয়-সভার পুর্ণ অনুভূতি জমিল তখনও সামস্ত্র-প্রধার সামরিক দিকটা তাঁহার কর্ম ও ভাবের কেন্দ্র হইয়া ধাকিল। তাঁরতে ও চীনে পুরোহিত ও পণ্ডিত ষেমন গোরব লাভ করিয়া

আসিয়াছে, জাপানে কখনও তেমন হয় নাই। জাপান, বুদ্ধ ও কনফিউশিয়াস, এই উভয়ের ধর্মই গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহার আপন চিন্তার ধারা দিয়। এই দুই ধর্মকে জাতীয় ভাবের সহিত মিশ-ইয়া লইয়াছে। এই ভিন্ন ভিন্ন বাদে যে বিরোধ আছে তাহাতে ডয়না পাইয়া জাপান তাহার জাতীয় প্রবৃত্তি অনুসারে কর্মনীতি এবং প্রত্বাবে গড়িয়া তুলিল যে তাহাতে মানবশক্তির উৎকর্ষ ও অভিব্যক্তি প্রধান স্থান অধিকার করে। সামরিক যুগ হইতে সে তাহার ‘বুশিদো’ বা ক্ষাত্রাধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। প্লেটো ও হিন্দু দার্শনিকগণ সত্যামুরাগ, মহাপ্রাণতা, সাহস ও অস্ত্রান্ত যে-সব গুণ ক্ষত্রিয়েচিত বলিয়া বর্ণনা করেন, এই ‘বুশিদো’ ধর্ম সেই সকল গুণকেই প্রশংস্য দেয়। নব্য জাপান, জাতির সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই নৌতি চালাইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে চৃড়ান্ত মীমাংসা এখনও হয় নাই; স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সামরিক যুগে যে-সব বিধি যুদ্ধব্যবসায়ী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে সে-সকল বর্তমান শ্রমজীব-সমাজের নৈতিক সমস্যা সকলের মীমাংসা করিতে অপারিগ।

(৩)

সমসাময়িক প্রাচ্যচিন্তার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে, যে এই সব প্রাচীন জাতি কর্ম ও শক্তির তত্ত্ব কতদূর ভেদ করিতে পারিয়াছে। এই সকল বিষয়ে প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের প্রভেদ থাকিবেই, র্মেলিক ভেদের অন্য বাহিরের উন্নতির পথেও স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে। পাশ্চাত্য Individualism বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলিতে যাহা বুঝায় আজও সে ভাবে প্রাচ্যে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই

মানবের ব্যক্তিহের এই যে প্রাধান্য, স্বচ্ছন্দ বিকাশের এই যে অবসর, ইহার মূল খুঁজিতে গেলে গ্রীস রোমের ক্লাসিসিজ্মের (Classicism-এর) নিকট যাইতে হইবে। ক্লাসিক আদর্শ আত্মসংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত; যাহা শুধু কৌতুহল তৃপ্তি করে, তবে উৎপাদন করে বা বুদ্ধিভূংশ জন্মায় সে-সব ছাড়িয়া এক নির্দিষ্ট পথে ভাব ও ভাষাকে পরিচালিত করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা—ইহারই নাম ক্লাসিক ভাব। এইরূপে আত্মদমন হইতে স্বাধীনতা জন্মে। এই আত্মসঞ্চোচনের ফলে মানুষ পরম্পরারের চরিত্র ও ব্যক্তিহের প্রভেদ বুঝিতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্য মনে হয় যে এই স্বাতন্ত্র্যবাদী পাশ্চাত্য সকলের প্রতি সমান ভাবে নৈতিক বিধান প্রয়োগ করিতে চাহিয়াছে, নৌত্তর সহিত সমাজতন্ত্র মিশাইয়াছে। কিন্তু ‘ব্যক্তিগত আত্মসংযমের ফল’ একথা মনে রাখিলে এ ব্যাপার তেমন অসম্ভব বোধ হইবে না।

এই সকল ব্যাপারে অবশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা মন্তব্য ভেদ রাখিয়া গিয়াছে। মানবজীবনে কর্মশক্তি বিকাশের আকাঙ্ক্ষা জানিবা মাত্র প্রাচ্যদেশ বর্ণাশ্রম ধর্মে যেসব কর্তব্য বিহিত আছে তাহাদের দোহাই দিতে চায়। প্রাচ্যের বর্তমান যুগে প্রধান সমস্তা—শক্তির আদর্শ অনুসরণ করিতে হইলে যে সকল গুণের প্রয়োজন বর্ণাশ্রম ধর্ম ছাড়িয়া মানবসাধারণের জন্য বিহিত নৌতিশাস্ত্র অনুসরণ করিলে কি তাহা লাভ করা যাইবে? সমাজধর্মে সাধারণ-তন্ত্র চলিবে, না অভিজ্ঞত তন্ত্র?

এশিয়ার প্রধান দেশ তিনটির মধ্যে চৌনই গণতন্ত্রের দেশ; যখন পৃথিবীতে অপর কোনও দেশ গণতন্ত্রকে শ্রেষ্ঠ শাসনপ্রণালী বলিয়া স্বীকার করে নাই, তখন চৌনের অবস্থা এরূপ ছিল যে সমগ্র

সমাজের পক্ষে Community সম্বন্ধে কিছু করিতে হইলে সর্বসাধারণের সম্মতির আবশ্যক হইত। বর্তমান জাতীয় পরিবর্তনে এই প্রজাতন্ত্রের ভাব আরও পরিস্ফুট, রাষ্ট্র এখন সাধারণের মতানুযায়ী করিয়া গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। আপানে যে একটা নামমাত্র পার্লামেন্ট প্রচলিত আছে তাহা ছাড়াইয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যকে এমন শাসনপ্রণালী দেওয়া হইবে যাহাতে ইহার জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বাস্তবিকই লোকায়ত হইতে পায়।

সমাজধর্মে বহুর প্রাধান্ত থাকিবে, না কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কেই বরেণ্য করিয়া রাখা হইবে এই সমস্তার মৌমাংসা দূর-প্রাচ্যে ক্রিপ্ত ভাবে সমাধান হয় তাহা দ্রষ্টব্য বটে। ভাবতে ও আপানে সমস্তা দাঢ়াইতেছে এই—জাতীয় জীবনে যে শক্তির প্রয়োজন, প্রাচীন পন্থ। অবলম্বন না করিয়া অন্য কি উপায়ে সেই শক্তির বিকাশ সাধন করা যাইতে পারে? আর যদিই বা এই প্রাচীন ধর্মের আবশ্যকতা থাকে তবে এমন কোনও উপায় আছে কি যাহাতে ইহার প্রভুধর্ম (master morality) সর্বসাধারণের অন্তর্মে অনুপ্রবিষ্ট করিতে পারা যায়। আর চীনের সমস্তা—যে স্বল্পমংখ্যকের নেতৃত্বে আপানে এতদূর বিকাশিত যাহা ভাবতে প্রাধান্ত লাভের চেষ্টা করিতেছে, সেই নেতৃত্বের বিকাশের অপেক্ষা না রাখিয়া জীবনে কৃতকার্য হওয়া যায় কি না? ইহা যে অসম্ভব, একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলে চীনের সমাজধর্মে গণতন্ত্রের ভাব ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতে পারে। দশ বার বৎসর পূর্বে কে ভাবিয়াছিল যে সভ্যতার এই বিকাশ-বৃক্ষভূমি এশিয়ায় প্রভুধর্ম ও দাসধর্মের মহা বিরোধের এত শীত্র সামঞ্জস্য হইতে চলিল?

এ কথা হয় ত সত্য যে, প্রাচ্যের ভাবুকগণ যখন ইউরোপের সহিত আমাদের সভ্যতা তুলনা করিয়া দেখেন তখন তাঁহারা যে ব্যক্তিগত ফলে ব্যক্তিগত শক্তি ফুটিয়া উঠে এদেশে সেই ব্যক্তিহের অভাবই বিশেষ করিয়া বোধ করেন। উচ্চ আশায় তাঁহাদের মন একেবারে ভরিয়া গিয়াছে, নবজাগরণের জাতীয় উদ্বোধনের ভাবে তাঁহারা অনুপ্রাণিত। তাঁহাদের ধারণা, মানবকে ব্যক্তিগত-বিকাশ লাভ করিতে ও কর্মে পরিণতি লাভ করিতে হইলে তাঁহার পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা আবশ্যিক। তাই তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়ান যে অতীতের কোন বিধানের বলে সমস্ত জাতির মধ্যে নেতৃত্বের ভাব সঞ্চালিত করা যায় এবং আশা করেন যে এই সব বিধি-বিধান হইতে মানুষের ব্যক্তিহ এমন ভাবে ফুটাইতে পারিবেন যে তাঁহাতে জাতীয়-জীবন সমৃক্ষ হইয়া উঠিবে।

(৪)

বর্তমান যুগে জড় প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচ্যের ধারণা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্বে প্রকৃতির অত্যাচার সহ করিবার যে প্রবৃত্তি ছিল তাহা দূর হইয়া এখন প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার বাসনা এশিয়ার মনেও জাগিতেছে। সে দিন পর্যন্ত প্রাচ্য-জীবনে বিশ্বের রহস্যের দিকটাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। প্রাচ্য বুঝিতে তেমন চায় না, যেমন সে কল্পনা করিতে চায়, ব্যাখ্যা করিতে চায়, ডষ্টয়েভক্সি বলিয়াছিলেন, “রাশিয়াকে বুঝিতে পারা যায় না, রাশিয়াকে বিশ্বাস করিতে হইবে।” (Russia cannot be understood, she must be believed in.) এই ভাব লইয়া

প্রাচ্য চারিদিকে যাহা কিছু উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যময় তাহাতেই মুঞ্চ থাকিতে প্রস্তুত। তাহার মতে জীবনের প্রত্যেক ভাব কোন রহস্যময় আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশমাত্র! সর্বত্রই ভূতযোনি আছে, দরিদ্রতম হিন্দু কৃষকের মনেও এই বিশ্বাস বন্ধনুল। চীনাদের বিশ্বাস, পৃথিবী ও বায়ুমণ্ডল ভূতযোনীতে পূর্ণ। গভৌর বনে, উপত্যকার মধ্যে, আপানীরা সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে, মানুষ তাহাতে কথনও প্রবেশ করে না ; কিন্তু সে-সব মন্দির বিদেহ বীর-আজ্ঞার ও দেবতার আবাস। যখন স্তুক সঙ্ক্ষ্যার নীরবতায় প্রকৃতি শব্দহীন তখন অনেকে জালযুক্ত গবাক্ষের মধ্য দিয়া সম্মের সহিত মন্দির মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকে। এই বিশ্বাস প্রাচ্যজাতির, বিশেষত ভারতীয় ও জাপানাদের বীরপূজায় অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তাহারা মহাপুরুষকে ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাদের পূজা তাহাদের নিকট অতি স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রাচ্য যেন চারিদিকে আধ্যাত্মশক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং এই আধ্যাত্মিক আবেষ্টনীর ভিতরই তাহার জীবন বাঢ়িয়া উঠে।

কিন্তু প্রাচ্যে একটা অতি প্রয়োজনীয় ধারণা প্রচলিত নাই, ধারণাটি এই যে, রহস্যময়ী ও সর্বশক্তিমতী প্রকৃতির সকল কর্ম এক নির্দিষ্ট বিধান অনুসারে চলিতেছে। প্রাচা জনসভের মনে এখনও ব্যথেচ্ছাচারী ভূতযোনী রাজস্ব করিয়া আসিতেছে, প্রাকৃতিক নিয়ম এখনও জনসাধারণের মনে ছাপ মারিয়া যায় নাই। অড়ঙ্গতের শৃঙ্খলার ও এক বিশ্বজনীন নিয়মানুযায়ী সংহতভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভের ধারণা শুদ্ধ অতীতে তাহাদের দর্শনশাস্ত্রে প্রচারিত

হইয়াছে বটে কিন্তু পাশ্চাত্যে এ ভাব যেমন বহুজনবিদিত, প্রাচ্যে তেমন নয়।

প্রতি প্রাচ্য মনের এইভাব দুই কারণে জন্মিয়াছে; প্রথমত স্বভাবের শক্তি দেখিয়া মানব-মন ভৌত ও সঙ্গুচিত হয়, এই সব শক্তির শাস্তা ও নিয়ন্ত্রণপে সে আর নিজকে ভাবিতে পারে না, বিত্তীয়ত প্রাচ্যের দার্শনিক মন (philosophical mind) আজ্ঞা লইয়াই এত ব্যস্ত যে সে স্থিতক্ত্ব ও বিবর্তবাদ লইয়া এক অট্টল শাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছে বটে কিন্তু পরৌক্তাপ্রণালীর ভাষায়ে (Experimental method) পুজ্ঞানুপুজ্ঞারপে প্রকৃতির ঋহস্যে করিতে শিখে নাই। কিন্তু আমরা যে শক্তিবাদের কথা আলোচনা করিতেছি তাহাতে প্রাকৃতিক ব্যাপারের প্রতি প্রাচ্যের মনোভাব অনেকটা পরিবর্তিত হইবেই। পাশ্চাত্যে মানববৃক্ষি ও শক্তি যে-বিষয়ে একটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে সে-বিষয় প্রাচ্যের অভিজ্ঞতার বাহিরে থাকিবে না। ইহার মধ্যেই জাপানীরা জড়বিজ্ঞানের চর্চায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেছে আর তারতে মহা আন্দোলন চলিয়াছে —সক্রীণভাবে প্রাচীনগ্রন্থ অধ্যয়নের প্রচলিত প্রথা বর্জন করিয়া বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রতিষ্ঠান হইবার এই যে সৃষ্টি জাগ্রত প্রবল বাসনা, ইহার সহিত প্রাচ্যের গভীরতম ভাব মিশান আছে।

(৫)

কিন্তু প্রাচ্যে যদি এই শক্তিবাদ ও কর্মবাদ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার অন্তরের আধ্যাত্মিক ভাবও সেই সঙ্গে

বর্জন করিতে হইবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। আপানীরা যে পাশ্চাত্য প্রণালীর সাহায্যে শক্তিলাভ করিয়াছে, তাহা শুধু আপন আদর্শ ও সভ্যতা আরও দক্ষতার সহিত রক্ষা করিবার জন্য। “শক্তি ‘সঞ্চয় কর যেন নিজস্ব বজায় রাখিতে পার” (Make yourself strong so that you may retain the right to be yourself)—শুধু জাপানের নয়, চীন ও ভারতের মনোভাবও ইহাই বলিয়া মনে হয়, বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করা কর্মজগতে শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু মানুষের আত্মা, তার মনোজগতের রহস্য, মানবত্বার অনন্ত বিকাশের সম্ভাবনা, এই সব ভাব জড়জগতের যে-কোন ব্যাপার অপেক্ষা তাহাকে অধিক মুক্ত করিবে। এই উদার আধ্যাত্মিভাব পৃথিবীকে দিবে, সংসারে ইহা চিরস্থায়ী করিবে, ইহাই প্রাচ্যের প্রধান কাজ—প্রাচ্যের নিকট ইহা অতি উৎসাহের ও উদ্দাপনার কথা। প্রাচ্য জানে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়—তাহার ব্যাপ্তির উন্নতি, কর্মজগতে শক্তিবিকাশ, সরল ও সুন্দর কার্য্যপ্রণালী, জটিল যন্ত্রতন্ত্র, এ সকলের মূল্য প্রাচ্য বোঝে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ইহাও ভাল করিয়া জানে যে, মানুষের আত্মা শুধু এইসব উন্নতি, এইসব বাহিরের সিদ্ধি দিয়া সর্বদা অভীষ্ট লাভ করে না, জানে যে যন্ত্রতন্ত্র আত্মাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে, কলের চাপে মানুষের চিত্তবৃত্তি একেবারে চাপা পড়িয়া যায়। যখন সে দেখে অতি গভীর চিন্তারাজ্যেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জড়বাদ ছাড়াইয়া যাইতে পারিতেছে না, তখন সে অনুভব করে যে প্রাচ্যেরও একটা কথা বলিবার আছে এবং সে কথা জগৎ শুনিবে। প্রাচ্য আশা করে, এই জড়বাদ হইতে সংসারকে সে মুক্তি দিবে। ঠিক কোন পথে কেমন করিয়া দিবে তাহা এখনও পরিকার বুঝিতে

পারা যায় না ; কিন্তু পাঞ্চাত্য যেমন তাহার কর্মজগতে প্রাধান্তে
গোরব বোধ করে, প্রাচ্যও তেমনই এই চিন্তা হইতে আশা ও সান্ত্বনা
লাভ করে যে তাহার আধ্যাত্মিকতা জগৎকে মুক্তি দিবে । আধ্যা-
ত্মিক জগতে যে-বস্তুর মূল্য আছে সেই বস্তু লাভের জন্য যদি প্রাচো
তাহার নবজ্ঞাগ্রত শক্তি প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার জীবন সার্থক
হইবে ।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন মেননপ্ত ।

সাহিত্য বনাম পলিটিক্স।

—::—

গত পঞ্চাংশুয়ারি তারিখে একটি বঙ্গুর বাড়ীতে আমার পরমশ্রদ্ধাভাজন জনৈক প্রাচীন ভদ্রলোকের সঙ্গে বহুকাল পরে আবার দেখা হয়, তিনি প্রথম কথা যা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে হচ্ছে এই—

“এখন তুমি কি করছ ?”

আমি উত্তর করলুম—“বিশেষ কিছুই না।”

প্রত্যন্তে তিনি বললেন—

“হা আমিও তাই মনে ভেবেছিলুম। কি কংগ্রেস কি কন্ফাৰেন্স, কোন দলেই তোমার নাম দেখতে পাই নে। পলিটিক্সে যোগ দেও না কেন ?

এ প্রশ্নার কি উত্তর দেব ভাবছি, এমন সময় পাশ্চাত্যেকে একজন প্রবীন মডারেট বলে উঠলেন—

“ওদের কথা ছেড়ে দিন। ও সাহিত্য নিয়েই বসে আছে, যেমন ওর ভাই রয়েছে শিকার নিয়ে”।—এ কথার কোনও জবাব থুঁজে না পেয়ে একটু ভদ্রতার হাসি হাসলুম। কেন না আমার সাহিত্য-চর্চার সঙ্গে আমার অগ্রজের ঘণ্যাচর্চার যোগাযোগটা কোথায় এবং কতখানি তা ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না। মনে হল যে হয়ত লোকের শাস যে আমার জ্ঞাতা যেমন জন্মলেৱ বাধ ভাস্তুকেৱ উপৱ শুলি

চালান আগিও ডেমনি মনোজগতের চতুর্পদদের উপর বাক্যবাণ নিষ্কেপ করি। ঘটনা যদি তাই হয় তাহলে ভদ্র-সমাজে বাক্য-সম্বরণ করা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই শ্রেয়।

এই ঘটনার দিন দুই তিন পরে আইন ব্যবসায়ীদের একটি আড়ায় কার্য্যগতিকে উপস্থিত হবামাত্র জনকয়েক যুবক এসে, আমি কেন পলিটিক্সে যোগ দিই নে, সেই বিষয়ে র্যাবনশুলভ মুক্তবিদ্যানা সহকারে আমার কৈফিয়ৎ চাইলেন। আমি উভর করলুম—“শরীরে যে সব গুণ ধাকলে মানুষে পলিটিসিয়ান হতে পারে আমার দেহে সে সব গুণ নেই বলে।”

এ জবাব তাঁদের কাছে অবশ্য গ্রাহ হল না। তাঁদের ধারণা যে রক্ত মাংসের শরীরমাত্রই পলিটিসিয়ান হবার পূরো ক্ষমতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। নহলে তাঁরা পলিটিসিয়ান হলেন কি করে? অতএব স্থির হল, পলিটিক্স থেকে আলগা হয়ে থাকায় আমি দেশের প্রতি আমার আসল কর্তৃত্ব অবহেলা করছি। এ অভিযোগের কি প্রতিবাদ করব মনে ভাবছি, এমন সময় পাশথেকে একটি নবীন Extremist বলে উঠলেন—

“কেন উনি ত বাঙলা সাহিত্য লিখছেন, সেও ত একটা মন্দ কাজ নয়। Artistic কাজ করবার জন্মও ত দেশে দুচার জন লোক চাই।”

বাঙলা লেখাটা একেবারে অকাজ নাও হতে পারে, এ সন্দেহ যে ইংরাজি বক্তাদেরও আছে এর পরিচয় পেয়ে আমি অবশ্য চমৎকৃত হলুম, বিশেষত যখন শুনলুম যে আমরা যা করি পলিটিসিয়ানদের মতে সেটি হচ্ছে আটিষ্ঠিক কাজ। বুঝলুম যে রাজনীতির বিশ্বকর্মাদের বিশ্বাস, তাঁরা যে মাতৃভূক্তি গড়ে তুলছেন তার সাজের জন্ম আমরা আগে

থাকতেই পাঁচ রকম সোনা কল্পোর নয়, রাঙ্গতাৰ অলঙ্কাৰ বানিয়ে রাখছি। এ অবস্থায় চূপ কৱে থাকাই শ্ৰেয় মনে কৱলুম। কিছু বলতে হলে বলতে হত এই কথা যে, তোমৱা যদি সত্যসত্যই মায়েৰ প্ৰতিমা গড়ে তুলতে কৃতকাৰ্য্য হও তাহলেও তাৰ প্ৰাণপ্ৰতিষ্ঠাৰ জন্ম আক্ষণেৰ কাছে আসতে হবে, আৱ এ যুগে যাৱা মনেৰ কাৱবাৰ কৱে তাৱাই হচ্ছে যথাৰ্থ আক্ষণ, বাদবাকী সকলে অস্তত এদেশে, হয় বৈশ্য, নয় শুন্দ। বলা বাহল্য এ জ্বাব artistic হত না, অৰ্থাৎ—শ্ৰোতাদেৱ কাছে তাদৃশ শৃতিমধুৱ হত না।

(২)

উপৱোক্ত দুটি ঘটনাই সম্পূৰ্ণ সত্য, তিলমাত্ৰ কাল্পনিক নয়। এৱ থেকে বোৰা যাচ্ছে যে, আজকেৱ দিনে দেশেৰ পলিটিক্স সম্বন্ধে কাৱো পক্ষে উদাসীন হওয়াটা কেউ সঙ্গত মনে কৱেন না। শুধু তাই নয় অধিকাংশ ইংৱাজি শিক্ষিত লোকেৱ মতে রাজনৈতিক আন্দোলন কৱাটা বাঙালী মাত্ৰেই পক্ষে এখন অবিভীয় কৰ্তব্য হয়ে পড়েছে, এবং যিনি রাজনৈতিক ব্যাপাৱ থেকে দূৰে থাকেন সমাজেৰ কাছে তাঁৰ একটা জ্বাবদিহি আছেই আছে, বিশেষত সে ব্যক্তি যদি হন একজন সাহিত্যসেবী। কেননা যে একমাত্ৰ বস্তু নিয়ে আমাদেৱ পলিটিক্সেৱ কাৱবাৰ, অৰ্থাৎ—বাক্য, সে বস্তু সাহিত্যিকদেৱও হাতে আছে এবং পলিটিসিয়ানদেৱ অপেক্ষা বেশি পৱিমাণেই আছে। কেননা পলিটিক্সেৱ কাজ গুটিকয়েক মুখস্থ বুলিৱ সাহায্যেই চলে যায় কিন্তু সাহিত্যেৱ কাজেৱ জন্ম চাই অনেক মনেৰ কথা। পলিটিক্সেৱ কথাৱ নোট বদলাই কৱে যে অনেক ক্ষেত্ৰে সিকি পয়সাও মেলে না, তা ভুক্ত-

ভোগী জাতমাত্রেই জানে, অপর পক্ষে সাহিত্যের কথার পিছনে যে অক্ষয় অর্থ আছে এ সত্যও সত্য জগতের কাছে অবিদিত নেই।

(৩)

দেশের পলিটিক্যাল অবস্থার সঙ্গে সকলের স্বার্থ যে সর্বাঙ্গীনভাবে জড়িত সে জ্ঞানটা অবশ্য আমাদেরও আছে, কেন না এ জ্ঞানলাভের জন্য দিব্যদৃষ্টির দরকার নেই, কিন্তু তাই বলে পলিটিক্সে হাত লাগাবার সবারই যে সমান অধিকার আছে একথা চূঁকরে মানা কঠিন। সে কথা মানতে হলে এ কথাও মানতে হয় যে ও-বিষয়ে বিশেষকরে কারও অধিকার নেই, অর্থাৎ—ও হচ্ছে সমাজের একটা বেওয়ারিস মাল। আসলে কিন্তু ও হচ্ছে সংসারের আর পাঁচ রকম ব্যবসার মধ্যে একটা বিশেষ ব্যবসা, এবং এ ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ীর ভিতর বিস্তর প্রভেদ আছে। তবে যে পলিটিসিয়ানরা যাকে পান তাকেই দলে টানতে চেষ্টা করেন, সে শুধু দল পুরু করবার জন্য। এবং যে যত বেশি অনধিকারী তাকে ধরে যে এঁরা তত বেশি টানাটানি করেন তার কারণ, নেতারা জানেন যে ঐ শ্রেণীর লোক তাঁদের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হবে। আর সেই সঙ্গে এও তাঁদের জানা আছে যে এক পক্ষের মেষেরাই অপর পক্ষের উপর বাঘ হয়ে বসে। এ সম্বন্ধেও সাহিত্যিকদের এক্ষেত্রে টেনে আনা বুথা। এজাতীয় জীবরা পলিটিক্সের সিংহব্যাপ্তি হতে যেমন অক্ষম, গড়লিকা হতে তার চাইতেও বেশি অক্ষম। এরা সব একবর্গী লোক।

সে যাই হোক। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, পলিটিক্সে মেতে যাওয়াটা সাহিত্যিকদের পক্ষে ক্ষতিকর। ইউরোপের ইতি-

হাসে এর প্রমাণ পাতায় পাওয়া যায়। স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করা যে ভয়াবহ, এ কথা ত আমরা সবাই ভক্তিভরে যথন-তথনই আওড়াই। এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে সাহিত্যের ধর্ম ও পলিটিক্সের ধর্ম এক নয়। কবি দার্শনিক প্রভৃতির কাজ হচ্ছে মানুষের মন গড়ে তোলা আর পলিটিক্সের কাজ লোকের মত গড়ে তোলা। বলা বাহল্য মন ও মত এক বস্তু নয়। যার মন নামক পদার্থ নেই, তারও যে মত থাকতে পারে তার পরিচয় ত নিয়েই পাওয়া যায়। বরং সত্য কথা বলতে হলে, যে ক্ষেত্রে প্রথমটির যত অভাব সে ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টির তত প্রভাব।

আর এক কথা, এ জাতের লোকের হাতে পড়াটা পলিটিক্সের পক্ষেও ক্ষতিকর। পলিটিক্স কবির হাতে পড়লে হয়ে ওঠে ভাবমদমস্ত, দার্শনিকের হাতে বাহজ্ঞানশূন্য, উপন্যাসিকের হাতে অসুস্থ ও ঐতিহাসিকের হাতে ভূতগ্রাস। একথা যে সত্য তার প্রমাণের সঙ্কানে কি আর বিদেশে যেতে হবে? কিন্তু পলিটিক্সের মোটা কারবার হচ্ছে তেল-মুন-লকড়ি নিয়ে, অতএব এ কারবারে সাহিত্যিক অংশীদার হলে সে কারবার ফেল মারবারই বেশি সন্তান। এ কারবারে সাহিত্যিক থাকতে পারেন শুধু, ইংরাজিতে যাকে বলে sleeping partner, সেই হিসেবে। এ হিসেবে এ ব্যাপারে তিনি চিরকালই আছেন কেননা ভাবের মূলধন একা তিনিই যোগান, কাজ চালায় শুধু যত শূন্য বক্রাদারে। পরের ভাবের ধনে পোদারী করবার চাতুরী যিনি আনেন তিনিই না শ্রেষ্ঠ পলিটিসিয়ান!

উপরে যা সব বললুম সে নিজে সাক্ষাই হবার জন্য নয়, কেননা আমি কবি ও নট, দার্শনিক ও নই, উপন্যাসিক ও নই, ঐতিহাসিক ও

নই, এক কথায় আমি সাহিত্যিকই নই। আমি লেখক বটে কিন্তু সে হচ্ছে টীকা টিপ্পনির, অর্থাৎ—আমাৰ কলম সৰ্বব্যটেই আছে, সে কলম পলিটিক্সেৰ কালিও বাৱ বাৱ মুখে মেখেছে। জন্মেৰ ভিতৱ্ব
কৰ্ম আমি একবাৱ মাত্ৰ একটি গল্প লিখেছিমুম, কিন্তু সেটি গল্প নয়,
“ৱাম শ্যামেৰ” জীবনচৰিত। অনুগ্ৰহ কৰে যিনি সেটি পড়বেন
তিনিই দেখতে পাৰেন যে তাৰ ভিতৱ্ব কাব্যাবস বিন্দুমাত্ৰও নেই,
আছে শুধু ছাঁকা পলিটিক্স এবং সে পলিটিক্সেৰ ভিতৱ্ব দার্শনিক
তত্ত্বেৰ নাম গঙ্কও নেই, আছে শুধু নিৱেট সত্য।

অতএব আমি যে কেন পলিটিক্সে যোগদান কৰি নে তাৰ জন্ম
সমাজেৰ কাছে আমাৰ জবাবদিহি নিশ্চয়ই আছে। আমাৰ কৈফিয়ৎ
হচ্ছে এই যে, আমি যোগ দিই নে কেননা দিতে পাৰি নে। কথাটা
আৱ একটু পৰিষ্কাৰ কৱা যাক।—

আজকেৱ দিনে পলিটিক্সে যোগ দেবাৰ অৰ্থ, হয় মডারেটেৱ, নয়
extremist-দেৱ ক্ষুৰে মাথা মোড়ানো। আমি যে এ দু দল থেকেই
তক্ষণ থাকি, তাৰ কাৰণ এ দু'দলেৱ মতামতেৰ ও কাৰ্য্যকলাপেৰ মধ্যে
আমি বিশেষ কোনও প্ৰভেদ দেখতে পাই নে। এ অবস্থায় কাকে
ছেড়ে কাকে ধৰব ? দু'দলেই যা কৱছেন, পলিটিক্সেৰ পৰিভাৰ্ষাৰ তাৱ
নাম constitutional agitation, তবে প্ৰথম দল কোঁক দেন এৱ
প্ৰথম পদ, অৰ্থাৎ—বিশেষণেৰ উপৱ, আৱ বিতীয় দল কোঁক দেন এৱ
বিতীয় পদ, অৰ্থাৎ—বিশেষ্যেৰ উপৱ, এই যা তক্ষণ। এ ছাড়া আৱ যা
প্ৰভেদ আছে সে হচ্ছে আসলে প্ৰকাশেৰ ভাষায় ও ভঙ্গীতে, অৰ্থাৎ—
এ দু'দলেৱ আসল পাৰ্থক্য হচ্ছে রীতিগত, ইংৱাজীতে যাকে বলে style,
তাই নিয়ে এঁদেৱ যত দলাদলী। যাঁৱা নিজেদেৱ মডারেট বলেন তাদেৱ

বাক্য প্রধানত করুণ রসাত্মক, আর যাঁরা নিজেদের extremist বলেন তাঁদের বাক্য প্রধানত বৌরুরসাত্মক। এ ত হবারই কথা, কেননা মডারেটরা দেশ উকারের উপায় বা'র করেছেন বুরোক্রাসির সঙ্গে গলাগলি করা, আর extremist-রা উপায় প্রির করেছেন বুরোক্রাসিকে গলাগলি করা। পলিটিক্সে এ উভয় রীতির যে কোনই সার্থকতা নেই, এমন কথা আমি বলি নে, তবে অস্থানে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করলে এই গলাগলিটে আমার কাছে যেমন দৃষ্টিকূট, এই গলাগলিটেও আমার কাছে তেমনি শৃতিকূট হয়ে ওঠে। এই দু'পক্ষের কৃতকার্য্যতার দুটি টাট্কা উদাহরণ নেওয়া যাক। মডারেটরা সেদিন টাউনহলে এক সভা করে যে সব বক্তৃতা করেছিলেন তার স্বর এমন মিনিমনে যে তা শুনে বিজেন্ট্রলালের কথা চুরি করে আমার বলতে ইচ্ছে যায় “সালসা থাও, সালসা থাও”! তারপর extremist দল সেদিন গোলদিঘিতে লর্ড সিংহের পিছনে যে রকম ফেউ লেগেছিলেন তা শুনে আবার বিজেন্ট্রলালেরই কথা চুরি করে দেশের লোককে বলতে ইচ্ছে যায় “ঘটিবাটি সামলা”! আমার মতে আত্মমর্যাদায় জলাঞ্জলি দেওয়ায় যেমন আত্মসংযমের পরিচয় দেওয়া হয় না, তেমনি আত্মসংযমে জলাঞ্জলি দেওয়ায় আত্মমর্যাদার পারচয় দেওয়া হয় না। তার উপর নাকি করুণ ও খেকি-বৌর—এ দু'ই আমার কানে সমান বেছেরো লাগে। রস মাত্রেই ব্যভিচারী হলে বিভৎস হয়ে পড়ে, তা সে ছিঁড়েই যাক আর গেঁজেই উঠুক। জানি যে এ কথায় আমার সঙ্গে শিক্ষিত ভদ্র সন্দায়ের বেশির ভাগ লোক সহানুভূতি করবেন না। কিন্তু কি করা যাবে—শাস্ত্রেই বলে “ভিন্ন কুচিহি লোকঃ”। এ কথা শুনে রাজনৈতিকের দল যদি চটে বলেন যে রাজনীতিতে স্বীকৃতির কোনও স্থান নেই, তাহলে অবশ্য

আমাকে নিষ্কৃত থাকতে হবে। রাজনীতিতে সুনীতির যে কোনও স্থান নেই তার প্রমাণ ত আজকের দিনে মহা মহা দেশের মহা মহা পলিটিসিয়ানরা সকাল-বিকেল দিচ্ছেন, অতএব সুরুচি কোনু দলিলে সেখানে প্রবেশ লাভ করবে ?

মন্ত্রক গে সুনীতি আর সুরুচি। রাজনীতির রাজ্য হতে ও-চুটিকে নির্বাসিত করে দিলেও সেই সঙ্গে বিষয়বুদ্ধিকেও যে গলাধাকা দিতে হবে এমন কথা বর্তমান ইউরোপীয় পলিটিক্সের আদিগুরু স্বয়ং Machiavelli-ও বলেন না এবং একটু ভেবে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, ও দু'দলের কোন দলে যোগ দেওয়াটা আজ সুবুদ্ধির কার্য হবে না। কারণ কালে এ দু'দলের কোন দলই টিকে থাববে না, সত্য কথা বলতে গেলে, এর একটি দল ত ইতিমধ্যে গত হয়েছে। মডারেট দল ত সেদিন আভাস্তা করেছে, সন্তুষ্ট অচিরাং সরকারী স্বর্গ লাভ করবার আশায়। আমাদের পরম্পরার ভিতর নানা বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগ সম্বন্ধে ত কোনরূপ মতভেদের অবসর নেই। যার শরীরে মানুষের চামড়া আছে তার গায়েই ত পল্টনি চাবুক কেটে বসেছে। স্বতরাং অমৃতসহরের দিকে নারা পিঠ ফিরিয়েছেন পলিটিক্যাল হিসেবে তারা যে মৃত্যুকে বরণ করেছেন, সে কথা বলাই বেশি।

তারপর রিফুম্ বিল আমাদের পলিটিক্সের বনেদ নতুন করে প্রস্তুন করেছে। এতদিন আমাদের পলিটিক্স দুই চোখ আকাশে তুলে দাঢ়িয়ে ছিল ইংরাজী বইয়ের উপর, ভবিষ্যতে তার এক পা নামাতে হবে বাঁচলার মাটিতে ; সেই সঙ্গে আমাদের পলিটিক্সের এক চোখ রাখতে হবে প্রভুদের উপর, আর এক নজর দিতে হবে দাসদের উপর। এ ভঙ্গীটি সুদৃশ্যও নয়, সহজসাধ্যও নয়। উপরন্তু অবস্থাটা

হবে টলমলায়মান। কিন্তু উপায় কি? দু-ইয়ারিকি সামলানো ইয়ারিকির কথা নয়। কথার রাজ্যথেকে একধাপ নেমে আমাদের কাজের রাজ্য আসতেই হবে। এ কাজের অন্ত নৃতন দলের দরকার।

(৪)

অঙ্গপর ধরে নেওয়া যাক, যে এদেশে ডিমোক্রাসির গোড়াপত্তন হয়েছে। আর ডিমোক্রাসির অর্থ যে, Sovereignty of the people, এ তথ্য কংগ্রেস সেদিন মুক্তকর্ণে সর্বসাধারণের কাছে ইংরাজি ভাষায় ঘোষণা করেছেন। এখন দেখা যাক people শব্দের অর্থ কি। কোনো দেশের সকল লোক মিলে কথনো একটা people হতে পারে না, এক ভাষায় ছাড়া ; কেননা শিক্ষা দৌক্ষা অর্থ সামর্থ্যের প্রত্তে অনুসারে একটা জাতি নানা জাতিতে বিভক্ত। এবং এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থও এক নয়, সাম্রাজ্যিক স্বার্থসিদ্ধির পথও এক নয়, বরং অনেক স্থলে এদের ভিতর একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের বিরোধী। এই কারণে ডিমোক্রাসির দৌলতে যে রাজশক্তি people-এর হাতে আসে তাও বিভক্ত হয়ে পড়ে, আর কালক্রমে এই বিভিন্ন অংশের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আমাদের দেশেও আজ না হোক কাল তা হবে, যেহেতু তা হতে বাধ্য। সুতরাং এই হস্তান্তরিত রাজশক্তি কোন শ্রেণীর ভাগে কতটা পড়ল সেইটি জানতে পারলেই জানতে পারা যায় যে, এই Sovereignty কোথায় গিয়ে মজুত হল।

সকলেই জানেন, এ তন্ত্রে ভোটশক্তি রাজশক্তি। এই রিফরমেন্ট প্রসাদে আমাদের demos, অর্থাৎ—চাষাভূষণ রাতারাতি কম করেও তের চৌদ্দ লাখ ভোটের মালিক হয়ে উঠেছে আর বাদবাকী আমাদের

সবার কপালে লাখ কতকের বেশি জোটে নি, তাও আবার সম্প্রদায়ে
সম্প্রদায়ে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়েছে।

ফলে দাঁড়াল এই যে, বাঙ্গলার প্রজা অতঃপর হল বাঙ্গলার রাজা।
এর উভয়ের অনেকে বলবেন, দানের রিফরমে জনগণ ত একদম
পুরো রাজহ পেলে না, পেলে শুধু স্বরাজের শিক্ষানবিশী করবার
অধিকার। তথাপি। তাহলে প্রজাবাহাদুর যে ঘোবরাজ্যে অভিষিক্ত
হলেন একথা অস্বীকার করবার আর যো নেই। অতএব আমাদের
ভবিষ্যৎ-পলিটিক্সের কাজ হবে এই যুবরাজের মোসাহেবি করা।
যাঁরা মনে করছেন যে তাঁরা এ ক্ষেত্রে উক্ত রাজা হবুচন্দ্রের মোসাহেবি
না করে তাঁর উপর সাহেবি করবেন তাঁদের ভুল দু দিনেই ভঙ্গবে।
আমরা যা করব সে হচ্ছে এই—আমরা সবাই আমাদের হবুরাজকে
বলব, lend me your ears. কেউ বা সে কান চেপে ধরবার জন্যে,
কেউ বা তাতে মন্ত্র দেবার জন্যে। দু'জনেরই উদ্দেশ্য হবে এক। কান
টানলে মাথা আসে, স্বতরাং প্রজার কর্ণধার হয়ে তাঁর মাথাকে ভোট
আফিসে টেনে নিয়ে যাওয়াই উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়। প্রভেদ যা, তা
উপায়ে। কেউ বা স্বকার্য উক্তার করতে চাইবেন অর্থ বলে, কেউ বা
বাক্য বলে। এ অবস্থাতেও আমাদের পলিটিক্সে আবার দু-দল হবে।
তবে মোটামুটি ধরতে গেলে একদল প্রজারাজকে গালাগালী করবার
জন্যে প্রস্তুত হবেন আর একদল প্রজারাজের সঙ্গে গলাগলি করবার জন্যে
প্রস্তুত হবেন। কিন্তু এ দু'দলেরও পরমায় এক ইলেকসান পেরুবে
কি না সন্দেহ। এই দু-দলের টানাটানিতে ও চেঁচাচেঁচিতে হবুরাজ
যখন চোখ রঞ্জড়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবেন তখন এ দু-দল ভেঙ্গে আবার
ছুটি নতুন দলের স্থষ্টি হবে।

যখন জনগণের তাড়নায় পলিটিস্কের তাস আবার নতুন করে ভাঁজা হবে তখন কালো লাল সব সাহেবগুলো এক দিকে জড় হবে আর কালো গোলাম আর এক দিকে, বলা বাহ্যিক লাল গোলাম এদেশে নেই, সব সাহেব আর টেকা ?—যে মারতে পারে সেই হবে। বিবির কথা উল্লেখ করলুম না এই জষ্ঠে যে, আমাদের পলিটিস্কের নতুন জুয়ো-খেলায় লাল কালো নির্বিচারে বিবি বাদ দেওয়া হয়েছে। গত কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু এর জন্য মনের দুঃখে অশ্রুবর্মণ করেছেন। এ বিষয়ে আমি ঠাঁর সহাশ্চপাতী। এঁদের Communal representation না দেবার কোনোক্রম স্থায়সঙ্গত কারণ নেই। যে সব কারণে নানা সম্প্রদায়কে বিভিন্ন representation দেওয়া হয়েছে, এ ক্ষেত্রে সে সকল কারণ একাধারে বর্তমান। প্রথমত স্ত্রীজাতি যে পুরুষ হতে স্বতন্ত্র জাতি, সে জান পশ্চপক্ষী গাছপালাদেরও আছে। এ জাতিভেদ স্বয়ং ভগবানের হাতে তৈরি। এরা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র চিরস্থায়ী separate community, এবং অন্তত ভারতবর্ষে খাঁটি community. এদেশে পুরুষ যথার্থ পুরুষ না হলেও মেয়ে যে যথার্থ মেয়ে, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়ত এরা অশিক্ষিত। তৃতীয়ত যদিচ এরা দ্বিজমাত্রকেই জন্ম দেয় তবু নিজেরা দ্বিজ হতে পারে না, এরা সব শূন্দি। চতুর্থত এরা অস্পৃশ্য না হলেও Depressed class. পঞ্চমত এরা লাটসভার গৃহসজ্জাক্রপে যে যে পরিমাণ সে সভার শোভাবৃক্ষি করতে পারত অপর কোনও জরিজরাবতপরা পগ্গধারী সম্প্রদায় তার সিকির সিকিও পারবে না। তারপর এদের সঙ্গে আমাদের entente cordiale বহুকালথেকে রয়েছে এবং

কল্পিনকালেও যাবে না। আর এককথা, এঁরা লাট সভায় বসলে গভর্ণমেণ্টকে minister নির্বাচনের জন্য আর ভাবতে হত না। স্ত্রী-মন্ত্রীকে কেউ ঘাঁটাতো না। ও শাসনে আমরা অভ্যন্তর Home Member হবার জন্য ত এঁদের প্রত্যেকেই সবিশেষ উপযোগী। কিন্তু যেহেতু উক্ত মন্ত্রীপদ গভর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রেখেছেন তখন হস্তান্তরিত বিষয়কটির মধ্যে একটির minister ত ভারতরামণীকে অনায়াসে করা যায়, অর্থাৎ—Educational Member! স্বতরাং এত গুণ সঙ্গেও এরা যে সাম্প্রদায়িক ভোট পেলে না, এ দুঃখ রাখবার আর স্থান নেই। তবে কংগ্রেসের দল ভরসা দিয়েছেন যে আমাদের যে-সব দাবী এ ফেরা গ্রাহ হয় নি, অতঃপর সে সবের জন্য তাঁরা তুমুল আন্দোলন করবেন। আন্দোলনটা প্রধানত অবশ্য এই স্ত্রী-ভোটের জন্যই করা হবে তাহলে তাঁরাও এ আন্দোলনে যোগ দিতে পারবেন। তখন আমাদের রাজনৈতিক দোল হয়ে উঠবে ঝুলন। এর চাইতে উল্লাসের কথা আর কি আছে?

সে যাই হোক বর্তমান ক্ষেত্রে অতঃপর একটি বৈশ্বের দল আর একটি শূন্যের দলের স্ফটি হবে। এবং এই দুটি দলের মধ্যস্থতা করবার জন্য প্রয়োজন হবে আর একটি আঙ্গণ দলের, যারা এই পরম্পর বিরোধী শক্তির সামঞ্জস্য করে প্রজাশক্তিকে যথার্থই রাজশক্তি করে তুলতে চেষ্টা করবে।

(৫)

রাষ্ট্রের মূল শক্তিই যে প্রজাশক্তি, একথা বলাই বাহ্যিক। কেননা যে রাজ্যে অধিকাংশ লোক দেহে মনে ও চরিত্রে দুর্বিল, সে দেশে

স্বদেশী রাজশক্তি বলে কোন পদাৰ্থ থাকতেই পাৱে না, সে দেশে
সে শক্তি বিদেশী হতে বাধ্য এবং এযুগে সেই বিদেশের যে বিদেশে
প্রজাশক্তি স্বপ্রতিষ্ঠিত, পুঁজীভূত ও প্রবল।

এখন দেখা যাক আমাদের হবুরাজের বৰ্তমান অবস্থাটা কি।—

প্ৰথম দফা—আজকেৱ দিনে হবুরাজেৱ পেটে ভাত নেই, পৱণে
কাপড় নেই। তিনি নিৱম বলে আমাদেৱ চাইতে যে তাঁৰ ক্ষিধে
কম, মোটেই তা নয়। মেয়েৱা বলে ছোট ছেলেৱা বড়দেৱ তুলনায়
হাতে ছোটবড় হলেও পেটে এক। কথাটা ঠিক কি না জানি নে,
কিন্তু এটি ক্রুৰ সত্য যে ছোটলোকেৱা বড়লোকদেৱ তুলনায় পদে
ছোটবড় হলেও পেটে এক। স্বতুৰাং এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে
কুস্তকৰ্ণেৱ নিৰ্দাভজ হলে সব প্ৰথমে সে খেতে চাইবে এবং তাৰ
অন্য যথেষ্ট অংশেৱ ব্যবস্থা কৱতেই হবে, কেননা মুখেৱ কথায় কাৱলও
পেট ভৱে না, হোক না সে কথা যেমন বিশাল তেমনি রসাল, যেমন
প্ৰচুৱ তেমনি মধুৱ। সমগ্ৰ জাতিৱ দিক ধেকে দেখলেও এদেৱ
ৱসদেৱ স্বৰাবস্থা কৱা ছাড়া উপায়ান্তৰ নেই, কেননা অন্তই হচ্ছে
প্ৰাণ।

দ্বিতীয় দফা—হবুরাজেৱ অন্ত বন্দেৱও ব্যবস্থা কৱতে হবে। পলি-
টিসিয়ানদেৱ মতে আমাদেৱ এই গৱমেৱ দেশে বেশি কাপড়েৱ দৱকাৱ
নেই, কথাটা ঠিক; কিন্তু বেশি না হোক কিছু কাপড় চাই ত, নেংটি
কখনো রাজবেশ হতে পাৱে না! যাতে লঙ্ঘা নিবাৱণ হয় না
তাৰ সাহায্যে রাজাৱ মৰ্যাদা রক্ষা কৱা যায় কি কৱে? তা ছাড়া
মন্ত্ৰী গবুচন্দ্ৰ যখন আমাজোড়া পৱে বৱবেশ ধাৱণ কৱবেন তখন
ৱাজা হবুচন্দ্ৰ ডোৱকোপীন ধাৱণ কৱতে আদপেই রাজী হবেন না।

আত্মসম্মান জ্ঞানও ইচ্ছে মানবের একটি সামাজিক শক্তি—এবং উক্ত জ্ঞান প্রধানত বস্তুজ ।

তৃতীয় দফা—হবুরাজের পেটে ভাত না থাকলেও পিলে আছে। এবং সেপিলে অতি প্রবৃক্ষ, মাপে প্রায় পেট্রিয়টদের হৃদয়ের তুল্যমূল্য। কিন্তু পিলেতে পেট মোটা হলে হাত পা সব সরু হয়ে আসে। তারপর পিলের আর এক দোষ এই যে, যে কেউ যখনতখন তাকে চমকে দিতে পারে। স্বতরাং হবুরাজকে যদি মানুষ করে তুলতে হয় তাহলে তার উদরপ্রতি অতিস্ফীত প্রিহাকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্টি করবার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য চাই, পরিষ্কার জল, ধোলা হাওয়া, ডাক্তার এবং ঔষুধ। যে-দেহে স্বাস্থ্য নেই, সে-দেহে ও সে-মনে যে শক্তি নেই, এর প্রমাণ ত আমরা হাড়ে হাড়ে পাই ।

চতুর্থ দফা—হবুরাজ এখন একদম নিরঙ্কুর। পলিটিসিয়ানরা বলবেন যে রাজা বাহাদুরের পেটে বিছে না থাক মাথায় বুকি আছে। এ কথার প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক। বিষ্ঠাবুকি অবশ্য এক বস্তু নয়। বুকির পরিচয় না দিয়ে বিছের পরিচয় যে লোকে দিতে পারে, তার পরিচয় ত এদেশের আইন-আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যে ও সংবাদ পত্রে নিত্যনিয়মিত পাওয়া যায়। কিন্তু জাতির এ অবস্থা ত আর চিরদিন থাকবে না। একদিকে যেমন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে কিঞ্চিৎ বুকিবৃত্তির চর্চা করতে হবে, আর একদিকে তেমনি আমাদের জনগণকে কিঞ্চিৎ বিছাচর্চা ও করতে হবে। বিষ্ঠাবুকি এক বস্তু না হলেও ও-ছয়ের যোগাযোগ না হলে দু-ই ব্যর্থ হয়। জ্ঞানও ইচ্ছে একটি শক্তি এবং সমগ্র জাতির অন্তরে সে শক্তির স্থিতি করতে হবে। অপর কোনও কারণে না হোক, স্বজাতির আত্মসম্মান জন্যও হবুরাজকে

কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শেখানো দৱকাৰ। রাজা মুখ হলে এত খামখেয়ালি হন যে রাজ্যেৱ দিনে ছুবাৱ ওলটপালট হয়।

অতএব অবস্থা দাঢ়িয়েছে এই যে, এই নালায়েক হুৱাইজের আজকে আমৱা উছি হয়েছি, তাৰ শিক্ষাৱ ও স্বাস্থ্যৰক্ষাৱ ভাৱ বৃটিশৱাজ আমাদেৱ হস্তে সমৰ্পণ কৱেছেন। কিন্তু সব আগে আমাদেৱ কৰ্তব্য হচ্ছে তাৰ ভৱণপোষণ অশনবসনেৱ ব্যবস্থা কৱা। তেল-মুন-লকড়িৱ সংস্থান সৰাৱই চাই এবং অধিকাংশ লোকেৱ ও-ছাড়া আৱ কিছুই চাই নে। মানুষ যদি বেঁচে না থাকে ত বড় হবে কি কৱে? আৱ ব্যক্তিবিশেষেৱ পক্ষে যা সত্য, আতিবিশেষেৱ পক্ষেও তাই সত্য। একটা জাতি কতকগুলো ব্যক্তিৰ সমষ্টি বহু ত আৱ কিছুই নয়। এখন ভেবে দেখুন ত এই রিফৱম আমাদেৱ ঘাড়ে কি বিৱাট কৰ্তব্যেৱ ভাৱ চাপিয়েছে।

সত্তা কথা বলতে গেলে এ কৰ্তব্য সম্যকৱপে পালন কৱবাৱ শক্তি আমাদেৱ একৱকম নেই বলৈই হয়। প্ৰথমত বাকপটুতা ও কৰ্মকৌশল এক বিষ্টে নয়। যাৱ ধড়ে এৱ প্ৰথম গুণ আছে তাৱ ধড়ে বিতীয়টি না থাকতেও পাৱে এবং না থাকবাৱই বেশি সন্তাৱনা। বিতীয়ত দেশৱ লোকেৱ মনেৱ ও দেহেৱ খোৱাক জোগানেৱ পক্ষে দেশৱ অবস্থা প্ৰতিকূল। কেন কি বৃত্তান্ত তা বোৰাতে হলে রাজনীতি ছেড়ে আমাকে অৰ্থনীতিৰ বিচাৱ শুৱ কৱতে হবে। সে আলোচনা আমাৱ অধিকাৱ বহিভূত। তবে পলিটিসিয়ানৱা সে আলোচনা নিশ্চয়ই তুলবেন, কেন না সকল বিষয়েই তাদেৱ সমান নৈসৰ্গিক অধিকাৱ আছে! আমি আন্দাজ কৱছি যে আমাদেৱ পলিটিসিয়ানৱা যথন এ বিষয়ে মুখ থুলবেন তখন দেখা যাবে যে তাদেৱ

মুখ দিয়ে উদগীর্ণ হচ্ছে ছেরেফ্ ধূম। এত হবারই কথা, তাদের অন্তর যে বহুমান সে কথা তারাই বলেন। পলিটিস্টের সে ধূম পান করে দেশের লোকের মাথা ঘূরে থাবে। ও ধূমপানে বেচারায়া ত আমাদের মত অভ্যন্ত নয়। কাজেই তারা নেশার খেয়ালে হাতি ঘোড়া কিনবে কিন্তু “যো হাতি মোলেগা ওত তুরস্ত চলা যায়েগা।” তার পর? এস্বলে আমি একটি ভবিষ্যত্বাণী করে রাখছি যে বাঙালী পলিটিসিয়ানদের ইকনমিস্টের মূলসূত্র হবে ইকনমি, অর্থাৎ—স্থাকামি।

স্বজ্ঞাতির প্রতি কর্তব্যপালন করবার জ্ঞান ও শক্তি আমাদের দেহে আজ না থাকলেও কাল তা সঞ্চয় করা কঠিন হবে না। কিন্তু তার জন্য চাই উক্ত কর্তব্য পালন করবার আন্তরিক প্রযুক্তি, যা ভদ্র সমাজের অধিকাংশ লোকের ভিতরে আজ ষষ্ঠেষ্ঠ পরিমাণে নেই। আমাদের সমাজ আমাদের ইতিহাস উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের দেহে যে মন গড়ে তুলেছে সে মন সমাজকে গণতান্ত্রিক করে তোলবার পক্ষে একান্ত প্রতিকূল। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে সে মনের এ বিষয়ে প্রতিকূলতা অনেকটা কমে এসেছে বটে কিন্তু তাই বলে তাকে আজও নৌচুকে উঁচু করবার অনুকূল করে নি। একথা যে সত্য তার পরিচয় ইংরাজি আইডিয়ার আবরণ ভেদ করে নিজের নিঘের মনের দিকে তাকালে ইংরাজি শিক্ষিত ভদ্রসন্তান মাত্রই অবিসম্মত পাবেন।

শুভরাঃ আমরা যদি সত্য সত্যাই স্বজ্ঞাতিকে স্বরাট করতে চাই তাহলে সব আগে আমাদের কর্তব্য হবে নিজের নিজের মন বদলানো, চরিত্র বদলানো এবং তার অন্ত চাই বহু পূর্ব-সংস্কার, বহু অভ্যন্ত মত, বহু সক্ষীর্ণ ধারণা বর্জন করা। কিন্তু এ পরামর্শ দেওয়া যত

সহজ, মেওয়া তত সহজ নয়। যে সকল ভাব যুগ্যুগের দাসত্বের আওতায় আমাদের মনের অন্তর্কল পর্যাপ্ত শিকড় নামিয়াছে এক দিনে সেই আগাছাগুলিকে সমূলে উপরে ফেলবার জন্য যে পরিমাণ মনের সাহস ও শক্তি চাই তা আমাদের নেই। অথচ আমরা যদি আত্মকে আত্ম মানুষের মত মানুষ হতে চাই তাহলে এ অসাধ্য সাধন আমাদের করতেই হবে। আর এই মন বদলাবার ভার পড়বে বিশেষ করে সাহিত্যের হাতে, স্বতরাং সাহিত্যিকরা যদি সব পলিটিক্সের মোক্ষার হয়ে ওঠেন, সাহিত্য যদি পলিটিক্সে লৌন হয় তাহলে দেশ আজ যে তিমিরে আছে কালও সেই তিমিরেই থাকবে। অতএব নবীন সাহিত্যিকদের কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ যে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ক্ষত্রিয় তাঁরা মনোজ্ঞগতের চতুর্পদদের উপর তাঁর চালান, হোক না তাঁদের পদগৌরব যত বেশি, আর যাঁরা ব্রাহ্মণ তাঁরা ধ্যানবলে মায়ের সর্বললামভূতা যৌবনাট্যা অপাপবিক্ষা অনবদ্ধাঙ্গী মানসীমূর্তি গড়ে তুলুন যে আদর্শমনশচক্ষুর স্বরূপ দেশের কর্মীর দল ভারত-সভ্যতার সেই আগ্রহপ্রতিমা গড়ে তুলবে—বিশ্বমানব যা পূজা করতে প্রস্তুত হবে।

আমি কিন্তু এখন চললুম সাহিত্য ছেড়ে পলিটিক্সে যোগ দিতে, তবে যদি কোন পলিটিক্সের স্কুলে, বয়েস বেশি হয়ে গিয়েছে বলে আমাকে ভর্তি না করে, তাহলে যেখানে ছিলুম সেখানেই আবার ফিরে আসব, অর্থাৎ—সাহিত্য ও পলিটিক্সের মাঝামাঝি একটা আয়গায়।

বীরবল।

টিকা ও টিপ্পনী ।

————— :: —————

বিজেস্বলাল একবার বড় দুঃখে বলেছিলেন “বলিত হাসব
না” ইত্যাদি ।

কিন্তু তাঁর সে দুঃখের কথা শুনে দেশমুক্ত লোক হেসেছিলেন ।
কিন্তু যে-কেউ কথনো হাস্ত্যবর্জন করবার জন্য স্থিরসংকল্প হয়েছেন
তিনিই জানেন যে বিজেস্বলালের দুঃখ কতদূর মর্মান্তিক । দেশের
লোক আমাদের কিছুতেই ঠোটের উপর ঠোট দিয়ে থাকতে দেবে
না । তাঁরা থেকে থেকেই এমন কথা বলবে, এমনি অঙ্গভঙ্গী করবে
যাতে করে আমরা দস্তবিকাশ করতে বাধ্য হব ।

দেশের এই ছোটবড় জাট দরবারগুলোতে থেকে থেকেই যে
সব প্রহসনের অভিনয় হয় তা দেখে যিনি হাস্তসন্ধরণ করতে পারেন
তিনি হয় মুক্তপুরুষ, নয় জড় পদার্থ ।

এই দেখনা সেদিন সেখানে কি কাণ্ড ঘটল । বড়লাটের রাজপাট
কোঢায় বসানো হবে তাই নিয়ে সেদিন সেখানে তুমুল আলোচনা,
আৱ ও ঘোৱ তর্ক হয়ে গেছে ।

• প্রস্তাব ছিল দুটি ।—

প্রথম—জাটপাট যেখানে হোক এক আয়গায় গাড়া উচিত ।
ডেৱাডাণা নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুৰে বেড়ান্টা বে-সরকারী মেমৰদের
মতে যেমন অর্থহীন তেমনি অর্থসাপেক্ষ । রাজাৰ পক্ষে সম্ভাসীৰ

আচরণ এদেশে শোভা পায় না—কেননা এর একজন হচ্ছেন সমাজের কেন্দ্রস্থল আর একজন তার বাইরে।

এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেকে মহাবক্তৃতা করেছিলেন কিন্তু সরকারী অবাব হ'ল—যখন রাজাসন বাঞ্ছনির মাটী থেকে তোলা হয়েছে তখন permanent settlement-এ সরকার আর রাজি নন।

এর পর যখন ভোট নেওয়া হল তখন দেখা গেল যে, যাঁরা এ প্রস্তাবের পক্ষে মহা ওকালতি করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই তার বিপক্ষে ভোট দিলেন।

এ ব্যাপার দেখে যাঁর চোখে অল আসে তাঁর আস্তুক আমার কিন্তু বেজায় হাসি পায়।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—রাজধানী যেখানে ছিল সেখানেই ফিরিয়ে আনা হোক, অর্থাৎ—কলিকাতায়। দিল্লির আব-হাওয়া নাকি শুধু শরীরের পক্ষে নয়, মনের পক্ষেও মারাত্মক। অপর পক্ষে কলিকাতা সহরে ম্যালেরিয়া নেই আর যদিও থাকে ত বস্তিতেই আছে—বড়লোকের ঘরে তা বড় একটা চুক্তে পারে না আর সাহেবলোকের ঘরে মোটেই পারে না। তারপর মনের আব-হাওয়া এ সহরে যতটা চাঙ্গাকর, ইংরেজীতে যাকে বলে bracing, ভারতবর্ষের অপর কোথাও ততুল্য নয়। বোম্বাই সহরে হাওয়ার ভিতর কলের ধোয়া ঢুকেছে, দিল্লিতে কবরের ধূলো আর মান্দাজের মনোবায়ুর মধ্যে অঙ্গিজেন নেই।

এ প্রস্তাবের স্বপক্ষে অনেকে মহা মহা বক্তৃতা করলেন। এর উত্তরে সরকারী জবাব হল, “তোমরা যা বলেছ সে সবই ঠিক, বিশেষত ঐ মানসিক অলবায়ুর কথা। কলিকাতার যত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর থেকে দূরে থাকায় সরকার কি বিরহ বেদনা সহ করছেন তা সরকারই

জানেন, তবে কি না গতস্ত শোচনা নাস্তি। বড় লাটি বধন কলিকাতাকে একবার তালাক দিয়েছেন তখন তাকে আবার নিকে করা অসম্ভব, বিশেষত যখন তার থরচা বেজায়।”

এ জবাবের নির্গলিতার্থ পুনর্মূঘিক হতে কোন সিংহই রাজি হয় না, উপত্রিতিশ সিংহও নয়।

এর পর যখন ভোট নেওয়া হল তখন দেখা গেল, যাঁরা এ প্রস্তা-
বের স্বপঙ্কে মহাওকালতি করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই তার বিরুক্তে
ভোট দিলেন। লাটসভায় আমরা মুখ খুলি এক দিকে আর একদিকে
হাত তুলি। এ ব্যবহার দেখে যাঁর কান্দতে ইচ্ছে যায় তিনি কানুন,
আমি কিন্তু না হেসে থাকতে পারি নে।

(২)

লাটসভা দিল্লিতেই বসুক আর ফতেপুর শিকরীতেই বসুক তাতে
আমার কিছুই যায় আসে না, কেবল সে সভায় আমি কখনো বসব না।
এ ত আর আকবর বাদশার সরবার নয় যে বৌরবল সেখানে উচ্চাসন
পাবে! কিন্তু লাটপাট কলিকাতায় কায়েম হলে একটি কারণে খুসি
হতুম।—

লাটদরবারে দেশী মেছুরেরা নানাকৃতি সেজেগুজে যে নানা ছাঁদে
অভিনয় করেন তাতে আমার কোনই দুঃখ নেই কিন্তু দুঃখ এই যে
বাড়লার বড় এলগু দিল্লির মরুভূমিতে সব ক্রমায়তে।

আজ ছুদিন হয় নি, পাটেল বিলের বিচারস্থলে কাশিমবাজারের
মহারাজা মনোক্রচন্দ্ৰ নন্দী ও হাটখোলার শ্রীযুক্ত সৌতানাথ রায়
মুক্তকষ্টে বলেছেন যে, বাড়লা মেশে nobody who is any body

পাটেলবিলের স্বপক্ষে। আমি হলপ করে বলতে পারি যে লাট-দরবার কলিকাতায় বসলে উক্ত দরবারীযুগল এ হেন উচ্চভাষ কখনই করতে পারতেন না, কেন না এ সত্তা তাঁদের কাছে কিছুতেই অবিদিত থাকতে পারে না যে, বাঙ্গলার শ্বুঙ্গি তাঁদের কথা হেসে উড়িয়ে দিতো।

তবে একথা আমাকে স্মীকার করতেই হবে যে, নন্দী-রায় কোম্পানি লাটসভায় যে প্রশ্ন করেছেন তাৰ উত্তৰ দেওয়া স্বধূ কঠিন নয়; একেবাবে অসম্ভব। আমৱা কেউ বলতে পারি নে আঢ়কেৱ দিনে বাঙ্গলায় somebody কে ? কেননা somebody-হ যে কিসেৱ উপৱ নির্ভৱ করে, শিক্ষা-দীক্ষাৱ উপৱ না বংশাবলীৱ উপৱ, জাতিৱ উপৱ না গুণেৱ উপৱ, বাক্পটুতাৱ উপৱ না কৰ্মশৰ্তাৱ উপৱ, টাকা ধাৱ দেওয়া না নেওয়াৱ সামৰ্থেৱ উপৱ, টিকিৱ উপৱ না টেড়িৱ উপৱ ? এ সব প্ৰশ্নেৱ জবাব আমৱা কেউ কৰতে পারি নে। অতএব আমৱা মানতে বাধ্য যে বাঙ্গলায় অন্ত তাৰিখে nobody is anybody.

অপৱ পক্ষে আমৱা দেখতে পাই রাম শ্যাম যদু হৱি প্ৰতোকেই somebody হয়ে উঠেছেন। যঁৰ বিষ্টে নেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েৱ কৰ্তৃপক্ষদেৱ দলভুক্ত হচ্ছেন, যিনি কোন ভাষাই জানেন না তিনি সকল ভাষাতেই বক্তৃতা কৰুছেন, যঁৰ রোকড়ত্যান বাতৌত অপৱ কোনও বইয়েৱ সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নেই তিনি সাহিত্যেৱ সমালোচনা কৰছেন, শূদ্র শাস্তি ব্যাখ্যা কৰছে, নবশাখ আঙ্গণ সমাজেৱ গোষ্ঠীপতি হয়ে উঠেছে। অতএব একথাও আমৱা মানতে বাধ্য যে বাঙ্গলায় অন্ততাৱিখে everybody is somebody.

এই প্রমাণ যে ইংরাজি শিখেও ইংরাজি শাসনের ফলে হিন্দুসমাজ একদম ভেঙ্গে গেছে, শাস্ত্রসঙ্গত ও আচারগত উচ্চনৌচের অধিকার ভেদ কার্য্যত কেউ মানে না ও কেউ কাউকে মানাতে পারে না। যে জাতিহুন্দ প্রথা সমাজে ঢিলে হয়ে গেছে সেই প্রথা আইনে কশে রাখবার বিরুদ্ধে পাটেলবিল হচ্ছে একটি প্রতিবাদ মাত্র। অতএব উক্ত বিলের বিপক্ষতাচরণ করা সমাজে প্রোমোশন প্রাপ্ত somebody-দের পক্ষে শোভা পায় না। তবে সংসারের নিয়মই এই যে, যার পক্ষে যা শোভা পায় না তাই করতে সে চির উত্তৃত। এ ব্যাপারের একটি বিলেতি নজির দেখাচ্ছি। বেশি দিনের কথা নয় ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর লোকে গির্জেজয় গিয়ে ভগবানের কাছে যে এই প্রার্থনা করত—

“God bless the squire and his relations
And keep us in our proper stations”—

এ কথা ইংলণ্ডের লোক আজ বিশ্বাসই করতে পারে না। স্বতরাং আশা করা যায় যে Squire-এর জায়গায় আঙ্কণ বসিয়ে আজ অন্তর্বাসনেরা ইংরাজরাজের কাছে যে ঐ স্তবই পাঠ করছেন, ভবিষ্যতে বাঙালী সে কথা বিশ্বাসই করতে পারবে না, অবশ্য ভবিষ্যৎ বলে এ দেশের যদি কিছু থাকে। ইতিমধ্যে আমরা একটু হেসে নিই।

(৩)

আমাদের শিক্ষিত সমাজে হরেক রকমের অনুত্ত ঔৰ আছে কিন্তু এদের মধ্যে সব চাইতে অনুত্ত হচ্ছে টিকিওয়ালা ডিমোক্রাট। লোক হাসাতে এঁরা অস্বিতৌয়। একটা জলজ্যান্ত উদাহরণ নেওয়া ষাক।

মেদিনকের লাটেন্সবারে সবাইকে অবাক করেছেন M. R.

Ry. রঞ্জস্বামী আয়েজাৱ। উক্ত ইংৰেজি অক্ষর ক'টি সাটে
কি বলতে চায় জানি নে। আমাৱ একটি সংক্ষেতজ্ঞ বক্তু বলেন,
“ওৱ অৰ্থ Madras Rohilkund Railway.” এ ব্যাখ্যা
আমি গ্ৰাহ কৰি। ভৌগোলিক হিসেবে উক্ত দুই প্ৰদেশেৰ
সাঙ্গাংসঙ্গকে কোনও যোগাযোগ না থাকলেও ঐতিহাসিক হিসেবে
আছে। রামচন্দ্ৰ অযোধ্যা থেকেই কিঞ্চিক্ষাতে গিয়েছিলেন এবং
সেইসূত্ৰে উত্তৱাপথেৰ সঙ্গে দক্ষিণাপথেৰ যে মিলন হয় সেই
মিলনেৰ ফল হচ্ছে দ্বাৰিড়াক্ষণ—তাই দ্বাৰিড়াক্ষণ মাত্ৰেৰই
মাথায় M. R. Ry. ছাপ মাৰা থাকে।

উপৰোক্ত রঞ্জস্বামী একজন দুর্ধৰ্ষ extremist. রাজনীতিৰ
ক্ষেত্ৰে লিবাড়াটি ইকোয়াড়িটি ও ফেড়াটাড়নীটি এই কথা ক'টি
ইনি এবং এৰ দলবল এমনি তাৱস্বৰে ঘোষণা কৰেন যে তা
কুনলে ভুলে যেতে হয় যে এ দেশটা ভাৱতবৰ্ষ আৱ এ কালটা
বিংশ শতাব্দী। মনে হয় আমৱা সশৰীৱে ১৭৮৯ খন্তাদেৱ প্যারি
নগৱে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। অথচ এঁৱা পাটেল বিলৱ ষথন নাম
শোনেন তথন “গেল ধৰ্ম” “গেল সমাজ” বলে সমান তাৱস্বৰে আহি
পবননন্দন বলে চীৎকাৱ কৱতে পুনৰ কৱেন। তথন এঁদেৱ উচ্চবাচ্য
শুনে মনে হয় যে আমৱা থ্ক্টপূৰ্ব অক্তোদশ শতাব্দীৰ অক্ষাৰভৰ্তে গিয়ে
উপস্থিত হয়েছি। শৈযুক্ত সচিদানন্দ সিংহ দুঃখ কৱে বলেছেন যে
এই পৱন্স্পৱ বিৱোধী মতামত কি কৱে এক অনুৱে বাস কৱতে
পাৱে তা তাৱ বুকিৱ অগম্য। দ্বাৰিড়লজিকেৱ থেই সিংহ মহাশয় যে
ধৰতে পাৱেন না এ কথা শুনে আমি আশৰ্য্য হই নি, কেননা তিনি
উত্তৱাপথেৰ লোক। দক্ষিণাপথ ষথন নিঅমূৰ্তি ধাৰণ কৱে তথন সে

মুক্তি দেখে আমাদের চমকে উঠবাই কৰা। তবে স্নাবিড়আঙ্গণেরা কেন বে উল্টোপাণ্টী কথা বলেন, সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে ইংরেজি বচন কেন যে মেলাতে পারেন না তার কারণ ও-হুই হচ্ছে তাদের মুখ্য বুলি, ওর একটিও তাদের নিজস্ব ভাষা নয়। তা ছাড়া তাদের ভাষার সঙ্গে, কি আমাদের কি ইংরাজের ভাষার কোনই সম্পর্ক নেই, কেননা এ দুটিই হচ্ছে আর্ধ্য ভাষা এবং তামিল অন্ধ্য। তাই ইংরেজি তাদের মনে ঢোকে না, ঠোটের উপরই থেকে থায়, আর সংস্কৃতও তাদের মনে ঢোকে না, কর্ণাঙ্গ হয়ে তাদেরকে ষন্তবৎ চালায়। এইদের কথা পরিষ্কার বোধ থায় যখন এঁরা তামিল বলেন। আজকের দিনে স্নাবিড়শূন্দ্ররা কি বলছে সে কথা কি কারো বুক্তে বাকী আছে? স্নাবিড়আঙ্গণের বিকলে স্নাবিড়শূন্দ্রের এই বিস্তোহের কারণ, দক্ষিণ-পথের শূন্দ্রেরা জানে বে তারা শূন্দ্র, সে দেশের আঙ্গণেরা সে দেশের অআঙ্গণদের এ বিষয়ে অস্ত থাকতে দেয় নি। স্বধু তাই নয়, স্নাবিড়আঙ্গণগণ স্বদেশে আকারা পেয়ে আমরা তাদের অনুরূপ শূন্দ্রপীড়ন করিবে বলে আমাদের বাঙালী আঙ্গণদেরও তামিল শূন্দ্রের সামিল করেছেন। এস্বলে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করে থাকতে পারছি নে।

আজ বছর দেড়েক আগে বড়লাটের দরবারের জনৈক স্নাবিড়আঙ্গণ মেম্বর একদিন বাঙালির জনকয়েক আঙ্গণ-সন্তানকে ‘ল-ড়য়োর ভেদাঙ্গক’ ইংরাজি ভাষায় ঘোর আক্রমণ করেছিলেন। তিনি একজন দুরস্ত ডিমোক্রাট, তাই বেচারা বাঙালীদের বিকলে তার অভিযোগ ছিল এই বে তাদের অন্তরে ডিমোক্রাটিক মনোভাব মোটেই জন্মায় নি। মানুষে মানুষে বে কোনই প্রভেদ নেই, সবাই বে সমান

স্বাধীন, সবাই যে সমান প্রধান, এই সত্য সকলের মনে বসিয়ে দেবার জন্য তিনি “ভাড়াটেয়াড়” কি বলেছেন “ড্ববসোপিয়েড” কি বলেছেন সেই সব কথা অনগ্রহ আউড়ে যাচ্ছিলেন। বকতে বকতে তাঁর জল-পিপাসা পেল, জল এল কিন্তু তা পান করবার সময় তিনি বিনা বাক্য-ব্যয়ে নববধূর মত অবগুণনবতী হলেন। কেন জানেন? — পাছে বাঙালী ভাস্করের অনার্যা দৃষ্টিপাতে তাঁর পানীয় জল অপেয় হয়ে ওঠে! তিনি তাঁর পিপাসা নিবারণ করে ঠাণ্ডা হবার পর আমি তাঁকে বলতে বাধা হলুম, “মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে”। তিনি প্রশ্ন করলেন, “কি প্রমাণ”? আমি উত্তর করলুম, “প্রমাণ ত স্মৃথেই রয়েছে। আপনাতে আমাতে প্রভেদ বিস্তর। ও ঘোমটা আমি কখনই দিতে পারতুম না, কেননা ওরপ ঘোমটা দেওয়ায় ভদ্রসমাজে আভিজাত্যের নয় নির্জন্জতার পরিচয় দেওয়া হয়।” বলাবাহ্ল্য এর পর আমাদের আলোচনা আর এগুলো না, রুশে দাঁতের মতামতের মাজাজিভাষ্য শোনবার স্থয়োগে আমরা বক্ষিত হলুম।

(৪)

এছলে আমার একটি নিবেদন আছে। একথা যদি সত্য হয় যে ভবিষ্যৎ অতৌতের জের টেনে চলে, তাহলে ভারতবর্ষের নব-সভ্যতা উন্নয়নথের লোকদেরই গড়ে তুলতে হবে, এ দায় আমাদের পৈতৃক, ধর্ম বলো, নীতি বলো, জ্ঞান বলো, বিজ্ঞান বলো, কাব্য বলো, দর্শন বলো, রাষ্ট্র বলো, সমাজ বলো সেকালে সবই বিক্ষ্য-পর্বতের উত্তর ভূতাগেই জন্মলাভ করেছে অতএব ভবিষ্যতেও করবে। ইংরাজির সঙ্গে সংস্কৃত আমরাই মেলাতে পারব, কেননা

ও-দুই হচ্ছে আর্যভাষা, অর্থাৎ—ও-দুই হচ্ছে আর্যমনের শব্দেহ। আমরা যদি ভারতবর্ষের নব সভ্যতা গড়ে তুলতে পারি তাহলে দক্ষিণাপথ সে সভ্যতার দেহার টিকাভাষ্য লিখবে। এই হচ্ছে উগবানের বিধি।

কেউ যেন মনে না করেন যে আমি দ্রাবিড় জাতির উপর কোনোরূপ কটাক্ষপাত করছি। দ্রাবিড় সভ্যতা আমার কাছে অজ্ঞাত এবং সন্তুষ্ট অঙ্গেয়, স্মৃতিরাং তার দোষগুণ বিচার করতে আমি অপারগ। কিন্তু আমার কাছে যা অঙ্গেয় নয় অবজ্ঞেয়, সে হচ্ছে মাদ্রাজি আর্য্যামি। মাদ্রাজি শুন্দের আমি যেমন ভক্তি করি তেমনি ভয়ও করি। দেখতে পাচ্ছি তারা যেখানে আছে সেখানে আর থাকতে রাজি নয়, তারা উঠতে চায় একলক্ষ্মে একেবারে লাট-দরবারে। অতএব আশা করা যায় যে, রিফরম দরবারে মাদ্রাজের মনের খাঁটি কথা পাওয়া যাবে। আর খাঁটি কথাকে আমি চিরকালই ভক্তি করি।

তবে ভয়ের কথা এই যে উচ্চপদস্থ হলে মানুষের মেজাজ উঁচু হয়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আবিষ্কার করেছেন যে আর্য্যত্ব মানুষের রক্তে নেই—আছে তার পদে ও মস্তিষ্কে। দ্রাবিড় শুন্দ ও depressed class যখন লাটসভায় ঢুকবে তখন তারা আঙ্গণের সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে বসে যাবে। এ অবস্থায় আঙ্গণের ছোঁয়াচ লেগে তারা খুব সন্তুষ্ট ভৌষণ আর্য্যামিগ্রস্ত হয়ে উঠবে। তারপর পাটেল বিলের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করবে! তাদের ভবিষ্যৎ বক্তৃতার কথা সব আজ আমার কানে আসছে। আমি দিব্যকর্ণে শুনতে পাচ্ছি ভারতবর্ষের যত অস্পৃশ্য জাতির প্রতিনিধিরা সমবেত সমন্বয়ে ও তারস্বত্বে বলছেন—

“আমাদের আর্য পিতামহরা যে ধর্মশাস্ত্র রচনা করেছেন, যে বর্ণাশ্রম-প্রথার তাঁরা স্থিতি করেছেন, তার উপর হস্তক্ষেপ করলে সমাজ যাবে, ধর্ম যাবে, হিন্দুর হিন্দুত্ব যাবে, তারপর পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উঠবে, আর আমাদের এই আধ্যাত্মিক সত্যতা আধিভৌতিক হয়ে পড়বে।”

এহেন বক্তৃতা শুনে যিনি হাসি চাপতে পারেন—তিনি নিশ্চয়ই একজন somebody—আমি পারি নে কেননা আমি হচ্ছি nobody.

বীরবল ।

ইহাৱ তুলনা কোন মুগে নেই, তবুও এটি আমাদেৱ মুগেৱ
বাহিৰেই পড়িয়া আছে, ইহাৱ প্ৰতাৰ আমাদেৱ মুগেৱ উপৱ থুব
অল্লই। একটা সূল জড়বাদ ক্ৰমে জমে মানুষকে যেন চালাইয়া
লাঈতে চাহিতেছে, সাক্ষাৎ কাজেৱ হিসাবেই সব জিনিষেৱ মূল্য
নিৰ্ণ্যাত কৱিয়া দিতেছে। সৌন্দৰ্যবোধকে বা শুধু কৌতুহলকে
চৱিতাৰ্থ কৱা ছাড়া যে জিনিষেৱ অন্ত কোন সাৰ্থকতা নাই, তাৰাকেই
একপাশে ঠেলিয়া ফেলিতেছে। ঘৰ-গৃহস্থালীৱ ভাৰনা চিন্তা লাইয়া প্ৰাণীন
অনসজ্ঞ থুব কমই বাপৃত থাকিত, বৰ্তমানে তাৰাই কিন্তু হইয়া পাঢ়-
মাছে মহে অনুষ্ঠান। আমাদেৱ পিতৃপুৰুষদেৱ পুৱুষৰাচিত প্ৰমাণ
সমূহেৱ স্থান অধিকাৰ কৱিয়াছে যত তুচ্ছ ক্লেশ। যে ধৰ্মৰ বা যে
ত্ৰুণাদেৱই ভাষায় বলি না কেন, মানুষ ইহজগতে আছে ভোগেৱ
লুভেৱও উপৱে একটা অতীন্দ্ৰিয় আদৰ্শেচিত লক্ষ্যৰ অন্ত। এই
লক্ষ্যটিৱ কাছে পৌছাইয়া দিতে আধিভোতিক উন্নতি আমাদিগকে
সাহায্য কৱিয়াছে কি? আগেৱ তুলনায় মানুষ মোটেৱ উপৱ
বেশি বুদ্ধিমান, বেশি চৱিত্ববান, স্বাধীনতাৰ জন্ম বেশি লালামুত,
সুন্দৱ জিনিষেৱ উপৱ বেশি আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কি? ইহাই
জিজ্ঞাসা। উন্নতি হইতেছে, বিশ্বাস কৱা যাইতে পাৱে; কিন্তু তাই বলিয়া
কৃতক গুলি সুখসুবিধা হইবে এই আশায় অনুঃকৰণকে ছোট হইতে দেখিয়াও
যে লজ্জা পায় না, উন্নতিৱ প্ৰতি তাৰার মত দারুণ অভিবিশ্বাস না
থাকিলেও চলে। মানবজীৱন স্পৃহনীয়, কেননা মানবজীৱনেৱ আছে
একটা অৰ্থ, একটা মূল্য যাহাকে হাৱাইয়া এই সুখসুবিধা লাভ কৱাকে
প্ৰয়োজন উন্নতিকাৰী মানুষ কখন যথেষ্ট মনে কৱিবেন না।

সত্য বটে, আধিভোতিক উন্নতি হেয় নয়; দুইটি সমাজ যিৱি

ବୁଲିତେ ଓ ଚରିତ୍ରେ ସମାନ ହସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏକଟିତେ ସଦି ଥାକେ ସାହିକ ଉନ୍ନତିର ସହଳ ବିକାଶ, ଆର ଏକଟିତେ ସଦି ତାହା ନା ଥାକେ, ତବେ ନିଃସମ୍ବେଦିତିରେ ପ୍ରଥମଟିକେଇ ଭାଲ ବଲିଯା ଗ୍ରହଣ କରିତେ ହେବେ । ତବେ ସେ କଥାଟା ମାନିଯା ଲାଗ୍ଯା ଉଚିତ ନୟ ତାହା ଏହି ସେ, ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ନୈତିକ ଅବନତିର କ୍ଷତିଟା ପୂରଣ କରିଯା ଦିତେ ପାରେ । ସମାଜ ସେ ହରବଳ ହେଯା ପଡ଼ିତେଛେ ତାର ଚିହ୍ନ ଆମରା ଏକେବାରେ ନିଃସମ୍ବେଦିତ ପାଇ ତଥନ, ସଥନ ଦେଖି ବଡ଼ ଉଦେଶ୍ୟ ଲାଇଯା ବ୍ଲ୍ଲ୍କ ଆର ନାହିଁ, ଫଳେ ସଥନ ବ୍ୟବସାୟାଣିଙ୍ଗ୍ୟ ଓ ଦଣ୍ଡବିଧାନେର ସମଞ୍ଜ୍ଞାର ତୁଳନାୟ ମହା ରାଜନୈତିକ ସମଞ୍ଜ୍ଞା ସବ ଗୋଟିଏ ହେଯା ପଡ଼ିଯାଛେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରିଇ ଆବନ-ଇତିହାସେ ଏମନ ଏକଟା ପ୍ରଲୋଭନେର ସମର ଉପର୍ଦ୍ଵିତ ହୟ, ସଯତାନ ସଥନ ତାହାକେ ଜଗତେର ସମ୍ପଦ ଦେଖାଇଯା ଦିଯା ବଲେ, “ଏ ସବେଇ ତୋମାକେ ଦିବ, ଆମାକେ ସଦି ପୂର୍ବା କର ।”

ତାଇ ବଲିଯା ନୈତିକବଳ ସେ ସକଳ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗେରଇ ସାଧାରଣ ସମ୍ପଦି ଛିଲ, ଏ ଅତ୍ୟକ୍ରିୟା ସେବା ଆମରା ନା କରିଯା ବସି । କାରଣ, ଚିରକାଳ ଓ ଜିନିଯ ଛିଲ ଅନ୍ଧ କମ୍ପେକ୍ସନେରଇ ଅଲକାର । ସ୍ଵଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଏକ ଅଭିଜାତ-ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟେଇ ଶୁଣ୍ଟ ରହିଯାଛେ ମାନୁଷେର ମହତ୍ତ୍ଵ; ଏଇ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀ ବାଚିଯା ଥାକିବାର, ଆପନାକେ ଛଡ଼ାଇଯା ଦିବାର ଆବହାୟା ପାଇତେଛେ କି ନା, ମେହି ଅନୁସାରେଇ ଶ୍ରୀ କରିତେ ହେବେ ମାନ୍ୟଜାତିର ଧର୍ମବଳ ସାଡିତେଛେ ନା କମିତେଛେ । ଫଳତ ଏ କଥା କେହ ଅସ୍ତ୍ରୀକାର କରିତେ ପାରିବେ ନା ସେ, ବ୍ୟବସାୟାଣିଙ୍ଗ୍ୟର ମହା ବିଷ୍ଟାର ବ୍ୟବସାୟର ନୟ ସାହାରା, ଅର୍ଥାତ୍—ପୁରୀକାଳେ ଶାହା-ଦିଗକେ ବଲା ହିତ ସନ୍ତ୍ରାନ୍ତ (noble) ତାହାଦେର ଉପର ଏକଟା ବିପୁଲ ଦାବି ଥାଢା କରିଯା ଜଗତକେ ସେବ ନିଜେର ଛାଁଚେ ଢାଲାଇ କରିଯା ଫେଲିତେଛେ । ଆଧୁନିକ ସମାଜେର ଏକଟା ଅଲଜ୍ୟ ନିଯମେର ଭାଡଣାଯ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୟାକ୍ଷି ସେ ପ୍ରତିଭା ସା ସେ ମୂଳଧନେର ଅଧିକାରୀ ହେଯାଛେ ସେଟିକେ ଥାଟାଇଯା ଲାଇତେ ଜ୍ଞମେଇ

বাধ্য হইয়া পড়িতেছে, টাকার হিসাবে যে ব্যক্তি কিছুই উৎপাদন করিতেছে না তাহার জীবন ঘাতা অসম্ভবই হইয়া উঠিতেছে। নব্যতন্ত্রের দলভুক্ত কেহ কেহ এই পরিণামটি শীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে যতদিন তাঁহাদের মত সব শ্রেণীই বৈশ্য না হইয়া উঠে ততদিন বৈশ্যবৃত্তি কোন না কোন শ্রেণীর পক্ষে অনিষ্টকর হইবে। এ রূপম অবস্থা যদি চরমে যাইয়া পৌঁছে (অবশ্য আগি মানি তাহা কথনো ঘটিবে না), তবে তাহার ফল হইবে এই যে, যাঁহাদের কর্মটি হইতেছে আর্থিক সুবিধার কাছে অস্তরের স্বাধীনতাকে কথনো বলি না-দেওয়া, তাঁহাদের পক্ষে এ পৃথিবী আর বাসের যোগ্য থাকিবে না—এ কথা কে না বুঝিবে? শিল্পকে তুমি ব্যবসাদার করিয়া তুলিবে, সে কি জ্ঞেতার হৃকুম অনুসারে, মুক্তি গড়িবে, না ছবি আঁকিবে? ইহার অর্থ কি এই নয় যে উচুদরের শিল্পকে একেবারে প্রত্যাখান করা? এ শিল্প ত, যে-শিল্প তৃচ্ছভাব ও ইতর ঝটির সঙ্গে মিশ ধাইয়া চলে, তাহার স্থায় লাভের নয়। জ্ঞানীকে তুমি ব্যবসাদার করিয়া তুলিবে, তিনি কি সাধারণের জন্ম গ্রহ রূচনা করিতে থাকিবেন? কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে রূচনা যত মূল্যবান হয় তাহার পাঠকও তত কম হইতে বাধ্য। আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, তিনি আবার সেই সঙ্গে ছিলেন গুণিপূর্ণ, নাম তাঁর ‘আবেল’ (Abel), তিনি ত দারিদ্র্যেরই মধ্যে প্রাণ হারাইলেন। স্বতরাং মানুষের কয়েকটি শ্রেষ্ঠস্থিতি সম্বন্ধে, এ কথা স্পষ্টই দেখা যায় যে কাজের মূল্য আর তাঁর পরিশ্রমের মূল্য, এই দুইএর মধ্যে আছে একটা বিপুল অসামঞ্জ্ব্য, অথবা আরও ঠিক বলিতে গেলে, কাজের মূল্য আর পরিশ্রমের মূল্য, এ দুটি চলে বিপরীত

অনুপাতে। ফলে দাঢ়াইল এই যে, যে-সমাজে স্বাধীন জীবন কঠিন হইয়া পড়িতেছে, যেখানে সাধারণের প্রয়োজন অনুসারে যে উৎপাদন করে সে, যে কিছুই উৎপাদন করে না তাহাকে পদদলিত করিয়াই চলিয়াছে, সে-সমাজে পরিশেষে সকল উচ্চবৃত্তির লোপ পাইয়া বসে, অর্থাৎ—সে-সমাজের উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়া পড়ে। মধ্যযুগ এই সত্ত্বে এতদুর অনুপ্রাণিত হইয়া গিয়াছিল যে তখন এমন উচ্চট ব্যবস্থাও দেওয়া হয় যে দারিদ্র্যও একটা সংগ্ৰহ, আধ্যাত্মিক কৰ্মে ভূতী ঘিণি, তিনি ভিক্ষা দ্বাৰাই জীবনযাপন কৰিবেন। এ মতে স্বীকার কৱা হইয়াছিল যে জগতে দাম দিয়া কেনা যায় না এমন জিনিষও আছে; বাহিরের কোন মূল্য দিয়াই ভিতরের বস্তুকে নিৰূপণ কৱা যায় না, আৱ অন্তরোত্তাৰ অন্ত যে সেবা, তাহার এমন কোন পারিশ্রমিকই নাই যাহাকে বেতন নাম দেওয়া যাইতে পারে। খন্দীয় চার্ক যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখাইয়া এই নীতিটিই খরিয়া রযিয়াছে; অৰ্থ দিয়া তাহার দাবি যে চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, একথা সে কখনও স্বীকার কৰিবে না, সে বলে সে চিৰদিনই গৱীব। সমস্ত অঙ্গাণের অধিকারী হইলেও সে বলিতে থাকিবে, জড়বস্তু বিষয়ে, সে কিছুই চাহে না, চাহে শুধু সেণ্টপল যাহা চাহিয়াছেন— গ্রামাঞ্চাদন।

অড়বস্তুর উপর মানুষের আধিপত্য যে বাড়িয়া উঠিয়াছে ইহা একটি স্পষ্ট লাভ, এদিক দিয়া আমাদের যুগের যে উন্নতি হইয়াছে তাহাকে প্রশংসা কৰিতেই হইবে। কিন্তু এ রূক্ম উন্নতি ষদি প্রকৃতিৰ বাধাসমূহের উপরে অযৌ কৰিয়া মানুষকে আপন আদর্শ সাধনের সহায়তা কৰিতে পারে তবেই শুধু তাহার পূৰ্ণ সার্থকতা। প্রয়োজনের ভোগের জিনিষকে পৃথিবীৰ অপৰ প্রাপ্ত হইতে মুহূৰ্তমধ্যে

এ অঞ্চের উভয়ে মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত ট্রেচি সাহেব
লেখেন :—

“অধিকার বলতে আমরা যা বুঝি, এদেশের অনসাধারণের ক্ষিন্কালেও
যে তা ছিল একপ বিখাস আমার নয়। সত্য কথা বলতে গেলে, তাদের
কোনোক্রম অধিকার নেই, কোনোক্রম স্বাধীনতা নেই। যদি কোথায়ও দেখা
যাব যে তারা স্বত্ত্ব শাস্তিতে বাস করছে তার অর্থ এ নয় যে, তাদের স্বত্ত্বে
থাকবার কিছি শাস্তিতে থাকবার কোনোক্রম অধিকার আছে। ও-হই বস্তু
হচ্ছে তাদের শাসনকর্তাদের দ্বারা বরস্তুক্রম। শাসনকর্তারা উচিত জ্ঞান কিম্বা
স্বার্থজ্ঞানের বশবন্তী হয়ে তাদের উপর যদি জুলুম জবরদস্তি না করেন তাহলেই
তারা নিজেদের কৃতার্থ এবং অঙ্গুগ্রহীত মনে করে” — (Fifth Report, Vol.
II, page 596.)

একথা যে সত্য তা কে অঙ্গীকার করবে ? একটু চোখ-চেয়ে দেখলে
সকলেই দেখতে পাবেন যে, আজকের দিনেও অধিকার সম্বন্ধে তারা
যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই আছে। আজও লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবন-
যাত্রা উপরওয়ালাদের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে। হজুরের
মেহেরবানি ও ধর্মাবতারের অনুগ্রহের জন্য আজও এদেশে লক্ষ লক্ষ
লোক লালাপ্তি।

মানুষের এই অধিকারজ্ঞান আমাদের দেশে ভুঁইফুঁড়ে ওঠে নি,
সাগরপার থেকে আহাজে চড়ে এসেছে। মনুষ্যহের দাবী আমরা
ইংরাজি শিক্ষার শুণে করতে শিখেছি। সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র পড়ে দেখ
তাতে আছে শুধু কর্তব্যের কথা, অধিকারের ‘অ’ পর্যন্ত তাতে নেই।
মানুষমাত্রেরই অধিকারের কথা (Rights of man) ইউরোপেও সেদিন
উঠেছে, এই ফরাসী-বিপ্লবের সময় থেকে। ও-জ্ঞান কোনো সমাজেই
পুরাতন নয়। আমরা যে ভাবি ও-জ্ঞান সনাতন, তার কারণ আমরা

জয়েছি এই জ্ঞানের আবহাওয়ার ভিতর, আৱ ইংৰেজি স্কুলে চুকে পৰ্যন্ত এই বস্তু হয়েছে আমাদেৱ মনেৱ নিত্য নিয়মিত খোৱাক। ইংলণ্ডেৱ ইতিহাসেৱ মত তাৱ কাব্য সাহিত্যও স্বাধীনতাৱ গক্ষে ভূৱভূৱ কৱছে; সুতৰাং ও-বস্তুৱ আগে অৰ্ক ভোজন আমাদেৱ সৰাৱই হয়ে গেছে।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদেৱ প্ৰথম ও প্ৰধান কৰ্তব্য হবে জনসাধাৱণেৱ মনে তাদেৱ অধিকাৱেৱ জ্ঞান চুকিয়ে এবং বসিয়ে দেওয়া। ওৱ থেকে পালাৰাৰ জো নেই, কেননা সে পালানো হবে আমাদেৱ সৰ্বপ্ৰধান কৰ্তব্য থেকে পালানো। কেউ কেউ অবস্থা বলবেন যে ও আমাদেৱ মোটেই কৰ্তব্য নয়, কেননা আমৱা পৱেৱ অস্ত ডিমোক্ৰাসি চাই নি, নিজেৱা হতে চেয়েছিলুম স্বদেশী বুৰোক্ৰাসি। পলিটিসিয়ানদেৱ অনেকেৱ নজৰ বে দেশেৱ দিকে নয়, সিমলাৰ উপৱ ছিল সে কথা আমৱা জানি। সেই কথাটা স্পষ্ট কৱে বললে গোল ত চুকেই বেত।

“অচল বলিয়া উচল সেবিশু
পড়িশু অগাধ অলে”—

অবস্থাটা যদি সত্য সত্যই তাই হয়ে থাকে ত ভদ্ৰলোকেৱ পক্ষে সে কথা চেপে ধাৰণাই শ্ৰেয়। সুতৰাং কি চেয়েছিলুম আৱ না-চেয়েছিলুম, তা নিয়ে হা-হৃতাশ কৱা নিষ্ফল। ঘটনা যা হটেছে তাতে চাষাৱ ভোট দিন দিন বাড়বে বই কমবে না, সুতৰাং পলিটিক্যাল হিসেবে লোকশিক্ষাৱ ভাৱ আমাদেৱ হাতে নিতেই হবে। অতএব প্ৰোগ্ৰাম চাই।

(৩)

(অধিকার সামগ্র্য ও বিশেষ)

এ পর্যন্ত বোধহয় আমরা সকলেই একমত। কিন্তু আর বেশি এগোবার আগে অধিকার কথাটাৱ ঠিক মানে যে কি তা বোৰবাৰ একটু চেষ্টা কৱা যাক। এ চেষ্টা ফুজুল নয়, কেননা কথাটা হচ্ছে ধ্যার্থবাচক।

আমি এই খানিকক্ষণ হ'ল বলেছি যে, আমাদেৱ ধৰ্মশাস্ত্ৰে মানুষকে শুধু তাৱ কৰ্তব্য সম্বন্ধে হয় আদেশ কৱা হয়েছে, ময়ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সে শাস্ত্ৰে ধৰ্ম বলতে বোৰায় বিধি-নিষেধ-সম্বলিত বচন, অৰ্থাৎ—মানুষকে কি কৱতে হবে আৱ কি না কৱতে হবে, তাই আনন্দো হচ্ছে ধৰ্মশাস্ত্ৰেৰ কাজ। এক কথায় ধৰ্মশাস্ত্ৰ হচ্ছে কৰ্তব্যাকৰ্তব্যোৱা শাস্ত্ৰ।

সে শাস্ত্ৰে এই ধৰ্ম আবাৱ ছ'ভাগে বিভক্ত। শাস্ত্ৰেৰ ভাষায় দু-ৱকম ধৰ্ম আছে, এক সামাজিক ধৰ্ম আৱ এক বিশেষ ধৰ্ম। চুৱি কৱো না, খুন কৱো না, পৱনাৱ হৱণ কৱো না—এসব হচ্ছে সামাজিক ধৰ্মৰ কথা, কেননা এ সকল আক্ষণ-শূল নির্বিচারে সকলেৱ পক্ষে সমান মান্য। অপৰ পক্ষে বেদপাঠ কৱা আক্ষণেৱ ও আক্ষণেৱ সেবা কৱা শূলৰ বিশেষ ধৰ্ম। আমাদেৱ ধৰ্মশাস্ত্ৰে সামাজিক ধৰ্মৰ কথা এক ব্লকম উহু বলয়ে গিয়েছে। মেধাতিথি বলেন, যে-ধৰ্ম সৰ্বসাধাৰণ তাৱ বিশেষ কৱে উল্লেখ কৱবাৱ প্ৰয়োজন নেই, কেননা ধৰে নেওৱা ষেতে পাৱে যে সে-ধৰ্ম সৰ্বলোকবিদিত। অপৰ পক্ষে বাইবেলে ধিন্দুখ্যক্তেৱ সব উপদেশই সামাজিক ধৰ্মগত। টাকা ধাৰ

নিলে, কি হারে সুন্দর দিতে হবে সে বিষয়ে যিশুগ্রীষ্ট সম্পূর্ণ নীরব। অর্থাৎ—আমাদের ধর্মশাস্ত্র হচ্ছে আইন আৱ বাইবেল হচ্ছে নীতিকথা।

বলাবাহল্য এই সামাজিক ধর্ম ও বিশেষ ধর্মের ভিতর দা-কুমড়োর সম্পর্ক নেই, এছয়ের উপরই সভ্য সমাজের ভিত্তি। বাইবেলে বিশেষ ধর্মের কথা উহু রয়ে গিয়েছে কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয় নি। কেননা যিশুগ্রীষ্ট এককথায় এ বিষয়ে সব কথা বলেছেন, “সিঙ্গারের প্রাপ্য তাকে দিয়ো”, অর্থাৎ—আইন মেনে চলো।

তারপর কর্তব্য ও অধিকার হচ্ছে দুটি আপেক্ষিক শব্দ। শৃঙ্গের পক্ষে ব্রাহ্মণের সেবা করা যদি কর্তব্য হয় তাহলে শৃঙ্গের কান ধরে সে সেবা আদায় করবার অধিকার ব্রাহ্মণের নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং এ দু’-ই পরম্পর পরম্পরকে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাচীন সভ্যতা ও নব সভ্যতার ভিতর আসল প্রভেদ এই যে, সেকালে লোক একমাত্র কর্তব্যটাই মানুষের চোখের স্মৃতি থাঢ়া করে রাখত, একালে বিশেষ করে অধিকারিটাই আমরা থাঢ়া করতে চাই।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই কথাটা স্পষ্ট করা যে, কর্তব্যের মত অধিকারও দুভাগে বিভক্ত, এক সামাজিক অধিকার আৱ এক বিশেষ অধিকার। খুন করবার অধিকার যেখানে বাবো নেই, বেঁচে থাকবার অধিকার সেখানে সবাই আছে, এই হচ্ছে মানুষের সামাজিক অধিকারের প্রথম দফা। কিন্তু তুমি আন, আমি আনি আৱ সবাই আনে ফাঁসি দেবাৱ, অর্থাৎ—মানুষের প্রাণবধ করবাব বিশেষ অধিকার State-এর আছে, অর্থাৎ—সমাজ যখন প্রাণহিংসাৰ বিশেষ অধিকার বিশেষ বিশেষ লোককে কিন্তু সম্প্রদায়কে দেয় তখন তা হয় বৈধহিংসা। অতএব

সামাজ্য অধিকারের কথাগুলো অনেক অংশে ফাঁকা, মন্ত হলেও সঁপা।

এখন আমার কথা এই যে মানুষের পক্ষে তার বিশেষ অধিকারের জ্ঞানটাই হচ্ছে তার পক্ষে সবিশেষ দরকারী। মানুষের সঙ্গে মানুষ মাত্রেরই একটা দূর সম্পর্ক অবশ্য আছে কিন্তু প্রতি লোকের, কোনো কোনো বিশেষ লোকের সঙ্গে যে বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাই নিয়েই তার জীবন। বাপ ও ছেলে, স্বামী ও স্ত্রী, মুনিব ও চাকর, এদের প্রস্তরের ভিতর কর্তব্য ও অধিকারের নানা রূক্ষ বিশেষ বন্ধন আছে। এবং সেই সব অধিকারের উপর দাঁড়িয়েই সামাজিক লোকে সংসার চালায়। এ স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যিক। মোটামুটি ধরতে গেলে এ সব ক্ষেত্রে যে প্রবল, অধিকারটা বেশি করে তার হাতেই থাকে আর যে দুর্বল কর্তব্যটা বেশি করে তার ঘাড়েই পড়ে। আর এই দেনা-পাওনার হিসেবটা যতদূর সম্ভব দু-দিকে সমান করে নিয়ে আসাটা এ যুগের পলিটিস্টের সর্বিপ্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব জনসাধারণের মনে প্রধানত তাদের বিশেষঅধিকারের জ্ঞান জমিয়ে দিতে হবে এবং সামাজ্য অধিকারের কথা সেই স্থলেই পাঢ়তে হবে যেখানে আমরা তাদের অধিকার বাঢ়াতে চাইব। যা আছে সেই টুকুকে শুধু রক্ষা করার অর্থ স্থিতি, উন্নতি নয়। কিন্তু আমরা সবাই উন্নতি চাই, এ-ও হচ্ছে এ যুগের মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা। বিশেষ অধিকারের নিঃসম্পর্কিত সামাজ্য অধিকারের ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে জনসাধারণকে ভোগা দেওয়া। সে দিন কংগ্রেস মানুষ মাত্রেরই সামাজ্য অধিকারের ফর্দি ধরে দিয়েছেন। পলিটিসিয়ানরা যদি দেশের

মানুষের বিশেষ অধিকারসকল তার স্বার্থের সঙ্গে অভিত। স্মৃতিরাং তার স্বার্থ যে কোথায় এবং কি উপায়ে সেই স্বার্থের রক্ষা ও বৃক্ষি করা যেতে পারে, সেই জ্ঞান দান করতে পারলেই আমরা তাদের পলিটিক্যাল শিক্ষা দান করতে পারব। আপনার কড়াগণটা বুঝে নেবার ক্ষমতাটা ও মানুষের একটা শক্তি, আর শক্তিই হচ্ছে সকল উন্নতির মূল। কেবলমাত্র অনসাধারণের দিক থেকে নয়, সমগ্র আতির দিক থেকে দেখলেও, যাতে অনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয় সেই চেষ্টা করাটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হবে। আদমশুমারিতে অনসাধারণই হচ্ছে অসংখ্য আর অসাধারণ অন, অর্থাৎ—জন্মলোকের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। আর যে আতির বেশির ভাগ লোক দুর্দশাপন্ন সে আতির কি শব্দীরে কি অন্তরে কোনো শক্তি ও নেই, কোনো উন্নতির আশা ও নেই।

স্মৃতিরাং বাজনৈতিক ভাবের বিলেতি আকাশ থেকে বাঞ্ছলার মাটিতে নেমে এসে দেখা যাক, সে দেশের অবস্থাই বা কি আর দেশ-বাসীদেরই বা অবস্থা কি? অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার সুবিধে হবে। আমরা সকলে লাটিদুরবারে চুক্তে চাচ্ছি শুধু বেউচিত ব্যবস্থা করবার অস্ত্র, তা সে দুরবারের নামেই প্রকাশ। কে না আনে সে সভার নাম ব্যবস্থাপক সভা।

ছেলেবেলায় কথামালায় পড়েছিলুম যে জৈনক হক কৃষক তার ছেলেদের ডেকে বলেন যে তার ক্ষেতে ধনরত্ন পৌতা আছ। সেই ধনরত্নের লোভে তার ছেলেরা সেই ক্ষেত আগামোড়া খুঁড়ে ওলট-পালট করলে; কিন্তু পৌতাখনের কোথায়ও সাক্ষাৎ পেলে না, তবে এই খোড়ার কলে এই ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত কসল অশ্বাল।

আমাদের বাংলা দেশ হচ্ছে এই রকমের একটি প্রকাণ্ড কৃষকের ক্ষেত্র, ওয়ার বুকের ভিতর কোনো গুপ্তধন পৌঁতা নেই, ও-ক্ষেত্রে শুধু ফসল জন্মায়। বাংলা দেশ যে সোনার খনি নয়, এ বলে কোনো দুঃখ করবার দরকার নেই, কেননা আবাদ করতে জানলে এ জমিতে আমরা সোনা ফলাতে পারি। আর খনির সোনা হ'দিনেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু আবাদের সোনা অফুরন্ত ও চিরদিন ফলে।

বাংলা দেশ যে শস্ত্রক্ষেত্র এই সত্ত্বের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান জমিতে সার দিয়ে! তারা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর-মন যদি অসার হয় তাহলে জমিতে সার দিয়ে দেশের ক্ষেত্রে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদোর পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানব জমিন আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই তাহলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানব জমিনের আবাদ করা। এবং তার অন্য দেশের অনসাধারণের মনে রস ও দেহে রস্তা—এ হুই জোগাবার অন্য আমাদের যা-কিছু বিছাবুজ্জি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে। এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক। আগামী ইলেকসানের অন্য সেই প্রোগ্রাম তৈরী করতে হবে, যার উদ্দেশ্ট হবে, বাংলার কৃষকের ওপরে বাংলার জাতির অবস্থার উন্নতি করা। একটা সমগ্রজাতির দুরবস্থা দূর করা যে কঠিন, এবং তা করবার সকল উপায় যে আমাদের হাতে নেই একেবা আমি সম্পূর্ণ আনি। আমি শুধু বলি যে, যেটুকু আমাদের সাধ্যের অতীত নয়, সেইটুকু করবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে কেননা সে চেষ্টার ফল ভাল না হয়ে যাব না।

(৫)

(কৃষকের অবস্থা)

ইলেকসানের প্রোগ্রাম অবশ্য পলিটিসিয়ানদেরই তৈরী করতে হবে, কেননা দেশ উকারের ভাব তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছভাবে নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। অতএব কৃষকের অবস্থার যাতে উন্নতি হয় সেই মধ্যে প্রোগ্রাম তৈরী করা অবশ্য আমাদের পলিটিসিয়ানদের পক্ষেই কর্তব্য। তাঁদের নিজের স্বার্থের দিক থেকে দেখলেও এ কর্তব্য তাঁরা অবহেলা করতে পারবেন না। গাঁয়ে যাঁকে মানে না তাঁর পক্ষে দেশের মোড়লি করা আর চলবে না। তবে এ প্রোগ্রাম তাঁরা তৈরী করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

আমি না হই তুমি যখন আধ আধ কথা কইতে, সেই কালে বঙ্গিমচন্দ্র অতি স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে :—

“জমিদারের ঐশ্বর্য সকলেই আনেন, কিন্তু যাহারা সংবাদপত্র লিখিবা, বক্তৃতা করিবা বঙ্গসমাজের উকারের চেষ্টা করিবা বেড়ান তাহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন”—

বঙ্গিমের ঘূর্ণে পলিটিসিয়ানদের অভিভাব যা পরিমাণ ছিল ইতিমধ্যে তা যে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য, কেননা ইতিমধ্যে বাঙলার ভদ্রলোকের মধ্যে জমি থেকে টের বেশি আলগা হয়ে পড়েছে। এখন এ সম্প্রদায় টিঁকে আছে চাকরি, ওকালতি ও ডাক্তারীর উপর। ডাক্তারী-কেরাণীগিরির সঙ্গে জমি-জমার কোনই সম্পর্ক নেই, আছে শুধু ওকালতির সঙ্গে। আমাদের উকিল সম্প্রদারের সম্পদ অবশ্য জমিদার ও রাজ্যভৱের বিরোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু Bengal Tenancy জানা এক কথা আৱ Bengal Tenantry জানা আৱ এক কথা। এৱে একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞ হয়ে আৱ একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। আমাৱ বিশ্বাস বেশিৱভাগ সহৱে উকিলৱা কৃষকেৱ অবস্থা সবিশেষ অবগত নন। আৱ যাঁৱা জানেন তাঁৱাও কৃষকেৱ ব্যথাৱ ব্যথী হতে পাৱেন কিন্তু তাৱ কথাৱ কথক নন। বাঙ্গলাৱ উকিলেৱ দল জমিদাৱেৱ মিত্ৰপক্ষ। এঁৱা যে একমাত্ৰ জমিদাৱেৱ অন্মে প্ৰতিপালিত তা অবশ্য নয়। জমিদাৱ ও রায়ত উভয়েই এঁদেৱ মকেল; অতএব এঁৱা গাছেৱাও পাড়েন তলাৱ-ও কুড়োন। তবে তিল কুড়িয়ে তাল কৱাৱ চাইতে গোটা তাল হাতে পাওয়া চেৱি আৱামেৱ ও আহলাদেৱ কথা। ফলে এঁদেৱ লুক-দৃষ্টি উপৱেৱ দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয় এবং আৱ নামে না। অথচ এই দলেৱ লোকই হচ্ছেন আমাৱেৱ পলিটিক্সেৱ ল্যাঙামুড়োছ-ই। পলিটিসিয়ানৱা প্ৰজাৱ হয়ে কোনোৱুপ দাবী কৱতে প্ৰস্তুত নন, আমাৱ এ বিশ্বাস যদি অমূলক হয় তাহলে তাৱ অস্ত প্ৰধানত পলিটিসিয়ানৱাই দায়ী। মডারেট, একট্ৰিমিষ্ট কোন দল খেকেই অস্থাৱধি কোনো প্ৰোগ্ৰাম বাৱ হয় নি এবং তা বাৱ কৱবাৱ তাঁদেৱ যে কোনুৱুপ অভিপ্ৰায় আছে তাৱ কোনুৱুপ অভিবাসও তাঁদেৱ কাছ থেকে পাওয়া যাব না।

শুনতে পাই যে মডারেট দল জমিদাৱদেৱ সঙ্গে সক্ষি কৱবাৱ চেষ্টায় ফিরছেন। তাঁদেৱ নাকি বিশ্বাস যে, নায়েৰ গোমস্তাৱ সাহায্যে তাঁৱা প্ৰজাৱ ভোট আদাৰ কৱতে পাৱেন, উপৱস্থ জেলাৱ হাকিম ও পুলিশেৱ Co-operation-এৱ উপৱাও তাঁৱা ভৱসা রাখেন। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে তাঁদেৱ প্ৰোগ্ৰামেৱ কোন প্ৰয়োজন নেই। “ঝোৱ যাৱ ভোট তাৱ” এই হচ্ছে তাঁদেৱ প্ৰোগ্ৰাম।

এ বিষয়ে Extremist দলের মত আনবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সে চেষ্টার কোনো ফল হয় নি। এ দলের দু-চারজন কর্ত্তাব্যস্থির সঙ্গে আমার এ বিষয়ে যে কথাবার্তা হয়, তা প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য এই যে, লাট-দৱবারে তাঁরা চুকলে বাঙলা দেশকে সেই দেশে পরিণত করবেন ধে-দেশে আমাদের মেয়েরা খোকাবাংবুর বিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ—যে-দেশে—

“লোকে গাই বলদে চৰে ।

দাঁতে হৌরে ঘষে ;

কই মাছ পালঙ্গের শাক ভাবে ভাবে আসে”—

এ উদ্দেশ্য যে অতি মহান সে বিষয়ে কোনই সম্মেহ নেই কিন্তু সম্মেহ আছে তার উপায় নিয়ে। স্বদেশকে “ধনে ধান্তে পুঁপে ভৱা” করে তোলবার উপায় সম্বন্ধে এঁরা নীরব। এ ধরণের কথা আমাদের মুখেই শোভা পায়, কেননা ছেলেভুলোনো ছড়া ভাল করে বাধতে আমরাই পারি। কবিতা কবিতাতেই করা কর্তব্য, ও-জিনিস গঢ়ে ধাপ খায় না। আর পলিটিক্সের তুল্য ঝুনো গঢ় এক আইন ছাড়া আর কিছু নেই। সে যাই হোক, এঁদের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে আমার মনে এই সম্মেহ জমেছে যে, কি উপায়ে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে, হয় তাঁদের কোনও মত নেই আর না হয়ত সে মত এখন তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। তবে এ বিষয়ে কথা তুললে তাঁরা যে স্বকর্ম অসোঘাস্তি বোধ করেন ও বিরক্তি প্রকাশ করেন তাতে মনে হয় তাঁরা একটু উভয়-সংস্কৃটে পড়েছেন। প্রজার উপকার করতে

প্ৰস্তুত কিঞ্চিৎ প্ৰজাকে কোনো অধিকাৰ দিতে রাখি নন এমন লোক
সকল সমাজেই আছে। এই মনোভাবকেই না বুৱোকৃষ্টিক মনোভাব
বলে? তবে এ কথা ও ভোলা উচিত নয় যে আমাদেৱ স্থাসনলিষ্টৰা
আপাতত বিদেশী বড় পলিটিক্যু নিয়ে এতটা ব্যস্ত আছেন যে স্বদেশী
ছোট পলিটিক্যু মন দেৱাৰ তাদেৱ একদম কুৱসৎ নেই। বড়
পলিটিক্যুৰ কাৱবাৰ অবগু রাজৱাজড়া নিয়ে। মানুষে যখন মুখে
ৱাজা উজিৱ মাৰতে বসে তখন কি কত ধানে কত চাল হয় তাৰ
ভাবনা সে ভাবতে পাৰে?

(রাস্তেৱ প্ৰোগ্ৰাম)

দেশেৱ পলিটিসিয়ানৱা যখন এ বিষয়ে ঔদাসিশ দেখাচ্ছেন তখন
ষা হোক একটা একমেটে প্ৰোগ্ৰাম তৈৱো কৱবাৰ চেষ্টা কৱা যাক।
মদি কেউ বলেন :—

“যাৱ কৰ্ম তাৱ সাজে
অন্ত লোকে লাঠি বাজে” —

তাৱ উন্নৱ, রায়তেৱ ভাবনা ভাৰা বাঙালী সাহিত্যকেৱ পক্ষে যে
অনধিকাৰ চৰ্চা নয়, এৱ ভাল ভাল নজিৱ আছে। বাঙালীৰ মধ্যে
যে-শ্ৰেণীৰ লোকদেৱ আমৱা শুন্দৰ বলে মাশু কৱি তাৱা সকলেই
প্ৰজাৱ ব্যধাৰ ব্যধী এবং সে ব্যথা তাৱা কথায় প্ৰকাশ কৱেছেন।
ৱাজা রামমোহন রায়, বঙ্গিমচন্দ্ৰ, রবীন্দ্ৰনাথ সবাই প্ৰজাৱ হয়ে
ওকালতি কৱেছেন। এ বিষয়ে কথা কইবাৰ এই হচ্ছে আমাৱ
ধিতীয় দলীল।

তুমি আমি বখন বালক সেই কালে বঙ্গিমচস্ত্র বাঞ্ছনার প্রজার
অবস্থা বিচার করে এই সিঙ্কাণ্ডে উপস্থিত হলেন যে রায়তকে যে-
অবস্থায় আমরা রেখেছি তার কল ত্রিবিধঃ—

দারিজ্ব্য, মূর্খতা, দাসত্ব

তারপর তিনি আবার বলেন যেঃ—

“ঐ সকল কল একবার উৎপন্ন হইলে, ভারতবর্ষের গ্রাম দেশে প্রাকৃতিক
নিয়মগুণে স্থানিক লাভ করিতে উন্মুখ হয়”।

বঙ্গিমচস্ত্রের কথা যে কত সত্য তার প্রমাণ আজকের দিনেও
বাঞ্ছনার রায়তের দল দরিদ্র, মূর্খ ও দাস।

তারা যে মূর্খ সে বিষয়ে ত আর কোনো মতভেদ নেই।
তারপর তারা আইনত না হলেও বস্তুত যে দাস, “ক্রীতদাস” না হলেও
যে “গর্জদাস” এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। জীবনের অধিকাংশ
ক্ষেত্রে আজও তারা নিজের অধিকারের উপর দাঁড়াতে পারে না,
প্রভুর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অবশ্য ইংরাজের আইন
তাদের অনেক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সে শুধু নামে। Tenancy
Act আজকের দিনে অধিদারের হাতে সজীব অস্ত্র। প্রজাকে
হয়রান করতে চাও, নাজেহাল করতে চাও, জেরবার করতে চাও
ত করো উচ্ছবের মামলা, সত্ত্বের মোকদ্দমা, জমাবৃক্ষির নালিশ,
ফসলক্ষণকের দরখাস্ত, মায় ড্যামেজ বাকী খাজানার নালিশ, আর
তার ভিটেমাটি উচ্ছবে দিতে চাও—কর তার নামে বাকীপড়।

তবে যে প্রজা টিঁকে আছে তার কারণ বেশির ভাগ অধিদার
আইনের মাঝে রায়তদের মাঝেন না, তাছাড়া মুনসেফ বাবুরা অধিদারের

দাখিলী কাগজ, তা সে জমিদারই হোক সুমারেই হোক, পাইৱপক্ষে
আমাণ্য বলে আহ কৰেন না। আৱ আমলা-ফয়লাৱ এজাহাৰ বে
বিলকুল খেলাপ এই হচ্ছে হাকিমেৰ দৃঢ় ধাৰণা। এইঁৱা যে
জমিদারেৱ প্ৰতি সব সময় স্ববিচাৰ কৰেন তা নয়, তবে প্ৰজা যে বেঁচে
বৰ্তে থাকে সে মুন্সেফবাৰু ও Settlement office-এৱ গুণে। সৱ-
কাৱেৱ বেঙ্গলভোগী এই রাজ-কশ্চিচাৰীৱাই হচ্ছেন বাঙ্গলাৰ রায়তেৱ
যথাৰ্থ রক্ষক, জমিদারেৱ বিভূতিগী-ৱাঞ্চনীতি-ব্যবসায়ী উকিল মোস্তক-
ৱেৱা নন। অতএব একথা নিৰ্ভয়ে বলা যেতে পাৱে যে প্ৰজাৰ দাসত্ব
আৰু ঘোচে নি।

আৱ তাৱ দাখিলা যে কি ভৌষণ তা শ্ৰীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্ৰবৰ্তী
ব্যারিস্টাৱ মহোদয়েৱ কথাতেই প্ৰকাশ। তিনি সেদিন Bengal
Land-holders-দেৱ তৱক থেকে গৰ্ভমেটকে ষে পত্ৰ লিখেছেন
তাৰ কিয়দংশ এখানে উক্ত কৰে দিচ্ছি—

“Bengal, if not the whole of India, Bengal prob-
ably more so than the rest of India, is an agricul-
tural community—seventy-seven per cent of her popu-
lation being agriculturists. It is an undeniable fact
that seventy per cent of the peasantry out of the
seventy-seven per cent of the whole population is so
poor, that the income *per capita* is not more than
a few rupees a year, and they go to bed every
day without a square meal. (Statesman, 5th March
1920).

অস্ত বাঁঙলা :—

বাঁঙলা, বটপি সমগ্র ভারতবর্ষ না হয়, বাঁঙলা সন্তুষ্ট বাকী ভারতবর্ষের অধিক, হচ্ছে একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়, কারণ তার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা সাতাত্ত্বর জন কৃষক। ইহা অস্বীকার করবার জো নেই যে কৃষকদের মধ্যে শতকরা সন্তুষ্ট জন, যে কৃষকেরা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা সাতাত্ত্বর, এতাদুশ দারিদ্র্য বে মাথা পিছু বাঁসরিক আয় ছ-চার টাকা মাত্র, এবং তারা পেটভরে না খেয়েই শুভে যায়”—

চক্রবর্তী সাহেবের বক্তব্য আমি যতদূর সন্তুষ্ট কথায় কথায় অনুবাদ করেছি, তার উপর সাহিত্যিক হাত চালাই নি এই ভয়ে যে, পাছে কেউ বলে যে আমি তার গায়ে রং চড়িয়েছি। বাঁঙলা দেশে শতকরা সন্তুষ্ট জন লোক যে বাঁরো মাস আধপেটা খেয়ে থাকে, স্বাস্থ্যের অবস্থা যে এতদূর সাংঘাতিক এ জ্ঞান আমার ছিল না। দিনের পর দিন ও-অবস্থায় যারা শুভে যায় তারা যে আবার বিছানা থেকে ওঠে এইটেই আশ্চর্যের বিষয়। তবে একথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য, কেননা যাঁর তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে চক্রবর্তী সাহেবের কথনো ঠিকে ভুল হয় না। বিশেষত তিনি যখন অধিদায়ির পক্ষ থেকে প্রজার এই ভৌষণ দারিদ্র্য কবুল করেছেন তখন রাজতেজের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা আহম্মকি। আর আজ আমি প্রজার হয়ে ওকালতি করতে বসেছি।

প্রজার দুর্দশা সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ করতে বক্ষিমচক্র ভুলে পিয়েছিলেন সে হচ্ছে তার স্বাস্থ্যের কথা। সন্তুষ্ট সে যুগে যালেরিয়া দেশকে ডেমন আচ্ছন্ন করে ফেলে নি। আজকের দিনে অনসাধারণের শরীরগতিক কি রকম তার পরিচয় সরকারের তরফ

থেকে বৰ্কমানেৱ মহামারাই দিঘেছেন। তাৰ কথা তাৰ ভাষায়
এসলে উক্ত কৱে দিছি—

“Roughly speaking we may say that in each of these two years (1918-19) very nearly four per cent of the population has died, and unfortunately the births have not entirely replaced this loss. The more regrettable thing about this appalling mortality is the fact that a large proportion is due to causes that are entirely preventable.” (Statesman, March 6, 1920.)

অস্ত বাংলা :—

“ৰোটামুটি বলতে গেলে, গত দুই বৎসৱের অতি বৎসৱ বাংলা দেশেৱ
লোকেৱ মধ্যে শতকৱা চাৰ শতেৱ মৃত্যু হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যেৱ বিষয় এই মে
ষত মৃত্যু হয়েছে তত অন্ম হয় নি। বিশেষ দুঃখেৱ বিষয় এই যে, ধে-মৰ
কাৱণে লোকক্ষয় হচ্ছে তাৰ একটিও অনিবার্য বন্ধ।”

এই ত গেল মৃত্যুৱ তালিকা ; কিন্তু যাৱা বেঁচে থাকে তাৰ মধ্যেও
অধিকাংশ লোক অৱজীৰ্ণ। আৱ বলাবাছল্য যে এই ৱোগেৱ
অভ্যাচাৰ বিশেষ কৱে সহ কৱতে হয় আমাদেৱ প্ৰজা সাধাৱণকে।
দারিদ্ৰ্যেৱ সঙ্গে ৱোগেৱ ঘোগাঘোষ্টো যে অতি ঘনিষ্ঠ সে কথা
উল্লেখ কৱিবাৰ কি আৱ কোনো দৱকাৰ আছে। যাৱা বাঁৰোমাস
এক সক্ষে আধপেটো খেয়ে শুভে যায় তাৱা যে ৱোগ-শব্দালৰ
শৱন কৱলে সেখান থেকে আৱ উঠে না, সে বিষয়ে কি সন্দেহ
আছে।

লইয়া আসা অপেক্ষা একটি শুন্দর চিত্তা, একটি মহৎভাব, একটি সৎকার্যের স্বষ্টা বলিয়াই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে স্থিতির রাজা বলা চলে। এই রাজহ হইতেছে আমাদের অন্তরাঙ্গায়। যে অড়বাদী জীবনের দিব্য অর্থটি না বুঝিয়া ভূমণ্ডলের উপরে উপরেই ওলট-পালট খাই-তেছে, সে নয়, কিন্তু ধৈরাইদ মন্ত্রভূমির তপস্বী, হিমালয়শৃঙ্গের ধ্যানী নানাহিসাবে প্রকৃতির দাস হইলেও তাহারাই হইতেছেন উহার অধীশ্বর, তাহারাই অন্তরাঙ্গার দিক দিয়া উহার ব্যাখ্যা দিতেছেন। আমাদের তুচ্ছ আনন্দ অপেক্ষা তাহাদের দুঃখবাদও সৌন্দর্যে ভরপুর অতএব অনেক শ্রেষ্ঠ। তাহাদের উন্মত্তাই মানবপ্রকৃতিকে বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে—আর যে সব মানুষের জীবন শিরবুদ্ধি-পরিচালিত বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা কিন্তু শুধু লাভলোকসানের হিসাব গত স্বার্থাভিমানের তুচ্ছ কলহে পরিপূর্ণ।

স্বতরাং M. de Sacy-র এ অনুযোগ শ্যায়সঙ্গত যে আমাদের সমাজ হত শত ভাল জিনিষের আর স্থান নাই, তাহারা আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে। এসব জিনিষ আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনে আসে না, ইহাদের অভাবও তাই চক্ষে ধরা পড়ে না ; কিন্তু একদন দেখা যাইবে ইহারা চলিয়া গিয়া জগতের মধ্যে কি বিপুল ফাঁকাই রাখিয়া গিয়াছে। শিক্ষাবাবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যুগের ভূল এই যে আমরা বুঝিতেই চাই না, যে বিশেষ বিশেষ বিদ্যা—যে বিদ্যা ব্যবহারে আসে, তাহার উপরে আছে একটা সাধারণ জ্ঞানমাহাত্ম্য। সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও আমরা সেই একই ভূল করিতেছি। প্রয়োজনের খাপে খাপে যাহা মিলিয়া যায় না তাহাকেই আমাদের মনে হয় আড়ম্বর-অলঙ্কার। সত্য বটে, ভদ্রলোক লোপ পাইলেও ক্ষুণ্ণ

হইবাৱ কিছু নাই ; কাৰণ এ নামটি দেয় অম্বেৱ পৱিচয়, আৱ আজকাল
সকল শ্ৰেণী হইতে প্ৰায় সমান পৱিমাণেই কৃতৌ লোকেৱ উপৰ
হইতেছে। কিন্তু ক্ষুঁষ হইতে হয় সৎলোক হাৰাইয়া—এ কথাটি আমি
ব্যবহাৱ কৱিতেছি ১৭শ অক্টোবৰ যে অৰ্থ ছিল সেই অৰ্থে, অৰ্থাৎ—
সেই লোক যিনি বিশেষ কোন পেশাৱ দিক দিয়া কোন জিনিষকে
সঙ্কীৰ্ণ কৱিয়া দেখেন না, যাহাৱ মনে বা চলনে বিশেষ কোন শ্ৰেণীৱ
ভঙ্গিমা নাই। বিশেষ বিশেষ কৰ্ম প্ৰায়ই বিশেষ বিশেষ অভ্যাসেৱ
স্থষ্টি কৱে, এমন কি সে কৰ্মে ভাল রূক্ষম সফল হইতে হইলে,
প্ৰত্যোকেৱ, যাহাকে বলা হয় বৃত্তিগত মন, সেটি ধোকা চাই। কিন্তু
শ্ৰেষ্ঠত্ব (nobility) জিনিষটি ত ঠিক এইথানেই, যে তাৰাৰ এৱকম
কোনই বক্ষন নাই ; কোন বিশেষ ব্যবসা নাই যাহাদেৱ, তাৰাদেৱ দিয়াই
ত বিশেষ ব্যবসা আছে যাহাদেৱ, তাৰাদেৱ পাৰ্থক্যটি দেখাব সন্তুষ্পন্ন।
এসব লোকেৱ ধৰ্মী হওয়া উচিত নয়, কাৰণ টাকাৱ হিসাবে ইহাৱা
সমাজকে কিছুই দেয় না। কিন্তু ইহাদেৱই হওয়া উচিত আভি-
জ্ঞাত্য—আভিজ্ঞাত্য কথাটি এখন হইতে এই নিতান্ত বিশেষ অৰ্থেই
ব্যবহাৱ কৱিতে হইবে ; তবেই মানুষ যে-সব জিনিষ লইয়া চলে
তাৰাদেৱ মোট ধৰণটিৱ মৰ্যাদা বজায় পাকিবে, তবেই নানা বিভিন্ন-
দিক হইতে জৌবনকে প্ৰতিফলিত কৱিয়া দেখাইবাৱ লোক মিলিবে।
যে-সব লোক বিশেষ কাজে ব্রতী, বিশেষ দিক দিয়াই দেখিতে অভ্যন্তু
যাহাৱা, তাৰা ত সন্দয়ঙ্গ কৱে না জৌবনেৱ নানা বিভিন্ন দিকেৱ
কি প্ৰয়োজন।

যে-সব জিনিষ সূক্ষ্ম, যাহা স্বদূৰেৱ দিকে চাহিয়া আছে, আধুনিক
সমাজসংস্কাৰকগণ সে সকলকে দিয়াছেন একটা অভি সঙ্কীৰ্ণ ভিত্তি ;

আমাৰ বিশ্বাস অদূৱ ভবিষ্যতে এই অন্ত উহাদেৱ বিশেষ স্ফৰ্তি হইবে। যাহা মহৎ, তাৰা যে হইবে, তাৰাৰ আৱ সন্তাৱনা নাই। সুপৰিপক্ষ পূৰ্ণাঙ্গ হইতে, জিনিষেৱ দৱকাৰ ছুই বা তিন শত বৎসৱ আয়ু, আমৱা দেখি যে আমাদেৱ জীৱনকালেৱ মধ্যে বিধাতা ও তাঁৰ বিধান দশবাৱ বদলাইয়া যাইতেছে। মানুষেৱ মধ্যে কাব্যকলাৰ আসন্নমৃত্যুও ঐ অন্তই। কবিতা জিনিষটি সমস্তই অন্ত-ৱাঞ্চাৰ ভিতৱে, ভাৰুকতাৰ মধ্যে। কিন্তু আমাদেৱ যুগেৱ প্ৰতিটি হইতেছে সব আৰুগায় ভিতৱেৱ যন্ত্ৰেৱ পৱিত্ৰতে বাহিৱেৱ যন্ত্ৰ দিয়া কাঞ্জ কৱা। খুব তুচ্ছ একটা জিনিষ, এই সামান্য একখণ্ড বন্ধুও প্ৰায় ভিতৱেৱ জিনিষ হইয়া, মানুষভাৱ ধৰিয়াই উঠে যথন দেখি তাৰাৰ প্ৰত্যেক বুননটিৱ সাথে সাথে মিশিয়া আছে শতাধিক সজীৱ সত্ত্বাৰ নিশ্বাসপ্ৰশ্বাস, তাৰাদেৱ স্বদয়ানুভূতি, হয়ত বা তাৰাদেৱ দুঃখ কষ্ট, যখন দেখি তাঁতিনো ঝাঁপটি উঠাইতে নামাইতে তাঁতৌ মাকুটি স্বল্পাধিক দ্রুততাৰে ঠেলিতে ঠেলিতে কাজেৱ সাথে তাৰাদেৱ চিন্তা, তাৰাদেৱ কাহিনী, তাৰাদেৱ গান জড়াইয়া সে বন্ধুখানি ঈয়াৱ কৱিয়াছে। আজ কিন্তু সে সকলেৱ স্থান অধিকাৰ কৱিয়াছে প্ৰাণহীন সৌম্বৰ্যহীন একটা যন্ত্ৰ। প্ৰাচীনকালেৱ যন্ত্ৰটি মানুষেৱ সাথে অঙ্গুত ভাৱে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিল, তাই ক্রমে তাৰাৰ মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল জীৱাধাৱেৱ মত জীৱন্ত একা, একটা নিৰ্মুক্ত সামঞ্জস্য। আধুনিককালেৱ যন্ত্ৰটি হইতেছে কিন্তু কদৰ্যা, তাৰাৰ না আছে শ্ৰী, না আছে সৌষ্ঠব; সে কখনো মানুষেৱ অঙ্গ হইয়া উঠিতে পাৱিবে না, তাৰাৰ সেবা ষে কৱে সে আপনাকেই ক্ষুদ্ৰ পশুমৰ্ষভাৱ কৱিয়া কৱে,

প্ৰাচীন যন্ত্ৰটিৱ মত সে আৱ তাৰাকে বন্ধু ও সহায়কৰ্পে পায় না। . . .

মানুষের দেবতার শুধু তাহার অস্তরাঙ্গা রই দিক দিয়াই ; বুদ্ধিকে
ও কর্তাবকে সে যদি করক পরিমাণে নির্দোষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে
পারে, তবেই সে তাহার জীবনের লক্ষ্যগ্রহে গিয়া পৌঁছিল । এই
সুস্থৎ উদ্দেশ্যের যাহা সহায় হইতে পারে, তাহা কিছুই অদরকাৰী
নহ ; কিন্তু তুলজগতের যে-সব উন্নতি, সাথে সাথে তাহারা মনকে ও
কর্তাবকে উন্নত করিতে পারে ন', অতএব তাহাদের নিজস্ব যে কিছু
মূল্য আছে, এ বিশ্বাস একটি মন্ত্র ভুল । বাহিরের বস্তুর তত্ত্বানিঃ
মূল্য, তত্ত্বানি মানুষের ভিতরের ভাবের সহিত তাহার মিল আছে ।
আজকাল অতি সামাজিক একটি বাগানে যে-সব ফুল পাওয়া যায়,
এককালে তাহা ধাক্কিত শুধু রাজাৰ উষ্টানে । কিন্তু ভগৱানের গড়া
ক্ষেত্রে ফুলই যে মানুষের প্রাণে গিয়া কথা কহিত, মানুষের প্রাণে
যে আগাইয়া তুলিত প্রকৃতির প্রতি একটা সুস্থুর ভাব, তাহাতে কি
আসে যায় ? আজকাল সকল রূমণীই যে রকমে সামাজিকা করিতে
পারে, আগে কেবল রাজনীতিৰাই তাহা পারিতেন ; কিন্তু সেজন্ত
আজকালের রূমণী যদি বেশি সুন্দর বেশি চিন্তাকৰ্মক না হয়, তাতেই
বা কি আসে যায় ? তোগের পশ্চা সহস্রভঙ্গীতে সূক্ষ্ম করিয়া
অসংখ্যগুণে বাঢ়াইয়া তোলা হইয়াছে ; তবে ইহা সব ক্লাস্তিৰ
বিস্তিৰ বিষে অর্জনীত, আৱ আমাদেৱ পিতৃপুৰুষদেৱ দারিদ্ৰ্যেৰ
মধ্যেই ছিল বেশি আনন্দ, বেশি তৃপ্তি ; কিন্তু কি আসে যায় তাতে ?
ব্যবসা-বাণিজ্যেৰ যে উন্নতি হইয়াছে সেই অনুপাতে বুদ্ধিবৃত্তিৰও
উন্নতি হইয়াছে কি ? আমাদেৱ পূৰ্বেই যাহাৱা চলিয়া গিয়াছেন তাহাবা
হচ্ছি করিয়াছিলেন সমাজেৰ একটা জলস্ত জীবস্ত গতিধাৰা, আজ
পৰ্যাপ্ত তাহাই ধৰিয়া বঁচিয়া আছি—তাহাদেৱ যত সুন্দৰ জিবিব

ধারণা করিবার আমাদের সামর্থ্য আছে কি ? শিক্ষাকে কি আরও
উদার করিয়া তোলা হইয়াছে ? মানুষের প্রকৃতি কি শক্তিতে,
মহস্তে বাড়িয়া উঠিয়াছে ? নৃতন যুগের মানুষের মনে উচ্ছবাব,
অস্তঃকরণের মহস্ত, জ্ঞানের চৰ্চা, আপনি মতের উপর নিষ্ঠা, ধৰ্ম ও
ক্ষমতার প্রলোভনের বিকল্পে দাঢ়াইবার তেজ বেশি পরিমাণে কি
পাওয়া যায় ? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি চেষ্টা করিব না।
আমি শুধু বলিব, এ সব জিনিস ছাড়া উম্মতি আর কিছুতে নাই।
যতাদুন এ রূক্ষ উম্মতি না হইতেছে, ততদিন অতীতের সৎস্মৃণৱাণী
হারাইয়া পাইলাম আরামে থাকার স্বৰাবস্থা কিন্তু স্বরের মাত্রা
তাহাতে বেশি হইল না, পাইলাম নিষ্কণ্টক শাস্তিভোগ, কিন্তু হইল না
স্বভাবের উৎকর্ষ ; এই বিনিময়ে মানুষ হইয়া জমিয়াছে যাহারা
তাহারা কোনই সাক্ষনা পাইবে না।

পত্র ।

— :: —

শ্রীমান চিরকিশোর

কল্যাণীয়েষু :

তুমি আমাৰ গত পত্ৰেৰ উভৰে জিজ্ঞাসা কৱেছ যে—

“না হয় মনস্তিৱ কৱলুম যে—অতঃপৰ সাহিত্যেৱই চাষ কৱব ।

কিন্তু লিখি কি ! লেখবাৰ বিষয় নিয়েই ত ষত গোল ।”—

এ প্ৰশ্ন আমাৰ মনকে যে ব্যতিব্যস্ত কৱে নি, তা নয় । অনেক দিন
এৱ কোনো জ্ঞাব থুঁজে পাই নি । তাৰপৰ একদিন এৱ একটা
সহস্রৱ আপনা হতে আমাৰ মনে এসে গেল, আমি হঠাৎ আবিষ্কাৰ
কৱলুম যে সাহিত্যেৱ কোনো বিষয় নেই । এই নব আবিষ্কৃত ষত
পাছে আবাৰ হাৱিষে ফেলি, এই ভয়ে তথন মনেৰ মধ্যে যে সব কথা
উদয় হয়ে ছিল—সে সব আৱ কাল বিলম্ব না কৱে লিপিবদ্ধ কৱে
ফেললুম । সে লেখা অবশ্য প্ৰকাশ কৱবাৰ অভিপ্ৰায় ছিল, কিন্তু
ইতিপূৰ্বে কেন যে তা প্ৰকাশ কৱি নি, তাৱ কাৰণ শুনবে ?—পাছে
লোক আমাকে *dilettante* বলে, এই ভয়ে লেখাটা চেপে ৱেথেছিলুম ।
জানই ত আমি মেই সব ইংৰেজি কথাকে বড় ডৱাই ধাৱ ঠিক মানে
আৰম্ভা কেউ জানি নে অখচ সবাই যথন-তথন আওড়াই । যে লেখা
প্ৰবন্ধ হিসাবে চলবে না, মেটা পত্ৰ হিসাবে চলতে পাৱে, এই বিশাসে
তোমাৰ কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি ।

সাহিত্যের বিষয়

আজ আমার একটি পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল, পাঁচ বৎসর
পূর্বে কলিকাতায় যথন সাহিত্য-সমিলনের অধিবেশন হয় তখন
আমার জনৈক আকৈশোর বঙ্গু আমাকে একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে
অনুরোধ করেন, কি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করব জিজ্ঞাসা করায় তিনি
উত্তৰ করেন যে, কোন বিষয়েই নয়, এ প্রস্তাবে আমি নিজেকে মহা
সম্মানিত মনে করি, কেননা এ অনুরোধ হচ্ছে আকাশ-কুসুম রচনা
করবার অনুরোধ, অতএব আমি ধরে নিলুম যে বঙ্গুবরের মতে সাহিত্য-
জগতে আমি একটি অস্তুতকর্ষা-বাঙ্কি এবং আমার লেখনী হচ্ছে অফিন-
গটন পটিয়সী।

আমি অবশ্য তাঁর অনুরোধ রক্ষা করি নি। কিন্তু তাঁরপর ভেবে
দেখলুম তাঁর প্রস্তাবটি একেবারে অসঙ্গত নয়। মানুষে যা করেছে
মানুষে তা করতে পারে। এই ভূতাকাশে মানুষ যে ফুল ফুটিয়াছে
সে কথা আর কারো কাছে অবিদিত নেই। আমরা যাকে আতসবাজি
বলি তাঁর উদ্দেশ্য আকাশে ফুল ফোটানো ছাড়া আর কি? সকলেই
প্রত্যক্ষ করেছে যে প্রকৃতির হাতে-গড়া ফুলের চাইতে মানুষের হাতে
গড়া এই সব আকাশকুসুমের বর্ণ টের বেশি উজ্জ্বল, আর টের বেশি
বিচিত্র, এমন কি তুবড়ির ফুলের পাশে আকাশের তারাও হীনপ্রভা
হয়ে পড়ে। এই অমূলক ফুলের উপরে গাছের ফুল শুধু এক বিষয়ে
টেক্কা দিতে পারে, সে হচ্ছে তাঁর স্থায়ীভূতে। প্রকৃত ফুলের জীবনের
মেয়াদ একসঙ্গে, আর কৃতিম ফুলের এক মুহূর্ত। কিন্তু এ প্রভেদ
ধর্ত্বের মধ্যেই নয়। কার আস্তা এক মুহূর্তে নির্বাণমুক্তি লাভ

করে, আর কান্ত আজ্ঞা এক প্রহরে, অনন্তকালের হিসেবে তা গণনার মধ্যেই আসে না। এ জগতে সবই অনিত্য, সন্তুষ্ট হয় পরমাজ্ঞা নয় পরমাণু ছাড়া, শুভরাং কালের হিসেবে সব পদার্থেই মূল্য সমান, কিন্তু আমাদের হিসেবে বস্তুর সঙ্গে বস্তুর মূলোর তারতম্য অগাধ এবং সে তারতম্য নির্ভর করে, হয় বস্তুর রূপের নয় তার গুণের উপর। পৃথিবীতে যার কোনো মূল নেই এমন ফুল ষদি কেউ আকাশে কোটাতে পারে তাহলে এক রূপের গুণেই তা আমাদের কাছে চিরদিন অমূল্য হয়ে থাকবে।

ভূত্তাকাশের আঁধার ঘরে আলোর ফুল ফোটানো, মানুষের পক্ষে ছেলেখেলো হতে পারে, কিন্তু চিন্দাকাশে ঐ ফুল ফোটানোই হচ্ছে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতীত্ব। আমরা যাকে কাব্য বলি,—তার প্রতিটিই এক একটি আকাশ কুসুম, কেননা সে সব ফুলের মূল বস্তুজগতে নেই, আছে শুধু মনোজগতে। মেঘদৃতের অলকা আর শকুন্তলার উপোবন, দুটি অপূর্ব শুন্দর আকাশ কমল বই আর কি? এ দুয়ের ভিতর প্রত্যেক শুধু বর্ণে; একটির ঝঁড় লাল আর একটির শাদা। অলকা কবির হৃদয়ের তাজা রস্তে রঞ্জিত আর মালিনীর তীরস্থ উপোবন কবির আজ্ঞার শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত। এ উভয়ই আকাশ মেশের বস্তু, অর্থাৎ—এ উভয়ই চিরদিন মানুষের হাতের বাইরেই আছে এবং থেকে যাবে। এবং এ উভয়ই অজ্ঞ এবং অমর, কেননা যর্ণ্যভূমিক্ষে সবে উভয়ই সম্পর্কশূন্য। শুভরাং সাহিত্য-অগতে আকাশকুসুম রচনা করা শুধু যে সন্তুষ্ট তাই নয়, এই হচ্ছে কবিপ্রতিভান চরম স্থষ্টি। এই কল্পনার সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কবির ভারতীকে “নিষ্পত্তিকৃত নিষ্পত্তি, অবিভাজ্যাদৈক্ষমিক, অনন্তপদ্মতন্ত্রা” বলা হয়েছে। তবে যে আদি

আমাৰ বন্ধুৰ অনুৱোধ বন্ধা কৰি নি, তাৰ কাঁয়ণ এ বিষয়ে আমি
সম্পূৰ্ণ সচেতন যে, আমি কবি নই, আৱ এক শ্ৰেণীৰ জীব।

আমাৰ পূৰ্বৰ্বাসু বন্ধুটি ছাড়া অপৰ কেউ যদি আমাকে এ
অনুৱোধ কৱতেন, তাহলে আমি মনে ভাবতুম যে উক্ত প্ৰস্তাৱেৰ
অন্তৰে প্ৰচলন শ্ৰেষ্ঠ আছে। উক্ত বন্ধুৰ সম্বন্ধে সে সন্দেহ মনে উদয়
হয় না, কেননা তিনি হচ্ছেন একজন পৰম খিয়োজ্জিষ্ঠ। আমৰা
সন্তুষ্য অসন্তুষ্যেৰ ভিতৰ যে লজিকেৱ সীমাবেধে বসিয়ে দিই, তাৰ কাছে
সে রেখাৰ আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। শুভৱাং তাঁদেৱ ভাষায়
অসন্তুষ্য বলে কোনো শব্দই নেই। সে যাই হোক, অপৰ কেউ যদি
আমাকে এমন একটি প্ৰবন্ধ লিখতে অনুৱোধ কৱতেন যাৱ কোনো
বিষয় নেই, তাহলে আমি ধৰে নিতে পাৱতুম যে তিনি গ্ৰ অনুৱোধছলে
আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে আমাৰ লেখাৰ ভিতৰ কোনো বস্তু নেই।
আমাৰ লেখা সম্বন্ধে একপ মন্তব্য মধ্যে আমাৰ কৰ্ণগোচৱ
হৱেছে। কাৰো কাৰো মতে আমাৰ লেখাৰ অন্তৰে কোনো সাৱ
মেই, বা আছে সে হচ্ছে শুধু হাসি-তামাসা, কথাৱ মাৱপেঁচ, অৰ্থাৎ—
তাতে শ্ৰেষ্ঠ আছে, উপমা আছে, অনুপ্রাস আছে, বক্রোক্তি আছে,
ব্যঙ্গোক্তি আছে, আৱ কিছু যদি থাকে ত সে হচ্ছে
অ-বস্তু। এক কথায়, সাহিত্যে আমি বিনি সৃতোয় কথাৱ মালা গাঁথি,
এ কথা যদি সত্য হত তাহলে আমি সত্য সত্যই নিজেকে ধৃত মনে
কৱতুম। আমাৰ কলমেৰ মুখ দিয়ে যদি কথাৱ রঙ-বেৱডেৱ কোয়াৰা
ছুটত—তাৱপৰে তাৰ পুল্পবৃষ্টি হত তাহলে সকলকেই স্বীকাৰ কৱতে
হৃত বে আমাৰ তাৱতী “নিয়তিকৃতনিয়মৱহিতা, স্লাদেকময়ী এবং অনন্ত
শৰুত্বা” অৰ্থাৎ—আমি একজন জাতকবি। সমালোচকেৱা ভূলে ঘান

যে, একমাত্র আর্টিষ্টের লেখনীর ডগা দিয়েই ভাব ফুলের আকারে ফুটে ওঠে, আর ভাষা তারা কাটে। শুভরাং এ ব্যাজস্তুতি আমি আস্ত্রণ করতে একেবারেই অপারগ। এ জ্ঞান আমার আছে যে আমি করিও নই, আর্টিষ্টও নই,—আমি ইচ্ছি একজন একেলে নৈয়ায়িক, সাহিত্যের আসরে তর্ক করাই ইচ্ছে আমার পেশা, এবং আমার লেখার ভিত্তি যদি কোনরূপ কৌশল থাকে ত সে হচ্ছে সহাস্য তর্ক করবার কৌশল। সন্তুষ্ট গ্রীষ্মের আবরণই অনেককে তর্কিত বিষয়ের স্বরূপ দেখতে দেয় না। সকল দেশেই এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁদের বিশ্বাস, ষে-কথা গন্তব্যের ভাবে বলা হয় নি, সে-কথার ভিত্তি কোনো গুরুত্ব নেই। যে-কথা চোধের জন্মে ভিজে নয় তাৰ ভিত্তি রস নেই। আমি ত কোনু ছাই,—যে অসামাজ্য প্রতিভাশালী লেখকের মতামত আজকের দিনে ইউরোপের দার্শনিক সমাজের মনের উপর প্রভৃতি করছে সেই অধ্যাপক উইলিয়ম জেমসকে তাঁৰ ক্লাসের একটি ছাত্র একদিন জিজ্ঞাসা কৰে “Can’t you ever be serious”? বলা বাহ্য্য সে সময়ে তিনি হার্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের লেকচার দিচ্ছিলেন।

এ সব কথা শুনে অনেকে হয়ত মনে করবেন যে, এ সব কথা আমি সাহিত্যসমাজে সাফাই হবার জন্মে বলছি এবং প্রকারাস্তুরে আস্ত্রণ করছি। এর উন্তরে আমার নিবেদন এই যে, পরনিষ্ঠা করবার চাইতে আহুপ্রশংসা কৱা চের বেশ নিরাপদ, নিজের প্রশংসা নিজে করলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু পরের নিষ্ঠা করলে কেউ তা অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু সত্য কথা এই যে, আমরা কি বলি, তাৰ চাইতে তা আমৰা কি কৰে বলি,—তাৰ মূল্য কম

ত অয়ই, বৱং অনেক বেশি। আজকের মতামত যে কাল টেঁকে না
তার প্রমাণ ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছাপা রয়েছে। মানুষের
জ্ঞানের সম্পদ দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে, শুতুঁবাং এক যুগের স্বল্প-
জ্ঞানের উপর যে মতামত প্রতিষ্ঠিত পরযুগের প্রবৃক্ষজ্ঞানের আলোকে
তার হীনাঙ্গতা ধৰা পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে
হেগেলের দর্শন ইউরোপের মনের উপর কি রূক্ষ একাধিপত্য স্থাপন
করেছিল তা সকলেই জানে। আর আজ সে দর্শনের কি দশা ! সে
দিন ফেইন নামক জৈনক অর্হান দার্শনিকের গ্রন্থে পড়লুম যে, এ যুগে
হেগেলের গ্রন্থ কোনো অর্হান দার্শনিক স্পর্শ মাত্রও করে না। ও
হাড় নাকি অর্হানির দার্শনিক সমাজের কোন কুকুরেও চিব়ন্ন না' !
অপর পক্ষে প্লেটোর দর্শন অস্তাৰ্থি সকল দার্শনিকই শ্রদ্ধাভরে,
ভক্তিভরে, সামন্দে ও সোৎসাহে পাঠ কৱেন। এৱ কাৰণ কি ?
প্রথমেই চোখে পড়ে যে Style-এৱ গুণে প্লেটোৰ দর্শন মানুষের
চিৱ-আনন্দের অতএব চিৱ-আনন্দের সামগ্ৰী হয়ে রয়েছে, আৱ Style-
এৱ দোবে হেগেলেৰ দর্শন চিৱদিনই কষ্টপাঠ্য ছিল, এবং যখন তাঁৰ
মত অগ্রাহ হল, তখন তাঁৰ গ্রন্থ যথাৰ্থই অপাঠ্য হয়ে পড়ল। এক
কথায়, হেগেলেৰ মতেৰ পিছনে কোনো বড় মন নেই—আৱ প্লেটোৰ
মতেৰ পিছনে যে-মন আছে তাৱ সৌন্দৰ্যেৰ ও ঐশ্বর্যেৰ কোনোই সৌমা
নেই। এই কাৰণে প্লেটোৰ দর্শন সাহিত্য, আৱ হেগেলেৰ দর্শন হয়
বিজ্ঞান, বন্ধ ত কিছুই নয়।

এই সব দেখে শুনে এ কথা বলতে সাহস হয় যে, সাহিত্য হচ্ছে
সেই বন্ধ যাৱ অন্তৰে কোনো বিষয়েৰ নয়, মানুষেৰ মনেৰ পূৰ্ণ পরিচয়
পাওৱা যায়। এবং সে মন যত মহৎ, যত সুন্দৰ, যত শক্তিশালী হবে

তার প্রকাশও তত উজ্জ্বল, তত মনোহারী হবে। সাহিত্য মানুষকে কোনও বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের শিক্ষা দেয় না। যাঁদের মন বড়, তাঁরা তাঁদের মনের মহসুস আমাদের সকলেরি মনে অন্তর্বিস্তর সঞ্চারিত করে দিতে পারেন; এই কারণে মানুষে যত কিছু করেছে, সাহিত্যের স্থান সে সবের উপরে। কবিই হচ্ছে মানুষের যথার্থ ত্রাণকর্তা, কেননা তাঁর বাণী মানুষকে তাঁর হৃদয়ের ও মনের সঙ্গীণ গন্তী থেকে উদ্ধার করে।

আর এক কথা, সাহিত্যে যে মানুষের মনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, সাহিত্যে এবং একমাত্র সাহিত্যেই মানুষের পূর্ণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়—অপর পক্ষে যাকে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান বলি তাতে মানুষের শুধু বুদ্ধিবৃত্তিরই খেলা দেখতে পাওয়া যায়। সকলেই জানে যে জগত্বিদ্যাত দার্শনিক কাট যে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন তাঁর একখানির বিষয় ছিল pure reason, আর একখানির practical reason, আর একখানির *Aesthetic judgment*, অর্থাৎ তিনি প্রথমে সত্যাসত্য জ্ঞানের, তাঁর পরে ভালমন্দ জ্ঞানের এবং সর্বশেষে সুন্দর অসুন্দরের জ্ঞানের বিচার করেন। বলা বাহ্যিক মানুষের অস্তরে একটি স্বতন্ত্র শক্তি নয়—আমরা যাকে মন বলি তাঁর ভিতর এ তিনটি শক্তি একটি শক্তিরই ত্রিমূর্তি। আমাদের মন যখন কোনো বিষয়ের সংস্পর্শে আসে তখন সেটিকে আমরা আমাদের সমগ্র মন দিয়ে—হয় চেপে ধরি, নয় ঠেলে দিই এবং তাঁর সত্যাতা, তাঁর উপাদেয়তা, তাঁর সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের আত্মা একযোগে রায় দেয়। বিষয় বিশেষের স্পর্শে যাঁর সমগ্র মন সাড়া দেয় এবং যিনি সেই সমগ্র মনের ঔবন্ত ছবি বাণীর সাহায্যে লোকের

চোখের স্মৃতি ধৰে দিতে পাৰেন তিনিই যথাৰ্থ সাহিত্যিক অতএব
যথাৰ্থ সাহিত্য একাধাৰে দৰ্শন বিজ্ঞান এবং আৰ্ট।

, আৱ এক কথা, আমৰা সকলে মানুষ হলেও সকলেই এক প্ৰক-
তিৱ মানুষ নহ। আমাদেৱ কি দেহ কি মন কি চৰিত্ৰ কিছুই আৱ
এক ছাঁচে ঢালাই হয় নি। তাৱপৰ শিক্ষা দীক্ষাৱ গুণে অভাবেৱ
বশে কতকটা অবস্থাৰ প্ৰভাৱে কতকটা স্বীয়কৰ্ষেৱ ফলে আমাদেৱ
এই অম্মুলভ বিশেষহ হয় ফুটে ওঠে, নয় চেপে যায়। সুতৰাং
সকল বিষয়েৱ সংস্পৰ্শে আমাদেৱ সকলেৱ মন সাড়া দেয় না, এবং
যাদেৱও দেয় তাদেৱও একভাৱে দেয় না। যাঁৱ বাণীৱ অন্তৰে একটি
বিশেষ মনেৱ বিশেষহেৱ পৱিচয় পাওয়া যায়, তাঁৱ লেখাই সাহিত্য,
এবং এই কাৱণেই সাহিত্যে style-এৱ মাহাত্ম্য এত বেশি, কেননা
style-এৱ যথাৰ্থ অৰ্থ হচ্ছে মানুষেৱ আত্মপ্ৰকাশেৱ নিয়ম ভঙ্গী,
সাহিত্যেৱ বিষয় ত হচ্ছে একটা উপলক্ষ্য মাত্ৰ। মানুষেৱ মনও
বিভিন্ন এবং তাৱ প্ৰকাশেৱ ভঙ্গীও বিচিৰি, সে কাৱণ সাহিত্যেৱ
বৈভব এবং বৈচিত্ৰ্যও এত অসীম। আমাৱ এসব কথা যদি সত্য
হয়, তাহলে স্বীকাৱ কৱতেই হবে যে জাতীয় সাহিত্য বলে কোনো
পদাৰ্থই নেই, আছে—শুধু নানা জাতীয় সাহিত্য, কেননা বেসব
লোকেৱ বাস্তিত শিক্ষা দীক্ষাৱ গুণে এবং আত্মচেষ্টার ফলে ফুটে
ওঠে তাঁৱা সত্য সত্যহ পৱন্পৰ বিভিন্ন জাতেৱ মানুষ হয়ে ওঠেন।

দেখতে পাচ্ছ ঘূৰে কিৱে আবাৱ সেই individualism-এৱই
গুণকৌৰ্তন কৱছি—যাৱ নাম শুনলে আতকেওঠা এদেশে পেট্ৰিয়টিক্যেৱ
একটা প্ৰধান নিৰ্দৰ্শন, কিন্তু কি কৱা যাবে? ও কথা বলা ছাড়া
উপায়ান্তৰ নেই। আমাদেৱ সকলেৱই যদি, এক জ্ঞান, এক ধ্যান

এক মত, আর এক ভাষা হত, তাহলে আমাদের হাত থেকে যে সাহিত্য বেরত, তা এক কলে তৈরি লিখিষের মত সব এক আকার এক বর্ণ এক মাপ এক মূল্য হত। বলা বাহ্যিক সে অবস্থায় আমাদের, একাধিক গ্রন্থ পড়ার কোনো প্রয়োজন থাকত না। পড়ার কথা দূরে থাক লেখা কোনো প্রয়োজন থাকত না, কেননা কেউ এমন কোন কথা বলতে পারতেন না, যে কথা সকলের কথা নয়। এ অবস্থা অবশ্য খুব আরামের অবস্থা, কেননা ও অবস্থায় মনের কোন খাটুনি থাকত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, এমন কি যা কিছু প্রেয়, তার রচনার ভিতরও আরাম নেই, ধারণার ভিতরও আরাম নেই। ইহজীবনে মানুষের দুটি শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় হচ্ছে—সত্যকে সুন্দর করে তোলা, আর সুন্দরকে সত্য করে তোলা। এবং এ দুই বিষয়ে সিক্রিলাভ করতে হলে, অল্পবিস্তুর সাধনার আবশ্যক। সুতরাং সাহিত্য রচনার জন্ম রচয়িতার পক্ষে সর্বাঙ্গে প্রয়োজন হচ্ছে আন্তর্জ্ঞান লাভ করা, অর্ধাৎ—নিজের ব্যক্তিত্ব বিকসিত করে তোলা। Pericles-এর যুগে আথেন্সের এবং এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ডের সাহিত্যের বৈভব এবং বৈচিত্র্য যে এত বেশি, তার কারণ এ উভয় যুগে উভয় দেশেই বহু লোকের ভিতর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ স্ফুর্তিলাভ করেছিল। অপর পক্ষে গত পঞ্চাশ বৎসরের জর্মানীর সাহিত্যের যে কোনো ঐশ্বর্য নেই তার একটি প্রধান কারণ অর্মানীর ইল্পিয়াল শাসন এবং অর্মানীর ইল্পিয়াল শিক্ষা দেশস্বত্বে লোকের মন ও চরিত্র একই ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করেছিল এবং অর্মানীর ছুর্ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টায় বহু পরিমাণে কৃতকার্য হয়েছিল। আমাদের সমাজ-শাসন এবং আমাদেরও শিক্ষাদীক্ষা মানুষের individualism-

এৱ স্কুলিন মোটেই অনুকূল নয়, স্বতন্ত্ৰ আমাদেৱ ভবিষ্যৎ সাহিত্যেৱ
উন্নতিৰ জন্ম আমাদেৱ বৰ্তমান সাহিত্যকে individualism-এৱ
স্বপক্ষে লড়াই কৱতেই হবে। অৰ্থাৎ—বিষয়কে গৰ্ণ কৱে বিষয়ীকে
মুখ্য কৱে তুলতে হবে।

বৌৱৰল।

পুনৰ্শ—

এ প্ৰবন্ধ বহুদিন পূৰ্বে লেখা হয়েছিল, যখন লেখাৰ কোন
নতুন বিষয় ছিল না। যদি নতুন বিষয় চাও ত আজকেৱ দিনে তাৱ
ত কোন অনাটন নেই। আমি একটা ছোট ফৰ্দি ধৰে দিছি, তাৱ
ভিতৰ থেকে যেটা খুসি তুমি বেছে নিতে পাৱ।

১। Einstein-এৱ আবিষ্কাৰ। আকাশেৱ উঠোন বাঁকা, না
আলোৱ চলন বাঁকা, এই সমস্তাৱ আশ্রয়ে হৱেকৱকম দার্শনিক আকাশ-
কুন্দল রচনা কৱা যেতে পাৱে।

২। Marconi-ৱ কাছে তাৱা থেকে বে-তাৱ তাৱ আসছে।
এ তাৱ পাঠাচ্ছে কে, দেবতাৱা, না যাৱা যুক্তে মৱে জোতিল্লোকে
গিয়েছে? যুক্তে মৱলেই যে মানুষ স্বৰ্গে যায় এ কথা ত সকল
শাস্ত্ৰেই বলে। অতএব নক্ষত্ৰলোক হতে আগত ট্ৰেটকাৰ অৰ্থ
নিয়ে দেদোৱ কল্পনা খেলানো যেতে পাৱে।

৩। যদি এই সব বিশ্বসমস্তা নিয়ে মাথা বকাতে না চাও
ত Khalifate নিয়ে অনেক কথা বলতে পাৱো—যাৱ ভিতৰ
ঐহিক পাৱত্বিক সকল বস্তু মিলেমিশে একাকাৰ হয়ে যাবে,

অর্থাৎ কলমের বাঁটানে সমীমকে অসীম আর ডানটানে অসীমকে সমীম করতে পারবে।

৪। ওর চাইতে যদি নিরীহ বিষয় চাও তাহলে স্বমুখেই ত' Exchange পড়ে রয়েছে। ক্লপোর দর বাড়ে নি, সোনার দরও কমে নি, অথচ টাকার দাম যেমন বেড়েছে গিনির দাম তেমনি কমেছে। টাকা ও গিনির এই লুকোচুরি খেলা নিয়ে দেখ দেখি বুকি খেলাবার কি সুযোগ পাওয়া গেছে আর বলা বাহল্য যে পৃথিবীতে হেন লোক নেই রাজত-কাঙ্কনের এই মায়ার খেলায় যাকে মুক্ষ না করবে।

আর যদি চাও ত উপরোক্ত চারিটি বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে পারো, যেহেতু ও চারিটির গোড়ায় রয়েছে একটি মাত্র সমস্যা—ভূলোকে সঙ্গে হ্রা-লোকের যোগাযোগের রহস্য। আলো বেঁকে যাব কেন? Einstein বলেন মাটির টানে। দেবতারা পৃথিবীতে তার পাঠাচ্ছেন কেন? উত্তর একই, মাটির টানে। Khalifate সমস্যার মূলে কি আছে, ইউরোপের মাটির টান, সোনার ক্লপো এক দেশ থেকে আর এক দেশে চলে যায় কেন?—মাটির টানে।

এর থেকে ছুটি সিকান্দে উপনীত হওয়া যায়, প্রথমে পৃথিবীতে যা ঘটে মানুষ যা করে তার মূলে আছে মাটির টান। দ্বিতীয় দ্ব্যালোক থেকে ভূলোকে যা কিছু আসে তা আলোকই হোক আর আকাশবাণীই হোক, সব বেঁকে যায়, সব বিগড়ে যায় এই মাটির টানে।

অতএব মানুষের কৃতীহ হচ্ছে সেই বস্তু স্থিতি করায়, যার উপর মাটির টান নেই, অর্থাৎ—আকাশকুসুম। ওবস্তু যে আমরা ভূলোক থেকে দ্ব্যালোকে পাঠাই।

বাপ ও ছেলে ।

—::—

—“বাবা ! বাবা ! একটা গল্প বল ।”

—“কিসের গল্প বাবা ?”

—“এই—এই—একতা—একতা—বাগেল—এভুবল বাঘেল—
না, না, সেই কুমোলেল—সেই যে ইঁ ক'লে খেতে আসে ।”

—“আচ্ছা,—এক যে ছিল কুমীর, সে করতো কি—না গর্ভের
মধ্যে থাকতো—”

—“না—না, গর্ভেল মধ্যে নয়, তুমি আব না, জলেল মধ্যে ।
তালপল বলবো ? শুনবে ? তালপল—তালপল—একদিন—এই যে
সে—এই যে—একদিন—গর্ভে থেকে বেলিয়ে—সে—তালপল কি
বাবা ?”

—“তারপর সে দেখলে, একটা গুরু—”

—“না—না, তুমি বলচো কেন ? আমি বলবো । তালপল সে
দেখলে—দেখলে—গলু—একতা গলু অল খাবো—না বাবা ?”

—“ইঁ, ইঁ, লক্ষ্মী—কেমন গল্প শিখেচে আমাৰ বাবা ।”

শ্রেষ্ঠকাতুর পিতা শিশুর কচি গাল দুটিতে বাবুবাবু চুম্বন কৰতে
লাগলেন । পিতাবু এই অসাময়িক অর্থহীন দৌৱাঞ্চ্য থেকে নিজেকে
মুক্তঃকরে শিশু বিশুণ উৎসাহেৱ সঙ্গে বলতে লাগলো !

—“তালপল—শোন না বাবা—না, তুমি শোন—তালপল, কুমীল
আতে আতে—এয়মি ক'লে—আতে আতে না গিয়ে—ঁা—ক।”

শিশু নিজেকে কুমীর এবং বাবাকে গরু করে পিতার হাত ধরে
চান্তে লাগ্লো। পিতাকেও সহাস্থমুখে কুস্তীর কবল এন্দু গরুর
মত ছট্টফট করতে হল কিন্তু ছেলে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে অভিমানের
স্তরে বললে—“তুমি কান্দ বাবা কান্দ—ঁা—ঁা—ঁা।”

—“গরু কি কান্দতে পারে বাবা।”

—“ইঁ, পালে—কান্দে।”

—“আচ্ছা, কান্দচি—হাম্মা—”

—“গলু হায়—মা বলে কান্দে ? গলুল মা কোথায় বাবা ?
হাসপাতালে ? আবাল আসুবে ? —আবাল গলুকে কোলে নিয়ে—
হায়—?”

মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে নিয়ে তাড়াতাড়ি পিতাকে বলতে হল।

—“বাবা, কেমন ছবির বই !—কেমন ভাল ভাল ছবি !”

—“কৈ বাবা ? কৈ ? দেখবো।”

—“এই যে, এই দেখ—এই অঞ্গর সাপ—এই ঝিগল পাখী—”

—“এই উত্।”।

—“ই ইঁ—এই উট আর এই এককা গাড়ী”।

—এককা গালী খুব ছুটেছে”।

—“লক্ষ্মী, লক্ষ্মী—সব জানে বাবা আমাৰ—এই কুল—এই—”

পিতা তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে পিয়ে বলেন—“এই ক'য় কুকুৱ”

—“না কুকুল না—ঞ্চ যে তুমি দেখালে না—ঞ্চ যে ওলেল পল—”

—“ও কিছু না”।

অভিমানী ছেলে টেঁট ফুলিয়ে ফুলিয়ে বাপের দিকে একটি ছেট মুঠো তুলে বলে—“মাল্বো”।

বিপদ্গ্রস্ত পিতা বলে উঠলেন “বাবা, এই দেখ—উঃ কত বড় সিংহ—কত বড় কেশর”।

“—না ছিংহ না” মাটিতে শুয়ে পড়ে নির্মমভাবে বইখানার উপর লাখি ছুড়তে ছুড়তে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বাপের কোলে মুখ লুকালো।

মা ছেলেকে অসুবিধা ওয়াচে এ ছবি কি সে না দেখে থাকতে পারে? যে তার মা-ই তাকে কতবার দেখিয়েচে—সে জানে ও তার মায়েরই ছবি—অমন লম্বা চুল, অমন গয়না কাপড়—আর কোন্ স্তোলোকের আছে! তার মা-ই যে তাকে কতবার পাছড়ে কোলে ফেলে কাল-মেঘের রস খাইয়েচে।

বইখানাকে টেনে নিয়ে এসে পিতা বলেন—“আচ্ছা কেঁদোনা বাবা, দেখাচ্ছি” শিশু লাফিয়ে কোলের উপর উঠে বসলো। একটু-খানি দেখিয়েই তিনি আবার পাতা ওণ্টাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শিশু তার গোল গোল কচি হাত পাতার উপর চাপা দিয়ে বলে—

—না, দেখি বাবা—মাকে আমি ভাল কলে দেখি”—

সে আজ কতকাল মাকে দেখে নি—কতদিন—কতমাস।

টস্ক করে এক ফোটা গরম জল পিতার চোখ থেকে বইয়ের উপর পড়লো, তাড়াতাড়ি সেটাকে মুছে নিয়ে, ছেলেকে আরো ভাল করে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেন—

—“হয়েচে ত বাবা ছবি দেখা? এইবাবা বন্ধ করে রাখি—কেমন”?

ছেলে কোন উক্তির দিলে না—বিষান গন্তীর মুখে শুধু বলে—

“বাবা, আমি যুমুকো—তোমার কোলে শুয়ে”।

তার শরীর ক্লাস্ট হয়ে নেতিয়ে পড়েচে।

কোলে শুইয়ে তাকে নাচাতে নাচাতে পিতা বলেন—তুমি চোখ
বোঝ বাবা, আমি যুম্পাড়ানো গান গাই—যুম্পাড়ানী মাসী পিসি
আমাদের বাড়ী এসো—খাট নেই, চোকি নেই—

“না বাবা, সেইটে—এ ধন যাল ঘলে নেই তাল”—

“ধন, ধন, ধন—আমার বাড়ীতে ফুলের বন—এ ধন যার ঘরে
নেই তার বৃথাই জীবন—তারা কিসের গরব করে—তারা—”

আর গাইতে হল না—পিতা দেখলেন—শিশুর নিশ্চাস স্থিরভাবে
পড়েচে—সে ঘুমিয়েচে। একদৃষ্টে তার চাঁদমুখখানির দিকে চেয়ে
তিনি কার সাদৃশ্য তাতে দেখছিলেন কে জানে? কতক্ষণ নিশ্চলভাবে
পাষাণে-গড়া মুর্তির মত বসেছিলেন—সহসা চুক্কে উঠে শুনলেন,
শিশু ঘুমের ঘোরে জড়িয়ে জড়িয়ে দলচে—

“আমি আলো অশুদ্ধ খাবো—আমি আল কাঁদব না।”

শ্রীসতীশচন্দ্ৰ ঘটক।

ରାୟତେର କଥା ।

—::—

ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ

ଶୁଣସବେ—

ବାଙ୍ଗଲାର ନତୁନ କାଉସେଲେର ନତୁନ ଇଲେକସାନେର ଜଣେ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
ହାତେ ନିଯ୍ମେ ଲୋକେର ଶୁଭୁଖେ ଆମାଦେର ଖାଡ଼ୀ ହୋଯା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ବିଷୟେ ତୁମି
ଆମାର ମତ ଜ୍ଞାନତେ ଚେଯେଛ । ଏ କଥା ଶୁଣେ ଲୋକେ ହାସବେ । ଏକ-
ଜନ ସଥର ସାହିତ୍ୟକେର କାହେ କାଜେର ପଲିଟିକ୍ସ୍ରେ ପରାମର୍ଶ ଚାଓୟାଟା
ସଥର ଦଲେର ପଲିଟିସିଯାନଦେର କାହେ ନିଶ୍ଚଯିତ କାମାରେର ଦୋକାନେ
ଦିଇସେଇ ଫରମାଯେସ ଦେଓପାର ମତ ହାତ୍ତାଂସଦ ବ୍ୟାପାରହିସେବେ ଗଣ୍ୟ ହବେ ।
ତବୁ ତୋମାର ଅନୁରୋଧ ଆମି ବୁଝା କରତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଁଛି । କାରଣ
କି ଜାନୋ ? — ଏ ଯୁଗେର ପଲିଟିକ୍ସ୍ରେ ଅଧିକାରୀଭେଦ ମେଇ । ଡିମୋ-
କ୍ରାସୀର ଅର୍ଥି କି ଏଇ ନଯ ଯେ, ରାଜନୀତି ମନ୍ଦିରକେ ସକଳେର ସବ ବୁକମ
କଥା କଇବାର ସମାନ ଅଧିକାର ଆହେ ? ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ ଲୋକମତ ତ
ବେଦବାକ୍ୟ ! ଆର ଅସଂଖ୍ୟ “ଆମାର ମତକେ” ଠିକ ଦିଯେଇ ତ “ଆମାଦେର
ମତ” ପାଓୟା ଯାଯା । ଏ ହିସେବେ ଆମାରଓ ମୁଖ ଖୋଲିବାର ଅଧିକାର
ଆହେ ।

ଆର ଏକ ହିସେବେ ଆମି ବଲତେ ପାଇଁ ଯେ, ତୁମି ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ ଠିକ
ଲୋକେର କାହେଇ ଏସେହ, କେନନା ଆମି ଆମାର କଥା ବାଙ୍ଗଲାଯ ବଲତେ

পারি। রিফরম বিলের কল কি হল না হল, আর কি হবে না হবে—এ সব বিষয়ে টের মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই আইনের বলে আমাদের রাজনীতির ভাষা একদম বদলে গেল। এতদিন সে ভাষা ছিল রাজাৱ, এবাৱ হল তা প্ৰজাৱ। ষোলজানাবৰ, মধ্যে পোনেৰোআনা ভোট যখন প্ৰজাৱ হাতে তখন সে ভোট আদায় কৱতে হলে মাত্ৰভাষাৱই শৱণাপন হতেই হবে। ভিক্ষাটা, ভিক্ষাদাতাৱ ভাষাতেই কৱতে আমৱা বাধ্য; এই কাৱণেই ত সে ভাষা জানি আৱ না জানি—আমৱা এ-যাৰৎ আমাদেৱ রাজনৈতিক আৱজি-দৱখান্ত সব ইংৱাজিতেই কৱতে বাধা হয়েছি। এখন থেকে দৱখান্ত যখন বাঙলা-তেই লিখতে হবে তখন যাৱ ও-ভাষাৱ কলম হাতে আছে তাকে বাদ দিয়ে পলিটিক্স কৱা আগেকাৱ মত আৱ চলবে না। আৱ আমি যে বাঙলা জানি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, কেননা আমাৱ লেখা পড়ে লোকে বলে আমি সংস্কৃত জানি বৈ। হাল পলিটিক্স সম্বন্ধে কথা কইবাৱ বিশেষ অধিকাৱ যে আমাৱ আছে এই হচ্ছে তাৱ প্ৰথম দলিল। আৱ যে সব দলিল আছে তা ক্ৰমে পেশ কৱছি।

(২)

কেন প্ৰোগ্ৰাম চাই ।

তুমি ঠিক ধৰেছ যে এ-ফেৱা আমাদেৱ যা-হোক একটা প্ৰোগ্ৰাম চাই-ই চাই। ইতিপূৰ্বে যে সব ইলেকসান হয়ে গেছে তাতে প্ৰোগ্ৰামেৱ কোনই আবশ্যকতা ছিল না। ভোটাৱেৱ সংখ্যা ছিল স্বল্প বিশ্বটি আৱ সে ভোট যে যাঁৱ খাতিৱ রাখে তিনি তাকে দিতেন। মিউনিসিপালিটি ও ডিস্ট্ৰিক্ট বোর্ডেৱ মেծৱৰা দেখতেন ভোটপ্ৰাৰ্থী

লোকটা কে ; তার মতটা কি, সে কথা কেউ জিজ্ঞাসা করত না । পুরুষের ইলেকসান ছিল একরকম সামাজিক ব্যাপার, এমন কি সে ব্যাপারকে পারিবারিক বললেও অসম্ভব হয় না, কেননা আমাদের দেশের পরিবার শুধু আত্মীয় স্বজন নিয়ে নয়, তার ভিতর আগ্রিম অনুগত লোকও চের থাকে । উকিল মোক্তার যেখানে ভোটার সেখানে জমিদারের সাহায্য ব্যতীত জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভোট আদায় করা কোনো অ-জমিদারের পক্ষে এক রকম অসম্ভব ছিল, তা তিনি যতই বিষ্ণুন বৃক্ষিমান, যতই স্বদেশী ও “স্বরাজী” হোন না কেন । তোমার মনে থাকতে পারে যে গত ইলেকসানে, একটি জমিদার ভোটারের দল ভোটপ্রার্থী কি জাত সেই হিসেবে নিজেদের ভোট দেন । ফলে বারেক্স ব্রাঙ্কণ কাণ্ডিডেটকে হারিয়ে রাঢ়ী কায়স্ত কাণ্ডিডেট পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে লাট সভায় চুকে গেলেন । বলা বাহ্যিক এ মলে বেশির ভাগ ভোটার ছিল রাঢ়ী কায়স্ত ।

কিন্তু রিফরম বিলের প্রসাদে ভোটারের সংখ্যা যখন দশ-লাখের উপর উঠে গেছে, তখন আর ইলেকসানের মামলা পারিবারিক ভোটে ফতে করা চলবে না । সুতরাং প্রোগ্রাম চাই ।

প্রোগ্রাম চাই দু কারণে । এই নতুন ভোটারের দল প্রায় সবাই নিরক্ষর । পলিটিস্টের “প” অক্ষর তাদের কাছে হয় গোমাংস, নয় হারাম । তুমি অবশ্য জানো যে এই অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভোটের অধিকারী করবার বিরুদ্ধে প্রধান কারণ দেখান হয়েছিল তাদের এই শিক্ষার অভাবটা, বাঙালী স্ত্রীলোকের দেহের মত, যাদের মনের পক্ষে “ঘর হতে আজিনা বিদেশ”, তাদের হাতে ব্যবস্থাপক

সভার সদস্য নির্বাচন করবার ভার দেওয়াটা যে প্রহসন মাত্র এ কথা
দেশী বিদেশী, সরকারী বে-সরকারী অনেক লোক অনেক ভাবে বলে-
ছেন, কেউ চটে কেউ হেসে, কেউ ধৌরে কেউ জোরে। এ আপত্তির
সার্থকতা আমি অবশ্য কখনো দেখতে পাই নি। গভর্নমেণ্ট বলতে কি
বোঝায়, গভর্নমেণ্টের কটি সেরেন্টা আছে, প্রতি সেরেন্টার গঠন কি,
কার অধীনে থেকে কি নিয়মে প্রতি সেরেন্টার কাজ চালাতে হয় এবং
নানা বিভিন্ন সেরেন্টার আভ্যন্তরিক যোগাযোগটা কি, এ সব না জানলে
যদি রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে মত দেবার অধিকার না থাকে ত
বাংলা দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরও সে অধিকার নেই। অধি-
কার নেই যে কেন তা শুনবে?—চু'বছর আগে পর্যাপ্ত কলিকাতার
ল-কলেজে Constitutional Law পড়াবার ভার আমার হাতে ছিল।
আমার ক্লাসে প্রতি বৎসর গোণাগাঁথা তিনশ' করে ঢাক্ক জড় হত এবং
এরা প্রত্যেকেই হয় B. A., নয় B. Sc., অর্থাৎ—যুগপৎ বিদ্বান ও
বৃক্ষিমান। এই অধ্যাপনাসূত্রে আমি কি আবিক্ষা করি জানো?—আমি
নিত্য পরিচয় পেতুম যে এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকে Legislative
Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর প্রতেক যে কি সে
বিষয়ে খোঁকিব হাল নন। এ কথা তুমি সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে
না, কেননা কোনো আইনজ্ঞ লোকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন।
নিজের অভ্যন্তর যদি গোপন রাখতে হয় তাহলে “শতং বদ মা লিথ”
এই পরামর্শ মেনে চলতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভদ্রসন্তান-
দের সে পন্থা অবলম্বন করবার ত উপায় নেই। এগজামিন আমাদের
দিঁতেই হবে, লিখিত প্রশ্নের লিখিত জবাব দিতে আমরা বাধ্য, এবং
কার কত বিত্তে তা মুখ খুললেই ধরা পড়ে।

আমি আজ বছর দুয়েক আগে একবার Constitutional Law-এর কাগজ পরীক্ষা করি। “ভারতবর্ষের আইন কে তৈরী করে” এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর শতকরা নববইটি ছাত্র দিতে পারেনি, তাতে কিন্তু আমি অশ্রদ্ধ্য হই নি, কেননা ছাত্রসাধারণের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে পাকা জবাব পাবার আশা আমি কোনো কালেই রাখি নে। মুখস্থজ্ঞান পত্রস্থ করতে গেলে কম বেশি গলদ হবেই হবে, বিশেষত সে জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ বিলেতি পুঁথিগত। কিন্তু কতকগুলি উত্তর পড়ে আমারও চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল।

একজন লিখেছেন “ভারতবর্ষের সব আইন মুনিখ্বিনা তৈরী করে গেছেন এবং আজও সেই সব বাহাল রয়েছে” আর এক জনের বিশ্বাস যে “ইংলণ্ডের রাজা হিন্দুস্থানের বড় লাটকে যে সব চিঠি পত্র লেখেন, সেই সব চিঠিতে তিনি যে হকুমজারি করেন সেই সব হকুমই হচ্ছে এদেশের আইন”। আর একজনের উত্তর—“ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আইন-কানুন তৈরী করে Native Prince-রা”। কিন্তু এঁদের সকলের মন ভারতবর্ষে আবক্ষ নয়—এ দেশের আইন কর্তৃর তল্লাসে বাড়লার নবীন ভাবুকদের কল্পনা “ভারতের নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ”, অবশেষে “উপনীত হয়েছিল হিমালয়শিরে”। শেষে দেখলুম একজন লিখেছেন, “ভারতবর্ষের আইন বানান নেপালের রাজা”।

এরকম সব গাঁজাখুরি জবাবের কারণ আমি আনি। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছেলে Constitutional Law-এর কোনো বই কখনো চক্ষেও দেখে নি, কেননা তারা জানে যে এ বিষয়ের কোনো জ্ঞান না ধাকলেও তাদের পাশ আটকাবে না এবং পরে ওকালতিরও ঠেকা হবে না। কিন্তু এই সব উত্তরই প্রমাণ যে আমাদের দেশের

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোনোরূপ স্পষ্ট ধারণা নেই, এ বিষয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় সবাই এক পঙ্ক্তি। এ অবস্থায় শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি লাটিসভায় বসবার অধিকারী হন তাহলে অশিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সেখানে বসবার অধিকার কেন না পাবে? এদেশের জনগণ নিরক্ষর বলে যে ভোটের অধিকারী হতে পারে না, এ আপত্তি মণ্টেগু-চ্যাম্সফোর্ড রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কি কারণে অগ্রাহ্য হয়েছে তার আনুপূর্বিক বিবরণ উক্ত রিপোর্টের ৮৫ হতে ৯১, এই দশ পৃষ্ঠার ভিতর পাওয়া যাবে। ঐ পাতাক'টি বাঁকলায় অনুবাদ করে দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সে ধাটুনি খাটুবার অবসর আমার নেই। মারা পলিটিক্সের ব্যবসা করেন তাদের এই দশ পৃষ্ঠা ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি। এছলে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রিফরমের স্বষ্টাদের মতে এই ভোটসূত্রেই জনগণ পলিটিক্সের শিক্ষা লাভ করবে, আর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান কর্তব্য হবে তাদের সে শিক্ষা দেওয়া, বই পড়িয়ে নয়—মুখে মুখে। অর্থাৎ—ইলেক্সানের ক্ষেত্রেই হবে এ দেশের যথার্থ পলিটিক্যাল স্কুল, যেমন আদালতেই হচ্ছে আইনের যথার্থ স্কুল।

জানই ত এ যুগের পলিটিক্সের গোড়ার কথা হচ্ছে প্রতি লোকের নিজের অধিকারের জ্ঞান। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ—একশ' আঠামো বৎসর আগে তখনকার ইংরেজ গভর্নমেণ্ট দেশের অবস্থা জানবার জন্মু জিলার কালেক্টরদের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন করে পাঠিয়ে দেন তার একটি প্রশ্ন ছিল এই—এদেশের প্রজাদের কি কি অধিকার আছে

স্মরণ করলে এ অরিমানার দায়ি হতে তাকে শুক্তি দেওয়াটা কি
অসম্ভু ?

তার পর আসে কুয়ো থোড়া কোঠাবাড়ী তৈরী করবার অধিকার।
এ সম্বন্ধে আইনের কথা ইচ্ছে একটা বেজায় রহস্য। আইনে বলে
ষাটে জোড়তের উন্নতি হয় তা করবার অধিকার প্রজার আছে। এবং
জোড়তের উন্নতি কাকে বলে সে সম্বন্ধে অনেক আইনের তর্ক, দেদার
নজির আছে। Bench এবং Bar-এর এই সব চুলচেরা তর্ক, সূক্ষ্ম
বিচারের গুণে এ বিষয়ে আইন ক্রমে সরু হতে হতে শেষটা
লৃতাতঙ্গ হয়ে দাঢ়িয়েছে। ফলে, এ মামলায় প্রজার শুধু দোকর দণ্ড
দিতে হয়, একবার উকিলের কাছে আর একবার জমিদারের কাছে।
নিজের পয়সায় প্রজা কোঠাবাড়ী তৈরী করলে তার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের
নালিশ চলে। বাস্তু পাকা করতে চেষ্টা করলে প্রজাকে যে ভিটে থেকে
উচ্ছেদ হতে হবে এর চাইতে আর অনুত্ত ব্যবস্থা কি হতে পারে ?
তবে ভরসার কথা এইটুকু যে, আদালতে বোনা-আইনের মাকড়সার
আলে বাঁধা পড়ে কীট, মানুষ নয়। আর আমরা চাই বাঙ্গালার প্রজা
আর কীট হয়ে থাকবে না, সব মানুষ হয়ে উঠবে।

প্রজার শেষ দাবী এই যে তার জোত মৌরসি ও মোকরি হবে।
অর্থাৎ—অতঃপর জমাবৃক্তির অধিকার জমিদারের আর থাকবে না।
আমার মতে Record of Rights প্রজার জমি অনুসারে যে জমা
ধার্য করে দেয় সেই জমাই আইনত চিরস্থায়ী হওয়া কর্তব্য।
অর্থাৎ—যতদিন State-এর সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
বাহাল থাকবে, ততদিন জমিদারের সঙ্গেও রায়তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
বাহাল থাকবে। এ দাবী অপূর্বও নয় অনুত্তও নয়। ১৮৭৫

খন্দাকে রাজা রামবোহন রায় বিলাতে পার্লিমেণ্টারি কমিশনের সহযুক্তে যখন সাক্ষ্য দেন, তখন তিনি প্রজার হিতকল্পে এই দাবী উপস্থিত করেছিলেন। বাংলা দেশের এই অধিবৃত্তীয় মহাপুরুষের বাক্য আমার শিরোধৰ্ঘ্য। তার সেই সাক্ষ্যের রিপোর্ট পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে যে পলিটিক্স সম্বন্ধেও তার দিব্যদৃষ্টি ছিল। তারপর আমার মতের স্বপক্ষে আবার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের কথা উল্লিখিত করতে বাধ্য হলুম। তিনি গভর্ণমেণ্টকে লিখেছেন যে :—

“It would be iniquitous to think of taxing a population so poor as this, and my Committee venture to enter an emphatic protest against any idea of further taxation”—

অস্য বাংলা :—

“এক্ষণ দরিদ্র সম্পদবাহুর উপর টেক্স বসানোর চিহ্নও পাপ কার্য হবে এবং আমার কথিত এস্তে আবার নৃতন কোনো টেক্স বসানোর বিকল্পে তাদের মোর আপত্তি জ্ঞারগলার জানিয়ে রাখতে সাহসী হচ্ছে” —

উপরোক্ত কথা কটির মধ্যে “টেক্স” কথাটি বদলে তার আয়গায় “খাজনা” বসিয়ে দিলে, আমার বক্তব্যের একটা জ্ঞানালো সংক্ষরণ পাবে। টেক্স অবশ্য State আদায় করে আর খাজনা জমিদার, অর্থাৎ—প্রথম ক্ষেত্রে সমগ্রজাতি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ। সুতরাং যে-টাকা জাতীয় কার্যে ব্যয় করবার জন্য জাতির পক্ষে আমার করা পাপ কার্য, সেই টাকা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিজের ব্যয়ের জন্য আদায় করা যে কি হিসেবে পুণ্যকার্য, তা বোঝবার মত সূক্ষ্ম ধর্ম-জ্ঞান আমার নেই।

আমি আনি এর উত্তরে পলিটিসিয়ানরা কি বলবেন। উঁরা বলবেন যে, বর্তমান State ত আমাদের জাতীয় নয়, ও-হচ্ছে বিদেশী গভর্নেণ্ট; অতএব এ ক্ষেত্রে State-এর স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ এক নয়। তাখাস্ত। কিন্তু নৃতন টেক্সের বিরুদ্ধে চক্রসাহেবপ্রমুখ অমিদার বর্গের জোর প্রতিবাদের কারণ দর্শানো হয়েছে রায়তের দারিদ্র্য। রায়ত যদি নতুন টেক্সের চাপ আর বিন্দুমাত্রও সইতে না পারে তাহলে জমাবৃক্তির চাপই যে সে কি করে সইতে পারবে, তা আমি বুঝতে পারি নে। তবে আমি বুঝতে পারি নে বলে যে পলিটিসিয়ানরা বুঝতে পারেন না, তা অবশ্য হতেই পারে না। স্বতরাং অমিদার কর্তৃক হত-দরিদ্র প্রজার উপর জমাবৃক্তির চাপ দেবার কি সব পেট্রিয়টিক এবং স্থাশনলিঙ্ট ওরফে “স্বদেশী” ও “স্বরাজী” মুক্তি আছে তা শোনবার জন্মে উৎসুক হয়ে রইলুম।

আপাতত দেখতে পাইছি যে, যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে সেখানে প্রজার স্বার্থের কথা শুনলে আমাদের পলিটিসিয়ানদের ‘পেট্রিয়টিক’-কুর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। দেশের ধাঁরা ভাল চান তাদের পক্ষে রায়তদের উপরোক্ত দাবী ক’টি প্রসঙ্গ মনে গ্রাহ করে নেওয়া কর্তব্য। প্রথমত, এ-ক’টি অধিকারে তারা অধিকারী হলে তাদের দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ লাঘব হবে। দ্বিতীয়ত, তারা তাদের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করবে। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার বলে তাদের ‘দাস’ বুকি দূর করা যাবে না, সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চাই তাদের অবস্থারও পরিবর্তন ঘটানো।

পূর্বে যে রাশিয়ান ব্যায়িষ্ঠারের উক্তি উক্ত করে দিয়েছি

তিনিই তাঁর অশ্বান অতিথিকে আম বে একটি কথা বলেছিলেন
সেটি এখানে তুলে দেখার লোভ সম্বন্ধ করতে পারিলুম না।
সে কথা এই :—

“অদাদের অসাধারণের মধ্যে সব ঢাইতে কিসের বিশেষ অভাব আছে
আমেন !—অধিকারের জ্ঞান। অস্তুববিদ্যের জানেন বে সহ্যের জ্ঞান খেকেই
মানুষের অধিকারের জ্ঞান অস্তাৱ। আপনি বোধ হয় জানেন না বে,
এমেশের কৃষকদের মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক লোকের জমি তাঁর নিষ্ঠ
সম্পত্তি।”

বাঙ্গলার প্রজা যদি জমি ইস্তান্তৰ করবার, গাছ কাটবার, কোঠা-
বাড়ী করবার, কুয়ো খোড়বার অধিকার পায় এবং সেই সঙ্গে তাঁর
জোত মৌরসী-মকরণি হয়, তাহলে সে ইংরাজিতে যাকে বলে
peasant proprietor, তাই হয়ে উঠবে। প্রজা জমির মালিক হয়ে
উঠলে, জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য যে কতদূর বেড়ে যায় তাঁর
জাজ্জল্যমান উদাহরণ—বর্তমান ফুন্স। আর প্রজাকে সহৃদীন ও দরিদ্র
করে রাখলে তাঁর ফল যে-কি হয় তাঁর জাজ্জল্যমান উদাহরণ বর্তমান
রাশিয়া। যাঁরা Bolshevism-এর ভয়ে কাতুর তাঁদের অনুরোধ
করি যে, তাঁরা বাঙ্গলার রায়তকে বাঙ্গলার peasant proprietor
করবার জন্য উপর হোন। বে-রকম দিনকাল পড়েছে তাঁতে করে
মানুষকে আর দাস ও দরিদ্র করে রাখা চলবে না। প্রজাকে এ সব
অধিকার আমুৱা যদি আজ হিতে প্রস্তুত না হইত কাল তাঁরা তা
কেড়ে নিতে প্রস্তুত হবে। পৃথিবীর লোকের এখন মাথার ঠিক
নেই, তাঁর উপর তাঁদের ঐতিক উন্নতিৰ পিপাসা অত্যধিক বেড়ে
গিয়েছে।

(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)

প্রজার এক মন্তব্য ও দ্রু'মন্তব্য দাবী আমরা যে মুখে অত সহজে মেমে নিই তার কারণ, কাজে তা পূরণ করা অভিশয় কঠিন। দেশ-যোড়া রোগ ও অঙ্গতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যে টাকার দরকার সরকারের তহবিলে তার সিকির সিকিও নেই। এবং এই অতিরিক্ত টাকা বে কোথা থেকে আসবে তার লক্ষণ আমরা আজও পাই নি। আয় বৃদ্ধি না করে অবশ্য ব্যয়বৃদ্ধি করা চলে না আর সরকারী তহবিলের আমদানির মুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরদিনের মত বক্ষ করে রেখেছে। স্বতরাং ধরে দেওয়া যেতে পারে যে জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মামলাটা এখন মূলত ধীরে ধীরে। কত দিনের জন্য বলা কঠিন, কেমন আজকের দিনে ৪-মামলার তারিখ ফেলতে কেউ প্রস্তুত হবেন না। ইতিমধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিধানের যে সব অকিঞ্চিত্কর বন্দোবস্ত করা হবে তাতে করে মেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কোনই সুস্মাৰ হবে না—মধ্যে থেকে কতকগুলো টাকা শুধু জলে ফেলা হবে।

অপর পক্ষে প্রজার অপর দাবীগুলি আমাদের পার্লামেন্ট বসন্ত-মাত্র আমরা একদিনে পূরণ করে নিতে পারি। Tenancy Act-এর গুটিকয়েক ধারা বদলালেই কার্য্য উক্তার হয়ে যাব। এতে কোনো খরচ নেই।

তবে বর্তমান Tenancy Act-এর উপর ইন্দৃষ্টিপে করবার প্রস্তাৱ কৱলেই অমনি চারিমিক থেকে চীৎকাৰ উঠবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর ইন্দৃষ্টিপে করা হচ্ছে। এমন কথা ও শুনতে পাব

ষে, ও-কার্য করাও বা আর ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করাও তাই। জানই ত আজকাল ধর্ম শব্দের মানে বদলে গেছে। আগে ধর্ম বলতে লোকে বুঝত সেই বস্তু, যার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে, যার উপরে লোকের পারলৌকিক ভয়-ভরসা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজকাল ধর্মের মানে হয়েছে *temporal*, অর্থাৎ—সাংসারিক ব্যাপার। এতে আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই, কেননা যে-কালে পলিটিক্স হয়ে উঠেছে ধর্ম, সে কালে ধর্ম অবশ্য পলিটিক্স হতে বাধ্য। অতএব এখানে বলা দরকার যে প্রজার দাবী অনুযায়ী *Tenancy Act*-এর বদল করলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। কি করা হবে জানো?—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সরকার প্রজাকে যে কথা দিয়েছিলেন এবং যে কথা আজ পর্যন্ত খেলাপই করা হয়েছে, তাঁর সেই কথা রাখা হবে, এর বেশি কিছুই নয়।

আমার এ কথা বে সত্য, তা যিনিই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্বৃত্তি আনন্দে তিনিই স্বীকার করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে ইতিবৃত্ত খুব কম লোকেরই জানা আছে। আমাদের জাতীয় স্মৃতি এতই কম যে, যে-জিনিস ইংরাজের আমলে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে আমরা মান্তার আমলে রাবলে মেনে নিই। অতএব এস্তে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসটা বর্ণনা করা আবশ্যিক মনে করি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালা দেশে ঘোর অব্রাজকতা থটেছিল। সেই অব্রাজকতার ফলে ইংরেজ এদেশের রাজা হয়ে বসলেন এবং সেই অব্রাজকতার হাত থেকে দেশকে উকার করবার উদ্দেশ্যে ইংরাজরাজ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্থষ্টি করলেন। এ আইন হচ্ছে

ଆସଲେ ଏକଟି emergency legislation, ଯେମନ ଗତକଲେର Ghee Act ଏବଂ ଆଗାମୀ କଲେର Rent Act; ଏ ରକମ ଆଇନ ଅବଶ୍ୟମେଯାଦୀଇ (temporary) ହୁଏ ଥାକେ; କିନ୍ତୁ ଜମିଦାରେର କପାଳଜୋରେ ଏ ସମ୍ବୋବନ୍ତ ଚିରପ୍ଲାଯୀ ହୁଏ ଗେଲା । ଏକଥିବା କାରଣ କତକଟା ଦେଶେର ଅବଶ୍ୟାର ଗୁଣ ଆର କତକଟା ଇଂରାଜେର ବୁନ୍ଦିର ଦୋଷ ।

ଦେଶ ଯେ କତଦୂର ଅରାଜକ ହୁଏ ଉଠେଛିଲ ତାର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଵୟଂ ଭାରତ-ଚନ୍ଦ୍ର । ମୋଗଲେ-ମାରହାଟ୍ଟାଯ ମିଲେ ବାଙ୍ଗଲାର ଅବଶ୍ୟା ଯେ କି କରେ ତୁଲେଛିଲ ତାର ବର୍ଣନା ଅମଦାମଙ୍ଗଲେର ଏହୁସୂଚନାତେଇ ପାବେ । ସେ ବର୍ଣନାର କତକ ଅଂଶ ଏଥାନେ ଉନ୍ନତ କରେ ଦିଚ୍ଛ :—

“ଶୁଜା ଥାଁ ନବାବଶୁତ ସନ୍ଦର୍ଭରାଜ ଥାଁ ।

ଦେଯାନ ଆମଜଚନ୍ଦ୍ର ରାଯ ରାଯରୀଯା ॥

ଛିଲ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ଥାଁ ନବାବ ପାଟନାଯ ।

ଆସିଯା କରିଯା ଯୁକ୍ତ ବଧିଲେକ ତାଯ ॥

ତଦବଧି ଆଲିବର୍ଦ୍ଦି ହଇଲା ନବାବ ।

ମହାବଦଜଙ୍ଗ ଦିଲ ପାତ୍ସା ଖେତାବ ॥

* * * * *

କଟକେ ହଇଲ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦିର ଆମଳ ।

ଭାଇପୋ ସୌଲଦଜଙ୍ଗେ ଦିଲେନ ଦଥଳ ॥

* * * * *

ଭାଇପୋ ସୌଲଦଜଙ୍ଗେ ଖାଲାସ କରିଯା ।

ଉଡ଼ିଯା କରିଲ ଛାର ଲୁଟିଯା ପୁଡ଼ିଯା ॥

এই ত গেল মোগলের ব্যবহার। ভারপুর শোন মাঝাটোর
কীর্তি :—

* * * * *

স্বপ্ন দেখি বর্ণি রাজা হইল ক্ষেত্রিত।
পাঠাইলা রঘুরাজ ভাস্কর পত্রিত ॥

* * * * *

বর্ণি মহারাষ্ট্র আৱ সৌরাষ্ট্র প্ৰভৃতি।
আইল বিস্তুৱ সৈত বিহৃতি আকৃতি ॥
লুটি বাঙালীৱ লোক কৱিল কাঙাল।
গঙ্গাপাৱ হৈল বালি নৌকাৱ আঙাল ॥
কাটিল বিস্তুৱ লোক গ্ৰাম পুড়ি পুড়ি।
লুটিয়া লইল ধন বিউড়ি বহুড়ি ॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাৰ রহিল।
কি কহিব বাঙালীৱ যে দশা হইল ॥”

* * * * *

নবাৰ বৰ্ণিৰ ভয়ে পালিয়ে রইলেন বটে কিন্তু বাঙালীৱ উপৰ
অত্যাচাৱ তাৱ বাড়ল বই কমল না। আবাৱ ভাৱতচন্দ্ৰেৱ কথা
শোনো :—

* * * * *

“নগৱ পুড়িলে দেৰালয় কি এড়ায়।
বিস্তুৱ ধাৰ্মিক লোক ঠেকে গেল দুয়ায় ॥

নদীয়া প্রভৃতি চার সমাজের পতি ।
 কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুক্র শাস্ত্রমতি ॥
 মহাবদ্ধস্তুতি তাঁরে ধরে লয়ে ঘায় ।
 নজরানা বলে' বারো লক্ষ টাকা চায় ॥

* * * * *

লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার-লক্ষ ।
 সাজোয়াল হইল সুজন সর্বভক্ষ ॥
 বর্গিতে লুটিল কত কত বা সুজন ।
 মানামতে রাজার প্রজার গেল ধন ॥”

* * * * *

উপরোক্ত বর্ণনা কাব্য নয়—থাটি ইতিহাস । আলিবদ্দি থায়ে
 প্রজাপীড়ন করে' টাকা আদায় করেছিলেন, সে বর্গির রাজাকে চৌঁ
 দেবার জন্য । একদিকে দিলীর বাদশাকে, আর একদিকে বর্গির
 রাজাকে কর দিতে না পারলে তার নবাবী থাকে না, কাজেই বাঙ্গলার
 প্রজাকে সর্বস্বাস্ত্র করতে তিনি বাধ্য হলেন । এখানে একটি কথার
 মানে বলে দিই । সাজোয়াল শব্দের অর্থ সেই সরকারী কর্মচারী
 যে সরকারের উরফ থেকে থাসে প্রজার কাছ থেকে থাজানা আদায়
 করে । এই সুজন সাজোয়ালটি যে কে তা জানি নে, কিন্তু সেকালে
 অমন সুজন দেদার মিলিত । এবং এই সব সুজনের হাত থেকে
 প্রজাকে রক্ষা করা জমিদারের সঙ্গে চিরস্মায়ী বন্দোবস্ত করার
 অন্তর্ম কারণ ।

ভারতচন্দ্রের কবিতার এতটা অংশ উক্ত করে দিতে এই কারণে
বাধ্য হলুম যে “অন্মদামঙ্গল” আজকাল কেউ পড়ে না, সকলে পড়ে
“মেঘনাদবধু”। বাঙ্গলার চেয়ে লক্ষ আমাদের মনকে বেশি পেয়ে
বসেছে।

১৭৫৬ খ্রষ্টাব্দে আলিবদ্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তখন বাঙ্গলার তত্ত্বে
বসলেন সিরাজউদ্দৌলা। এর শাসন যে দেশের লোকের কাছে
কতদূর প্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ বছর না পেরুতেই বাঙ্গলায় ঘটল
রাষ্ট্রবিপ্লব। যে ঘটনায় সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের গদি ও পৈতৃক প্রাণ,
হৃ-ই হারালেন, একে আমি রাষ্ট্রবিপ্লব বলছি, কেননা জন কোম্পানীর
সেকালের কর্তব্যক্রিয়া সকলেই এ ব্যাপারকে Revolution বলেই
উল্লেখ করেছেন। পলাসীর যুক্ত জেতবার ফলে কোম্পানী বাহাদুর
বাঙ্গলার রাজগদি পান নি, পেয়েছিলেন শুধু চবিশ পরগণার
জমিদারীসত্ত্ব।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত মিরজাফরের আমল। এ তিন
বৎসর গোলেমালে কেটে গেল। ফলে বাঙ্গলার অরাজকতা বাড়ল
বই কমল না।

তারপর নবাব হলেন মিরকাশিম। তাঁর নবাবীর মেয়াদ ছিল
পাঁচ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ধরে তিনি বাঙ্গলার প্রজার রক্ত শোষণ
করলেন। কি উপায়ে তা বলছি।—রাজা টোড়র মলের সময়
বাঙ্গলার প্রজার আসল জমা স্থির হয়। এ জমাকে Land Tax
বলা যেতে পারে। এ জমাবৃক্ষ কোনো নবাব করেন নি। আসল
জমা স্থির রেখে নবাবের পর নবাব শুধু আবয়াবের সংখ্যা ও পরিমাণ
বাড়িয়ে চললেন। এই আবয়াবকে Cess বলা যেতে পারে।

মিরকাশিমের হাতে এই আবয়াব কি রকম বিপুলায়তন হয়ে উঠেছিল তার সাক্ষ্যৎ পাবে Fifth Report-য়ে। মিরকাশিমের আমলের একখানি দাখিলা দেখলে তোমার চক্ষুশ্঵িনি হয়ে যাবে।

তারপর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর বাদশা কোম্পানী বাহাদুরকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলেন। অর্থাৎ—সরফরাজ খাঁর আমলে আমলচন্দ্র রায় বায়-রাঁয়ার যে পদ ছিল, ১৭৬২ সালে কোম্পানী বাহাদুর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তফাতের মধ্যে এই যে আমলচন্দ্র প্রভৃতি বাঙ্গলার নবাবের কর্তৃক নিযুক্ত হতেন আর কোম্পানী বাহাদুর দেওয়ান হলেন দিল্লীর বাদশার সনদের বলে। ফলে কোম্পানী পেলেন বাঙ্গলার অর্কেক রাজহারার বাকী অর্কেক রাজহারার নবাব নাজিমের হাতে। এ কালের ভাষায় বলতে হলে—দিল্লীর বাদশা Diarchy-র সৃষ্টি করলেন।

এ ক্ষেত্রে ফৌজদারী সংক্রান্ত সকল রাজকার্য নবাব নাজিমের হাতে reserved subject-স্বরূপ রয়ে গেল। আর কোম্পানীর হাতে যে কি কি বিষয় transferred হয়ে এল, তার স্বাক্ষর নেওয়া দরকার, কেননা এই transfer-সূত্রেই চিরস্থায়ী বস্ত্রোবস্ত্র জমলাড় করলে। বলা বাহুল্য নবাবের আমলে সবই ছিল অচিরস্থায়ী।

দিল্লীর বাদশার ফারমানের বলে কোম্পানী বাঙ্গলার প্রজার কর আদায় করবার অধিকার পেলেন, কিন্তু এই কর আদায়ের ভার কোম্পানী নিজ হাতে নিলেন না—নবাবের নিয়োজিত নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর হাতেই রেখে দিলেন।

তারপর ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে মহা দুর্ভিক্ষে (বাঙ্গলায় যাকে আমরা বলি ছেয়াত্তরের মন্ত্রীর মন্ত্রীর) যখন বাঙ্গলার এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহারে

প্রাণত্যাগ করলে, এবং দেশ যখন একটা মহা শুশানে পরিণত হল তখন কোম্পানীর বিলেতের ডিরেক্টরদের মাথার টনক নড়ল। তাঁরা বাতিবাস্ত হয়ে Hastings সাহেবকে বাংলার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে এ দেশে পাঠিয়ে দিলেন—প্রধানত খাজানা আদায়ের একটা স্বৰ্যবস্থা করবার জন্য। প্রচলিত ব্যবস্থা যে স্বৰ্যবস্থা ছিল না, তার প্রমাণ এই দুর্ভিক্ষের বৎসর যত টাকা কর আদায় হয় তার পূর্বে কোনো বৎসর তত টাকা হয় নি।

এই দুর্ভিক্ষে দেশের যে কি সর্ববনাশ ঘটেছিল, তার পরিচয় Hunter's Annals of Rural Bengal-য়ে পাবে। এর ভোগ বাঙালী জাতিকে আঁরও ত্রিশ বৎসর ভুগতে হয়েছিল। এ মুসলিমের ধাক্কা বাংলা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আর সামলে উঠতে পারে নি। এই কথাটা মনে রাখলে বুঝতে পারবে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কেন আমি Emergency legislation বলেছি।

Hastings সাহেব কলকাতায় এসে—বাংলার জমির পাঁচশালা বন্দোবস্ত করলেন। এ বন্দোবস্ত করা হল কিন্তু ডাকস্বরত ইজারাদারের সঙ্গে। জমিদার অ-জমিদার নির্বিচারে সর্বোচ্চ ডাককারী-কেই জমির ইজারা দেওয়া হল। বলা বাহ্য ইজারাদার বাংলার প্রজাকে লুটে নিলে। এই সূত্রে Hastings সাহেবের সঙ্গে তাঁর কাউন্সিলের বগড়া বাধল। কেননা ধরা পড়ে গেল যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ইজারাদারের স্বয়ং Hastings সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজ কর্মচারীদের বেনামদার বই আর কেউ নয়। এই স্থিয়ে Hastings সাহেবের প্রথম শক্ত Francis সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব উপাপন করেন এবং কোম্পানীর বিলেতি

ডিরেক্টোরদের সে প্রস্তাবে সম্মত করেন। কিন্তু ডিরেক্টোর-মহোদয়দের এ বিষয়ে যা হোক একটি মনস্থির করতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। অতঃপর অনেক বলাকওয়া অনেক লেখালেখির পর তাঁদের আদেশ উপদেশ মতই, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত করা হল। এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্র। অর্থাৎ—যে বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietorship-এর সূত্রপাত হল সেই বৎসরই বাঙলার প্রজা সকল সত্ত্ব হারাতে বসল।

এ ক্ষেত্রে চারিটি সমস্যা ওঠে :—

(১) বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করা হবে— প্রজার সঙ্গে, না জমিদারের সঙ্গে ?

(২) জমিদার বলতে কি বোঝায়—তুম্যধিকারী, না সরকারের টেক্স কালেক্টর ?

(৩) যদি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয় তাহলে সে বন্দোবস্ত মেয়াদি না মৌরসী করা হবে ?

(৪) জমিদারকে যদি মৌরসী পাট্টা দেওয়া হয় তাহলে তার দেয়ো মাল খাজানা চিরদিনের মত নির্ধারিত করে দেওয়া হবে কি না ?

এই সমস্যার মীমাংসা করা হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং তার কারণ এই যে কোম্পানীর কর্তৃব্যক্তিদের মতে তা করা ছাড়া উপায়স্তর ছিল না, কেননা কোম্পানীর গভর্ণমেন্ট হচ্ছে বিদেশী গভর্নেন্ট।

কি সব তদন্তের পর, কি যুক্তি অনুসারে জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হ্যায় তার আনুপূর্বিক বিবরণ Fifth Report-য়ে দেখতে পাবে। এছলে আমি সকল যুক্তিক বাদ দিয়ে

Sir John Shore প্রিমুখ কোম্পানীর প্রধান কর্মচারীরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তারি উল্লেখ করছি।

প্রথম। যায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। এদেশে জমি-জমার হিসেব এত জটিল যে, ইংরাজ কর্মচারীদের পক্ষে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব। বিশেষত তাঁরা যখন বাড়লা ভাষা জানেন না। একেত্রে ইন্দুর তৈরী করবার খাজানা আদায় করবার, বাকী-বকেয়ার হিসাব কিডাব রাখবার তার দেশী আমলাদেরই হাতে থাকবে। তারা যা খুসি তাই করবে, তহবিল তচ্ছুল্প করবে, রাজা প্রজা হৃদলকেই ফাঁকি দেবে। এবং ইংরাজ কালেক্টররা তার কোনো প্রতিকার করতে পারবেন না। কারণ এই দেশী তহশিলদারদের কাছ থেকে হিসেব নিকেশ বুঝে নেবার মত শিক্ষা ও জ্ঞান ইংরাজ কালেক্টরের নেই। অতএব খাজানা যদি নিয়ম মত ও নিয়মিত আদায় করতে হয় তাহলে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয়। জমিদার ভূম্যধিকারী কিম্বা টেক্স কালেক্টর তা বলা অসম্ভব; কেননা Ownership বলতে ইংরাজ যা বোঝে এ দেশের লোকে তা বোঝে না। আমরা সবাই জানি Austin-এর ভাষায় সবের অর্থ হচ্ছে :—

“A right over a determinate thing indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, and unlimited in point of duration”—

জমির উপর যে তাদের উচ্চুল্প সত্ত্ব আছে এ কথা সে কালে কোনো জমিদারও দাবী করেন নি। কেননা তাঁরা জানতেন যে,

রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন না, রায়তি জমি খাস করতে পারতেন না, এবং বাঙলার নবাব ও দিল্লীর বাদশা এইদের ভিতর যাঁর খুসি তিনিই যখন তখন জমিদারী জমিদারের গালে ঢড় মেরে কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন আফর খাঁ ওরফে মুরশিদ কুলি খাঁ কিছুদিন পূর্বে বাঙলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদের নির্বাংশ করে নতুন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থায় কোম্পানীর কর্তব্যক্রিয়া স্থির করলেন যে জমিদারেরা যদি ভূম্যধিকারী নাও হয় ত, আইনত তাঁদের তা হতে হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সভ্যদেশে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সেই সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে যুগে English landlord-দের সঙ্গে Irish tenant-দের যে সম্বন্ধ ছিল। এস্থলে Sir John Shore-এর মত উন্নত করে দিচ্ছি।

"The most cursory observation shows the situation of things in this country to be singularly confused. The relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar is neither that of a proprietor nor of a vassal; but a compound of both. The former performs acts of authority, unconnected with proprietary right—the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zamin-

dar to the simple principles of landlord and tenant". (Fifth Report, Vol. II, p. 520).

এই উক্ত বাক্য ক'টিৱ বাড়লায় অনুবাদ কৱিবাৰ সাধ্য আমাৰ নেই, কেননা কি বাড়লা কি সংস্কৃত এ দুই ভাষাতে এমন কোনো শব্দ নেই যা ইংৰাজি real property-ৰ প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহাৰ কৱা যেতে পাৰে। আমাৰে ভাষায় ও-শব্দ নেই, কেননা আমাৰে দেশে ও-বস্তু কম্পিন কালেও ছিল না।

Shore সাহেবেৰ কথাই প্ৰমাণ যে এদেশেৰ জমিদাৰেৰ সঙ্গে এদেশেৰ রায়তেৰ সম্বন্ধ তাঁৰ কাছে বড়ই গোলমেলে লেগেছিল। কাজেই যা গোল তাকে তিনি চৌকোশ কৱিবাৰ প্ৰস্তাৱ কৱেছিলেন। তিনি অবশ্য এ পৱিবৰ্তন রয়ে-বসে কৱতে চেয়েছিলেন। Lord Cornwallis-এর কিন্তু আৱ তুৱ সইল না। তিনি আইনেৰ ঠুক-ঠাকেৱ বদলে একধায়ে চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তু কৱে বসলেন। ফলে বাড়লাৰ প্ৰজা বাড়লাৰ জমিৰ উপৰ তাৱ চিৱকেলে সত্ত্ব-স্বামীহ সব হাৰালে, আৱ রাতাৱাতি বাড়লাৰ জমিৰ নিৰ্বৃত সত্ত্বাধিকাৰী জমিদাৰ নামক এক শ্ৰেণীৰ লোক জন্মলাভ কৱলে।

Lord Cornwallis যদি অত তাড়াছড়ো কৱে চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তু না কৱে বসতেম তাহলে রায়তেৰ peasant proprie-torship নষ্ট হত না। কাৰণ রাজা প্ৰজাৰ যে সম্বন্ধ সে কালেৱ ইংৰাজদেৱ বুদ্ধিৰ অগম্য ছিল; কালক্রমে তাৱ মৰ্ম তাঁৰা উকাৰ কৱতে সক্ষম হয়েছেন। আজ প্ৰায় দেড়শ বৎসৱ ধৰে চিৰস্থায়ী বন্দোবস্তো অভ্যন্তৰ হয়ে আমাৰেও মনে এই ধাৰণা জন্মেছে যে-

বায়তের আর যাই থাক জমির উপর কোনোক্রম মালিকীস্বত্ত্ব নেই
এবং পুরোহিত ছিল না সোকের এই ভূল ভাঙানো দরকার। তাই
এস্তে ভার্তবর্ষের জমিজমার ব্যব একজন বিশেষজ্ঞ ইংরাজের কথা
নিম্নে উক্ত করে দিচ্ছি :—

“ It is well-known that in the only place where the “ Laws of Manu ” allude to a right in land, the title is an individual one, and is attributed to the natural source—still so universally acknowledged throughout India—that a man was the first to remove the stumps and prepare the land for the plough. At the same time we see, from very early times, how the grain produce of every allotment is not all taken by the owner of the land, but part of it is taken by the owner of the land, and part of it is by custom assigned to this or that recipient. It is not, observe, that the land allotment itself is not completely separated, but when the crop is reaped, the owner (as we may call him) at once recognised that out of his grain heap at the threshing floor, not only the great Chief or Raja, and his immediate headman, but a variety of other villagers, have customary rights to certain shares—if it is only sometimes a few double-handfuls or other small measure. All this seems to spring

from the sense of co-operation (however indirect) in the work of settlement that made the holding possible. It seems to me quite clear that a sense of individual "property" may arise coincidently with a sense of a certain right in others to have a share of the produce (on the ground of co-operation) and the two are not felt to conflict.

(Baden Powell—Village Community. p. 130-31).

কষ্ট করে এর বাড়লা করবার কোনই প্রয়োজন নেই। কেননা বিলেতি আইন চর্চা করে ষাদের মন ও মত Sir John Shore-এর অনুরূপ হয়ে উঠেছে তাদের দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত Baden Powell সাহেবের মন্তব্য এখানে উক্ত করা গেল। যে চৰে, জমি তাঁর। এবং সে জমির উৎপন্ন ফসলে প্রথম রাজা, তাঁরপর আর পাঁচ জনের, যথা— আমের মণ্ডল ধোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতিরও তাঁগ বসাবার অধিকার আছে। এই হচ্ছে Baden Powell সাহেবের মোদ্দা কথা। আর এই ছিল তাঁরতরফের সন্মান প্রথা।

চিরকালী বন্দোন্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরাজ-রাজ যখন বিদেশীরাজ তখন দেশে এমন একটি দলের স্থাপ্ত করা আবশ্যিক, ষাদের স্বার্থ ইংরাজরাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু আপনে বিপন্নে এই দল ইংরাজরাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।

তৃতীয়। জমিদারকে যখন জমির মালিক সাব্যস্ত করা হল, বলা-বাহলা তখন সে মালিকী সব চিরকালী বলে স্বীকৃত হল। যে

সৰু unlimited in point of duration বৈয়, সে সৰু ইংৰাজেৰ
মতে আইনত মালিকীসৰু হতেই পাৰে না।

চতুৰ্থ। তাৱপৰ জমিদাৰেৰ দেয় রাজস্বেৰ পৰিমাণ চিৰদিনেৰ
মত ধাৰ্য কৰে দেৰাৰ প্ৰস্তাৱ Francis সাহেব প্ৰথমে উৎপন্ন
কৰেন। তাৰ কথা এই যে, কোম্পানী বাহাদুৱ বাঙ্গলা থেকে যে
রাজস্ব আদায় কৱাৰ অধিকাৰী, তা not a tribute imposed
on a conquered people but its land revenue”।

মনে রেখো যে এ সময়ে অন কোম্পানী রাজা হিসেবে নয়, দিল্লীৰ
বাদশাৰ দেওয়ান হিসেবেই ভূমিকৰ আদায় কৱাৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্ত
হয়েছিলেন। এ অবস্থায় আদায়ী সেৱেন্টাৰ ব্যয় সংকূলান কৱাৰ
অন্ত যে পৰিমাণ টাকা আদায় কৱা আবশ্যিক তাৰ অতিৰিক্ত টাকা
আদায় কৱা Francis সাহেবেৰ মতে যুগপৎ অন্তায় ও অসঙ্গত।
তাৰ নিজেৰ কথা এই :—“The whole demand upon the
country, to commence from April 1777, should be
founded on an estimate of the permanent services,
which the government must indispensably provide
for ; with an allowance of a reasonable reserve for
contingencies.....I know not for what just or useful
purpose any government can demand more from its
subjects ; for unless expenses are collected for the
express purpose of absorbing the surplus, it must
be dead in the treasury, or be embezzled. Having
ascertained the amount the Government needed to

raise by land revenue, the contribution of the districts should be settled accordingly and “fixed for ever”.

(Fifth Report, Vol. I, p. ccc").

সংক্ষেপে Francis সাহেবের মতে গভর্ণমেন্টের পক্ষে যত ব্যয় তত আয় হওয়া প্রয়োজন। অতএব দেশের শাসনসংরক্ষণ কর্তব্য অন্ত, সম্ভাবিত ব্যয় আয়ের একটা বজেট তৈরী করে আবহমান-কালের জন্ত সেই বজেটই কায়েম রাখা দরকার। এই মতান্তরে বাড়লার রাজস্বও চিরস্থায়ী করা হল। উপরোক্ত সব কারণে ১৭৯৩ খ্রষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হল। বঙ্গিমচন্দ্রের কথা ঠিক যে এ দেশের জলবায়ুর গুণে সব জিনিষই চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে।

(চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাসত্ত্ব)

এখন দেখা যাক এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর প্রজার সব চিরস্থায়ী হ'ল কিম্বা একদম কেঁচেগল।

প্রজার যে ভিঁটে ও মাটি দুয়ের-ই উপর কিছু কিছু সব ছিল সে-সত্য Sir John Shore প্রভৃতি সকলেই আবিষ্কার করেছিলেন। এবং সেই আবিষ্কারের ফলেই না তাদের মনে অটো ধোকা লেগেছিল! একই জমির উপর জমিদার ও রায়ত—উভয়ের যে একবোগে সম্মানীক্ষ কি করে থাকতে পারে এ ব্যাপার তাদের ধারণার বহিভূত ছিল। কেননা, কি Roman Law, কি বিলাতের Common Law—ও দুয়ের কোনোটির সঙ্গেই এ ব্যাপার মেলে না।

ফলে খে-সন্দেহ ছিল মিশ্র তাকে তাঁরা শুন্দ করতে চাইলেন। ভারত-বর্ষের মাটীর এমনি গুণ যে সে মাটী যে মাড়ায় সেই শুক্রিয়াতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে।

প্রজা এখনো যেমন, তখনো তেমনি, প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল,—খোদকস্ত আৱ পাইকস্ত। যে প্রজার বাস্ত ও ক্ষেত দুই এক গ্রামস্ত, তার নাম খোদকস্ত প্রজা। আৱ ভিন্ন গ্রামেৱ লোক যে-ক্ষেত্ৰে ঠিকে বন্দোবস্তে স্থৱতজমি চাষ কৰে তাৱ নাম পাইকস্ত। বলা বাছল্য যে, প্রজাসত্ত শুধু খোদকস্ত প্রজারই ছিল, কেননা পাইকস্ত প্রজার উপৱ জমিদাৱেৱ যেমন কোনোকূপ স্বামীস্ত ছিল না, জমিৱ উপৱ তাৱও তেমনি কোনোকূপ সত্ত ছিল না।

সে কালোৱ প্রজাসত্তেৱ মোটামুটি ফৰ্দ মেই।—

(১) প্রজাকে উচ্ছেদ কৱবাৱ অধিকাৱ জমিদাৱেৱ ছিল না, অৰ্থাৎ—তাৱ জোত ছিল দখলীসত্ত্ববিশিষ্ট।

(২) সে জোত পুত্ৰপৌত্ৰাদিকৰমে ভোগ কৱবাৱ অধিকাৱ খোদকস্ত রায়তমাত্ৰেই ছিল। আৱ পুত্ৰপৌত্ৰাদিকৰমে ভোগদখল কৱবাৱ সত্ত যে মালিকীসত্ত, এ বিষয়ে Privy Council-এৱ নজিৱ আছে। অতএব ধৰে নেওয়া যেতে পাৱে যে, জোত হস্তাস্তৱ কৱবাৱ অধিকাৱ প্রজামাত্ৰেই ছিল। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সেকালে জমি হস্তাস্তৱ কৱবাৱ স্বযোগ ও প্ৰয়োজন—এ দুয়েৱি বিশেষ অভাৱ ছিল। প্রজার তুলনায় জমিৱ পৱিমাণ এত বেশি ছিল যে জমিদাৱেৱ নামমাত্ৰ নিৱিষে পাইকস্ত প্রজাকে দিয়ে জমি চাষ কৱাতেন।

(৩) জমাৰুকি কৱবাৱ অধিকাৱ জমিদাৱেৱ ছিল না। এৱ একটি

প্রথম এই যে, বাঙ্গলার কোনো নবাবই আসল জমা করনো বাড়ান নি। আসল জমা হিস রেখে আবয়াব বাড়ানোই ছিল তাদের মামুলি দণ্ডন। রাজাৰ প্রাপ্ত ছিল প্রজাৰ উৎপন্ন ফসলেৰ একটি অংশমাত্ৰ, সে অংশৰ ইস্তম্ভ কৱবাৰ অধিকাৰ রাজাৰও ছিল না।

খালি বাঙ্গলার প্রজা নয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষেৰ প্রজা এই সকল সম্বেদনৰ বাবান ছিল। প্ৰমাণ স্বৰূপ, অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত শুভেন্দুনাথ সেন, এম-এ, পি-আর-এস মহাশয়েৰ “পেশবাদিগেৱ রাজ্য-শাসন পদ্ধতি” নামক প্ৰক্ৰিয়াকৰণ থেকে কিয়দংশ এখানে উন্নত কৰে দিচ্ছ।—

মারাঠী পলীৰ চাৰীদিগকে হই শ্ৰেণীতে ভাগ কৰা ষাৱ - মিৱাসদাৱ বা মিৱাঠী (ধোদকষ্ট) ও উপৱি (পাইকষ্ট)। মিৱাসীৱা গ্ৰামেৱই লোক, গ্ৰামেৰ জমি চাৰ কৰিত। সে জমিতে তাহাদেৱ একটি স্থাবী স্বয় থাকিত। খাজানা বাকী না কেলিলে কাহাৱও অধিকাৰ ছিল না যে তাহাদেৱ জমি ক'ড়া লয়। বাকী খাজানাৰ দায়ে জমি হস্তান্তৰ হইলেও কিন্তু তাহাতে মিৱাসীৰ সৰ একে-বাবে লুপ্ত হইত না। ৩০৪০ এমন কি ৬০ বৎসৰ পৰেও বাকী রাজস্ব পৱিশোধ কৰিতে পাৱিলৈছেই, মিৱাসী তাহাৰ জমি কিৱিয়া পাইত। * * * *

মিৱাসীৱা গ্ৰাম প্ৰতিষ্ঠাতাদিগেৱই বংশধৰ। মনুৰ বিধান অনুসৰে তাহাদেৱ পূৰ্ব পুকুৰেৱাই গ্ৰাম্য জমিৰ মালিকীত্ব লাভ কৱিয়াছিলেন। * * *

অবস্থা সৱকাৰেৰ বাৰ্ষিক কৰ প্ৰত্যোক গ্ৰাম্যসমিতিৰ প্ৰধান ও প্ৰথম দেৱ। এই কৰেৱ হাৰ সৱকাৰেৰ কৰ্মচাৰীগণ “পাটালেৱ” (মণ্ডল) সমে একজ হইলা গ্ৰামেৰ জমি ও চাৰেৰ অবস্থা পৱিত্ৰন কৱিয়া হিস কৱিতেন—” (তাৰতথ্য, কান্তন ১৩২৬, পৃঃ ৪১১)।

এককথাৱ সেকালে জমিৰ অধিকাৰী ছিল প্রজা, আৱ তাৰ উৎপন্নেৰ আংশিক অধিকাৰী ছিলেন রাজা। জমিদাৱ এই রাজস্বেৱাই

এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরাজিতে যাকে বলে টেক্সকালেষ্টন,
অর্থাৎ—জমিদার মাইনের বদলে আদায়ের উপর কমিশন পেতেন,
আরও যেমন অনেক জমিদারীতে তহশীলদারেরা পেয়ে থাকে।
তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, একালে তহশিলদারেরা শতকরা পাঁচ
টাকা হারে কমিশন পায়, সেকালে জমিদারেরা দশ টাকা হারে পেত।

জন কোম্পানী কিন্তু এদেশের জমিদার-বায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে
গুরুত্ব করলেন—এই সম্বন্ধ উল্টে ফেলে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের
প্রসামে জমিদার হলেন বাড়ির মাটির সম্পত্তিকারী, আর প্রজা হল
তার উপস্থের আংশিক অধিকারী।

কিন্তু এ পরিবর্তন কোম্পানীর বড় কর্ত্তারা সচ্ছল্ল চিঠি করেন
নি। এ ভয় তাঁদেরও হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে
জমিদার প্রজার ভঙ্গক না হয়ে ওঠেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের
রক্ষার ব্যবস্থাও যে করা কর্তব্য সে বিষয়ে তাঁরা আয় সকলেই একমত
ছিলেন। এখানে আমি শুধু ছুটি লোকের মত উল্লত করে দিচ্ছি,
প্রথম Francis সাহেবের, তাঁরপর Lord Cornwallis-এর ; কারণ
এঁদের একজন হচ্ছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনক, আর একজন
তাঁর জননী।

Mr Francis proposed, that it should be made
an indispensable “condition with the zemindar, that
in the course of a stated time, he shall grant new
pottahs to his tenants either on the same footing
with his own quit rents, that is as long as the

zemindar's quit rent remains the same, or for a term of years, as they may agree—”

Francis সাহেবের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে Shore সাহেবের মতো
হচ্ছে এই :—

“The former is the custom of the country, this will become a new assil jumma for each ryot, and ought to be as sacred as the zemindar's quit rent—”
(Fifth Report, Vol. II, p. 88).

এখন Lord Cornwallis-এর কথা শোনা যাক।—

“—unless we suppose the ryots to be absolute slaves of zemindar's :—every begha of land possessed by them, must have been cultivated under an express or implied agreement, that a certain sum should be paid for each begha of produce and no more.—”

(Fifth Report, Vol. II, p. 532).

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজা আজ যে-সকল সর্বের দাবী করতে
সে-সকল সব প্রজার যে মান্তাতার আমল থেকে ছিল, এ সত্য চিরস্থায়ী
বন্দোবস্তের জন্মদাতারাও মুক্তকর্ণে স্বীকার করেছেন। এবং শুধু
স্বীকার করেই ক্ষমত থাকেন নি, প্রজার ওই সব মামুলি সব যে
তারা আইনত রক্ষা করবেন, এ প্রতিজ্ঞাও তারা উক্ত চিরস্থায়ী
বন্দোবস্তের আইনেই লিপিবদ্ধ করেছেন—“It being the duty of

ଅତେବ ତୋମାଦେର ମେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖାଡ଼ୀ କରିବେ ହୁବେ କାହାର ସଲେ
ବାଙ୍ଗଲାର ବାସିତ ଯୁଧଭା, ଦାରିଜା, ଦାସିହ ଓ ରୋଗେର ହାତ ଥେବେ
ନିଳୁଫଳ ଲାଭ କରିବେ ।

ଆମାଦେର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏହି ସେ, ବାଙ୍ଗଲାର ନା ହୋକ, ବେହାରେର ପ୍ରଜାବର୍ଗ
ପଲିଟିସିଆନଦେର ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ନା ହୁଁ ନିଜେରାଇ ସ୍ଵପକ୍ଷେର ଏକଟି
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖାଡ଼ୀ କରିବେ । ମେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସଦି ସଞ୍ଚିତ ହୁଯ ଭାବଲେ
ତା ଆମାଦେର ଶିରୋଧର୍ଯ୍ୟ କରେ ନିତେ ହୁବେ । ଏଥିନ ଆମି ମେଇ
ପ୍ରୋଗ୍ରାମେର ବିଚାର କରିବେ ଅବସ୍ଥ ହଲୁମ ।

(ପ୍ରୋଗ୍ରାମେର ପରିଚୟ)

କିଛୁଦିନ ଆଗେ “ଇଂଲିସମ୍ୟାନ” କାମଜେ ହଠାତ୍ ଚୋଖେ ପଡ଼ିଲ ଯେ
ବେହାରେର ବାସିତରେ ମଜକରପୁରେ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସଭା କରେ ମକଳେ ଏକମତ
ହୁଁ ନିସ୍ତରିଖିତ ପ୍ରକାଶ କ'ଟି ପାଶ କରିବେ ।

ପ୍ରଥମ । ଦେଶମୟ Compulsory Primary Education
ପ୍ରଚଲିତ ହୁଯା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ସିତିଆଯ । ପ୍ରତି ଚାରମାହିନ ଅନ୍ତର ଏକଟି କରେ Charitable
Dispensary ଥାକା ଚାଇ ।

ତୃତୀୟ । ପ୍ରଜାର ଦଖଲୀସବ୍ରବିଶିଷ୍ଟ ଜୋଡ଼ମାତ୍ରେଇ ସର୍ବବତ୍ର ଆଇନିତ
ହତ୍ସତ୍ୱ ବୋଗ୍ୟ ସଲେ ଗଣ୍ୟ ହୁଯା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଅର୍ଦ୍ଧ—ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର
ଜୋଡ଼ ଜମିଦାରେର ବିନା ଅନୁଯାତିତେଇ ପ୍ରଜାର ହତ୍ସତ୍ୱ କରିବାର ଅଧିକାର
ଥାବେ ।

ଚତୁର୍ଥ । ନିଜେର ଦଖଲୀ ଜମିର ପାଇ କାଟିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଜାର
ଥାବେ, ଅର୍ଦ୍ଧ—ଅକ୍ଷା ମେ ଗାହେର ମହାଧିକାରୀ ସ୍ଵରୂପେ ଶ୍ରୀରୂପ ହୁବେ ।

পঞ্চম। প্রজা অমিদারের বিনা অনুমতিতে নিজের দখলী অমিতে পুরুর কাটাতে পারবে, কুয়ো খুঁড়তে পারবে, কোঠাবাড়ী তৈরী করতে পারবে।

ষষ্ঠ। প্রজাৰ দখলীসত্ত্ববিশিষ্ট জোতেৰ জমাবৃকি কৱাৰীৰ অধিকাৰ অমিদারেৰ অতঃপৰ আৱ থাকবে না। অৰ্থাৎ—দখলী-সত্ত্ববিশিষ্ট জোতেৰ আইনত মৌৰসী-মোকৱৱী বলে গণ্য হবে।

প্রজা পক্ষেৰ প্ৰথম ছুটি দাবী যে শায় সে বিষয়ে কোনোৱোপ মত-ভেদ নেই। লোকশিক্ষাৰ বিস্তাৱেৰ জন্ম আজ বছৱ দশেক ধৰে সকল দলেৱ পলিটিসিয়ানৱা ত সমান চীৎকাৰ কৱছেন। এবং গৰ্ভ-মেণ্ট এ বিষয়ে আমাৰেৱ কথায় বিশেষ কৰ্ণপাত কৱেন না বলে' আমৰাও, সৱকাৰ কৰ্তব্যেৰ অবহেলা কৱেছেন বলে, তাঁৰ প্ৰতি নিত্য দোষাবোপ কৰি। তাৱপৰ প্রজাৰ রোগেৰ প্ৰতিকাৰ কৱা ও যে গৰ্ভ-মেণ্টেৰ কৰ্তব্য সে কথা গৰ্ভমেণ্টও মানেন। মণ্টেগু-চ্যাম্সফোর্ড রিপোর্টে প্ৰকাশ যে আৱ পঁচাবক জিনিসেৰ মধ্যে—*the provision of schools and dispensaries within reasonable distance,—these are the things that make all the difference to his life.*—

সুভূতি দেখা গেল যে প্ৰজাপক্ষ ও সৱকাৱপক্ষ এ বিষয়ে একমত। অমিদাৰ পক্ষও এ ক্ষেত্ৰে প্ৰতিপক্ষ নন। শ্ৰীযুক্ত ব্ৰহ্মকেশ চক্ৰবৰ্তী তাঁৰ পূৰ্বৰোক্ত পত্ৰে লিখেছেন যে বাঙলাৰ ভবিষ্যৎ গৰ্ভমেণ্টকে এই পুই কৰ্তব্য সৰ্বাপে পালন কৱতে হবে:—

1. Sanitation involving, as it must, ways and

means as to how she is to combat the scourges of malaria and cholera and other similar scourges.

অস্থার্থ—

“বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করতে হবে, অর্থাৎ—ম্যালেন্টিস কলেরা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে যুক্ত করবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।”

2. She will be further called upon to provide for the education of her children in the light of the recent University Commission Report.

অস্থার্থ—

“নিম্নের সন্তানদের শিক্ষা দেবার দায় বাংলার শাড়ে পক্ষে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিসনের রিপোর্ট অনুধাবী লোকশিক্ষারও ব্যবস্থা করতে হবে।”

বলা বাহ্যিক যে, মণ্টেগু-চ্যাম্সফোর্ড রিপোর্ট যা দু-কথায় বলেছে, অমিদার পক্ষ তাই একটু ঘুরিয়ে ও ফলিয়ে বলেছেন। এ দু-মতের ভিত্তি কিন্তু একটু গরমিল আছে। মণ্টেগু-চ্যাম্সফোর্ড রিপোর্ট চায় ডিস্পেন্সারি আর অমিদার পক্ষ চান দেশের আব-হাওয়ার পরিবর্তন। অবশ্য এ দু-ই চাই। তবে সর্বাগ্রে চাই রোগীকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা, সমগ্র দেশকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা পরে হবে। যদি আমরা হাত হাত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করি তাহলে Sanitation-এর দৌলতে দেশকে ষে-দিন স্বর্গ করে তুলব সে দিন হয়ত দেখব ষে দেশে আর মানুষ নেই, সবাইই ইতিমধ্যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে।

মণ্টেগু-চ্যাম্সফোর্ড রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে যে, স্কুল ডিস্পেন্সারি প্রভৃতি প্রজার জীবনকে একদম বদলে দেয়, অর্থাৎ—তার উন্নতি

ষট্টায়। শিক্ষা জিনিসটের প্রভাব শুধু জীবনের উপর নয়, মনের উপরও আছে। আজকের দনে দেশের প্রজাসাধারণের মনের অবস্থা কি ?

রাশিয়ার সম্বন্ধে একজন আর্শেন লেখকের বই মে দিন আমি পড়েছিলুম। রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ব্যাখ্যাতা উক্ত আর্শেন ভজ্জলোককে যা বলেছিলেন তার গুটিকয়েক কথা এখানে অনুবাদ করে দিচ্ছি।

—“আমার দেশের লোক অবিচারে অভাস। জনসাধারণের উপর অত্যাচার করা আর না করা বড়লোকের মর্জির উপর নির্ভর করে। আমরা হাজাৰ হাজাৰ বৎসৱ ধৰে এই ব্যবহারে অভাস হয়েছি, কাজেই আমরা সকল অন্তার অত্যাহিত অনুষ্ঠিৱ নিয়ম বলে মেনে নেই। যে শীলাবৃষ্টি তাদের শৰ্শ নষ্ট করে ও উপরওয়ালার যে অত্যাচারে তাৰা বক্ষিত ও পীড়িত হয়, রাশিয়ার ক্ষকদের কাছে এ দুঃখের ভিতৰ কোনই তফাত নেই, হ-ই এবজ্ঞাতীয় ষটনা। (Hugo Ganz-Le Debacle Russe).

আমি জিজ্ঞেস কৰি যে আমাদের ক্ষকদের মনোভাবের সঙ্গে রাশিয়ান ক্ষকদের মনোভাবের কোনো তফাত আছে কি ? এবং উভয়েই কি একজাত নয় ? একেই বলে ‘দাস’-মনোভাব। আর আমার যতে মনের দাসহই হচ্ছে সব চেয়ে সর্ববেশে দাসহ। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ এই যে তাৰ প্রসাদে মানুষ মনেও মানুষ হয়ে উঠবার সুযোগ পাব। অজ্ঞতাৰ সঙ্গে মনের দাসত্বেৰ যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। স্বতুরাঃ গ্রামে আমে স্কুল যসালে আশা কৰা যেতে পারে যে, আমাদেৱ প্রজাসাধারণেৰ মনেৱ আব-হাওয়া বদলে যাবে। শিক্ষা জিনিসটে আসলে মনেৱ sanitation বই আৱ কিছুই নয় ! মন্টেজ-চাম্সকোর্ড রিপোর্টে রায়তেৰ সম্বন্ধে বলা হয়েছে :—

“His mind has been made up for him by his land-lord or banker or his priest or his relatives or the nearest official”—

ଅର୍ଧୀ—ରାସତେର ମନ, ହୁଏ ଡାଇ ଅମିଦାର ନୟ ତାର ମହାଜନ, ହୁଏ ତାର ପୁରୁଷ ମନ୍ଦିର ତାର ଆଶ୍ରୀଯ-ସଙ୍ଗନ ଆର ନା ହୁଏ ହାତେର ଗୋଡ଼ାର ସେ ରାଜପୁରୁଷ ଥାକେମ ତିନି ଗଡ଼େ ତୋଲେନ ।

ଆଶା କରା ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ପେଲେ ରାସତେରରେ ନିଜେର ମନ ବଲେ ଏକଟା ଜିନିମ ଅନ୍ଧାବେ ।

ଦେଖା ଗୋଲ ସେ ରାସତେର ଶିକ୍ଷାର ଦାବୀ ଓ ସ୍ଵାହ୍ୟେର ଦାବୀ ମକଳେଇ ମଞ୍ଜୁର କରେନ, କିନ୍ତୁ ତାଦେର ସବେର ଦାବୀର କଥା କାଣେ ଢୋକବାମାତ୍ର ଚମକେ ଉଠେନ ଏମନ ଲୋକେର ଏ ଦେଶେ ଅଭାବ ନେହି । ଶୁଦ୍ଧ ଡାଇ ନୟ, ଏଂଦେର ମଧ୍ୟ ଅନେକେ ଆବାର ପ୍ରଜାର ପକ୍ଷ ଯାରା ସମର୍ଥନ କରନ୍ତେ ଉତ୍ତତ ହନ ତୁମେର ସୁଧି ଓ ଚରିତ୍ରେର ଉପର ନାନାକୃପ ମୋଷାରୋପ କରନ୍ତେ ତିଳମାତ୍ର ହିଧା କରେନ ନା । ସେ ପ୍ରଜାର ଅଧିକାରେର କଥା ତୋଲେ, କାହାରେ ମତେ ମେ Bolshevist ; କାହାରେ ମତେ ମେ ଚିରହାୟୀ ବନ୍ଦୋବନ୍ଦେର ଶକ୍ତି, ଆବାର କାରି ଓ ମତେ ବା, ମେ ଏକ ସଂପ୍ରଦାୟେର ସଙ୍ଗେ ଆର ଏକ ସଂପ୍ରଦାୟେର ମାର୍ଯ୍ୟା-ମାର୍ଯ୍ୟା କାଟାକାଟିର ପକ୍ଷପାତୀ ।

ଏହା ଯଦି ଏକଟୁ ଭେବେ ଦେଖେନ ତାହଲେଇ ଦେଖିତେ ପାବେନ ଯେ, ଏ ମକଳ ଅପରାଧ କରୁଥିଲା ଅମୁଲକ । ପ୍ରଥମତ Bolshevist ଜନ୍ମଟି ସେ କି ତା ତୀର୍ତ୍ତା ଓ ଜାନେନ ନା, ଆମରୀ ଓ ଆନି ନେ । ଜୁଜୁର ଭୟ ଭାବରେ କରିବାର ପକ୍ଷେ ମେଧାନୋ ଅମୁଚିତ, ମେଧା ଓ ଛେଲେମି ।

ବିତୀନ୍ତ । ଚିରହାୟୀ ବନ୍ଦୋବନ୍ଦେ ତୁଲେ ଦେବାର ପ୍ରତ୍ଯାବ କରା ଆମାଦେର

পক্ষে শুর্ঘ্যতা হবে। কেননা উক্ত বল্লোবস্তে প্রজার কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতি হচ্ছে State-এর। সমস্ত বাংলা কাল সরকারের খাসমহল হলে প্রজার দেয়-ধার্জনা কমবার কোনই সম্ভাবনা নেই। স্বতরাং প্রজার তরফ থেকে সে প্রার্থনা কেউ করবে না।

তৃতীয়ত। নতুন অধিকারের দাবী যে-কেউ করে তার বিরুদ্ধে সকল দেশে চিরকালই ঐ ঘর-ভাড়ানোর মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। এ স্থলে কথাটা একটু ব্যক্তিগত হলেও আমি তা বলতে বাধ্য। বাংলার জমিদার সম্পদায়ের বিরুদ্ধে কোনোরূপ কু-সংস্কার আমার নেই, আর থাকতে পারে না। আমার আজুৱা-স্বজ্ঞন, জাতি-কুটুম্ব—সবাই জমিদার, কেউ বড় কেউ ছেট কেউ মাঝারি। আমি অস্বাবধি এই অমিদারের আবহাওয়াতেই বাস করে আসছি। স্বতরাং সে সম্পদায় আমার যতটা অস্তরঙ্গ অপর কোনো সম্পদায় ততটা নয়। জমিদারের উপর বক্ষিমচন্দ্র যে আক্রমণ করেছিলেন সে আক্রমণ আমি করতে পারি নে, কেননা আমি আনি যে সে আক্রমণ অস্থায়। ভালমন্দ লোক সকল সম্পদায়েই আছে কিন্তু এ কথা তোর করে বলতে পারা যায় যে সাধারণত জমিদারের দল অর্থলোক্তী নয়। জমিদার আর যাই হোক, মহাজন নয়। আমি বাড়ানোর চাইতে ব্যয় বাড়ানোর দিকেই এ সম্পদায়ের খোক বেশি। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, প্রজার সত্ত্বের দাবী মন্তব্য করতে অমিদারমাত্রেই নারাজ হবেন না। হংসত ছ-দিন পরে দেখা যাবে যে, অমিদারেই প্রজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হংস দাঢ়িয়েছেন।

রায়তের প্রোগ্রামের বাকী ক'টি দাবী যদি গ্রাহ হয় ত. আমার বিশ্বাস তার দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারে। অতএব দাবী-গুলির পর পর বিচার করা যাক।

দাখিলসম্ভবিশ্বিত জোত হস্তান্তর যোগ্য, কিন্তু নয় এ প্রশ্নের উত্তরে আইন এখন প্রথা দোহাই দেয়। আইনের কথা হচ্ছে যে, যে-জেলায় উক্ত জোত হস্তান্তর করবার প্রথা আছে—সে জেলায় সে জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতে রায়ত হস্তান্তর করতে পারে—আর যে জেলায় সেরূপ প্রথা নেই সেগুলো তাব দান বিক্রয় অমিদার ইচ্ছে করলে গ্রাহ করতে পারেন, ইচ্ছে করলে অগ্রাহ করতেও পারেন।

কিন্তু আসলে যটমা কি আনো?—ও-জোত সমগ্র বাঙ্গলায় নিত্য নিয়মিত হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং অমিদারও তা মেনে নিচ্ছেন, কেননা তাতে তাঁর লাভ আছে। তবে অমিদার যে প্রথা দোহাই দেন সে শুধু দাখিল-খারিজের মোটা রুক্ম সেলামি আদায় করবার অন্ত। কোথায়ও বা জোতের খরিদা মূল্যের চোখ আদায় করা হয়, কোথাও বা অমার পাঁচ থেকে দশগুণ পণ। এ বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই—যাঁর যে-রুক্ম প্রবৃত্তি ও শক্তি, তিনি এই স্থৈর্যে প্রজাকে সে অনুসারে হুয়ে নেন। যে সম্প্রদায়ের সাত্ত্বে অনের মধ্যে সন্তুষ্ট বাবোয়াসে একদিনও পেটভরে খেতে পায় না, তাদের একপ দোহন করা যে অত্যাচার, এ কথা যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে সে কখনই অস্বীকার করতে পারবে না। তা ছাড়া, এই দাখিল-খারিজসূত্রে প্রজাকে যে কি পর্যাপ্ত হয়রান-পরিশান করা যায় ও করা হয়, তা অমিদারী সেইস্তার সঙ্গে যাঁর কোনোরূপ সাক্ষাৎ সন্দেশ

আছে তিনিই আননেন। সাধিল-খারিজের আধীনের অধিদায়িত্বে কাছাকাছিতে যাতায়াত করতে করতে পায়ের নড়ি ছিঁড়ে যায়। খোত-খরিদায়ির পক্ষে অধিদায়ির সেরেন্টায় নামপত্র করার চাইতে বিয়ে করা কম কথায় হয়, যদিচ, বিয়ের অন্ত লাখ কথা চাই। এ অবস্থায় বেচারার কাছ থেকে নায়েব-গোমস্তা জমানবৌশ স্বমোর-নবৌশ পাইক বয়কল্পাজ যে পারে সেই ঘোচড় দিয়ে ছ-পয়সা আদায় করে নেয়। স্বতরাং তার এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার প্রস্তাব করলে আশাকরি Bolshevism-এর পরিচয় দেওয়া হয় না।

তার পর নিজের খোতের গাছ কাটিবার অধিকার। যার নিজের বোনা-শুভ্র কাটিবার অধিকার আছে তার নিজের পোতা-গাছ কাটিবার অধিকার যে কেন ধাকবে না তা আমার বুকির অগম্য। কিন্তু এ কথা বলতে গেলেই আইনের তর্ক উঠবে।—উকিল বাবুরা আমাদের Transfer of Property Act পড়ে স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির প্রভেদটা শিখে নিতে বলবেন। কিন্তু তার উন্তরে আমি বলব যে বাড়ির রায়তকে যদি মানুষ করতে চাও ত property সংকে অনেক শেখা বিষ্টে ভুলতে হবে। বেঁচে থাকবার অঙ্গে, প্রজার আয় কাটালের তক্ষার প্রয়োজন আছে—শোবার তক্ষাপোষের অঙ্গে, ছুরোরের কপাটের অঙ্গে, চালের খুটির অঙ্গে; আর যদি বলো যে তাদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই তাহলেও তাদের কাঠের দরকার আছে—মলে পোড়াবার অঙ্গে। যেমন মুসলমান প্রজার সাড়ে তিন হাত অধিতে অধিকার আছে—তার গর্জে অন্ত শ্রেণীর শত্রু করবার অঙ্গে। স্বতরাং গাছ কাটাটা এমন কিছু অপরাধ নয় বাব অঙ্গে তাকে অরিমানা দিয়ে হবে। তার দারিজের কথাটা,

the ruling power to protect all classes of people, and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor-General in Council will, whenever he may deem it proper, enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of the dependent taluqdars, raiyats and other cultivators of the soil.—” (Vide. cl. I, s. 8, reg. I of 1793).

দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রতিজ্ঞা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোটেই পালন করেন নি; যদিচ রাজা রামমোহন রায় ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে পার্লিমেন্টারি কমিটিকে কোম্পানী বাহাদুরের এই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কোম্পানীর আমল শেষ হয়ে যখন মহারাণীর আমল স্থার হল তখন উক্ত আইনের ৮ ধারার আশ্রয়ে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্য আইন পাশ করা হল। এই হচ্ছে Tenancy Act-এর প্রথম সংস্করণ। এই আইন অবশ্য কালক্রমে অনেক পরিমাণে সংস্কৃত ও পরিবর্কিত হয়েছে, তা সঙ্গেও এ আইনের প্রসাদে যে, শুধু মামলা বেড়েছে তার কারণ, ইংরাজিতে যাকে বলে half-measures ; অর্থাৎ—আধা-খেঁড়া ব্যবস্থা, ত্বর ক্রমে শুধু নৃতন উপস্থিতির সৃষ্টি হয়।

আজক্ষের দিনে প্রজার সকল দাবী আইনত গ্রাহ হলে, প্রজা যে হাঁকহেড়ে বাঁচবে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই এবং জমিদার-বর্গের নিকট আগামুর সন্দৰ্ভে প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ বিষয়ে প্রজার

প্রতিপক্ষ না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঢ়াবে আজকের
দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে একথা ভরসা করে বলা
যায় যে, গত যুক্তের প্রবল ধাকায় সকল সমাজের, কি আর্থিক
কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে” গেছে;
স্তুতরাঃ আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে
শুরু না করি তাহলে দু-দিন বাদে হয়ত দেখতে পাব যে
আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায়
দাঢ়িয়েছি। বহুকাল পূর্বে বঙ্গিমচন্দ্র জমিদারদের সম্বোধন করে
বলেছিলেন :—

“তুমি যে উচ্চকুলে অশ্রিয়াছ, সে তোমার শুণে নহে, অন্ত যে নীচকুলে
অশ্রিয়াছে সেও তাহার দোষ নহে। অতএব পৃথিবীর স্বত্ত্বে তোমার যে অধিকার,
নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার স্বত্ত্বের বিস্তারী হইও না, যদে
থাকে যেন সে তোমারই ভাই—তোমার সমকক্ষ। বিনি শাস্ত্রবিকল্প আইনের
দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মৌর্দিও প্রতাপাদিত ইহারাজাধিয়াজ
উপাধি ধারণ করেন, তাহারও যেন স্বত্ত্ব থাকে যে বহুদেশের কৃষক পরাণ যশো
তাহার সমকক্ষ এবং তাহার ভাতা—”

তিনি আরও বলেন যে :—

“একশে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ এবং মূর্ধের নিকট হাস্তের
কারণ। কিন্তু একদিন এইক্ষণ বিধি পৃথিবীর সর্বত্র চলিবে—”

বঙ্গিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জানো ?—ইংরাজিতে
থাকে বলে Communal property. একশে আমার বক্তব্য এই যে,
ইতিমধ্যে আমরা যদি বাড়িলার প্রাক্তে peasant proprietor না

৬ষ্ঠ বর্ষ, রামশ মংখা

রায়তের কথা

করি আহলে বঙ্গিমচন্দ্রের ভবিষ্যত্বানী সার্থক হতে আর বড় বেশি দিন লাগবে না। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে কেউ মনে করবেন না যে, আমি সাম্প্রদায়িক বিবাদের সূত্রপাত করেছি। সাম্প্রদায়িক বিরোধ হতে বাঙালী সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রায়তের সঙ্গে অমিদাঁরের co-operation-এর যে প্রয়োজন আছে, এই হচ্ছে আমার আসল বক্তব্য।—

শ্রীপ্রয়থ চৌধুরী



